বাংলাদেশের উপন্যাসে সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্নোর ঘটনাক্রম : রাজনৈতিক চিন্তার স্বরূপ

(Chronicle of Events Ranging from 1947 to 1952 in the Novel of Bangladesh : Patterns of Political Thoughts)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মো. রাফাত আলম মিশু

রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও সেশন : ২২/২০১৭-২০১৮

পুনঃরেজিস্ট্রেশন : ৮২/২০২১-২০২২

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম

বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা ১০০০

বাংলা বিভাগ ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অক্টোবর ২০২৩

Dhaka University Institutional Repository

তারিখ : ৩০.১০.২০২৩

ঘোষণাপত্র

‘বাংলাদেশের উপন্যাসে সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্নোর ঘটনাক্রম : রাজনৈতিক চিন্তার স্বরূপ’ শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব রচনা। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। সহায়ক যে-সব তথ্য ও উপাত্ত অন্য উৎস থেকে গৃহীত হয়েছে, সেগুলোর সূত্র যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশিষ্ট বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত আমার নিজের।

আমি এই মর্মে আরও অঙ্গীকার করছি যে, এই অভিসন্দর্ভে কোনো প্রকার Plagiarism বা কুম্ভিলকবৃত্তি নেই।

মো. রাফাত আলম মিশু ৩০।১০।২০২৩
(মো. রাফাত আলম মিশু)

পিএইচডি গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও সেশন : ২২/২০১৭-২০১৮
পুনঃরেজিস্ট্রেশন : ৮২/২০২১-২০২২
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

তারিখ : ৩০.১০.২০২৩

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মো. রাফাত আলম মিশু কর্তৃক উপস্থাপিত 'বাংলাদেশের উপন্যাসে সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্নোর ঘটনাক্রম : রাজনৈতিক চিন্তার স্বরূপ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেননি।

আরও প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, এই অভিসন্দর্ভে কোনো প্রকার Plagiarism বা কুম্ভিলকবৃত্তি নেই।

৩০/১০/২০২৩

(ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম)

গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ (Abstract)

পিএইচডি গবেষণার শিরোনাম

বাংলাদেশের উপন্যাসে সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্নোর ঘটনাক্রম : রাজনৈতিক চিন্তার স্বরূপ

গবেষক

মো. রাফাত আলম মিশু

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সাতচল্লিশের রাজনীতি ও বায়ান্নোর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের রয়েছে সবিশেষ গুরুত্ব। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসেও এই কালপর্বের রাজনৈতিক ঘটনাক্রম তাৎপর্যের সঙ্গে গৃহীত হয়। বাংলাদেশের সাহিত্যের অভিযাত্রাও ১৯৪৭ থেকে শুরু হয়। ১৯৪৭-এর রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ বাংলাদেশের সাহিত্যকে স্বতন্ত্র পরিচয়ে পরিচিহ্নিত করে। সাহিত্যের একটি শাখা হিসেবে উপন্যাসের গুরুত্ব এইখানে যে, উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তৈরি হয় একটি জনগোষ্ঠীর জীবনভাষ্য। মূলধারার রাজনৈতিক ইতিহাসের অন্যতম অনুষঙ্গে পরিণত হয় উপন্যাসের বয়ান। তাই নব্যইতিহাসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে একটি জাতির ইতিহাস নির্মাণে উপন্যাসের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। রাজনৈতিক ইতিহাসের এই দুই দিক-নির্ণয়ী কালপর্ব বাংলাদেশের উপন্যাসেও বহুমাত্রিক তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত থাকে। আলোচ্য সময়ের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভাষারূপ পাওয়া যায় বাংলাদেশের প্রারম্ভিক পর্বের ঔপন্যাসিকদের অনেক উপন্যাসে। ১৯৪৭-পূর্বাপর রাজনীতি সচেতন লেখককুলকে প্রভাবিত করেছিল দারুণভাবে; তার ভাষিক রূপায়ণ ঘটেছে তাঁদের সৃষ্টিশীল রচনায়। উপন্যাস পাঠের ক্ষেত্রে কেবল ঘটনাক্রমই পাওয়া যায় না; বরং উপন্যাসে প্রতিফলিত বিভিন্ন শ্রেণি-অবস্থান, ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থান – সর্বোপরি রাজনৈতিক চিন্তার বহুমাত্রিক প্রকাশ লক্ষ করা যায়। সাতচল্লিশ ও বায়ান্নোর রাজনীতির আবেদন বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে এতটা প্রভাবসঞ্চারী যে, তৎকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উপন্যাসে সেই রাজনীতিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ সহযোগে বিচারের আওতায় আনা হয়েছে। বর্তমান অভিসন্দর্ভে উপন্যাস পাঠের মধ্য দিয়ে আলোচ্য ঐতিহাসিক সময়পর্বে বাংলাদেশের জনমানুষ ও সচেতন সাহিত্যিকদের মধ্যে যে রাজনৈতিক চিন্তার রূপ-রূপান্তর ঘটেছে, তা অনুসন্ধান করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায় 'পরিপ্রেক্ষিত' অংশে আলোচিত হয়েছে সাতচল্লিশ-পূর্ববর্তী বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং বাংলা উপন্যাসের পরম্পরা। ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার অনুসন্ধানে বাংলার রাজনীতির পাশাপাশি এসেছে সর্বভারতীয় রাজনীতির কিছু অনিবার্য প্রসঙ্গ। এই অধ্যায়ের প্রথম অংশে অখণ্ড বাংলার ধারণার পাশাপাশি পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশের ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য আলোচিত হয়েছে। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে আলোচিত হয়েছে বাংলাদেশের উপন্যাসের পূর্বসুরিদের বিবেচনা। স্বতন্ত্র সাহিত্যধারা হিসেবে উপন্যাসের সংজ্ঞায়ন ও স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য আলোচনাপূর্বক বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের ধারায় এই জনাঞ্চলের অবস্থান নিরূপণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। 'বাংলাদেশের উপন্যাসে রাজনৈতিক চিন্তার স্বরূপ' শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায় চারটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত হয়েছে। পূর্ববর্তী প্রথম অধ্যায়ের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতকে বিবেচনায় রেখে উপন্যাস পাঠের অনুষঙ্গে কয়েকটি কালখণ্ডের মধ্য দিয়ে সাতচল্লিশ-কেন্দ্রিক রাজনীতির স্বরূপ বিশ্লেষণের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। চল্লিশের দশকে উদ্ভূত ভারতীয় জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বিপরীতে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনীতির পরস্পরবিরোধী প্রতিযোগিতা ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে দরকষাকষি জনমানুষের বিশ্বযুদ্ধ-মন্বন্তরকেন্দ্রিক বিপর্যয়কে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারেনি। বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি উপন্যাসে সেই বিচিত্রমাত্রিক মূল্যবোধগত বিপর্যয়ের ভাষিক রূপায়ণ ঘটেছে। জনসমাজের মধ্যে ব্যক্তিভেদে শ্রেণিগত অবস্থান, স্থানগত অবস্থানের ভিত্তিতে কীভাবে বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তরের বাস্তবতা ও রাজনীতির শিকার হয়েছে এবং মোকাবিলা করেছে – নির্বাচিত উপন্যাসের বয়ানে – তা বিশ্লেষিত হয়েছে। উপন্যাসপাঠের মধ্য দিয়ে সেই চল্লিশের দশকের রাজনীতির ঘটনাক্রমে জন্ম নেওয়া স্বাধীনতার স্বপ্ন ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সঙ্গে ব্যক্তির ও জনমাজের সম্পৃক্ত হওয়ার আর্থসামাজিক বাস্তবতা আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়েছে। কোন অর্থনৈতিক কাঠামো ও সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে ব্যক্তিকে স্বাধীনতার কথা ভাবতে হয় নতুন চিন্তা থেকে, কখনো কখনো যার নামকরণ হয়ে যায় 'সাম্প্রদায়িকতা' তা উপন্যাসের বয়ানে যেমন ধরা দেয়, তেমনি ঔপন্যাসিকের রাজনৈতিক অবস্থানও সেখানে প্রকাশিত হয়।

চল্লিশের দশকের রাজনীতির সবচেয়ে বড় ঘটনা দেশভাগ। দেশভাগেরই ক্ষতদীর্ণ ফলাফল উদ্বাস্তু সংকট। গবেষণায় 'দেশভাগ' শব্দটির তত্ত্বীয়, পরিভাষাগত ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দেশভাগ কাঙ্ক্ষিত না হলেও যে তা ছিল অনিবার্য পরিস্থিতি, উপন্যাসের চরিত্রের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সেটি উন্মোচিত হয়েছে। দেশভাগের ফলে বাংলার দুই অংশের জনমানুষই আক্রান্ত হয়েছে। দেশভাগের ফলে কোন কোন শ্রেণি সুবিধাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং কোন কোন শ্রেণি হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

সুবিধাবঞ্চিত, তা উপন্যাসের বয়ানে উন্মোচিত হয়েছে। দেশভাগের ফলে যে উদ্বাস্তু পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক কারণে পূর্ববঙ্গে সেই পরিস্থিতির স্বাতন্ত্র্য আছে। দেশভাগ কেবল ওই কালপর্বের সীমায়িত ছিল না; বরং এক প্রলম্বিত দেশভাগের ক্ষত বাস্তব জীবনে ও স্মৃতিসত্তায় বিরাজমান, তা ব্যক্তির আত্ম-উন্মোচন ও অস্তিত্ব-অন্বেষার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

সাতচল্লিশ-পরবর্তী তথা দেশভাগ-পরবর্তী পূর্ববাংলার আর্থসামাজিক রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনার মাত্রাগত বৈচিত্র্য রয়েছে। সাতচল্লিশ-পরবর্তীকালে নতুন রাষ্ট্রীয় কাঠামো পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তি পূর্ববাংলার জনমানুষকে মুখোমুখি করে বহুমাত্রিক আর্থরাজনৈতিক জিজ্ঞাসার। এর অব্যবহিত প্রসঙ্গ হিসেবে উপস্থিত থাকে এই জনাঞ্চলের বৃহত্তর তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর জাতীয়তার প্রসঙ্গ। রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত ও নীতি উপরিতলের একটি বড় বিষয় হলেও সমাজের বিভিন্ন স্তরে শ্রেণিগত, জীবিকাগত অনেক ধরনের শোষণচিত্র পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের উপন্যাসে এই স্তরবহুল সংকট প্রাধান্য পেয়েছে। সাতচল্লিশ-পরবর্তী আর্থরাজনৈতিক পরিস্থিতির ইতিহাস সমর্থিত তথ্য উল্লেখের পাশাপাশি জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত বিভিন্ন চিন্তা ও মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উপন্যাসে প্রতিফলিত রাজনৈতিক চিন্তাকে সূত্রবদ্ধ করতে ইতিহাস ও রাজনীতির সঙ্গে ঔপন্যাসিকদের শিল্পসত্তার সম্পর্ক আলোচনাসূত্রে তাঁদের জন্ম, পেশাগত ও রাজনৈতিক অবস্থান চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ধারার সমান্তরালে ঔপন্যাসিকদের ইতিহাসচেতনা ও রাজনৈতিক বোধের রূপান্তরের সূত্রও অনুসন্ধান করা হয়েছে।

এই গবেষণায় পদ্ধতিগতভাবে প্রধানত দুইটি দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হয়েছে – নব্য-ইতিহাসবাদী সমালোচনা পদ্ধতি এবং পাঠ-বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি। ইতিহাসের পাঠ ও উপন্যাসের সাহিত্যিক পাঠের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উপন্যাসপাঠের সঙ্গে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উপন্যাসের একাধিক অনুষঙ্গকে বিভিন্ন সাহিত্যিক তত্ত্ব ও মতবাদ দ্বারা যাচাই করা হয়েছে। ইতিহাসের ঘটনাক্রম এবং উপন্যাসে ইতিহাসের রূপায়ণ সমান্তরাল বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনুসন্ধান করা হয়েছে। সাতচল্লিশ-কেন্দ্রিক রাজনীতি ও ইতিহাসের ভাষ্যের মতো উপন্যাসের বয়ানের বড় অংশ জুড়ে থাকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, দেশভাগজনিত তথা দেশহারানো ও দেশবদলের ক্ষত-ক্ষতি; অপর বিবেচনায় নতুন রাষ্ট্রপ্রাপ্তির ক্ষণিক আনন্দ এবং আত্মসত্তা-অনুসন্ধানের নব-অভিযাত্রা।

Dhaka University Institutional Repository

এই গবেষণার অন্যতম দিক – বাংলাদেশের উপন্যাসের স্বতন্ত্র বয়ানের সন্ধান, যাকে অভিহিত করা যায় সাতচল্লিশ-কেন্দ্রিক রাজনীতির বিকল্প নন্দন হিসেবে। উপন্যাসের অন্যতম শর্ত অন্তর্বাস্তবতা তথা ব্যক্তির একক উন্মোচনের চেয়েও বাংলাদেশের উপন্যাস অনেক বেশি বহির্মুখী বাস্তবতার রূপায়ণ দিয়ে যাত্রা শুরু করে; ব্যক্তি উপস্থিত হয় সমষ্টির বড় পরিধিতে। বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকরা শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস থেকে নিজের কথা, সমষ্টির কথা তথা বাংলাদেশের জনসমাজের কথা বলতে গিয়ে ইতিহাসের নির্মম ও জটিল সময়পর্বকে দেখার স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ নির্মাণ করেছেন। বাংলাদেশের রাজনীতি যে অনেকখানি মধ্যশ্রেণিসাপেক্ষ – উপন্যাসেও তার প্রতিফলন দেখা যায়। তবে রাজনীতি মধ্যবিত্তের নিয়ন্ত্রণে থেকেও পাকিস্তান-আন্দোলন যে অপরাপর নিম্নবর্গের ও প্রান্তিক পেশাজীবী মানুষকে যুক্ত করতে পেরেছিল, তারও ঐতিহাসিক সমর্থন আছে। বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকগণ দেশভাগকে বাংলাভাগ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এবং ক্রমাগত এই দেশভাগের বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু অখণ্ড বাংলা যে একটি দেশ, এই ধারণা তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেননি। বরং চেতনে বা অবচেতনে পূর্ববাংলা যে অপর অংশ থেকে অনেক দিক থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, সেটিই রূপায়িত হয়েছে – কী জীবনবিন্যাসে, কী অর্থনৈতিক কাঠামোতে, কী খাদ্যাভ্যাসে, কী ভাষা প্রয়োগে। মূলত দেশভাগের প্রক্রিয়ার ফলে জনজীবনে যে সামূহিক বিপর্যয় নেমে এসেছিল, সেটাই ছিল মুখ্য বিবেচনার বিষয়। কিন্তু তাতে এক বাংলার ধারণা স্পষ্ট হয়নি। পাকিস্তান-আন্দোলনের অব্যবহিত পূর্বে বাংলা অঞ্চলের রাজনীতির অন্যতম অনুষঙ্গ ছিল মন্বন্তরের বাস্তবতা। মন্বন্তর পুরো বাংলা অঞ্চলকে আক্রান্ত করলেও কলকাতা শহরে আক্রান্তির বিষয়টি ছিল দৃশ্যমান। ফলে বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকদের একটা বড় অংশ মন্বন্তরকে উপস্থাপন করেছেন কলকাতার পটভূমিতে। আর যেসব উপন্যাসে পূর্ববাংলা এসেছে, সেখানে শ্রেণিগত অবস্থান গুরুত্ব পেয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী ইতিহাস বিনির্মাণের সমান্তরালেই যে বাংলাদেশের উপন্যাস বিকশিত, তারও দৃষ্টান্ত মেলে ওই কালপর্বের ঘটনাক্রম সম্বলিত উপন্যাসপাঠে। তবে জাতীয়তাবাদ নির্মাণ প্রক্রিয়া বা এর যাত্রাপথের একাধিক ও বিচিত্র মাত্রাকে কার্যকারণের ভিত্তিতে দেখবার চেষ্টা করা হয়েছে। বলা যায়, বাংলাদেশের উপন্যাসের বয়ানে নির্মিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বতন্ত্র স্বর; রাজনীতি-সচেতনতার সামূহিক অভিজ্ঞান।

বাংলাদেশের উপন্যাসে সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্নোর ঘটনাক্রম : রাজনৈতিক চিন্তার স্বরূপ

মো. রাফাত আলম মিশু

সূচিপত্র

ভূমিকা	১০
প্রথম অধ্যায় পরিপ্রেক্ষিত	২১
দ্বিতীয় অধ্যায় বাংলাদেশের উপন্যাসে রাজনৈতিক চিন্তার স্বরূপ	
প্রথম পরিচ্ছেদ বিশ্বযুদ্ধ-মন্বন্তর ও জনমানুষ	৫১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ স্বাধীনতার স্বপ্ন ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি	৮১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ দেশভাগ ও উদ্বাস্তু-সমস্যা	১৪২
চতুর্থ পরিচ্ছেদ সাতচল্লিশ-পরবর্তী আর্থরাজনৈতিক জিজ্ঞাসা, জাতীয়তা ও ভাষা আন্দোলন	২০০
উপসংহার	২৭৪
গ্রন্থপঞ্জি	২৮২

ভূমিকা

ভূমিকা

১৯৪৭ এবং ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে দুই যুগনির্ণায়ক সাল। এই সাল দুটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাংলাদেশের বিশেষত তৎকালীন পূর্ববঙ্গে বসবাসকারী বৃহত্তর জনমানুষের জাতীয়তাবোধ সংক্রান্ত পরিচয় নির্মাণের ইতিহাস। বাংলাদেশের উপন্যাসের আলোচনা ১৯৪৭ থেকে শুরু করা হয়; এটি প্রতিষ্ঠিত ধারণা। যদিও ১৯৭১ সালে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' নামক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় কাঠামো তৈরি হয়। তদুপরি, প্রচলিত বয়ানে ১৯৪৭-পরবর্তী ঢাকা-কেন্দ্রিক সাহিত্য তার সংগ্রামী জীবনচেতনার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যকে একটি স্বতন্ত্র পরিচয় দান করে। ১৯৪৭-কেন্দ্রিক রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন পূর্ববঙ্গের অনেক সাহিত্যিক। যেমন : আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯), সত্যেন সেন (১৯০৭-১৯৮১), শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮), সরদার জয়েনউদ্দীন (১৯১৮-১৯৮৬), মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১), শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৭-১৯৭১), আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯), জহির রায়হান (১৯৩৫-১৯৭২) প্রমুখ। তাঁরা রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করেছেন। যেমন, সরদার জয়েনউদ্দীন তাঁর *অনেক সূর্যের আশা* (১৯৬৮) উপন্যাসের ভূমিকাংশে লিখেছেন (২০১২ : ৭): 'সেসব দিনের অনেক ঘটনা চাক্ষুষ দেখবার দুর্ভাগ্য আমার হয়েছে; সেগুলো আঘাত করেছে আমার মানসপটে, হৃদয়ে। এ উপন্যাস সেসব মনোবেদনারই জীবন্ত চেতনা বা ভাষারূপ।' আলোচ্য সময়ের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভাষারূপ পাওয়া যাবে বাংলাদেশের প্রারম্ভিক পর্বের ঔপন্যাসিকদের অনেক উপন্যাসে। ১৯৪৭-পূর্বাপর রাজনীতি সচেতন লেখককুলকে প্রভাবিত করেছিল কার্যকরভাবে, তার ভাষিক রূপায়ণ ঘটেছে তাঁদের সৃষ্টিশীল রচনায়। একথা ঠিক, উপন্যাস ইতিহাসের সংবাদপত্রীয় বিবরণমাত্র নয়; কিন্তু একটি বিশেষ কালে, বিশেষ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মুহূর্তে সৃষ্টিশীল মানুষের চেতনা ও সৃজনকর্ম মূলত ইতিহাসেরই সৃষ্টি। ভারতীয় বঙ্গ তথা পশ্চিমবঙ্গ এবং বর্তমান বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ঔপন্যাসিকরা তাঁদের সৃজনের উপাদান হিসেবে সাতচল্লিশ-কেন্দ্রিক রাজনৈতিক ঘটনাক্রমকে গুরুত্বের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। ১৯৪৭ ও এরপর ১৯৫২-এর মতো দুই বড় ঘটনা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার সঙ্গে বাংলাদেশের জনাঞ্চলের দৃষ্টিকোণের যুক্ততা ওই কালপর্বের ইতিহাসের পাঠকে সামূহিক ও সম্পূর্ণ করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। উপন্যাস একটি শিল্প-রূপকল্প; এই রূপকল্পের বয়ান একটি জনজাতির মহাবয়ানের অন্যতম অনুষঙ্গ। একটি জাতির রাজনৈতিক ইতিহাসের অনিবার্য

উপাদান হিসেবে সামাজিক-অর্থনৈতিক-মনস্তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ উপন্যাসে উপস্থিত থাকে। বর্তমান অভিসন্দর্ভে মূলত উপন্যাস পাঠের মধ্য দিয়ে আলোচ্য ঐতিহাসিক সময়পর্বে বাংলাদেশের জনমানুষ ও সচেতন সাহিত্যিকদের মধ্যে যে রাজনৈতিক চিন্তার রূপ-রূপান্তর ঘটেছে, তা অনুসন্ধান করা হবে।

১৯৪৭-এর রাজনীতি ও তার অব্যবহিত রূপান্তরের ইতিহাস বাংলাদেশের উপন্যাসে বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। বিশেষত আলোচ্য কালের ঘটনাপ্রবাহকে উপজীব্য করে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বাংলাদেশ-ভূখণ্ডে অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যেসব উপন্যাস রচিত হয়েছে, তাতে সেই সময়কার রাজনৈতিক চিন্তা অনেক সতেজ ও প্রাণবন্ত হয়ে ধরা দেয়। এরপরে আরও অনেকে এই ঘটনাক্রম অবলম্বনে উপন্যাস রচনা করেছেন। বাংলাদেশের উপন্যাসসমূহের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত স্বাতন্ত্র্য লক্ষযোগ্য। ১৯৪৭-এর রাজনৈতিক চেতনা ছিল ক্ষণস্থায়ী ও ভঙ্গুর। ১৯৫২-তে এসে নতুন রূপে তা গতিপ্রাপ্ত হয়েছে। তাই উক্ত সময়ের বাঙালির রাজনৈতিক চিন্তার স্বরূপ আবিষ্কার একটি তাৎপর্যবহ বিষয়। আমরা সেই আবিষ্কারটি করতে চাই বাংলাদেশের উপন্যাসে আলোচ্য ঘটনাক্রম যে-ভাষারূপ পেয়েছে, তার বিশ্লেষণ থেকে। কারণ উপন্যাস এমন এক শিল্পমাধ্যম যা একটি কালের একটি জনাঞ্চলের জীবনজিজ্ঞাসা ও জীবনদর্শনের ভাষারূপ। সময়ের প্রতিনিধি হিসেবে একজন ঔপন্যাসিক স্বজাতি ও স্বকালের ভাষাকে রূপদান করেন।

বাংলা উপন্যাসে রাজনীতি নিয়ে একাধিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাজমা জেসমিন চৌধুরী রচিত *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি* (১৯৮০); এটি তাঁর পিএইচডি অভিসন্দর্ভের গ্রন্থরূপ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে ষাটের দশক পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বশীল অনেকের উপন্যাস এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই গবেষণায় অনুসৃত হয়েছে ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি। এখানে গুরুত্ব পেয়েছে বাংলা অঞ্চলের রাজনীতির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং তার ভিত্তিতে উপন্যাস বিচার। তবে পূর্ববাংলার উপন্যাস এখানে স্বল্পপরিসরে আলোচিত হয়েছে। কারণ তাঁর গবেষণাকালে পূর্ববাংলার উপন্যাসের পরিধি বিস্তৃত ছিল না। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের *উপন্যাস রাজনৈতিক* (১৯৯১) বইটি উপন্যাসের তাত্ত্বিক দিকের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক ও উপন্যাস পাঠের রাজনীতি অনুধাবনের ক্ষেত্রে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর আলোচনার পরিধি সাতচল্লিশ-পূর্ববর্তী বাংলা উপন্যাস; সেখানে বাংলাদেশের উপন্যাস আওতাভুক্ত হয়নি। পূর্ববাংলার উপন্যাস বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য – মনসুর মুসা রচিত *পূর্ববাঙলার উপন্যাস* (১৯৭৪)। এই বইয়ে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে প্রকাশিত বাংলাদেশের উপন্যাসের একটি ধারাবাহিক পরিচয় পাওয়া

যায়। কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে রাজনীতি ও সাতচল্লিশের রাজনীতির বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত হয়নি। বাংলাদেশের উপন্যাসের বিষয় ও শিল্পরূপ নিয়ে গবেষণা করেছেন রফিকউল্লাহ খান। *বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ* (১৯৯৭) তাঁর পিএইচডি অভিসন্দর্ভের (১৯৯৫) গ্রন্থরূপ। এই গবেষণায় ১৯৪৭ থেকে ১৯৮৭ এই চল্লিশ বছরে প্রকাশিত বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বশীল প্রায় সব উপন্যাসের বিষয় এবং তৎকালীন পরিপার্শ্ব ও প্রকরণকলা সবিস্তারে বিশ্লেষিত হয়েছে। উপন্যাস নির্বাচনে ও শিল্পরূপ বিচারে প্রতীচ্য উপন্যাসতত্ত্বের প্রতি গবেষকের অভিনিবেশ লক্ষ করা যায়। উপন্যাসের 'বিষয়'-অংশে রাজনৈতিক জীবনজিজ্ঞাসার আলোচনায় প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে চল্লিশ ও পঞ্চাশের রাজনীতির ঔপন্যাসিক বয়ান শনাক্তিকরণ; কিন্তু একক বিষয় হিসেবে তা স্থান পায়নি। ১৯৮৭ সালের পর আরও অনেক উপন্যাসে সাতচল্লিশ-কেন্দ্রিক নতুন নতুন বয়ান উপন্যাসে হাজির হয়েছে; সঙ্গত কারণেই সেগুলো উক্ত গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। শহীদ ইকবালের পিএইচডি অভিসন্দর্ভের গ্রন্থরূপ *রাজনৈতিক চেতনা : বাংলাদেশের উপন্যাস* (২০০৩) বইয়ে ১৯৪৭ থেকে ১৯৯৫ সময়পর্বে লিখিত রাজনৈতিক চেতনাধর্মী উপন্যাসগুলোর বিশ্লেষণ ও রাজনৈতিক ঘটনার সঙ্গে উপন্যাসবিধৃত কাহিনির সংযোগ উপস্থাপিত হয়েছে। শাহীদা আখতারের পিএইচডি অভিসন্দর্ভের গ্রন্থরূপ *পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উপন্যাসে* (১৯৯২) দুই অংশের উপন্যাসের তুলনামূলক আলোচনায় রাজনীতির বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ-সাপেক্ষ দৃষ্টিকোণের অনুষঙ্গে। এছাড়াও বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীণ জীবন ও মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে। যেমন : মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন, 'বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাস (১৯৪৭-১৯৮৬)' (১৯৯৩); মহীবুল আজিজ, 'বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গ ১৯৪৭-১৯৭১' (১৯৯৮); মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, 'বাংলাদেশের উপন্যাসের শৈলীবিচার : ১৯৪৭-১৯৭১' (২০০০); খোন্দকার শওকত হোসেন, 'বাংলাদেশের উপন্যাসে (১৯৪৭-১৯৭০) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতিফলন' (২০০৭); মোহাম্মদ তাজুদ্দিন আহম্মেদ, 'বাংলাদেশের নদীভিত্তিক উপন্যাসে জীবনচিত্র' (২০০৮); নীলিমা আফরিন জানু, 'বাংলাদেশের উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণ (১৯৪৭-২০০০)' (২০০৯); রওশন আরা বেগম, 'বাংলাদেশের মহিলা ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে সমাজচিত্র ও জীবনবোধ (১৯৭২-২০০০)' (২০১১); হামিদা বেগম, 'বাংলাদেশের উপন্যাসে সমুদ্র-উপকূলবর্তী জীবন ও জনপদ' (২০১৩); সুরাইয়া গুলশান আরা, 'বাংলাদেশের উপন্যাসে নারী-পুরুষের সম্পর্কের রূপায়ণ (১৯৪৭-২০০০)' (২০১৫)। বাংলাদেশের উপন্যাস নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে অন্যান্য গবেষকদের প্রবণতা একক ঔপন্যাসিক-সাপেক্ষ জীবন ও উপন্যাসের আলোচনা। কিন্তু ১৯৪৭-এর পূর্বাপর রাজনীতি, ১৯৫২-র রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মতো বাঙালির জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাক্রম নিয়ে বাংলাদেশের উপন্যাসের কার্যকর গবেষণা সম্পন্ন হয়নি; যা জরুরি বলে মনে করি। প্রভাবশালী

ইতিহাসের বিপরীতে যে ইতিহাসের ভিন্নতর মাত্রা থাকতে পারে, প্রভাবশালী নন্দনতত্ত্বের বিপরীতের যে বিকল্প-নন্দন থাকতে পারে, তা ইতিহাস ও উপন্যাসের সমান্তরাল পাঠ-বিশ্লেষণের মাধ্যমে আবিষ্কার করা সম্ভব। বাঙালি জাতির সত্তাসন্ধানের আয়োজনে বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকদের মনোভঙ্গিও এর মাধ্যমে উন্মোচিত হবে।

চল্লিশের দশক ও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন-কেন্দ্রিক বাংলাদেশের উপন্যাস রচনা শুরু হয় পঞ্চাশের দশক থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, দেশভাগ-পরবর্তী মানুষের প্রতিক্রিয়া, আর্থরাজনৈতিক জিজ্ঞাসা, স্বপ্নভঙ্গের বেদনা নিয়ে যেসব উপন্যাস রচিত হয়েছে বাংলাদেশে, সেগুলো পাঠের মধ্য দিয়ে পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশের বাঙালি জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক চিন্তার স্বরূপ অনুসন্ধান করা হয়েছে বর্তমান গবেষণায়। উপন্যাস নির্বাচনে গবেষণার শিরোনামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চল্লিশের দশক থেকে বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন-কেন্দ্রিক রাজনৈতিক ঘটনাক্রম যেসব উপন্যাসে উপস্থিত আছে (রচনাকাল : ১৯৪৭-২০১৭), সেগুলো আওতাভুক্ত হয়েছে। রচনাকালের পরিসর বিবেচনায় দুইটি বিষয় ক্রিয়াশীল থেকেছে – প্রথমত, এই গবেষণাকর্মের শুরুর কাল ২০১৮, তাই তার অব্যবহিত পূর্ববর্তী বছর পর্যন্ত রচিত উপন্যাসসমূহ আওতাভুক্ত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ১৯৪৭ থেকে ২০১৭ – ৭০ বছর – রাজনীতি ও সাহিত্য উভয়ের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আলোচ্য কাল থেকে গবেষণার জন্য একটি নিরাপদ ও দূরবর্তী সময়। মূলত বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকদের রচিত উপন্যাসের মধ্যে আলোচ্য সময়পর্বে রাজনৈতিক গতিধারার রূপ-রূপান্তর অনুসন্ধানে সীমাবদ্ধ থাকবে বর্তমান গবেষণা।

বর্তমান গবেষণার প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম – পরিপ্রেক্ষিত। পরিপ্রেক্ষিত অংশে আলোচিত হয়েছে সাতচল্লিশ-পূর্ববর্তী বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং বাংলা উপন্যাসের পরম্পরা। ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার অনুসন্ধানে বাংলার রাজনীতির পাশাপাশি এসেছে সর্বভারতীয় রাজনীতির কিছু অনিবার্য প্রসঙ্গ। এই অধ্যায়ের প্রথম অংশে অখণ্ড বাংলার ধারণার পাশাপাশি পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশের ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য আলোচিত হয়েছে। এখানে ১৯৪৭-এ পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে ঔপনিবেশিক বাস্তবতায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের সূচনা, ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্ট স্বদেশি আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমানের অবস্থানগত কার্যকারণ, সাম্প্রদায়িক ঘটনা ও তার উত্থান-পতনের কার্যকারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ১৯৩২ সালের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের সূত্রে ভারতশাসন আইন (১৯৩৫), ১৯৩৭-এর নির্বাচন, বিভিন্ন দাঙ্গা-সহিংসতার পটভূমি এই অঞ্চলের সাম্প্রদায়িকতার

আর্থরাজনৈতিক কারণ অনুসন্ধানে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়েছে। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব উত্থাপনের পর 'পাকিস্তান-আন্দোলন' নামক যে বড় রাজনৈতিক আন্দোলন সংঘটিত হয়, যার অন্যতম কেন্দ্র ছিল বাংলা অঞ্চল, সেখানে বিভিন্ন পক্ষের অবস্থান বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চল্লিশের দশকের রাজনীতিতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক সংগঠন এবং ব্যক্তির ভূমিকা ইতিহাসের তথ্যসূত্রের অনুষঙ্গে আলোচিত হয়েছে। এই অধ্যায়ের আরেকটি অংশ বাংলাদেশের উপন্যাসের পূর্বসুরিদের বিবেচনা। প্রসঙ্গক্রমে স্বতন্ত্র সাহিত্যধারা হিসেবে উপন্যাসের সংজ্ঞায়ন ও স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য আলোচনাপূর্বক বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের ধারায় এই জনাঞ্চলের অবস্থান নিরূপণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম – 'বাংলাদেশের উপন্যাসে রাজনৈতিক চিন্তার স্বরূপ'। এই অধ্যায়ের আলোচনাকে চারটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করা হয়েছে। পূর্ববর্তী প্রথম অধ্যায়ের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতকে বিবেচনায় রেখে উপন্যাস পাঠের মাধ্যমে কয়েকটি কালখণ্ডের মধ্য দিয়ে সাতচল্লিশ-কেন্দ্রিক রাজনীতির স্বরূপ বিশ্লেষণের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, পরিচ্ছেদ-পরিকল্পনার গঠনবৈশিষ্ট্যের কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই উপন্যাস ঘটনাক্রম অনুসারে একাধিক পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। ঘটনাক্রমের মাত্রা অনুযায়ী উপন্যাসপাঠ-পর্যালোচনার পরিধি নির্ধারিত হয়েছে। তাই একটি পরিচ্ছেদে সকল উপন্যাসের পাঠপর্যালোচনার আয়তনগত সমতা রক্ষা করা যায়নি।

সাতচল্লিশের ঘটনাক্রমকে ধারণ করে বাংলাদেশের উপন্যাসের এমন অনেকগুলোর পরিপ্রেক্ষিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তরের বাস্তবতা। তাই দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ – 'বিশ্বযুদ্ধ-মন্বন্তর ও জনমানুষ'। ইতিহাস-সূত্রে জানা যায় , বিশ্বযুদ্ধের মতো মন্বন্তরও ছিল মনুষ্যসৃষ্ট। ঔপনিবেশিক শাসনপদ্ধতি, স্থানীয় কর্তৃত্ববাদী অভিজাতদের রাজনৈতিক ব্যর্থতা-সিদ্ধান্তহীনতা, ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থতা ওই কালের জনমানুষকে একটি আর্থমানবিক বিপর্যয়ের মুখে পতিত করে। চল্লিশের দশকে উদ্ভূত ভারতীয় জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বিপরীতে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনীতির পরস্পরবিরোধী প্রতিযোগিতা ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে দরকষাকষি জনমানুষের বিশ্বযুদ্ধ-মন্বন্তরকেন্দ্রিক বিপর্যয়কে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারেনি। এই বিপর্যয়ের ধরন কেবল খাদ্য-বস্ত্রের অপ্রাপ্তি বা অর্থনৈতিক দারিদ্র্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; এক সামূহিক মূল্যবোধগত বিপর্যয়ের মুখোমুখি করে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই আবার চল্লিশের দশকের ক্ষমতার রাজনীতিও চলমান। ফলে ওই কালের রাজনীতি পায় মাত্রাগত বৈচিত্র্য। বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি উপন্যাসে সেই বিচিত্রমাত্রিক মূল্যবোধগত বিপর্যয়ের ভাষিক রূপায়ণ ঘটেছে।

জনসমাজের মধ্যে ব্যক্তিভেদে শ্রেণিগত অবস্থান, স্থানগত অবস্থানের ভিত্তিতে কীভাবে বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তরের বাস্তবতা ও রাজনীতির শিকার হয়েছে এবং মোকাবিলা করেছে – নির্বাচিত উপন্যাসের বয়ানে – তা-ই উক্ত পরিচ্ছেদে বিশ্লেষিত হয়েছে। এই বিশ্লেষণে বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তরের ঐতিহাসিক তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে; কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর আত্মকথন থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম – 'স্বাধীনতার স্বপ্ন ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি'। প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত পরিপ্রেক্ষিত অংশে 'স্বাধীনতার স্বপ্ন' ও 'সাম্প্রদায়িক রাজনীতি' শব্দবন্ধদ্বয়ের ঐতিহাসিক ও আর্থরাজনৈতিক কার্যকারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেই সূত্রে উপন্যাসপাঠের মধ্য দিয়ে সেই স্বাধীনতার স্বপ্ন ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সঙ্গে ব্যক্তির ও জনমাজের সম্পৃক্ত হওয়ার আর্থসামাজিক বাস্তবতা আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়েছে। কোন অর্থনৈতিক কাঠামো ও সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে ব্যক্তিকে স্বাধীনতার কথা ভাবতে হয় নতুন মতাদর্শ থেকে, কখনো কখনো যার নামকরণ হয়ে যায় 'সাম্প্রদায়িকতা' তা উপন্যাসের বয়ানে যেমন ধরা দেয়, তেমনি ঔপন্যাসিকের রাজনৈতিক অবস্থানও সেখানে প্রকাশিত হয়। আলোচ্য উপন্যাসের একটি বড় অংশ মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে। ফলে বাঙালি মুসলমান হিসেবে যে বর্গটি চিহ্নিত, তার মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের কার্যকারণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও মাত্রাগত তাৎপর্য নিয়ে হাজির হয় উপন্যাসে। একটি রাজনৈতিক মতবাদ যা কখনো কখনো ধর্মীয় মতবাদেরও সাপেক্ষ হয়ে ওঠে, তার সঙ্গে একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর একাত্ম হওয়ার পাঠও আলোচ্য উপন্যাসের বয়ান থেকে পাঠ করা সম্ভব। চল্লিশের দশকের রাজনীতির মধ্যে যে অমীমাংসিত ও অনিবার্য বাস্তবতা হিসেবে এই 'স্বাধীনতার স্বপ্ন' ও 'সাম্প্রদায়িক রাজনীতি' অবস্থান করে, তাকে অস্বীকার করে নয়, বরং স্বীকার করে নিয়েই তার কার্যকারণ নিরূপণের প্রয়াস গৃহীত হয়েছে।

চল্লিশের দশকের রাজনীতির সবচেয়ে বড় ঘটনা দেশভাগ। দেশভাগেরই ক্ষতদীর্ণ ফলাফল উদ্বাস্তু সংকট। তাই দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম নির্ধারিত হয়েছে – 'দেশভাগ ও উদ্বাস্তু-সমস্যা'। এই পরিচ্ছেদে আলোচনার শুরুতে 'দেশভাগ' শব্দটির পরিভাষাগত ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ের সকল আলোচনায় 'দেশভাগ' শব্দটিকে ব্যবহার করা হলেও একে প্রশ্নের মধ্যে রেখে গ্রহণ করা হয়েছে। দেশভাগ অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও তা যে ছিল অনিবার্য পরিস্থিতি, সেসব উপন্যাসের চরিত্রের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উন্মোচিত হয়েছে। দেশভাগের ফলে বাংলার দুই অংশের জনমানুষই আক্রান্ত হয়েছে। দেশভাগের ফলে কোনো কোনো শ্রেণি সুবিধাপ্রাপ্তও হয়েছে। কিন্তু

কোনো কিছুর পরিণতিই আকস্মিক নয়। দেশভাগের ফলে পূর্ববাংলা থেকে চলে যাওয়া মানুষের বেদনা ও যন্ত্রণা যেমন আছে, তেমনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত মুসলমানদেরকেও অভূতপূর্ব পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়েছে। আবার পূর্ববঙ্গে থেকে যাওয়া হিন্দু সম্প্রদায় ও মুসলমান সম্প্রদায়ের বাস্তব পরিস্থিতিও ইতিহাসের বয়ানে নতুন নতুন উপাদান যুক্ত করেছে। দেশভাগের ফলে যে উদ্বাস্তু পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক কারণে পূর্ববঙ্গে সেই পরিস্থিতির স্বাতন্ত্র্য আছে। এসব পরিস্থিতিকে চরিত্র ও পরিপার্শ্ব উভয়ের সমবায়ে নির্মাণ করেছেন বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকরা। তাদের দেশভাগ সংক্রান্ত বয়ানে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের প্রেক্ষণবিন্দু (Point of View) থেকে স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণের প্রকাশ।

সাতচল্লিশ-পরবর্তী তথা দেশভাগ-পরবর্তী পূর্ববাংলার আর্থসামাজিক রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনার মাত্রাগত বৈচিত্র্য রয়েছে। এই বিবেচনায় চতুর্থ পরিচ্ছেদের শিরোনাম – 'সাতচল্লিশ-পরবর্তী আর্থরাজনৈতিক জিজ্ঞাসা, জাতীয়তা ও ভাষা আন্দোলন'। সাতচল্লিশ-পরবর্তীকালে পূর্ববাংলার জনগণ নতুন রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হয়, যার নাম – পাকিস্তান। বহুকাঙ্ক্ষিত 'পাকিস্তান' নামক রাষ্ট্রের সঙ্গে পূর্ববাংলার বৃহত্তর জনমানুষের যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির প্রশ্ন জড়িত ছিল, তা ক্রমেই স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় পরিণত হয়। এক ব্রিটিশ শোষকের পরিবর্তে আবির্ভূত হয় আরেক পাকিস্তানি শোষক শক্তি – এটি বাঙালি জাতীয়াবাদী চেতনার একটি প্রতিষ্ঠিত বয়ান। কিন্তু শোষণের ধরন একমাত্রিক ছিল না। রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত ও নীতি উপরিতলের একটি বড় বিষয় হলেও সমাজের বিভিন্ন স্তরে শ্রেণিগত, জীবিকাগত অনেক ধরনের শোষণচিত্র পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের উপন্যাসে এই স্তরবহুল সংকট প্রাধান্য পেয়েছে। এই সময়কালেই সংঘটিত হয় রাষ্ট্রভাষা-কেন্দ্রিক সংগ্রাম – যা বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হিসেবে পরিচিত। এই সূত্রে উক্ত পরিচ্ছেদে পরিপ্রেক্ষিত অংশে সাতচল্লিশ-পরবর্তী আর্থরাজনৈতিক পরিস্থিতির ইতিহাস-সমর্থিত তথ্য উল্লেখের পাশাপাশি জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত বিভিন্ন চিন্তা ও মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ষাটের দশকে যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে তার সার্থক পরিণতি। সেই জাতীয়তাবাদের উন্মেষকাল হিসেবে ষাটের দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ কীভাবে বিবেচিত হয়েছে, কোন কোন অনুষঙ্গে, তা উপন্যাসের ভিন্ন ভিন্ন বয়ানের মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হয়েছে। ঔপন্যাসিকদের মধ্যেও রচনাকালের রাজনৈতিক চিন্তা উপন্যাসের বয়ান নির্মাণে কী ধরনের ভূমিকা পালন করেছে, তা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংগ্রামশীল অভিযাত্রায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মতো একটি মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থাপনে ঔপন্যাসিকদের অবস্থান, পর্যবেক্ষণ ও কখনো কখনো দ্বিধা প্রকাশিত হয়েছে তাদের

উপন্যাসে। এই আলোচনায় কেবল প্রতিষ্ঠিত মত নয়, বরং একাধিক দৃষ্টিকোণের ব্যবহার প্রত্যবেক্ষণ করা হয়েছে। উপন্যাসে প্রতিফলিত রাজনৈতিক চিন্তাকে সূত্রবদ্ধ করতে ইতিহাস ও রাজনীতির সঙ্গে ঔপন্যাসিকদের শিল্পীসত্তার সম্পর্ক আলোচনাসূত্রে তাঁদের জন্ম, পেশাগত ও রাজনৈতিক অবস্থান চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ধারার সমান্তরালে ঔপন্যাসিকদের ইতিহাসচেতনা ও রাজনৈতিক বোধের রূপান্তরের সূত্রও অনুসন্ধান করা হয়েছে।

সাতচল্লিশ-কেন্দ্রিক রাজনীতির স্বরূপ-সন্ধান তথা পাকিস্তান-আন্দোলন, মুসলিম জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, হিন্দু-মুসলমানের আর্থসামাজিক কাঠামোগত অবস্থান, দেশভাগের আলোচনা একটি ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় – সেটি উপন্যাস পাঠের মধ্য দিয়ে হলেও। কারণ এই পুরো পরিস্থিতির মধ্যে সে বিষয়টি প্রবলভাবে উপস্থিত তা হলো – সাম্প্রদায়িকতা। ফলে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিতে জনমানুষের চিন্তা ও অবস্থান শনাক্ত করতে গিয়ে, কার্যকারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নতুন করে পাল্টা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ উপস্থিত হবার আশঙ্কা থাকে, সেটি ঔপন্যাসিকের রচিত উপন্যাসের মধ্য দিয়ে যেমন হতে পারে, তেমনি গবেষণার মধ্য দিয়েও প্রকাশিত হতে পারে। আবার ১৯৪৭ থেকে সাত দশকের বেশি সময় অতিক্রান্ত হবার পর দুই ভিন্ন রাষ্ট্রীয় পরিপ্রেক্ষিতে 'দেশভাগে'র মতো একটি বড় রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে দেখার মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ওই কালের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার বহন করছে দুই রাষ্ট্রেরই জনগণ। পরিস্থিতিগত সংকট বিচার করতে গিয়ে কখনো একটি ধর্মীয় পক্ষের অবস্থান সমালোচিত হতে পারে; অন্যত্র আরেক পক্ষ সমালোচিত হতে পারে। আর্থরাজনৈতিক সংকট ছিল বলেই এতকাল পরেও দুই সম্প্রদায় বিশেষত বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের জনগণের একটা অংশ সেই কালকে ক্ষত হিসেবে বিবেচনা করে। সংকটের সমাধানের জন্য প্রয়োজন প্রথমে সংকটকে স্বীকার করা এবং এরপর তার কার্যকারণ উদ্‌ঘাটন।

উক্ত রাজনৈতিক ঘটনাপুঞ্জ বিশ্লেষণে একটি শক্তিশালী বয়ানও দীর্ঘদিন ধরে দুই রাষ্ট্রে বিদ্যমান আছে। দেশভাগের ফলে পূর্ববাংলা থেকে অনেক হিন্দু-ধর্মাবলম্বীকে দেশচ্যুত হতে হয়েছে, উদ্বাস্তু জীবনবরণে বাধ্য হতে হয়েছে, দলে দলে দেশত্যাগ করতে হয়েছে – এটি একটি বয়ান। কিন্তু এটিই একমাত্র বয়ান নয়। উপন্যাস পাঠের মধ্য দিয়ে আরও অসংখ্য বয়ান হাজির হয় পাঠকের সামনে। মুখোমুখি করে অসংখ্য প্রশ্নের। উপন্যাস-রচনার ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের ভৌগোলিক, শ্রেণিগত এবং কখনো কখনো সম্প্রদায়গত অবস্থানও এসব বয়ান নির্মাণে ভূমিকা পালন করে। দীর্ঘদিন বাংলার দুই অংশের বিদ্যাচর্চায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত ঔপন্যাসিক বয়ানই কার্যকর ছিল। সেটি একটি দিক। কিন্তু

পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশের উপন্যাসের বয়ান যদি তাতে যোগ না হয়, তবে সেই বয়ানের বলয় কোনোভাবেই পূর্ণতা পায় না। এই গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গের দৃষ্টিকোণের বিরোধিতা করার কোনো প্রয়াস নেই। বরং দীর্ঘদিন যে বয়ান ছিল আলোচনার বাইরে, তাকে যুক্ত করে একটি বহুস্বরিক বয়ান নির্মাণ প্রচেষ্টা এই গবেষণার অন্বিষ্ট। তাই সম্প্রদায়গত সংকট চিহ্নিত করতে গিয়ে এখানে সচেতনভাবে 'অসাম্প্রদায়িক' দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হবে। তবে বর্তমান গবেষণার আওতা যেহেতু বাংলাদেশের উপন্যাস, স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের প্রেক্ষণবিন্দু গুরুত্ব পাবে।

এই গবেষণায় পদ্ধতিগতভাবে প্রধানত দুটি দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হয়েছে – নব্য-ইতিহাসবাদী সমালোচনা (New Historical Criticism) পদ্ধতি এবং পাঠ-বিশ্লেষণমূলক (Textual Criticism) পদ্ধতি। ইতিহাসের পাঠ ও উপন্যাসের সাহিত্যিক পাঠের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উপন্যাসপাঠের সঙ্গে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উপন্যাসের একাধিক অনুষঙ্গকে বিভিন্ন সাহিত্যিক তত্ত্ব ও মতবাদ দ্বারা যাচাই করা হয়েছে। ইতিহাসের ঘটনাক্রম ও উপন্যাসে ইতিহাসের রূপায়ণ সমান্তরাল বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনুসন্ধান করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য ইতিহাসের সত্যাসত্য বিচার নয়। বরং একটি কালখণ্ডে সংঘটিত রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহকে উপন্যাসের কাঠামোতে স্থান দিতে গিয়ে কী কী ধরনের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হয়েছে, তার অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত রাজনৈতিক চিন্তার স্বরূপ-সন্ধানের অন্যতম সহায়ক উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। বর্তমান গবেষণাকর্মে কেবল আলোচ্য কালপর্বের রাজনৈতিক ঘটনা অনুষঙ্গী উপন্যাসগুলোকে আলোচনার আওতাভুক্ত করা হয়েছে। উপন্যাস নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত প্রতিনিধিত্বশীল উপন্যাস, যেগুলোতে আলোচ্য সময়পর্বের রাজনৈতিক ঘটনাক্রম সন্নিবেশিত আছে, সেগুলোকে বিবেচনাভুক্ত করা হয়েছে।

প্রতিটি উপন্যাসের আলোচনায় প্রথমবার উপন্যাসের নাম উল্লেখের সময় প্রথম সংস্করণের প্রকাশসাল প্রথম বন্ধনীর ভেতরে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। উপন্যাসের মূলপাঠ গ্রহণের ক্ষেত্রে পার্শ্বতথ্যসূত্রনির্দেশ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে; অর্থাৎ উদ্ধৃত অংশের পাশে প্রথম বন্ধনীর ভেতরে ঔপন্যাসিকের নামের প্রথমাংশ, যে সংস্করণ থেকে পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে তার প্রকাশসাল এবং পৃষ্ঠাসংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। উপন্যাসের পাঠ ছাড়াও অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থের পাঠ গ্রহণের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি অর্থাৎ গ্রন্থকারের নামের প্রথমাংশ, যে সংস্করণ থেকে পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে তার প্রকাশসাল এবং পৃষ্ঠাসংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রবন্ধের ক্ষেত্রে প্রাবন্ধিকের নামের প্রথমাংশ এবং যে গ্রন্থে বা পত্রিকায় প্রবন্ধটি

প্রকাশিত হয়েছে, তার প্রকাশকাল উল্লেখ করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভের 'গ্রন্থপঞ্জি' অংশের উল্লেখপঞ্জিতে অভিসন্দর্ভে উল্লেখকৃত সকল গ্রন্থ ও প্রবন্ধের তালিকা লেখকের নামের আদ্যক্ষর অনুযায়ী বিন্যস্ত করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভ রচনায় বাংলা একাডেমি প্রণীত 'প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' এবং *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান* (২০১৭) অনুসরণ করা হয়েছে। তবে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের কোনো পরিবর্তন করা হয়নি।

প্রথম অধ্যায়

পরিপ্রেক্ষিত

পরিপ্রেক্ষিত

১.১

১৯৪৭ ভারতীয় উপমহাদেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক ঘটনার মতো বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতেও একটি গুরুত্বপূর্ণ যুগচিহ্নিত সাল। সাতচল্লিশের অনিবার্যতা কোনো আকস্মিক বিষয় ছিল না। ঐতিহাসিক পরম্পরার মধ্য দিয়ে বাংলা অঞ্চলে বসবাসকারী জনমানুষ সাতচল্লিশের মুখোমুখি হয়। এই ঐতিহাসিক পরম্পরার মধ্যে অবস্থান করে রাজনীতির গভীরতর ও বিচিত্র সমীকরণ। আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ যে রাজনৈতিক ঘটনার জন্ম দিয়েছিল, তা নানা দৈশিক ও বৈশ্বিক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭-এ এসে অনিবার্য রূপ ধারণ করে। বাঙালির এই রাজনৈতিক চেতনা নির্মাণে উপাদান হিসেবে যুক্ত হয়েছিল সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮), অসহযোগ আন্দোলন-খেলাফত আন্দোলন (১৯২০), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা (১৯২১), সম্প্রদায়গত রোয়েদাদ (১৯৩২), অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচন (১৯৩৭), লাহোর প্রস্তাব (১৯৪০), দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫), বিশ্বযুদ্ধজাত মানবসৃষ্ট মন্বন্তর, দ্বিজাতিতত্ত্ব, ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদী রাজনীতির উদ্ভব, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৯৪৬), 'স্বাধীনতা', ভারতবর্ষভাগ ও বাংলা-ভাগ (১৯৪৭)। এই সামূহিক ঘটনাপুঞ্জের ফলাফল ১৯৪৭। প্রায় দুশো বছরের ঔপনিবেশিক শাসনে পীড়িত পূর্ববঙ্গবাসীর মনস্তত্ত্বও এই আলোচনায় গুরুত্বের দাবি রাখে। ১৯৪৭-কে দেশভাগের সাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। একইভাবে পূর্ববঙ্গের জনগণের শোষণমুক্তির আন্দোলন ও উপনিবেশমুক্তির স্মারক হিসেবেও এর তাৎপর্য অনুসন্ধান করা হয়। ফলে এ-নিয়ে ভাবনাগত ভিন্নতা ও বিতর্ক বিরাজমান।

প্রাচীন যুগ থেকে বঙ্গ জনপদ তথা পূর্ববঙ্গ প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক মানদণ্ডে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় বহন করে চলেছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়-জাতি-গোষ্ঠী-শ্রেণির সমন্বয়ে যে বাংলা জনাঞ্চল, তার স্বাতন্ত্র্য সুপ্রাচীন। এই স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে পূর্ববাংলা তথা বর্তমান বাংলাদেশ পরিধির ভূ-অঞ্চলের স্বাতন্ত্র্যও সুচিহ্নিত। হুমায়ুন কবির (১৯৯২ : ২) তাঁর *বাঙলার কাব্য* (প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৫) গ্রন্থে স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেন – 'বাঙলার পূর্বাঞ্চলের প্রকৃতি ভিন্নধর্মী। পূর্ববঙ্গের নিসর্গ হৃদয়কে ভাবুক করেছে বটে, কিন্তু উদাসী করেনি। দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তরের অভাব সেখানেও নাই, কিন্তু সে প্রান্তরে রয়েছে অহোরাত্র জীবনের চঞ্চল লীলা।' পদ্মা-মেঘনা-যমুনাবিধৌত পূর্ববঙ্গ বা বর্তমান বাংলাদেশ

মূলত প্রাচীন বঙ্গ জনপদের উত্তরসূরি। তাই বাংলার সংগ্রামশীল ও অধিকারসচেতন জনমানুষের পরিচয় তার নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে নিহিত। সৈয়দ আকরম হোসেনের (২০০৪ : ২৮) মতে – 'সুপ্রাচীন অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক-কাল থেকেই বঙ্গজনপদ সভ্য ছিল। তাদের স্বতন্ত্রভাষা, দর্শনচিন্তা, রাষ্ট্রচেতনা নিয়ে তারা ছিল অস্তিত্ববান।' ফলে এই জনাঞ্চলের মনোভূমিতে ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বিরাজ করা স্বাভাবিক। 'বাংলার প্রকৃতি ও ভৌগোলিক অবস্থান আমাদের সংস্কৃতিকে দান করেছে স্বাতন্ত্র্য। ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের দরুন বাংলায় বিভিন্ন রাজত্ব যেমন স্থায়িত্ব লাভ করতে সমর্থ হয়েছে, তেমনি বাংলার এই বিচ্ছিন্নতার ফলে ধর্মমতের ক্ষেত্রে বিদ্রোহ ও উদ্ভাবন দেখা দিয়েছে।' (আনিসুজ্জামান ২০০১ : ৭৪) 'এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠী প্রাচীনকাল থেকে তাদের পৃথক সত্তা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে এবং বাইরের কোনো কেন্দ্রীয় শক্তির আধিপত্য সহজে মেনে নেয় নি।' (সালাহ্‌উদ্দীন ২০১৭ : ১১) চল্লিশের দশকে এই মুক্তি-আকুল জনগোষ্ঠী তথা বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত তার আত্মসন্ধানের মহাযাত্রায় একটি বাহন হিসেবে সামনে পেয়ে যায় মুহম্মদ আলি জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮) প্রণীত 'দ্বিজাতিতত্ত্ব'জাত 'পাকিস্তান-আন্দোলন'কে। 'দ্বিজাতিতত্ত্ব' তথা ধর্মের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদী ধারণা বাংলার জনসাধারণকে একটি গভীরতর বাস্তবতার মুখোমুখি করে। উপনিবেশের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পূর্ববঙ্গের জনমানুষ কেন 'পাকিস্তান-আন্দোলন'কে সারথি করল, তা গভীর বিশ্লেষণের দাবি রাখে। আবার, ১৯৪৭-এর অব্যবহিত পরেই ১৯৪৮-এ জিন্নাহর উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রশ্নে পূর্ববাংলার বৃহত্তর জনমানুষের বাংলা ভাষার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান জাতীয়তাবাদের গতিকে নতুন দিকে পরিচালিত করে। ১৯৪৮ থেকে শুরু হওয়া রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন ১৯৫২-তে এসে একটি দৃশ্যমান পরিণতি লাভ করে। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিকে বাঙালির জাতীয়তাবোধের প্রথম সার্থক প্রকাশ হিসেবে বিবেচনা বর্তমানের জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের একটি প্রতিষ্ঠিত বয়ান। এই বয়ান অনুসারে – একুশের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন বাঙালিকে মুক্তি দিয়েছিল দীর্ঘ দিনের আত্মপরিচয়ের সংকট থেকে; এবং এর মধ্যেই নিহিত ছিল বাঙালির স্বাধিকার ও স্বাধীনতা অর্জনের বীজমন্ত্র। তাই, ১৯৪৭-এর ঐতিহাসিক বাস্তবতার ভেতর দিয়ে ১৯৫২-কে স্বীকার করে বাঙালি পৌঁছায় ১৯৭১-এ।

ঐতিহাসিকভাবে বঙ্গ অঞ্চল তথা প্রাচীন বঙ্গ জনপদ ছিল প্রান্তিক ও ব্রাত্য অঞ্চল। প্রাচীন পর্বে আর্যায়ণের সাপেক্ষে তাকে বলা যায় অনার্য অধ্যুষিত অঞ্চল। প্রথমত, এই অঞ্চল ছিল কৌমনির্ভর তথা গোত্রভিত্তিক সমাজ। বাংলার ইতিহাস বিষয়ে অধিকাংশ ঐতিহাসিক (নীহাররঞ্জন ১৪২৭; রমেশচন্দ্র ২০০৬) মনে করেন – 'বঙ্গ' শব্দের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগ্বেদের 'ঐতরেয় আরণ্যকে'।

‘ধর্মশাস্ত্রগুলিতে আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির বাইরে অবস্থিত বঙ্গদেশের স্পষ্ট উল্লেখ আছে।’ (রমেশচন্দ্র ২০০৬ : ৭) ‘মহাভারত-ভাগবতের প্রাচীন আখ্যানে বঙ্গজন ও তার প্রতিবেশীদেরেকে ঘৃণার চোখে দেখা হয়েছে।’ (সৈয়দ আকরম ২০০৪ : ২৭) বঙ্গ জনপদকে উৎস হিসেবে বিবেচনা করলেও অব্যবহিত পূর্ববর্তী পূর্ববঙ্গ তথা বর্তমান বাংলাদেশের আকার ও প্রকার সবসময় অভিন্ন থাকেনি। বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠীর শাসনাধীনে এর রাজনৈতিক প্রকৃতি যেমন বদলেছে তেমনি নামকরণেও এসেছে পরিবর্তন। প্রাচীন বঙ্গ থেকে সুলতানি আমলের ‘বাঙ্গালাহ্’, মুঘল আমলের ‘সুবা বাংলা’, ইংরেজ আমলের ‘বেঙ্গলা’ ও ‘বেঙ্গলে’র পরিবর্তিত রূপ বঙ্গ প্রদেশ। তাই এক অর্থে ‘বাঙালা নামটিও মুসলমানদের দেওয়া।’ (আবদুল করিম ২০০১ : ২৯) বঙ্গ জনপদ আরও বিস্তৃত হয়ে গৌড়, পুণ্ড, রাঢ় জনপদকে একীভূত করে বঙ্গদেশে রূপলাভ করে। প্রাক্-অধুনা বঙ্গদেশের পরিধি সম্পর্কে ধারণা দেন রমেশচন্দ্র মজুমদার (২০০৬ : ৭) : ‘বর্তমান মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ২৪ পরগণা, যশোহর, পাবনা, বরিশাল, ফরিদপুর এবং রাজশাহী জিলার কিয়দংশ বঙ্গদেশের অন্তর্গত ছিল।’ নিকট অতীতেও (কোম্পানির আমল) উড়িষ্যা, বিহার ও আসামও বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ‘ইতিহাসের উত্থান-পতনের সাথে সাথে রাজনৈতিক সীমারেখার পরিবর্তন সত্ত্বেও বাংলা ভাষাভাষী বাঙালিরা যে ভূভাগে বাস করে তার প্রাকৃতিক সীমারেখার বদল আজ পর্যন্তও হয়নি।’ (অজয় ২০১৭ : ২৮) কিন্তু সাতচল্লিশের পর পূর্ববঙ্গ আকৃতিগতভাবে একটি সুনির্ধারিত রাজনৈতিক রূপ লাভ করে। সময়ের পরিক্রমায় যে বাংলাদেশকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে পাওয়া যায়, যার সূচনা সাতচল্লিশ-পূর্বাপর পূর্ববঙ্গ, সেই বাংলাদেশও বঙ্গ জনপদের প্রাচীন কাঠামোকেই নিজের ভেতর ধারণ করেছে। ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, ত্রিপুরার সমতল ভাগ (কুমিল্লা), ও শ্রীহট্টের অধিকাংশ (সিলেট) ভূমির মতো প্রাচীন এবং খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রামের সমতল, নোয়াখালির নতুন নতুন ভূমি এবং এর সঙ্গে প্রাচীন পুণ্ড্র, বরেন্দ্র (রাজশাহী) ও গৌড়ের অনেকাংশ নিয়ে গঠিত যে ভূভাগ, তা-ই নিয়ে বর্তমান স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের মানচিত্র।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে বাংলা উপনিবেশের কেন্দ্রে অবস্থান করলেও পূর্ববঙ্গ এবং এর জনগণ বিশেষত সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলাম ধর্মাবলম্বী বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী ছিল অনেকটাই আলোচনার বাইরে। বাংলা অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যাধিক্যের বিষয়টি প্রথম নজরে আসে ১৮৭২ সালের জনশুমারির ফলাফল জানার পর; যেখানে দেখা যায় বাংলার প্রায় অর্ধেক লোক মুসলমান। (আকবর ২০২৩ : ১৪) তৎকাল থেকেই বাংলা অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কার্যকারণ অনুসন্ধানে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণা চলমান থাকে। এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু তত্ত্ব যেমন – বল-প্রয়োগ তত্ত্ব (Sword Theory),

রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষণ তত্ত্ব (Political Patronage Theory), সামাজিক স্বাধীনতা তত্ত্ব (Social Liberation Theory), সুফিবাদের প্রভাব (Persuasion Theory), সাংস্কৃতিক মধ্যস্থতা তত্ত্ব (Theory of Cultural Mediator), সীমান্ত তত্ত্ব (Frontier Theory), আঞ্চলিক ব্যক্তিত্বের প্রভাব (Theory of Regional Personality), উন্মুক্ত গ্রাম তত্ত্ব (Theory of Open Village) বাংলা অঞ্চলের মুসলমান সম্প্রদায়ের সামাজিক-সাংস্কৃতিক উৎস-সন্ধান ও বিকাশ-প্রক্রিয়া নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ এবং কখনো কখনো পরস্পরবিরোধী ভূমিকা পালন করেছে। উনিশ ও বিশ শতকের ঔপনিবেশিক ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ পেরিয়ে একুশ শতকে উক্ত বিষয়ে অধুনা গবেষকগণ এই ধারণায় পৌঁছেছেন যে, 'বাংলার বেশির ভাগ মুসলমান স্থানীয় ধর্মান্তরিত হিন্দুদের বংশধর। কিছু বিদেশি অভিবাসী এর মধ্যে রয়েছে। এদের বেশির ভাগ নিম্নবর্ণের ধর্মান্তরিত হিন্দুদের বংশধর। নৃতাত্ত্বিক গবেষণা এ অনুমানকেই সমর্থন করে।' (আকবর ২০২৩ : ১০০) বাংলা অঞ্চলে ইসলামের বিস্তৃতির ক্ষেত্রে পির-সুফি-দরবেশদের অগ্রণী ভূমিকার কার্যকারণ ব্যাখ্যাত হয়েছে অসীম রায়ের গবেষণায় (অসীম ২০১৭)। মুসলমান জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ও তাদের বিকাশের কার্যকারণ-নির্ণয়সূত্রেই ব্রাহ্মণ্যবাদের বিপরীতে বাংলা অঞ্চলের ভৌগোলিক ও জলবায়ুগত স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করে এই অঞ্চলের জনমানুষের সংগ্রামী, স্বাধীনচেতনা ও নতুনকে গ্রহণ করার প্রবণতা চিহ্নিত হয়েছে। দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন (১৯৯৩ : ৯৯৭):

> বাঙ্গলাদেশ চিরকালই দুর্দান্ত – স্বাধীনতাপ্রিয় সিংহকে খাঁচায় পুরিলে সে যে রূপ শৃঙ্খলকে দুঃসহ মনে করিয়া ছটফট করিতে থাকে, অত্যধিক ব্রাহ্মণ-শাসনে পীড়িত হইয়া বাঙ্গালী এই দৌরাত্ম্যের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে ব্যাকুল হইল। ব্রাহ্মণেরা মন্দিরগুলি আত্মসাৎ করিয়া দেবতাদিগকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইলেন, জনসাধারণ ও তাহাদের মধ্যে এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর উত্থিত হইল। অভিমানে এ দেশে অনেকে ইসলাম গ্রহণ করিল।

অর্থাৎ বাংলায় মুসলমান জনগোষ্ঠীর উৎস-বিন্দু থেকেই ব্রাহ্মণ্যবাদের বিপরীতে এবং ঔপনিবেশিক পর্বে হিন্দুত্ববাদের বিপরীতে তার অবস্থান লক্ষ করা যায়। 'এই অঞ্চলে আর্য প্রভাব বিস্তৃত হওয়ার পরে সেই যে বর্ণাশ্রম প্রথা প্রবর্তিত হল, এদের হতে হয়েছিল তার অসহায় শিকার।' (আহমদ ছফা ২০০৯ : ৩৩) মূলত নির্যাতিতদের একাংশ সেই ধর্মান্তরিত মুসলমান। ঔপনিবেশিক শাসন-কাঠামোর অধীনে হিন্দু-মুসলমান এই সম্প্রদায়চেতনা প্রকাশ্য রূপ ধারণ করে। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ থেকে পূর্ববাংলার জনমানুষ নতুনভাবে রাজনৈতিক পরিচয়ে পরিচিত হতে থাকে। বিশ শতকে সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের সাপেক্ষে অবিভক্ত বাংলা অঞ্চলও ছিল প্রচণ্ডভাবে রাজনীতিঘনিষ্ঠ। তবে, 'রাজনীতি ছিল দৃশ্যমান, ভেতরে বিদ্যমান ছিল সমাজ ও অর্থনীতি।' (সিরাজুল ২০১৬ : ১০) বঙ্গভঙ্গ থেকে সেই

বিষয়টির কার্যকারণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বঙ্গভঙ্গ-পরবর্তী বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামকে দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, তৎকালে এবং সমকালেও। বিষয়টির সঙ্গে সম্পর্কিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির অর্থনীতি ও রাজনীতির যোগ। কিন্তু একটি আন্দোলনকে সফল করার পেছনে প্রয়োজন কোনো একটি প্রেরণাসমৃদ্ধ বোধ বা চেতনা। ওই পরিপ্রেক্ষিতে 'দেশপ্রেম' সেই প্রেরণামূলক চেতনা। পরবর্তী রাজনৈতিক অভিযাত্রায় দেখা যাবে, প্রেরণামূলক বোধে তীব্রতা পায় ধর্মবোধ। 'আধুনিককালে ভারতের জাতীয় চেতনা বা রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা তার ধর্মীয় ভাবধারা থেকেই জন্মলাভ করেছে।' (আনিসুজ্জামান ২০১৪ : ৪৭) তারই ফলাফল সাতচল্লিশের ভারত-পাকিস্তান সৃষ্টি। এরপর পাকিস্তানপর্বেও পূর্ববাংলায় যে নতুন ও শক্তিশালী জাতীয়তাবাদ বিকশিত হতে থাকে, তার অনুপ্রেরণামূলক অনুষঙ্গ হয় ভাষাবোধ। যদিও সবকিছুর সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত থাকে অর্থনৈতিক বিন্যাস। 'দেশপ্রেম', যা পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদ হিসেবে আবির্ভূত হয়। 'দেশপ্রেম একটা মানসিক ব্যাপার, শৃঙ্খলা যেমন বাহ্যিক।' (আবদুল হক ২০১৯ : ৫৯) এই অনুপ্রেরণামূলক চেতনা বা প্রতীকের স্রষ্টা মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণি। কিন্তু কখনো কখনো মধ্যবিত্তসৃষ্ট চেতনাস্রোত অপরাপর শ্রেণিতেও সঞ্চারিত হয়। পাকিস্তান-পর্বের বাঙালি জাতীয়তাবাদ শক্তিশালী হবার পেছনে সেই বিষয়টি ক্রিয়াশীল।

উনিশ শতকের শেষের কয়েক দশকে উদ্ভিন্ন যে জাতীয়তাবাদ, তা পরিপূর্ণ অর্থে বাঙালি জাতীয়তাবাদ হয়ে উঠতে পারেনি। কারণ বাংলা অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার পরেও সেই জাতীয়তাবাদে মুসলমানদের অংশগ্রহণ ছিল না। মূলত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) *আনন্দমঠ* (১৯৮২) উপন্যাসকে কেন্দ্র করে যে জাতীয়তাবাদী চিন্তার প্রকাশ ঘটেছিল, তা এক অর্থে হিন্দু বাঙালি জাতীয়তাবাদ। বঙ্কিমচন্দ্র *আনন্দমঠে* জাতীয়তাবাদের আঙ্গিক গঠনে হিন্দু ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যবাদকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ফলে ওই কালেই মুসলমান পাঠকরা জাতীয়তার প্রশ্নে *আনন্দমঠ*কে গ্রহণ করেনি। (সিরাজুল ২০১৬ : ৪০)। উপন্যাসের শেষ খণ্ডে দেখা যায় – 'মুসলমান পরাভূত হইয়াছে, দেশ আবার হিন্দুর হইয়াছে। সকলে একবার মুক্তকণ্ঠে হরি হরি বল।' এবং আরও দেখা যায় – যখন গ্রামে গ্রামে মুসলমানরা আক্রান্ত হয়, তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, তখন প্রাণে বাঁচতে অনেক মুসলমান তাদের দাড়ি কেটে গায়ে মাটি মেখে হরিনাম জপে নিজেকে পরিচয় দেয় 'মুই হেঁদু'। মুসলমানদের 'অপর' করে দেখার আনুষ্ঠানিক সূচনা সেখান থেকে। এছাড়াও *আনন্দমঠে*র যে 'বন্দেমাতরম' গান বাঙালি জাতীয়তাবাদের সঞ্জীবনী সংগীত হিসেবে বিবেচিত হয়, সেখানেও মাতৃভূমিকে দেবীর সঙ্গে তুলনা, দেবীর আরাধনার প্রসঙ্গ মুসলমানদের উপস্থিতিকে অস্বীকার করে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের শুরুর দিকে এই ধারণায় যুক্ত হয় সাম্প্রদায়িকতা। উনিশ শতকের কথিত

বাঙালি জাতীয়তাবাদের পথিকৃত হিসেবে পরিচিত বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (২০১৬ : ৪২) মন্তব্য করেন:

> শেষ পর্যন্ত হিন্দুত্ব ঘোচানোর অপারগতার দরুন অত্যন্ত আধুনিক হয়েও পরিপূর্ণরূপে তিনি অসাম্প্রদায়িক বাঙালী হতে পারলেন না। পেছনে ছিল আর্যত্বের অভিমান, ভেতরে ছিল স্বাধীনতার প্রবল স্পৃহা ও সেই সঙ্গে সাম্যের ব্যাপারে গভীর ভীতি, ছিল আত্মপরিচয় নিয়ে দোদুল্যমানতা, এবং ধর্মের কাছ থেকে সেই আশ্রয় ও গৌরব প্রাপ্তির আগ্রহ ধর্ম যা বিশ্বাসীদেরকে অনায়াসে সরবরাহ করে থাকে।

উনিশ শতকের শেষের কয়েক দশকে যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটেছিল, বিশেষত ইংরেজি শিক্ষিত সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে, তার থেকে ১৯৪৭-পরবর্তী পূর্ববাংলায় বিকশিত জাতীয়তাবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ধরন সম্পূর্ণ ভিন্ন। মধ্যবিত্তই এর নেতৃত্ব দিয়েছে; কিন্তু পরিস্থিতিগত কারণে তথা শোষণের প্রত্যক্ষতায় এই জাতীয়তাবাদ নির্মাণে মধ্যবিত্তের সঙ্গে কৃষক-শ্রমিক শহুরে-প্রান্তিক তথা জনমানুষ যুক্ত হয়। উনিশ শতকের ওই জাতীয়তাবাদ শেষ পর্যন্ত ভারতীয় নাগরিকত্ব চেতনার মধ্যে সমর্পিত। কিন্তু পূর্ববাংলার জাতীয়তাবাদ ধাপে ধাপে অনেকগুলো পর্যায় অতিক্রম করে একটি বিজয়ের পথে অগ্রসর হয়েছে – সেই বিজয়ের নাম বাংলাদেশ। ফলে সাফল্য-স্বাতন্ত্র্য ও স্থায়িত্ব সব দিক থেকে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনমানুষই বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠাতা।

বিশ শতকের শুরু থেকে ভারতের কেন্দ্রীয় ঔপনিবেশিক ও দেশীয় শাসনের যুগ্ম অভিঘাত বাংলা অঞ্চলকে ধীরে ধীরে আক্রান্ত করতে শুরু করে। প্রথমত কোম্পানির শাসন ও পরবর্তী পর্যায়ে ব্রিটিশ শাসনযন্ত্রে হিন্দু মধ্যবিত্তের সম্পৃক্তি ও মুসলমানদের অপর করে তোলার মধ্য দিয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে সাম্প্রদায়িক চেতনা। এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে। বঙ্গভঙ্গের অব্যবহিত পরেই বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে হিন্দু সম্প্রদায়ের সরব অংশগ্রহণ, অনুশীলন ও যুগান্তর গোষ্ঠীতে হিন্দুয়ায়ন, হিন্দু জমিদারদের সক্রিয়তা, স্বদেশি আন্দোলনে ইংরেজ-বিরোধিতা ক্রমেই মুসলমান-বিরোধিতায় রূপ নেওয়া – প্রভৃতি ঘটনা একই ভূখণ্ডে ও একই সামাজিক কাঠামোতে বসবাসকারী দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজনরেখাকে স্পষ্ট করে তোলে। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের প্রথম পর্বে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও (২০১২ : ৫৪৯) উপলব্ধি করেছিলেন এই বিভাজন ও তার কার্যকারণকে:

> বঙ্গবিচ্ছেদ-ব্যাপারটা আমাদের অন্নবস্ত্রে হাত দেয় নাই, আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিয়াছিল। সেই হৃদয়টা যতদূর পর্যন্ত অখণ্ড ততদূর পর্যন্ত তাহার বেদনা অপরিচ্ছন্ন ছিল। বাংলার মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের সঙ্গে এক হয় নাই তাহার কারণ তাহাদের সঙ্গে আমরা কোনোদিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই।

> সংস্কৃত ভাষায় একটা কথা আছে, ঘরে যখন আগুন লাগিয়াছে তখন কূপ খুঁড়িতে যাওয়ার আয়োজন বৃথা। বঙ্গ বিচ্ছেদের দিনে হঠাৎ যখন মুসলমানকে আমাদের দলে টানিবার প্রয়োজন হইল তখন আমার সেই কূপ-খননেরও চেষ্টা করি নাই – আমরা মনে করিয়াছিলাম, মাটির উপরে ঘটি ঠুকিলেই জল আপনি উঠিবে। জল যখন উঠিল না কেবল ধুলাই উড়িল তখন আমাদের বিস্ময়ের সীমাপরিসীমা রহিল না।

এরই ফলাফল হিসেবে ইংরেজ-বিরোধী স্বদেশি আন্দোলনে হিন্দুসমাজের অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার প্রকাশ্য উদ্দেশ্য ও হিন্দুধর্মীয় উপাদান-উপকরণের ব্যবহার ক্রমশ একে মুসলমান-স্বার্থপরিপন্থি আন্দোলনে পরিণত করে। এর ফলে বাংলার, বিশেষত পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে অনেকগুলো দাঙ্গা সংঘটিত হয়। (অমলেন্দু ১৯৭৪ : ২৬০) এই বঙ্গভঙ্গের কালেই প্রথমবারের মতো মুসলমানদের মধ্যে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক বোধ জেগে ওঠে। একটি সমাজে কতকগুলো অভিন্ন বিষয়ে ঐক্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। প্রচলিত ধারণায় – ব্রিটিশের 'ভাগ করো ও শাসন করো' নীতির কারণে এই জনাঞ্চলের প্রধান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রদায়চেতনা চাঙ্গা হয়ে ওঠে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ক্ষেত্রে ব্রিটিশদের ভূমিকা মুখ্য হিসেবে বিবেচনা করা হলেও কেবল এককভাবে একটি পক্ষকে দায়ী করা চলে না। একাধিক সম্প্রদায় নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য নিয়েও পাশাপাশি নির্বিবাদে বসবাস করতে পারে। কিন্তু সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের মতো বাংলা অঞ্চলেও শোষক ও শোষিতের সম্পর্কই রূপ নেয় সাম্প্রদায়িকতায়। আর, দুই সম্প্রদায়ের স্বার্থসংশ্লিষ্ট সুবিধাপ্রাপ্ত গোষ্ঠীই এই সাম্প্রদায়িক বিভাজনে বড় অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। সম্মিলনের কিছু জাতীয় উদ্যোগ ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা গ্রহণ সত্ত্বেও ভারত ও বাংলার সাম্প্রদায়িক সংকটের রাস টেনে ধরা যায়নি। 'বঙ্গভঙ্গের পর্যায়েই বোঝা গিয়েছিল যে অদূরদর্শী রাজনৈতিক নেতাদের হিন্দুয়ানি কিংবা ইসলামিয়ানা ভাষিক পরিচয়কে গৌণ করে দিচ্ছে। বরং মাঝখানে বিভেদের প্রাচীর বজায় রেখেই অলীক ভারতীয়তা গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে। ... পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের এই প্রধান বিভাজন মনস্তাত্ত্বিক স্তরেও অকাট্য বাস্তব হিসেবে বহুদিন ধরে বজায় রয়েছে। এই বিভাজনে সম্পৃক্ত আছে আভিজাত্য ও ব্রাত্য কিংবা কেন্দ্র ও অপর-এর স্পষ্ট এবং অবিনিময়যোগ্য পরিসর।' (তপোধীর ২০২১ : ৫২-৫৩) বাংলা অঞ্চলের অর্থনৈতিক বিন্যাসে নবোদ্ভিন্ন রাজনৈতিক বাস্তবতায় জমিদার-কৃষকের সম্পর্ক ছিল মূলত শোষক-শোষিতের সম্পর্কে আবদ্ধ। শহরাঞ্চলে শ্রমিকশ্রেণির অস্তিত্ব থাকলেও কৃষিভিত্তিক বাংলা অঞ্চলের শোষিত শ্রেণির অন্তর্গত ছিল মূলত কৃষক। আরেকটি শ্রেণি ছিল জোতদার। তাদের একটা অংশ অবশ্য মুসলমান ধর্মাবলম্বী। জোতদারদের দ্বারা স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কৃষক-প্রজাই শোষণপ্রক্রিয়ার স্বাভাবিক নিয়মে শোষিত হয়ে আসছিল। শ্রেণির বিষয়টি মুখ্য হলেও সম্প্রদায়ধারণাই চল্লিশের দশকে বিশেষ মাত্রা পায়। সঙ্ঘবদ্ধ শ্রেণি-আন্দোলনের যথেষ্ট অনুকূল পরিস্থিতি থাকলেও তা

সম্প্রদায়ধারণায় রূপলাভ করে। এর ব্যাখ্যা হিসেবে কামরুদ্দীন আহ্‌মদের (২০১৪ : ৪৪) মন্তব্যটি উল্লেখ করা যায়:

> বাংলার দুর্ভাগ্যক্রমে এখানকার শতকরা নব্বই জন জমিদার আর শতকরা নিরানব্বইজন মহাজনই ছিল বর্ণ-হিন্দু। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই অর্থনৈতিক স্বার্থের খাতিরে নিজ নিজ ধর্মের আড়ালে আশ্রয় নিতে লাগল। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল একটি শ্রেণীসংগ্রাম, কিন্তু উপযুক্ত নির্দেশের অভাবে এবং সবগুলি ইংরেজি সংবাদপত্রের মালিক কলকাতার অবাঙালি বণিক সম্প্রদায়ের প্রচারণার দরুন তা সাম্প্রদায়িক বিরোধের আকার ধারণ করল।

এর সঙ্গে যুক্ত হয় চল্লিশের দশকের কেন্দ্রীয় রাজনীতি। কেন্দ্রীয় রাজনীতি বলতে উত্তর ভারত ও কলকাতাকেন্দ্রিক সাংগঠনিক তৎপরতায় সক্রিয় 'অভিজাত' শ্রেণিনিয়ন্ত্রিত, শাসকঘনিষ্ঠ রাজনীতিকে নির্দেশ করা হচ্ছে। আভ্যন্তর অর্থে শ্রেণির বিচেনায় কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অনেকাংশে শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিল। কেন্দ্রীয় রাজনীতি ক্রমে রূপান্তরিত হতে থাকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে। কেন্দ্রীয় রাজনীতির নেতৃত্বের জায়গায় যাঁদের অবস্থান, তাঁদের বড় অংশ ছিল শোষিত-শ্রেণি থেকে দূরবর্তী। তত্ত্ব ও স্বার্থের বিবেচনায় সেই নেতৃত্ব দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে শ্রেণি-আন্দোলনের উর্বর ক্ষেত্রটিকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জন্য ব্যবহার করতে পেরেছিল। এই পটভূমিতে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব-কেন্দ্রিক রাজনীতি একটি দিকনির্ণায়ক অনুষঙ্গ। বাংলার রাজনীতিতে এভাবেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি শক্ত ভিত্তি তৈরি করতে পেরেছিল। তাই দেখা যায় ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ চুক্তি, অসহযোগ আন্দোলন ও খেলাফত আন্দোলনে দুই সম্প্রদায়ের সাময়িক যৌথতা, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের উদ্যোগে বেঙ্গল প্যাক্ট (১৯২৩)-এর মতো উদ্যোগগুলো সফল হতে পারেনি। ফলে '১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত চার দশকের ইতিহাস দাঙ্গার সংখ্যা এবং ভয়াবহতা বৃদ্ধির ইতিহাসও বটে।' (সিরাজুল ২০১৬ : ৭৭) বোঝা যায়, বিশ শতকের প্রথমার্ধের রাজনীতির বড় অংশ জুড়ে থাকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি।

চল্লিশের দশকে বাংলা অঞ্চলের রাজনীতির গতিনিয়ন্ত্রক একটি ঘটনা ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারতীয় মুসলিম লীগের সাধারণ অধিবেশনে উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাব। লাহোর প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২)। অব্যবহিত আগে তিনি 'শের-ই-বাংলা' উপধিতে ভূষিত হন। যদিও ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় – এই 'লাহোর প্রস্তাবে'র মূল পরিকল্পনাকারী মুহম্মদ আলি জিন্নাহ। (অমলেন্দু ২০২০ : ২০৬) এর ভিত্তিতেই সূচিত হয় দ্বিজাতিতত্ত্বের আনুষ্ঠানিক যাত্রা। যদিও এই প্রস্তাবের কোথাও 'পাকিস্তান' কথাটির উল্লেখ ছিল না এবং

একাধিক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের প্রসঙ্গ ছিল, কিন্তু ক্রমেই তা 'পাকিস্তান-আন্দোলন' হিসেবে রূপ লাভ করে। এই প্রস্তাবের বিরোধীদের পুরো অংশই ছিল হিন্দু ধর্মবলম্বী। ফলে সহজেই এই বিষয়টি সাম্প্রদায়িক রূপলাভ করে। এর একটি কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়:

> কলকাতার ক্ষমতাশালী সাময়িক পত্রিকাগুলি, যার মালিকানা হিন্দুদের একচেটিয়া ছিল, তাঁরা লাহোর প্রস্তাবের নামকরণ করেন 'পাকিস্তান'... মুসলমান সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করে তাদের গৃহযুদ্ধে টেনে আনার জন্য কলকাতার হিন্দু সাময়িকপত্রগুলি মুসলিম লীগ নেতাদের গালাগালি ও অপমানসূচক মন্তব্য বর্ষণ করতে লাগলেন। (কামরুদ্দীন ২০১৪ : ৫১)

যদিও ১৯৩০ সালেই মুসলিম লীগের তৎকালীন নেতা স্যার মোহাম্মদ ইকবাল ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের জন্য পৃথক রাজনৈতিক ভূমি ও শাসনের পরিকল্পনা করেছিলেন। ১৯৩৩ সালে চৌধুরী রহমত আলি *Now or Never* বইয়ে পাঞ্জাব, আফগানিয়া, কাশ্মির, ইরান, সিন্ধু, তুখারিস্তান ও আফগানিস্তান অঞ্চলের নামের প্রথম অক্ষর এবং বেলুচিস্তানের শেষ অক্ষর নিয়ে পাকিস্তান (PAKISTAN) নাম প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন। (এম. এ. রহিম ২০০৯ : ২১৫) তাঁদের দুজনের কারো পরিকল্পনায় বাংলা অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বোঝা যায়, কথিত মুসলিম জাতীয়তাবাদের সূচনায় বাংলা তার আওতামুক্ত ছিল। 'কিন্তু হিন্দু-ভারতের নেতা লালা লাজপত রায় ১৯২৪ সালে তাঁর পরিকল্পনায় বাংলা, সিন্ধু, পাঞ্জাব সীমান্তপ্রদেশে মুসলিম রাজ্য গঠন করার কথা উল্লেখ করেছিলেন।' (কামরুদ্দীন ২০১৪ : ৪৮) অনেক সমালোচক কংগ্রেস কিংবা মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের চেয়েও বাংলা অঞ্চলে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাস্প ছড়ানোর ক্ষেত্রে হিন্দুমহাসভা ও সমজাতীয় রাজনৈতিক গোষ্ঠীসমূহকে বেশি দায়ী মনে করেন। একজন সমালোচকের বক্তব্য এখানে উল্লেখ করা হলো:

> হিন্দুদের সামাজিক শ্রেষ্ঠতা ও নিজেদের উৎকৃষ্টতর ভাবার এই অসুস্থ মানসিকতার সব থেকে উৎকট প্রকাশ ঘটেছে হিন্দু মহাসভা-হিন্দু মিশন জাতীয় মূলত বর্ণহিন্দুদের সংগঠনের মাধ্যমে। হিন্দুত্ববাদ নামক সর্বগ্রাসী এক ভাবধারা এই সংগঠনগুলির পাথেয়। এদের আরো জঙ্গি রূপ হল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ নামক আধা-সামরিক সংগঠন। হিন্দু মহাসভা ও আর এস এস-এর সম্পর্ক মধুর না হলেও এদের অভীষ্ঠ লক্ষ্য এক – ভারতবর্ষে হিন্দুরাষ্ট্র পত্তন। যেখানে অ-হিন্দুরা নিজেদেরকে সাংস্কৃতিকভাবে হিন্দু হিসেবে ভাবতে শুরু করবে। এক অদ্ভুত একীকরণ প্রচেষ্টা। (সৌম্য ২০১৮ : ১৪)

মূলত ১৯৩২ সালে সম্প্রদায়গত রোয়েদাদ (Communal Award) প্রকাশিত হবার পরপরই এই সাম্প্রদায়িক বিরুদ্ধ অবস্থান তীব্র ও প্রত্যক্ষ রূপ লাভ করে। এই রোয়েদাদ অনুযায়ী হিন্দু, মুসলমান, শিখ ও ইয়োরোপীয়দের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থার কথা বলা হয়। হিন্দুদের মধ্যে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের জন্যও আলাদা আসনব্যবস্থা রাখা হয়। ফলে জনঘনত্বের বিচারে বর্ণহিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা

হারায়। বাংলা প্রদেশের নতুন বিধানসভায় ২৫০টি আসনের মধ্যে ১১৯টি মুসলমানদের জন্য, ৮০টি হিন্দুদের জন্য (তার মধ্যে ১০টি তফসিলি হিন্দু তথা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের জন্য) এবং ৩০টি ইয়োরোপীয়দের জন্য নির্ধারিত হয়। (জয়া ২০১৪ : ২৫) স্বাভাবিকভাবেই দীর্ঘদিন থেকে ক্ষমতার সঙ্গে থাকা বর্ণহিন্দুদের ক্ষমতাহীন হবার আশঙ্কা তৈরি হয়। সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়, আবেদন, স্মারক, বক্তৃতা সর্বত্রই বাংলা প্রদেশে স্বায়ত্তশাসনের নামে ধর্মভিত্তিক আইনসভার বিন্যাসকে প্রত্যাখান করে বর্ণহিন্দুরা এবং তাদের সকল ক্রোধ প্রকাশিত হয় সুফলপ্রাপ্তব্য বাঙালি মুসলমানদের বিরুদ্ধে। জয়া চ্যাটার্জী এই বর্ণহিন্দুগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করেছেন 'বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণি' হিসেবে। (জয়া ২০১৪) এই ভদ্রলোক শ্রেণি দ্বারা মূলত ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তকে নির্দেশ করা হয়েছে। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে তার ফলাফলও পাওয়া যায় ফজলুল হকের জয়লাভের মাধ্যমে। নির্বাচন ও মনোনয়ন সব দিক থেকেই অখণ্ড বাংলায় যে তিনজন প্রধানমন্ত্রী পাওয়া গেছে তারা সকলেই মুসলমান – ফজলুল হক, নাজিমুদ্দিন ও সোহরাওয়ার্দী। ফলে বোঝা যায়, পরবর্তীকালে বাংলা অঞ্চলে যে সাম্প্রদায়িকতা বিভীষিকার রূপ লাভ করে তার প্রত্যক্ষ কারণ ক্ষমতার রাজনীতি। আরও লক্ষ করবার বিষয় – এই সাম্প্রদায়িকতা যতটা না বাংলা থেকে উৎসারিত, তার চেয়ে বেশি অন্যান্য অঞ্চল থেকে আরোপিত। বাঙালি হিন্দুরা উনিশ শতক থেকেই মনোযোগী ছিল প্রধানত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিপক্ষে। 'বাংলাদেশে মাড়োয়ারিরাই প্রথম হিন্দুসভা গঠন করে। ১৯২৫ সালে ফরিদপুরের বাংলা প্রাদেশিক কনফারেন্সে টাকীর যতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী বাংলার প্রতিটি জেলায় হিন্দুসভা গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন।' (সৌম্য ২০১৮ : ২৩০) ১৯২৬ সালে কলকাতায় হিন্দুসভা গঠন করা হয়। মূলত ওইসময়ের দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে এই সংগঠন তৈরি হয়। ১৯২৬ সালের মার্চ মাসে কলকাতার আর্যসমাজীদের শুদ্ধি আন্দোলন এবং মসজিদের সামনে গিয়ে আর্যসমাজীদের অব্যাহতভাবে বাজনা বাজিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটে। (প্রভাতকুমার ১৯৬১ : ২৩৯) যদিও এই দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল অবাঙালি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে; (শৈলেশকুমার ২০১৫ : ৪৩-৪৪) কিন্তু তার মূল্য পরিশোধ করতে হয় বাঙালি হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই। ১৯৩৭ সালে হিন্দু মহাসভার সভাপতি হন বিনায়ক দামোদর সাভারকার (১৮৮৩-১৯৬৬), মহারাষ্ট্রের বর্ণহিন্দু। সাভারকার ছাড়াও আরও একজন গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী হিন্দুত্ববাদী নেতা মহারাষ্ট্রের ডা. বালকৃষ্ণ শিবরাম মুঞ্জে (১৮৭২-১৯৪৮)। '১৯৩৬ সালে সম্ভবত প্রথমবার বাঙালি হিন্দুত্ববাদীরা মহাসভার মঞ্চ থেকে 'দ্বিজাতি-তত্ত্ব' প্রচার করে। ১৯৩৬ সালের ১৫ই আগস্ট, ভারত সভা হলে, হিন্দু মহাসভার একটি সভায় সভাপতির ভাষণে ডা. রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় বাংলায় হিন্দু ও মুসলমানকে পৃথক জাতি হিসেবে বর্ণনা করেন।' (সৌম্য ২০১৮ : ২৩৯) আর বাংলায় হিন্দু মহাসভায় সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন শ্যামাপ্রসাদ

মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৫৩)। বোঝা যায়, চল্লিশের দশকে সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম লীগ কর্তৃক উত্থাপিত 'লাহোর প্রস্তাবে'র অনেক আগে থেকেই হিন্দুত্ববাদী তৎপরতার কারণে বাংলার রাজনীতিতে দ্বিজাতিতত্ত্ব বিরাজ করতে থাকে। এরই সার্বিক প্রভাবে কংগ্রেসের ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, এবং অন্যদিকে মুসলিম লীগের মুসলিম জাতীয়তাবাদ চল্লিশের দশকে মুখোমুখি অবস্থানে এসে দাঁড়ায়। ভারতীয় কংগ্রেস এবং তার অনুসৃতিতে বাংলার কংগ্রেস চল্লিশের দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাস্তবতায় ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনেই ছিল বেশি সোচ্চার। তারা লাহোর প্রস্তাবকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি। এমনকি 'লাহোর প্রস্তাবকে গান্ধীজী ভারতের অঙ্গচ্ছেদ বলে অভিহিত করলেন এবং তিনি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ধারণাকেই মহাপাপ বলে ধরে নিলেন।' (কামরুদ্দীন ২০১৪ : ৫১) ফলে কংগ্রেসের 'ভারত ছাড় আন্দোলনে' (১৯৪২) মুসলিম লীগ ও মুসলমান জনগণ সম্পৃক্ত হতে পারেনি। ক্যাবিনেট মিশনের (১৯৪৬) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনপদ্ধতির প্রস্তাবে মুসলিম লীগ প্রথমত সম্মত হলেও কংগ্রেস প্রধান জওহরলাল নেহরুর বক্তব্যে কংগ্রেসের প্রতি অনাস্থা সৃষ্টির ফলে শেষ পর্যন্ত সম্মত হতে পারেনি। অতঃপর এ সময়ে রাজনীতি পরিগ্রহ করে রক্তক্ষয়ী রূপ। ১৯৪৬ সালের মুসলিম লীগ আহূত 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস'কে কেন্দ্র করে যে ভয়াবহ দাঙ্গা-গণহত্যার ঘটনা ঘটে, সেখানে শুভবোধ, জাতীয়তার বুদ্ধিবৃত্তিক তর্ক সবকিছু ছাপিয়ে একটি বিষয়ই প্রধান হয়ে ওঠে – দেশভাগ এবং একইসঙ্গে, বাংলাভাগ। সৃষ্টি হয় দুই রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তান এবং ঘটে বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগের মতো রক্তপ্লাবী ঘটনা যে রক্তস্রোত এখনও ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে বহমান। এ-প্রসঙ্গে অসীম রায় (২০১৭ : ১২৪) মনে করেন:

> মুক্ত দৃষ্টিতে বিচার করে আজ আর অস্বীকার করার উপায় নেই যে ক্যাবিনেট মিশনের ব্যর্থতার দায়িত্ব ইতিহাসের পক্ষপাতহীন কঠোর দৃষ্টিতে বহন করতে হবে মুসলিম লীগকে নয়, কংগ্রেসকে। ইতিহাসের কাঠগড়ায় দেশ-বিভাগের সম্পূর্ণ-বিরোধী মিশন-পরিকল্পনা হত্যার আসামি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস।

সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতের মতো চল্লিশের দশকে বাংলা অঞ্চলে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষাকারী দলে পরিণত হয় মুসলিম লীগ। প্রথমত, 'এটাকে মুসলমান জমিদার ও ইংরাজি শিক্ষিত উদীয়মান মধ্যবিত্তশ্রেণীর রাজনৈতিক দল হিসেবে গণ্য করা হত।' (সালাহউদ্দীন ১৯৯১ : ৭৩) ১৯০৬ সালে ঢাকায় একটি সমাবেশ থেকে মুসলিম লীগের জন্ম হলেও এর সর্বভারতীয় নেতৃত্ব কখনোই বাংলার হাতে ছিল না। এমনকি এর প্রধান কার্যালয়ও ঢাকা বা কলকাতায় ছিল না। 'আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়কে পাকিস্তান-আন্দোলনের পীঠস্থান বলা চলে।' (সৌম্য ২০১৮ : ২৭০) বাংলায় মুসলমানদের মধ্যে ১৯৩৭ সালের আগে মুসলিম লীগের সাংগঠনিক তৎপরতাও ছিল ক্ষীণ। তাই অসাম্প্রদায়িক চেতনাসমৃদ্ধ কৃষক-প্রজা অধ্যুষিত বাঙালি মুসলমানের প্রিয় দলে পরিণত হয় ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টি। ১৯৩৭ সালে সরকার গঠনের লক্ষ্যে ফজলুল হক কংগ্রেসের সমর্থন না পেয়ে মুসলিম লীগের সঙ্গে

কোয়ালিশন (জোট) করার পর রাজনীতিতে মুসলিম লীগ দৃশ্যমান হতে থাকে। মুসলিম লীগ শুরু থেকেই অভিজাত মুসলমানদের দল এবং তার নেতৃত্ব আজন্ম সামন্তশ্রেণিনিয়ন্ত্রিত। এক অর্থে সাধারণ শ্রমজীবী শ্রেণি থেকে এই নেতৃত্ব ছিল দূরবর্তী। বাংলার মুসলিম লীগ তখন পরিচালিত হয় নাজিমুদ্দিন-ইস্পাহানি-আকরম খাঁদের দ্বারা। পাকিস্তান সৃষ্টিতে নেতৃত্বদানকালে চল্লিশের দশকে দৃশ্যমান হতে থাকে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের প্রধান দুই অংশ। এক পক্ষে দেখা যায় সামন্ত ও ধর্মীয় মূল্যবোধতাড়িত শ্রেণি, যাদের নেতৃত্বে ছিল ঢাকার আহসানমঞ্জিল-কেন্দ্রিক নবাব পরিবার। অন্য পক্ষে দেখা যায় উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণি যাদের মধ্যে উদারনৈতিক বুর্জোয়া মানসিকতা লক্ষ করা যায়। ১৯৪৩ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩) সরবরাহ মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণকালে তাঁরই আগ্রহে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সম্পাদকের দায়িত্ব পান আবুল হাশিম (১৯০৫-১৯৭৪)। আবুল হাশিমকে মুসলিম লীগের সেই বুর্জোয়া অংশের নেতা হিসেবে আবির্ভূত হতে দেখা যায়। 'লীগের নবনিযুক্ত সেক্রেটারি বর্ধমানের আবুল হাশিম লীগকে, কংগ্রেসের মতো সাধারণ মানুষের দলে পরিণত করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। এজন্য পার্টিতে সকল সময়ের কর্মী বা হোলটাইমার, প্রতিটি জেলায় পার্টির কার্যালয়, কর্মীদের রাজনৈতিক শিক্ষাদানের জন্য লাইব্রেরি, ইত্যাদি পদক্ষেপ নিলেন হাশিম। তাছাড়া ইসলামের সঙ্গে সাম্যবাদের একধরনের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে মেহনতি মানুষের চোখে প্রগতিশীল প্রতিপন্ন করবার প্রচেষ্টাও হাশিমের।' (সৌম্য ২০১৮ : ২৭০-২৭১) এর ফলে সুদূরের জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্ব বাংলার সাধারণ মানুষের খুব কাছের বিষয়ে পরিণত হয়। লাহোর প্রস্তাব ও পাকিস্তান প্রশ্নে আবুল হাশিম নিজের যে অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন, তার মধ্য দিয়ে সচেতন বাঙালি মুসলমানের কণ্ঠস্বর অনুভব করা যায় (২০১৮ : ৩০):

> লাহোর প্রস্তাব ছিল ভারতীয় মুসলমানদের আবাসভূমি হিসাবে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ গঠনের জন্য আন্দোলনের ভিত্তি। ভারতীয় মুসলমানদের আবাসভূমি হিসাবে দুই স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের একটি হলো, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও কাশ্মীর নিয়ে গঠিত উত্তর-পশ্চিম ভারতে, অন্যটি বাংলা ও আসাম নিয়ে গঠিত উত্তর-পূর্ব ভারতে। একজন মুসলমান ও বাঙালি হিসাবে আমি স্বাধীনতা দেখেছিলাম লাহোর প্রস্তাবে এবং ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে আমি আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলাম।

পাকিস্তান-আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে বাংলার প্রান্তবর্তী প্রতিটি শহরে ও গ্রামে। ধর্মীয় পরিচয়ই তখন বড় হয়ে দেখা দেয়। মুসলমান জনগোষ্ঠীর পরম্পরাগত বঞ্চনা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হিসেবে আবির্ভূত হয় 'পাকিস্তান'। কিন্তু জিন্নাহ যে ধর্মীয় ও সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে দুই জাতির প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন, তাতে পাকিস্তানের ধারণা স্পষ্ট ছিল না। 'জিন্নাহ কখনও এমনকি ঘনিষ্ঠ

সহকর্মীদের কাছে তাঁর পাকিস্তান দাবির স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেননি। জনগণের কাছে অতি পরিচিত লাহোর প্রস্তাবেও দেশ-বিভাগের কথা উল্লেখ করা হয়নি। আসলে ‘পাকিস্তান’ ধারণার অস্পষ্টতাই এই স্লোগানকে অত্যধিক শক্তিশালী করে তোলে।’ (জয়া ২০১৪ : ২৬৪-২৬৫) পার্টিশন-গবেষক আয়েশা জালালও ‘পাকিস্তান-আন্দোলনে’ বাংলার রাজনীতির স্বাতন্ত্র্য শনাক্ত করেছেন। তিনি তাঁর গবেষণায় বলছেন:

> The Bengali Muslims’ idea of `Pakistan’ was very different from that Muslims in other parts of India, and certainly different from what Jinnah had in mind. It was not a question of how Muslims would get a share of power in the rest of India, but rather the ideal of an independent sovereign state consisting of the whole of Bengal and Assam (and free of the exploitative Permanent Settlement system), which was the real motivating force behind a movement which, for the lack of a better name, called itself the Bengal Muslim League. (Ayesha 1994 : 151)

বাংলা এবং বিশেষত পূর্ববঙ্গে পাকিস্তান-আন্দোলন মূলত শোষণমুক্তির প্রতীকে পরিণত করা হয়। কিন্তু পূর্ববঙ্গে শোষণের স্বরূপও একমাত্রিক ছিল না। হিন্দু সমাজের মতো মুসলমানদের মধ্যেও স্তরবিভাজন ছিল – ছিল আশরাফ-আতরাফের বৈষম্য, ছিল ভূমিকেন্দ্রিক শ্রেণিভেদ। হাশিমের নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িকতার বদলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার দিকে মুসলিম লীগ মনযোগী হয়। তাই সবকিছু ছাপিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলে সকল সমস্যা দূরীভূত হবে – এমন প্রচারণায় সফল হয় বঙ্গীয় মুসলিম লীগ; যার সুফল পায় কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগও। এর ফলাফল হিসেবে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে দেখা যায় অন্য কোনো প্রদেশে মুসলিম লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও বাংলায় তা অর্জন করে। চল্লিশের দশকে মুসলিম লীগের সহযোগী সংগঠন হিসেবে গড়ে ওঠে মুসলিম স্টুডেন্টস লীগ ও মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড। এই সংগঠন দুটিও পাকিস্তান-আন্দোলনকে সফল করার পেছনে সবিশেষ ভূমিকা পালন করে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও বিভিন্ন জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে বিবেচনা করেছিল। এবং মুসলমানদের স্বতন্ত্র বাসভূমি তথা পাকিস্তানের দাবিকে সমর্থন দিয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৬-এর দাঙ্গার ভয়াবহতা তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে বাধ্য করে। ১৯৪৭-এর মে মাসে কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি বাংলাকে ভাগ করার বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই সময়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক পি সি যোশী ও পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক ভবানী সেন একটি যুক্ত বিবৃতিতে বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গঠনের

লক্ষ্যে শরৎ বসু ও আবুল হাশিম যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তার প্রতি সমর্থন জানান। (সরোজ ১৯৮৬ : ৪২৭) এ-সময় সামূহিক তৎপরতায় পাকিস্তান একটি অনিবার্য প্রপঞ্চে পরিণত হয়।

ভারতীয় রাজনীতিতে এবং সেই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে যে বিষয়টি আবশ্যিকভাবে আলোচিত হয়, তা হলো – দাঙ্গার রাজনীতি। রাজনীতি তখন আর তত্ত্ব, যুক্তি-বুদ্ধি, বক্তৃতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বিশ শতকের শুরু থেকেই রাজনীতির অন্যতম অনুষঙ্গে পরিণত হয় দাঙ্গা। পরস্পর প্রতিবেশীর ন্যায় অতীতেও বিভিন্ন সময়ে হিন্দু ও মুসলমান গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। 'হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সমন্বয়ের প্রক্রিয়া ও ইতিহাস সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে উভয়ের মধ্যে মৌলিক বিরোধও ছিল।' (শৈলেশকুমার ২০১৫ : ২১) 'অখণ্ড বাঙলায় হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না।' (সন্দীপ ২০১৯ : ২১) সংস্কৃতিগত পার্থক্য, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বৈপরীত্য, পানাহারের বিধিনিষেধ – মূলত ধর্মীয় বিশ্বাসগত বৈভিন্ন্য এসব ছোট ছোট বিরোধের মূল উৎস, সেখানে রাজনীতি ছিল সামান্যই। কিন্তু বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বিরোধগুলো আর বিরোধের পর্যায়ে থাকে না, তীব্র সহিংসতায় রূপ নেয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে যায় অর্থনীতি ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। পুরো বিশ শতকেই এই দাঙ্গা অব্যাহত থাকে। চল্লিশের দশকের দাঙ্গা বিশেষত ১৯৪৬ সালের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসকে কেন্দ্র করে ১৬ই আগস্ট থেকে শুরু হওয়া মহাহত্যাকাণ্ড বাংলার সকল সহিংসতার ইতিহাসকে পরাজিত করে। তবে এই দাঙ্গায় আক্রমণকারী ও আক্রান্ত দুই পক্ষ বরাবরই পরস্পরকে দোষারোপ করেছে। ভারতীয়দের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক যে ক্যাবিনেট মিশন প্রেরণ করেছিল ১৯৪৬ সালের মে মাসে, তাদের প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই। কিন্তু তৎকালীন কংগ্রেসের সভাপতি জহরলাল নেহরুর এক বিবৃতির কারণে জিন্না তথা মুসলিম লীগ কংগ্রেস বা ইংরেজ কারোর উপরই আস্থা স্থাপন করতে পারেনি। ফলে তারা ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব প্রত্যাখান করে এবং ১৬ই আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ঘোষণা করে। তখন বাংলার সদ্য প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন সোহরাওয়ার্দী। তিনি প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের সমর্থনে ওই দিন সমগ্র প্রদেশে ছুটি ঘোষণা করেন। হিন্দু সম্প্রদায় একে সাম্প্রদায়িক স্বার্থবিরোধী মনে করেছে। নিকট অতীতের পরাজয়ের ক্ষোভ ও সোহরাওয়ার্দীর সরকারি ক্ষমতাকে রাজনীতিতে ব্যবহার করার প্রবণতা স্বাভাবিকভাবেই তাদের অধিকতর ক্ষুব্ধ করে। ওইদিনের 'নরমেধযজ্ঞে'র রাজনৈতিক দায় মুসলিম লীগের ওপরেই বর্তায়। কারণ তাদের আহূত কর্মসূচি এবং তাদের দলের প্রধানমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও এই দাঙ্গা এড়ানো যায়নি। কিন্তু অনেক গবেষক জানান এর প্রস্তুতি উভয়পক্ষেরই ছিল:

> বাঙলায় যখন গৃহযুদ্ধ সত্যি সত্যি আসন্ন হয়ে দাঁড়াল, তখন মহাসভা স্বেচ্ছাসেবীরা প্রস্তুত ছিল বাঁশের লাঠি, ছোরা ও দেশীয় পিস্তল নিয়ে নেতাদের পরামর্শ মতো কাজ করতে, তারা বাহিনীর মতো যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে ব্যগ্র ছিল। মুসলমানদের মতো হিন্দুরাও ১৬ই আগস্ট যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল; উভয় পক্ষই ছিল অস্ত্রসজ্জিত, তবে দলে-বলে হিন্দুদেরই ভারি দেখা যায়। (জয়া ২০১৪ : ২৭৬)

দাঙ্গা নিয়ে গবেষণা করেছেন শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি (২০১৫ : ৬৩) যেমন জানাচ্ছেন:

> ১৬ আগস্ট সকালেই (জোর করে হিন্দুদের দোকান বন্ধ করার প্রয়াসকে কেন্দ্র করে) উত্তর-পূর্ব কলকাতার মানিকতলা অঞ্চলে লীগের সশস্ত্র কর্মী ও সমর্থকদের দ্বারা একক তরফা হিন্দুদের আক্রমণের যেসব ঘটনার সূত্রপাত হয়, দিন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। আর বিকেলে ময়দানে লীগের জনসভায় নেতাদের উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বক্তৃতা শুনে ফেরার পথে জঙ্গী সমর্থকরা উদ্দেণ্ড হয়ে ওঠে। পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বক্তব্য যে তাঁদের উপর এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নির্দেশ ছিল।

আবুল হাশিম ওই সময়ের বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক। তাঁর ভাষ্য (২০১৮ : ৯৯) থেকে পাওয়া যায় ভিন্ন পাঠ:

> ১৬ই আগস্টের অভূতপূর্ব সংঘর্ষ যা সকাল থেকে শুরু হয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলেছিল সে বিষয়ে মুসলিম লীগের কোনোই জ্ঞান, সন্দেহ বা ধারণা ছিল না। সংঘর্ষ চলা অবস্থায় অক্টরলোনি মনুমেন্টের পাদদেশে আমরা সভার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম। মুসলমানরা নিরস্ত্র এবং পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য অপ্রস্তুত ছিল। মানুষ মিথ্যা বলতে পারে, কিন্তু পরিস্থিতি কখনও মিথ্যা বলে না।

আবুল হাশিমের পুত্র বদরুদ্দীন উমরও (২০১৬ : ১৬৮) স্মৃতিচারণায় অভিন্ন অভিমত প্রকাশ করেন:

> ১৬ আগস্ট কলকাতা ময়দানে লীগের বিশাল জনসমাবেশ দেখার জন্য আব্বা আমাকে ও আমার ছোট ভাই শাহাবুদ্দীনকে কলকাতা নিয়ে গিয়েছিলেন। ওইদিন যে বাংলার ইতিহাসের সব থেকে ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হবে সে বিষয়ে কারও ধারণা ছিল না।

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস উদযাপনে তৎকালীন তরুণ মুসলিম লীগ কর্মী শেখ মুজিবুর রহমানও (১৯২০-১৯৭৫) ছিলেন সক্রিয়। ওই দিন সকালে তিনি আরেক কর্মীকে নিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম লীগের পতাকা উত্তোলন করেন। বিকালে গড়ের মাঠে ছিল জনসভা। কিন্তু সকাল থেকেই সহিংসতা শুরু হতে থাকে। শেখ মুজিব (২০১৪ : ৬৫) ওই দিন সম্পর্কে বলছেন:

> সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা কাকে বলে এ ধারণাও আমার ভাল ছিল না। দেখি শত শত হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক মসজিদ আক্রমণ করছে। মৌলভী সাহেব পালিয়ে আসছেন আমাদের দিকে। ... এখন সমস্ত কলকাতায় হাতাহাতি মারামারি চলছে। মুসলমানরা মোটেই দাঙ্গার জন্য প্রস্তুত ছিল না, একথা আমি বলতে পারি।

এই প্রেক্ষণবিন্দু একজন মুসলিম লীগ কর্মীর, এ-কথা জোর দিয়ে বলা যায়। কিন্তু ইতিহাসের তথ্য বলে ভয়াবহ ট্র্যাজিক পরিণতির কথা। ওই সভায় যোগ দিয়েছিলেন তখনকার তরুণ একজন মুসলমান চিত্রশিল্পী ও সংগঠক কামরুল হাসান। আত্মকথনে তিনি জানান (২০১০ : ৮৯):

> ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টকে ঘোষণা করা হয়েছিল কেবল পাকিস্তানবিরোধীদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখার জন্য, দাঙ্গা বাধানোর জন্য নয়। কলকাতার মুসলমানদের সামনে গড়ের মাঠের জনসভায় সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব বক্তব্য পেশ করবেন, সবাই দলে দলে যোগদান করবে – এই ছিল প্রত্যাশা। দলে দলে যোগদান করলাম। দলে দলে সবাই গিয়েছিল সভায়। লাঠিসোঠা নিয়ে যায়নি কেউ, বরং কলকাতার চিরাচরিত মিছিলের রীতি অনুযায়ী ঢাক, ঢোল, ব্যান্ড-বাদ্য ইত্যাদি নিয়ে গিয়েছিল। এটা আমার নিজের চোখে দেখা।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের দেশভাগ বিষয়ক গবেষক সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (২০১৯ : ৪৭) লেখায় পাওয়া যায় ভিন্নচিত্র:

> দাঙ্গার পিছনে বাঙলার মুসলিম লীগ সরকারের প্রত্যক্ষ মদত যে ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সরকার থেকে দাঙ্গাকারীদের লরি, পেট্রল, কেরোসিন জোগান দেওয়া হয়েছিল। ১৬ অগাস্ট দিনের অনেকটা সময় সোহরাবর্দি নিজে লালবাজার পুলিস কনট্রোল রুমে বসে থাকেন এবং নির্বিচার হত্যা-লুণ্ঠন-গৃহদাগ সত্ত্বেও পুলিস কোন ব্যবস্থা নেয় না।

অবস্থানগত কারণে পরিস্থিতির ব্যাখ্যায় দৃষ্টিভঙ্গিগত বৈভিন্ন্য থাকলেও নারকীয় গণহত্যা যে সংঘটিত হয়েছিল, তা ইতিহাস-সমর্থিত। ১৬ থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত চলা এই সহিংসতায় সরকারি হিসাবে পাঁচ হাজার ও বেসরকারি হিসাবে দশ হাজার মানুষ প্রাণ হারায় (শৈলেশকুমার ২০১৫ : ৬৩)। 'ঐ লড়াইয়ে হিন্দুর চেয়ে অনেক বেশি মুসলমান নিহত হয়।' (জয়া ২০১৪ : ২৭১) 'উভয় সম্প্রদায়েরই লক্ষ্য ছিল পরস্পরকে অর্থনৈতিক দিক থেকে একেবারে বিপর্যস্ত করে দেওয়া। নারীদের ওপর অত্যাচার, ধর্মস্থানের ওপর আঘাতের কিছু ঘটনা থাকলেও খুনজখম আর লুঠপাটই ছিল হিংস্রতার প্রধান রূপ।' (সন্দীপ ২০১৯ : ৫৭) এই দাঙ্গা দ্রুত ছড়িয়ে যায় বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে এবং ভারতেরও বিভিন্ন প্রদেশে। নোয়াখালীতে সংঘটিত দাঙ্গা তারই একটি পরম্পরা। দাঙ্গায় ১৯৪৬-এর আগস্ট থেকে ১৯৪৭-এর আগস্ট পর্যন্ত বাংলা প্রদেশে প্রাণ হারায় ১৭ হাজার মানুষ। (Sumit 1983 : 434) এই দাঙ্গার পরম্পরা অনিবার্য করে দেয় বাংলা প্রদেশের বিভাজনকে। কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও ঢাকার ক্ষেত্রে দাঙ্গার তেমন ব্যাপকতার কথা জানা যায় না। যদিও ঢাকা দাঙ্গার শহর হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু এই দাঙ্গা মহামারির রূপ নেয়নি। ওই সময়ের তরুণ রাজনৈতিক কর্মী সরদার ফজলুল করিম (২০১৭ : ৬৮-৬৯) তাঁর স্মৃতিকথায় জানান:

'৪৬-এ সাম্প্রদায়িক গণহত্যা হলো কলকাতাতে। তার প্রতিক্রিয়ায় ঢাকাতেও শুরু হয়ে যেতে পারত নরমেধযজ্ঞ। কিন্তু তা যে হলো না, সে স্মৃতি আমার সচেতন গৌরবের স্মৃতি। ১৬ই আগস্টের খবরে আমরাও কেঁপে উঠেছিলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যকার প্রগতিশীল অংশটি। আমি তখন এমএ পড়ি এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে বেশ কিছুটা জড়িত হয়েছি। আমরা ১৭ কিংবা ১৮ আগস্ট ঢাকাতে বের করেছিলাম হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তিরক্ষার শান্তি-মিছিল। ... মহামারী আকারে ঢাকায় কখনো দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েনি। গণহত্যা ঘটেনি। ... ঢাকার মানুষ দাঙ্গায় নিহত হয়তো কমই হয়েছে। দাঙ্গা বেধেছে মহররম বা জন্মাষ্টমী উপলক্ষে।

এর মধ্য দিয়ে পূর্ববঙ্গের সবচেয়ে বড় শহরের সহনশীল মনোভাব প্রকাশিত হয়। কিন্তু সর্বভারতে যখন দাঙ্গার রাজনীতি ছড়িয়ে পড়ে, তখন তার অভিঘাতও প্রতিটি প্রান্তে সংক্রমিত হয়। আর ওই কালের বাংলার রাজনীতিতে ঢাকা তখনও এক গৌণ শহর। বেশিরভাগ মুসলিম লীগের কর্মী-সমর্থকদের অবস্থান ছিল কলকাতায়। ফলে কলকাতার দাঙ্গার রাজনীতিই পুরো বাংলার রাজনীতিকে সামূহিক বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত করে। এ কারণে বাংলা বিভাজনের অব্যবহিত আগে শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, শরৎ বসু (১৮৮৯-১৯৫০) ও কিরণশঙ্কর রায়ের (১৮৯১-১৯৪৯) অখণ্ড বাংলা বা সার্বভৌম বাংলা গঠনের প্রচেষ্টা তথা যুক্ত-বাংলা রক্ষার ক্ষীণ উদ্যোগ আর সফলতা পায় না। 'সার্বভৌম বাঙলার পরিকল্পনার মধ্যে ছিল : ১. বাংলার মুসলিম লীগ সরকার অর্থাৎ সোহরাওয়ার্দী সরকার বহাল থাকবে এবং হিন্দুমন্ত্রীদের স্থানে কংগ্রেসমন্ত্রীরা যোগ দেবে। ২. বাংলাদেশ ভারত বা পাকিস্তানে যোগ দেবে না এবং অখণ্ড ও স্বাধীন থাকবে, পরে সার্বজীবন যৌথ নির্বাচনপদ্ধতিতে নির্বাচিত বাঙলাদেশ গণপরিষদ সিদ্ধান্ত নেবে বাংলাদেশ স্বাধীন থাকবে না, ভারত বা পাকিস্তানে যোগ দেবে। ৩. আইনসভার মুসলিম হিন্দু ও তফশিলীদের আসন জনসংখ্যার ভিত্তিতে হবে।' (উদ্ধৃত, রফিকুল ২০০৪ : ২৪৬) কিন্তু পারস্পরিক অবিশ্বাস ও অনাস্থার পরিস্থিতিতে তা কার্যকর হয়নি। এক সময় ভাগ হয় ভারতবর্ষ; ভাগ হয় বঙ্গপ্রদেশও : পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ। পাকিস্তান-আন্দোলনের কেন্দ্র কলকাতা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবার ফলে কলকাতায় পাকিস্তান-আন্দোলনকারীরা মর্মাহত ও হৃতমনোবল হয়ে পড়ে। একে একে তারা পূর্ববঙ্গ বিশেষত ঢাকা শহরে পাড়ি জমায়। বাংলা বিভাজনের একমাত্র দায়ী গোষ্ঠী হিসেবে বাঙালি মুসলমানদের চিহ্নিতকরণের বয়ানের বিপরীতে গবেষক জয়া চ্যাটার্জী হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর সক্রিয়তাকে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত সহযোগে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে, 'হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের প্রাদেশিক শাখাগুলোর সহায়তায় বাঙলার অধিক সংখ্যক হিন্দু ১৯৪৭ সালে বাঙলা বিভাগ ও ভারতের অভ্যন্তরে একটা পৃথক হিন্দু প্রদেশ গঠনের জন্য ব্যাপকভাবে প্রচারণা চালায়।' (জয়া ২০১৪ : ২৬৬) 'ভারত বিভাগের সময় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের হিন্দু সদস্যদের বাংলা বিভক্তির পক্ষে বা বিপক্ষে

মতামত দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয় এবং তাঁরা বিভক্তির পক্ষে মত দেন।' (আবদুল করিম ২০০১ : ৩৬) 'শুধু রাজনৈতিক নেতারা নন বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের অগ্রণী – যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার, মেঘনাদ সাহা, শিশিরকুমার মিত্র ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৭ মে ভারত সচিবের কাছে এক তার বার্তায় সাম্প্রদায়িক সুরাবর্দি-মন্ত্রীসভার প্রতি অনাস্থা জানিয়ে পৃথক প্রদেশ চেয়েছিলেন।' (অমলেশ ১৪২৫ : ৪৬৮) মুসলমান শাসনের থেকে দেশ-বিভাগ অধিকতর পছন্দনীয় হতে থাকে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু মধ্যবিত্ত নেতৃবৃন্দের কাছে। 'হিন্দু বাঙালিদের কাছে 'পাকিস্তান' আসার অর্থ হল চিরকালের জন্য রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব হারানো এবং তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের ইচ্ছার অধীনে থাকা।' (জয়া ২০১৪ : ২৭০) সাধারণত যেভাবে বিশ্বাস করা হয় যে ভারত-বিভাগ মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতির ফল, কিন্তু বাংলা বিভাজনের ক্ষেত্রে হিন্দুদের স্বতন্ত্র হবার চেষ্টা একটা বড় অনুঘটক হিসেবে কাজ করে বলে প্রতীয়মান হয়।

প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক তৎপরতার বাইরেও ঢাকা কেন্দ্রিক আরও কিছু প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের ভূমিকার মধ্য দিয়ে পূর্ববঙ্গের আর্থরাজনৈতিক পটভূমি উপলব্ধি করা যায়। এর মধ্যে প্রধান প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। মূলত পূর্ববঙ্গের অবহেলিত মুসলমানদের শিক্ষা ও জীবনমান উন্নয়নের জন্যই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা (১৯২১)। কিন্তু কেন্দ্র থেকে দূরে অথবা পূবর্বঙ্গের সামবায়িক সংস্কৃতি এই প্রতিষ্ঠানকে সাম্প্রদায়িক হতে দেয়নি। (দ্রষ্টব্য : সরদার ফজলুল ২০১৬) এ-প্রসঙ্গে সমালোচকের একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে:

> ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৭-এর দেশবিভাগের নেতৃত্ব তৈরি করেনি। দেশবিভাগের নেতৃত্ব গড়ে উঠেছিলো ইংরেজের শাসন-তোষণনীতির গর্ভে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিসমূহের মধ্য থেকে – যাঁদের শিক্ষা সম্পন্ন হয়েছিলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যালকাটা মাদ্রাসা কিংবা অক্‌স্‌ফোর্ড-কেম্ব্রিজে। গোড়া থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারিত্র্য ছিলো সাম্প্রদায়িকতাবর্জিত এবং পাশ্চাত্য-চেতনাস্পর্শী। (রফিকউল্লাহ ২০০৯ : ১৫)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কয়েক বছরের মধ্যে (১৯২৬) ঢাকায় গড়ে ওঠে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' নামে উদারপন্থি মুসলমান যুবকদের একটি সংগঠন; যাদেরকে 'শিখাগোষ্ঠী' বা 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে'র অগ্রপথিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র নামকরণে 'মুসলিম' শব্দটি সম্প্রদায়চিহ্নিত হলেও এটির মর্মমূলে ছিল অসাম্প্রদায়িক বোধ। এটি সর্বব্যাপী না হলেও বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাচর্চার মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমানদের অগ্রগামী করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

পাকিস্তান-আন্দোলনের কালে আরও দুটি সংগঠন সক্রিয় ভূমিকা পালন করে – ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ (১৯৪০) এবং কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁস সোসাইটি (১৯৪২) । এই দুই সংগঠন 'পাকিস্তান আন্দোলন যুগে সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।' (সরদার ফজলুল ১৯৬৮ : প্রসঙ্গ কথা) লক্ষ করবার বিষয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হওয়ার অনেক আগে থেকেই, কেবল লাহোর প্রস্তাবের কারণে, এই তৎপরতা শুরু হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁস সোসাইটির লক্ষ্য ছিল : 'জাতীয় রেনেসাঁর উদ্বোধক পাকিস্তানবাদের সাহিত্যিক রূপায়ণ, পাকিস্তানবাদ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ও মননমূলক আলোচনার ব্যবস্থা করা, সাহিত্যে পাকিস্তানবাদবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারাকে প্রতিহত করা।' (সাঈদ-উর, ২০০১ : ২৫) এমন চিন্তাধারার সঙ্গে ওইকালের সাহিত্য-সংশ্লিষ্ট প্রায় সকল শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান একমত পোষণ করেছিলেন। এই তালিকায় কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১), আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯), ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪), মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯) প্রমুখ অগ্রভাগে থাকবেন। যেমন, ১৯৪২ সালে আবুল মনসুর আহমদ তাঁর 'সাহিত্যে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য' প্রবন্ধে বলেন : 'রাজনীতিতে পাকিস্তান সম্ভব-অসম্ভব ও আবশ্যক-অনাবশ্যক দুই-ই হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যে পাকিস্তান শুধু সম্ভব নয় – স্বাভাবিক এবং দরকারী।' (আবুল মনসুর ১৩৪৯) বাঙালি মুসলমানদের যে ভাষায় সাহিত্য চর্চা করা উচিত, তিনি তার স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে বলেন : 'সেটা হবে বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা – হিন্দুর মাতৃভাষা নয়।' (আবুল মনসুর ১৩৪৯) স্পষ্টতই এখানে সম্ভাব্য পাকিস্তানের ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক পরিচয় নির্ধারণের প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। তবে পাকিস্তান-আন্দোলনের সর্বভারতীয় প্রভাবকে স্বীকার করেও বাঙালি মুসলমানদের স্বতন্ত্র অবস্থান চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে এই সংগঠন দুটির ভূমিকা ছিল। ১৯৪৪ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির সম্মেলনে মূল সভাপতির অভিভাষণে আবুল মনসুর আহমদের বক্তব্য থেকে তাঁদের অবস্থানের স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়:

> আরবী, তূর্কী, ফারসী, আফগানীরা এক মুসলমান হয়েও এক জাত নয়। ইংরাজ, ফরাসী, ইটালী, জার্মান এক খ্রীস্টান হয়েও এক জাত নয়। এদের ধর্ম এক হলেও তমদ্দুন এক নয়। ... ধর্ম ও সংস্কৃতিও এক জিনিস নয়। ধর্ম ভূগোলের সীমা ছাপিয়ে উঠতে পারে; কিন্তু তমদ্দুন সংস্কৃতির পয়দায়েশ। এইখানেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সরহদ। এইখানেই পূর্ব-পাকিস্তান একটা ভৌগোলিক সত্তা, এই জন্যই পূর্ব-পাকিস্তানের বাসিন্দারা ভারতের অন্যান্য জাত থেকে এবং পশ্চিম-পাকিস্তানের ধর্মীয় ভ্রাতাদের থেকে স্বতন্ত্র আলাহিদা জাত। (আবুল মনসুর ১৯৬৮ : ১৪১)

বোঝা যায়, কেবল ভারত বা পশ্চিমবঙ্গীয় সংস্কৃতি থেকেই নয়, পশ্চিম পাকিস্তানি সংস্কৃতি থেকে স্বতন্ত্র হবার ধারণা পাকিস্তান-আন্দোলনের মধ্যেই বাঙালি মুসলমানের মধ্যে সক্রিয় ছিল। বঙ্গীয় মুসলমানদের স্বতন্ত্র চিন্তা যুক্ত হয়েছিল পাকিস্তান-আন্দোলনের মহাস্রোতে।

পূর্ববঙ্গের অর্থনীতি সম্পূর্ণত ভূমি কেন্দ্রিক। ফলে বৃহত্তর রাজনীতিতে ভূমি ব্যবস্থার একটি গভীর যোগ আছে। কোম্পানির শাসনকালে ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা আবহমান ভূমিব্যবস্থায় এক বড় পরিবর্তন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কাঠামোগত ত্রুটির ফল কৃষক-নিপীড়ন। কৃষকের মালিকানা থেকে জমিদারের মালিকানায় ভূমিব্যবস্থার রূপান্তর ঘটে। 'ব্রিটিশ শাসনামলে দশকের পর দশক ধরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে জমির বিভাজন, ভূমিহীন শ্রেণির বৃদ্ধি, মহাজনের নিয়ন্ত্রণে অধিকাংশ জমি, জটিল ভূমি ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগীশ্রেণির আবির্ভাব প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য ভূমি ব্যবস্থার বৈষম্যকে প্রকট থেকে প্রকটতর করেছে এবং বাড়িয়ে তুলেছে সামাজিক সংকট, যে সংকটের সর্বাধিক শিকার কৃষক।' (আবদুল বাছির ২০১২ : ৭) এর ফলাফল হিসেবে ঔপনিবেশিক আমলের বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য কৃষক-বিদ্রোহ সংঘটিত হতে দেখা যায়। ছোট-বড় অনেক ধরনের আন্দোলনের ইতিহাস বাংলার ইতিহাস – রংপুরের নুরলদীনের কৃষক আন্দোলন (১৭৮৩), তিতুমীরের কৃষক আন্দোলন (১৮৩০-৩১), গারো বিদ্রোহ (১৮৩৭-৩৮), সাঁওতাল কৃষক বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৬), নীল চাষীদের বিদ্রোহ (১৮৬০) প্রভৃতি। বিভিন্ন সময় কৃষক আন্দোলনগুলো সংঘটিত হয়েছে আবার শোষক দ্বারা নির্বাপিতও হয়েছে। কিন্তু এই বিদ্রোহগুলো একই সূত্রে গাঁথা। চল্লিশের দশকের রাজনীতিতেও কৃষকশ্রেণি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কৃষক কেবল একটি অখণ্ড শ্রেণি নয় – এখানে জমিদারের পর স্বচ্ছল কৃষক, রায়ত, জোতদার ও ভূমিহীন কৃষক এমন অনেকগুলো কৃষকস্তর পাওয়া যায়। মূলত অগ্রসরমান মুসলমান কৃষক বা জোতদাররা বিশ শতকের বিশ হতে চল্লিশের দশকে রাজনীতিতে নিয়ামকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ১৯৩৭ ও ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মূল ভূমিকা পালন করে মুসলমান জোতদাররা তথা সচ্ছল কৃষক। (এস এম রেজাউল ২০২১) মুসলিম লীগের তৎপরতার মাঝে কৃষকস্বার্থের বিষয়টি গুরুত্ব পায়। সে-কারণে এই পাকিস্তানকে তাজুল ইসলাম হাশমি তাঁর গবেষণায় 'কৃষকের কল্পরাজ্য' (Peasant Utopia) বলে অভিহিত করেছেন। (Taj 1992) কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কৃষকদের স্বার্থে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন প্রণয়ন করা হলেও জোতদারি ব্যবস্থা বহাল থাকায় শোষণ ও নিপীড়নের হাত থেকে প্রকৃত কৃষকের চূড়ান্তভাবে মুক্তি মেলেনি।

বৃহত্তর রাজনৈতিক বাস্তবতায় বাংলা অঞ্চলের ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা; এর বাস্তবতার জায়গাটিও স্বতন্ত্র। ভূমিভিত্তিক, কৃষিনির্ভর ও কেন্দ্র থেকে ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিকভাবে দূরে থাকা বাংলা অঞ্চলের অর্থনৈতিক বিন্যাসে যে শোষণের বাস্তবতা ছিল, সেখানে কেন্দ্রীয় রাজনীতির প্রভাবে চল্লিশের দশকে বাংলার রাজনীতিও নতুন নতুন বাস্তবতার জন্ম দেয়। সেই ধারাবাহিকতায় নানা রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে বিশ শতকের চল্লিশের দশকে বাঙালি উপনীত হয় এক উত্তাল সময়ে। পূর্ববঙ্গে নির্মিত হতে থাকে সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি সর্বাংশে ব্রিটিশনির্মিত সুবিধাভোগী মধ্যবিত্ত নয়। দীর্ঘ সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যিক পরিক্রমার মধ্য দিয়ে, ঔপনিবেশিক শক্তি দ্বারা শোষিত হয়ে আত্ম-আবিষ্কারের সূত্রসন্ধানের প্রয়োজনে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি গঠিত হয়েছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা কলকাতাকেন্দ্রিক মধ্যবিত্তের বিপরীতে একটি স্বতন্ত্র পরিচয় নিয়ে পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্ত শ্রেণির আত্মবিকাশ ঘটে। 'বিশ শতকের তৃতীয় দশকের প্রারম্ভ থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশের বিভিন্ন কলেজ-স্কুল-উত্তীর্ণ নব্য শিক্ষিতের সমবায়ে ক্রমবিকশিত হচ্ছিলো ঢাকা শহর-কেন্দ্রিক নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণি।' (সৈয়দ আকরম ১৯৮৫ : ১২) এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ কলকাতা পর্যন্তও পৌঁছেছিল শিক্ষা-কর্ম-ব্যবসার কারণে এবং কলকাতায় যাতায়াত ও অবস্থানসূত্রে। চল্লিশের দশকে শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত তার আত্মসন্ধানের মহাযাত্রায় একটি বাহন হিসেবে সামনে পায় মুহম্মদ আলি জিন্নাহ প্রণীত 'দ্বিজাতিতত্ত্ব'জাত 'পাকিস্তান-আন্দোলন'কে। 'দ্বিজাতিতত্ত্বে'র অসারতা পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে। যে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, চব্বিশ বছরের মধ্যে তাকে অস্বীকারের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র। ধর্মের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদী ধারণা যে বাংলায় গভীরতর সংকট তৈরি করেছিল, তা-ও তৎকালেই প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু ঔপনিবেশিকতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পূর্ববঙ্গের জনমানুষ কেন 'পাকিস্তান-আন্দোলন'কে সঙ্গী করেছিল, ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগের জয় যার একটি প্রমাণ, তা গভীর বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

১.২

উপন্যাসকে আধুনিক কালের শিল্পরূপকল্প হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাখতিনীয় উপন্যাসতত্ত্বের আলোকে বলা যায় – উপন্যাস হচ্ছে বহুস্বরতার নান্দনিক শিল্পগড়ন। 'যে-কোন শিল্পরীতির জন্মসূত্র সমাজজীবনের গভীরতর সত্যের সঙ্গে বিধৃত। ... উপন্যাস শিল্প এমন এক শিল্পপ্রয়াস যার মধ্যে ব্যক্তিজীবনের অন্তর্মুখিতা ও বৈচিত্র্য, সমাজজীবনের বিস্তৃত বাস্তব ও ভাবসত্য এবং দেশ-কাল-ইতিহাস

ও সভ্যতার পরস্পরিত সংযোগ, দ্বন্দ্ব-মিলন, সংঘাত-সংঘর্ষ রূপায়িত হতে পারে।' (সৈয়দ আকরম ২০২০ : ৬৬) ফলে উপন্যাস কেবল গল্প আর কাহিনি-নির্ভর শিল্পমাধ্যম বলে বিবেচিত হয় না। ব্যক্তির সমস্যা যেমন বহুবিচিত্র, উপন্যাসের আওতাও তাই বহুমাত্রিক। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মধ্য দিয়ে ইয়োরোপে উপন্যাসের অভিযাত্রা ও বিকাশ। আর বাংলা উপন্যাসের জন্ম ঔপনিবেশিকতার গর্ভে। ঠিক যে সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরে আধুনিক বাংলা উপন্যাসের যাত্রা শুরু হয়, সেই সময় রাজনীতিই ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের গতিনিয়ন্ত্রক। ফলে বাংলা উপন্যাসের শুরু থেকেই রাজনীতি এর অন্যতম অনুষঙ্গ। শুধু রাজনৈতিক ঘটনাই উপন্যাসকে রাজনীতিঘনিষ্ঠ করে না, বরং ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞান, তাঁর পরিপার্শ্ব, তাঁর সময় ও তাঁর সময়ের শাসনপদ্ধতিগত কাঠামো উপন্যাসকে রাজনীতিসাপেক্ষ পাঠ হিসেবে পরিচিহ্নিত করে। 'সেই উপন্যাসকেই আমরা যথার্থ রাজনৈতিক উপন্যাস বলব, যেখানে এই জনসমাজের গভীর প্রতিক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে।' (পার্থপ্রতিম ১৯৯১ : ১৭) এ-প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য:

> সকল মানুষ রাজনীতি-সক্রিয় নয়। কিন্তু নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের সকল মানুষের ভবিতব্য সেই অঞ্চলের সমাজ, রাজনীতি, রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ এবং ব্যক্তি ও সমষ্টির ক্রিয়াশীলতার ওপর নির্ভরশীল। এ ক্ষেত্রে, জনসাধারণ, মানুষ বা চরিত্রই হচ্ছে সবকিছুর নিয়ামক। একজন প্রকৃত ঔপন্যাসিকের জীবননীতি ও শিল্পনীতির মূলে যে বৈজ্ঞানিক বিশ্বদৃষ্টি ও অভিজ্ঞতার অঙ্গীকার ক্রিয়াশীল, তা জীবনের প্রতি শিল্পীর বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গিরই ফল। (রফিকউল্লাহ ২০১১ : ১৩)

রাজনৈতিক উপন্যাসের সংজ্ঞায়নে পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯৯১ : ১১) অভিমত সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ:

> প্রচলিতভাবে যেসব উপন্যাসকে আমরা রাজনৈতিক উপন্যাস বলি তার অধিকাংশ কনজাংচারাল; কোন রাজনৈতিক ঘটনা-আন্দোলন-প্রত্যক্ষ আদর্শের ছায়ায় তারা নির্মিত : কিন্তু গভীর স্তরের রাজনৈতিক উপন্যাস অর্গ্যানিক। প্রসঙ্গতঃ কোন রাজনৈতিক প্রসঙ্গ না থাকলেও একটি উপন্যাস রাজনৈতিক মাত্রা অর্জন করতে পারে ইতিহাস ও সমাজের গভীর বোধে। অন্তঃসলিলা ইতিহাসের প্রতিক্রিয়া উন্মোচনে, অভিজ্ঞান সন্ধানে, জনসমাজের নির্মাণ-ভাঙ্গনের চেতনায়, এমন কি ধর্মীয় জিজ্ঞাসার বহুমাত্রিক অন্বেষণেও উপন্যাস হয়ে উঠতে পারে রাজনৈতিক।

রাজনীতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত ক্ষমতা দখল, কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াই। কিন্তু উপন্যাসের বয়ানে কেবল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ক্ষমতা দখল রূপায়িত হয় না। বরং একটি বয়ানের ভেতরে থাকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক বোধ, অবস্থান, রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি তার সমর্থন ও বিরোধের স্থূল-সূক্ষ্ম ইতিবৃত্ত। 'কথাসাহিত্য আমাদের ইতিহাসের ধারাক্রম বোঝায় না, কিন্তু ফিকশন আমাদের জানিয়ে

দেয় সমাজের ভেতরে কী ধারাগুলো প্রবাহিত হয়েছিল। সেই অর্থে এগুলো ইতিহাসের পাঠ।' (আলী ২০২২ : ৬১) কখনো কখনো বৃহত্তর মূলধারার রাজনীতি কীভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমানুষকে সম্পৃক্ত করে অথবা আধিপত্য বিস্তার করে তা-ও উপন্যাসের চরিত্রায়ণের মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হয়। এ-কারণে উপন্যাসকে একটি দায়বদ্ধ সাহিত্যকর্ম হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। সেই দায় ব্যক্তি, সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র, জাতীয়তা এমন অনেকগুলো বিষয়ের সঙ্গে জড়িত।

উনিশ শতকের বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস পাঠে দেখা যায় সেখানে ধর্মীয় রাজনীতির প্রাধান্য। জীবনজিজ্ঞাসার অপরাপর উপাদানের মতো ধর্মীয় জিজ্ঞাসা সেখানে মূর্ত হয়ে ওঠে। উনিশ শতকের শেষ কয়েক দশকের মধ্যে জন্ম নেয় যে জাতীয়তাবাদী ধারণা, তা ধর্ম ও সম্প্রদায়গত বোধের সাপেক্ষে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *আনন্দমঠ* উপন্যাসকে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, সেখানে হিন্দুত্ব জাতীয়তাবাদের ও মুসলমানবিদ্বেষী রাজনীতি প্রধান। *আনন্দমঠ* হিন্দুত্ববাদী বাঙালি জাতীয়তাবাদের মুখপত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের অপরাপর রাজনীতি সংশ্লিষ্ট উপন্যাস *দেবী চৌধুরাণী* (১৮৮৪) ও *সীতারাম*ও (১৮৮৭) *আনন্দমঠে*র সহগামী হয়ে ওঠে। এরপর বাংলা উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) আবির্ভাব। তাঁর *গোরা* (১৯১০), *ঘরে-বাইরে* (১৯১৬) উপন্যাসে পাওয়া যাবে রবীন্দ্রদর্শনের রাজনৈতিক বয়ান। তবে রবীন্দ্রনাথ নির্মাণ করেছেন উদারনৈতিক বুর্জোয়া-দর্শনপরিস্রুত আখ্যান, যেখানে ধর্মের চেয়ে জনসাধারণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এমনকি কথিত জাতীয়তাবাদের ধারণা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে আন্তর্জাতিকতাবাদের ধারণা প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষিত শ্রেণির সঙ্গে বৃহত্তর জনসমাজের যে দূরত্ব এবং তার ফলে উদ্ভূত সংকটকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এরপর বাংলা উপন্যাসে আবির্ভুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) সামাজিক সংকট, মধ্যবিত্তের রোম্যান্টিক মনোবৃত্তি চিত্রণের সঙ্গে সঙ্গে কালের অনিবার্যতায় রাজনীতিকে অস্বীকার করতে পারেননি। *পথের দাবী* (১৯২৬) এর একটি দৃষ্টান্ত। কিন্তু শরৎচন্দ্র বিপ্লবী রাজনীতির রূপদান করতে গিয়েও ধর্মীয় জাতীয়তাবাদকে এড়াতে পারেননি। বাংলা উপন্যাসে রাজনীতিকে সচেতনভাবে রূপদান করেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)। আজীবন কংগ্রেসী রাজনীতির প্রতি আস্থাশীল তারাশঙ্করের সামন্তবাদের প্রতি প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ ও উঠতি বুর্জোয়া আর্থকাঠামাকে অস্বীকার করতে না পারা তাঁর উপন্যাসকে করে তুলেছে দ্বান্দ্বিক। আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সুচিহ্নিত বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তি ও সমাজকে তাঁর উপন্যাসে রাজনীতির পাটাতনে স্থান দিয়েছেন। চল্লিশের দশকে সতীনাথ ভাদুরী (১৯০৬-১৯৬৫), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০), সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮)

প্রমুখের উপন্যাসে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন ও মার্কসবাদী রাজনীতি রূপায়িত হয়েছে। বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের ধারায় এই পরম্পরার উল্লেখ অনিবার্য। কিন্তু সাতচল্লিশ-পরবর্তী বাংলাদেশের উপন্যাসের পূর্বসুরি হিসেবে এঁদের উপন্যাস গৃহীত হয় না। বরং দেখা যাবে সাতচল্লিশ-পূর্ববর্তী সেই সব উপন্যাস পটভূমি হিসেবে আলোচিত হয় (দ্রষ্টব্য : রফিকউল্লাহ : ২০০৯) যার রচয়িতারা সকলে এই ভূখণ্ডের নয়, তাঁদের উপন্যাসবিধৃত ভূগোলও এই ভূখণ্ড বা জনমানুষকে সম্পূর্ণত ধারণ করে না। তাঁদের একটি পরিচয়ই গুরুত্ব পায়, আর তা হলো – তাঁরা বাঙালি মুসলমান লেখক এবং তাঁরা উপন্যাসে বাঙালি মুসলমানের জীবনজিজ্ঞাসা, সমাজবিন্যাস ও সংকট-সম্ভাবনার কথা বলেন। ফলে বাংলাদেশের উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিত আলোচনায় এই ধর্মীয় পরিচয়কে কোনোভাবেই এড়িয়ে থাকা যায় না।

বাংলাদেশের উপন্যাসের পূর্বসুরি হিসেবে যেসব উপন্যাসকে বিবেচনা করা হয়, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মোহাম্মদ নজিবর রহমানের (১৮৬০-১৯২৩) *আনোয়ারা* (১৯১৪), কাজী আবদুল ওদুদের (১৮৯৪-১৯৭০) *নদীবক্ষে* (১৯২৩), কাজী ইমদাদুল হকের (১৮৮২-১৯২৬) *আবদুল্লাহ্* (১৯৩৩), আবুল ফজলের (১৯০৩-১৯৮৩) *চৌচির* (১৯২৭) কিংবা হুমায়ুন কবিরের (১৯০৬-১৯৬৯) *নদী ও নারী* (১৯৪৫) উপন্যাসকে। কোনো কোনো গবেষক (যেমন : নাজমা : ১৯৯১) আরও এগিয়ে মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১), কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১), ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) এমনকি কাজী নজরুল ইসলামকেও (১৮৯৯-১৯৭৬) এই বর্গভুক্ত করেন। এই বর্গভুক্তিকরণে শিল্পসত্তার চেয়েও রাজনৈতিক বিবেচনা বেশি কার্যকর থেকেছে; যেমন সমালোচক উল্লেখ করছেন : 'এই উপমহাদেশের বাঙালী মুসলমানদের যে স্বপ্ন ক্রমশ চারের দশকে এসে 'পাকিস্তান আন্দোলনে' রূপায়িত হল, সিরাজী ছিলেন তার বাঙালী প্রতিনিধি।' (নাজমা ১৯৯১ : ২৬৮) বাংলা উপন্যাসের মূলস্রোতে এই সকল ঔপন্যাসিকরা 'অপরায়ণে'র শিকার হয়েছিলেন বলেই হয়তো এই বর্গে তাঁদের স্থান দেওয়ার পেছনে গবেষকদের মনোভাবনা ক্রিয়াশীল ছিল। এইসব মুসলমান ঔপন্যাসিকরা মূলত বিশ শতকের প্রথম থেকে উপন্যাস লিখতে শুরু করেন। আর বিশ শতক সেই সময় যখন মুসলমানরা ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধ নয়, বরং সহযোগিতার মাধ্যমে আত্মউন্নয়নে তৎপর। তাই দেখা যায় আঙ্গিকগত দুর্বলতা সত্ত্বেও মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাগতিক সুযোগ-সুবিধা, বৈষয়িক মুক্তি, নারীশিক্ষার বিস্তার, কুসংস্কারমুক্তির লক্ষ্যে উপন্যাসগুলো মধ্যবিত্ত ও নাগরিক-উন্মুখ মুসলমান পাঠকদের কাছে আদৃত হতে থাকে। এসব উপন্যাসের প্রায় সবগুলো মুসলমানদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে আশ্রয় করে রচিত। ব্যক্তির চেয়ে সমাজ সেখানে গুরুত্ব পায়। ফলে উপন্যাস

শিল্পের যে মৌল প্রবণতা ব্যক্তির উত্থান, তার ঘাটতি প্রায় প্রতিটি উপন্যাসে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে পাশাপাশি বসবাসকারী দুই সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানের পরস্পরকে না জানার যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল, তার খানিক অবসান ঘটে। তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় *আবদুল্লাহ্* উপন্যাস পাঠপূর্বক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিমত থেকে:

> *আবদুল্লাহ্* বইখানি পড়ে আমি বিশেষ খুশি হয়েছি – বিশেষ কারণে, এই বই থেকে মুসলমানদের ঘরের কথা জানা গেল। এদেশের সামাজিক আবহাওয়া-ঘটিত একটা কথা এই বই আমাকে ভাবিয়েছে। দেখলুম যে ঘোরতর বুদ্ধির অন্ধতা হিন্দুকে পদে পদে বাধাগ্রস্ত করেছে, সেই অন্ধতাই চাদর ত্যাগ করে লুঙ্গি ও ফেজ পরে মুসলমানের ঘরে মোল্লার অন্ন জোগাচ্ছে। এ কি মাটির গুণ? এই রোগবিষে ভরা বর্বরতার হাওয়া এদেশে আর কতদিন চলবে? আমরা দুই পক্ষ থেকে কি বিনাশের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পরস্পর পরস্পরকে আঘাত ও অপমান করে চলব? লেখকের লেখনীর উদারতা বইখানিকে বিশেষ মূল্য দিয়েছে। (উদ্ধৃত, কাজী ইমদাদুল ১৯৬৮ : ৩৬৭)

পক্ষ যে দুইটি এ-নিয়ে বিশের দশকে কোনো পক্ষের চিন্তায় সংশয় ছিল না। কিন্তু দূরত্ব কমানোর বিষয়ে অনেকে সজাগ ছিলেন। বাঙালির ভাষা-নির্মাণে ও ইতিহাস-গঠনে দীর্ঘকাল যে অংশটি ছিল পর্দার আড়ালে, সেই অংশের প্রতিনিধি হিসেবে এই ঔপন্যাসিকরা স্বসমাজের ও স্ব-ঐতিহ্যের অনুসন্ধান করেছেন তাঁদের উপন্যাসে। সেদিক থেকে কাজী নজরুল ইসলামকেও বলা যায় বাঙালি মুসলমানের লেখক। মুজীবুর রহমান খাঁ-র (১৯৫৯ : ৮০) মতে, 'বাংলা সাহিত্যের মুসলমান গল্প-লেখকদের মধ্যে তাঁর স্থান কেবল পয়লা পংক্তিতে নয়, সর্বপ্রথম।' আবদুল মান্নান সৈয়দ (২০০৮ : ১৮) আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেন – 'নজরুল বাঙালি-মুসলমানের ঐতিহ্যের প্রথম স্রষ্টা ও দ্রষ্টা'। কারণ এর আগেও মীর মশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ, নজিবর রহমানসহ আরও বেশ কয়েকজন মুসলমান লেখক বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন বটে, কিন্তু সমকালের বাঙালি মুসলমান তাদের কথাসাহিত্যে স্থান পায়নি। দূর-অতীতের আদর্শায়িত ঐতিহাসিকতা নিয়েই ছিল তাঁদের কারবার। তাই এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র স্বরও তাঁদের গল্প-উপন্যাসে স্থান পায়নি। এ প্রসঙ্গে আহমদ ছফা (২০০২ : ১৩১) বলেন : 'নজরুলের কাছে বাঙালী মুসলমান সমাজের অন্যতম প্রধান প্রণিধানযোগ্য ঋণ এই যে, নজরুল তাদের 'ভাষাহীন' পরিচয় ঘুচিয়ে দিয়ে তাদের সামাজিক ভাষাকে সাহিত্যসৃষ্টির ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা দান করলেন এবং স্বীকৃতি অর্জন করে দিলেন।' তবে নজরুল বাঙালি মুসলমানের লেখক হিসেবেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, উত্তীর্ণ হয়েছেন বাঙালি লেখকে। বাঙালি মুসলমানের জীবনযাপন, ভাষাভঙ্গি, উৎসব-আনন্দ, বিরহ-বেদনা, গার্হস্থ্যজীবন ইত্যাদিকে বাংলা সাহিত্যের মূল স্রোতধারার সঙ্গে যুক্ত

করে তিনি বাংলা সাহিত্যকেই পূর্ণতা দান করেছেন। এবং তিনি বাংলা সাহিত্যের ধারায় কমিয়ে দিয়েছেন একের সঙ্গে অপরের অপরিচয়ের সংকট।

বাংলাদেশের ইতিহাস ও রাজনীতির সঙ্গে বাংলাদেশের অপরাপর সাহিত্যধারার মতো উপন্যাসের সম্পর্কও সমান্তরাল। ইতিহাস ও রাজনীতির পাঠের মতো উপন্যাসও তৈরি করে একটি জনাঞ্চলের পাঠ ও পাঠান্তর। শিল্প হিসেবে উপন্যাস অনেক বেশি দেশ-কাল ও সমাজ-সাপেক্ষ। 'উপন্যাসে কালিক ও দেশিক সঙ্কল্প অবিচ্ছিন্ন, তাদের উদ্ভাসে আবেগ ও মূল্যবোধ দুইই কাজ করে। বিমূর্তভাবে দেশ ও কালকে পৃথক সত্তা হিসাবে দেখা গেলেও, জীবন্ত প্রাণময় শিল্প-বীক্ষায় এ ধরনের বিভাজন সম্ভব নয়।' (পার্থপ্রতিম ১৯৯৪ : ৯) বাংলাদেশের উপন্যাসে বিশেষত যেখানে রাজনৈতিক ঘটনা প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত, সেখানে এই বিবেচনাটি বিশেষভাবে কার্যকর। বাংলাদেশ তার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক পথ অতিক্রম করে যখন উপস্থিত হয় চল্লিশের দশকে, তখন এই জনাঞ্চলে তৈরি হয় ইতিহাসের স্বতন্ত্র পাঠ। বাংলাদেশের উপন্যাসে প্রথমপর্বে যাঁরা পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের অনেকেই চল্লিশের দশকের রাজনীতির প্রত্যক্ষদর্শী, কেউ কেউ সেই রাজনীতির অংশীজন, কেউ কেউ ভুক্তভোগী। ফলে তাঁরা যখন উপন্যাস সৃষ্টি করেছেন, তখন সেই কালের ইতিহাস ও রাজনীতির সঙ্গে ঔপন্যাসিকের সম্পর্ক উপন্যাসপাঠের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচনাযোগ্য। 'ঔপন্যাসিক উপন্যাসের মাধ্যমে তাঁর সময় ও ইতিহাস, নিজ অভিজ্ঞতা ও জীবনের মধ্যের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কটিকে একটি টেকসট বা বয়ানে আকরিত করেন।' (পার্থপ্রতিম ১৯৯১ : ১১) উপন্যাস ও ইতিহাসের সম্পর্ক বিষয়ে আরও উল্লেখ্য:

> ইতিহাসের উপাদান নিয়ে সার্থক উপন্যাস সৃষ্টি করতে হলে অনিবার্য হয়ে ওঠে ইতিহাস ও উপন্যাসের মধ্যে একটি গভীর ভারসাম্য স্থাপনের। ইতিহাস ও উপন্যাস – এ দুয়ের একটি যাতে আরেকটিকে অতিক্রম করে না যায় সেদিকে জরুরি হয়ে পড়ে ঔপন্যাসিকের সতর্ক দৃষ্টিপাতের। উপন্যাসের বাস্তবতা ও ইতিহাসের বাস্তবতা দুয়েরই রাশ টেনে না ধরলে ব্যাহত হতে পারে উপন্যাসের শিল্পগত সফলতা। (সৈয়দ আজিজুল ২০২০ : ৩৮২)

১৯৪৭-পূর্বাপর ও ১৯৫২ – এই কালপর্ব বাংলাদেশের আত্ম-অনুসন্ধান ও জাতিসত্তা-সন্ধানের জন্য এত প্রয়োজনীয় যে, ওই কালপর্ব নিয়ে তৎসময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে বিচিত্র বয়ান যেমন তৈরি হয়েছে; একই সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গিগত মাত্রাও বৈচিত্র্য লাভ করেছে। তাই উপন্যাসবিধৃত সময়ের চেয়েও কখনো কখনো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে উপন্যাসের রচনাকাল। তৎকালীন রাজনৈতিক স্বরূপ বোঝার জন্য ঔপন্যাসিকের রাজনৈতিক চেতনার স্বরূপটিও বোঝা প্রয়োজন। এটি আরও জরুরি

হয়ে দাঁড়ায় যখন ঔপন্যাসিকদের ঔপন্যাসিক সত্তা নিয়ে উত্থাপিত হয় প্রশ্ন। কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হকের (২০১৩ : ১৪-১৫) পর্যবেক্ষণটি এমন:

> আমাদের প্রথমদিকের ঔপন্যাসিকদের অতিসরলীকৃত বক্তৃতার শিথিল ভাষায় লেখা আকারহীন উপন্যাসগুলি পড়লে অবাক না হয়ে গত্যন্তর থাকে না। ... মনে হয়, ঘটনা, ঘটনার অস্তিচর্মই, ঘটনার ভিতরের সত্য নয় – এঁদের প্রধান উপজীব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। সেজন্যে দেশবিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি যুগান্তকারী ঘটনাগুলি এঁদের উপন্যাসের সমস্ত জায়গা দখল করে থাকলেও, ব্যক্তি তার কর্মের জীবনে কিভাবে এসবের সঙ্গে জড়িয়ে যায় তা তাঁরা ঠিকমতো ধরতে পারেন নি।

হুমায়ুন আজাদ (২০০৭ : ২৭৩) ওই পর্বের উপন্যাস সম্পর্কে প্রায় একই ধরনের মন্তব্য করেছেন:

> আমাদের ঔপন্যাসিকেরা প্রথাসম্মতভাবে কল্পনানির্ভর, বানানো গল্পে বিশ্বাসী। বাস্তব ঘটনা যখন তাঁদের কাহিনীতে ঢুকে পড়ে, তখন তাঁরা ভীত হয়ে ওঠেন; ভূমিকায় জানিয়ে দেন যে 'উপন্যাস উপন্যাসই, ইতিহাস নয়।' ... অনেক উপন্যাসেই ঐতিহাসিক ঘটনা – দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, পাকিস্তান-আন্দোলন, ভাষা-আন্দোলন ইত্যাদি – স্থান পেয়েছে; কিন্তু ওই ঘটনাগুলো উপন্যাসে বিন্যস্ত হয়েছে এমনভাবে, যাতে ওগুলোকে বানানো গল্প ব'লে মনে হয়।

গবেষক শাহীদা আখতারের (১৯৯২ : ১৬৩) অভিমত:

> পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানী শাসনের চব্বিশ বছরে কোন সার্থক রাজনৈতিক উপন্যাস রচিত হয়নি। প্রথম দশকের উপন্যাসে পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমি এসেছে। অধিকাংশই স্মৃতিচারণা ও ভাবাবেগের প্রাবল্যে বাস্তবতা-বিবর্জিত।

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (২০২২ : ১৫...২১) বলেছেন:

> বাঙলাভাষায় দেশবিভাগ নিয়ে তেমন স্মরণীয় সাহিত্য যে রচিত হয়নি, তার একটি কারণ সম্ভবত এই যে, দ্বিধাদ্বন্দ্বের জড়তাই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল লেখকদের একটা বড়ো অংশকে। ... এধরনের জড়তা যেন পূর্ববঙ্গ বা পরে বাংলাদেশের লেককদেরও আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

এইসব বিবেচনাতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উপন্যাস বিশেষত সাতচল্লিশ-কেন্দ্রিক উপন্যাস পাঠের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ বিচার প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। বর্তমান অভিসন্দর্ভে তাই ইতিহাস ও রাজনীতির সত্যাসত্য বিচারের চেয়েও উপন্যাসে রাজনীতির বয়ান তথা ঔপন্যাসিক সত্তাস্থিত রাজনৈতিক চিন্তার পাঠ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এমনই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের উপন্যাস ১৯৪৭ সালে পেয়ে যায় এক স্বতন্ত্র পাটাতন, নতুন রাজনৈতিক ভূখণ্ড – পাকিস্তান। অখণ্ড বাংলা উপন্যাসের ধারা থেকে সে নির্মাণ করবার সুযোগ পায়

নতুন বয়ানের। এই বয়ানে অনিবার্যভাবে যুক্ত হয় রাজনৈতিক ঘটনা ও চেতনা। কারণ দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিযাত্রার ফলাফল আপাত উপনিবেশমুক্তি। কিন্তু বাংলার জনমানুষের সংগ্রাম অনিঃশেষ। প্রতি পর্বেই সে নতুন নতুন প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয়। আর শিল্পসৃজনে রাজনীতি বাংলাদেশের সাহিত্যে তাই প্রত্যক্ষভাবে বিরাজ করে। বলা যায়, বাংলাদেশের অপরাপর সাহিত্যধারার মতো উপন্যাসও বাংলাদেশের রাজনীতির সমান্তরালে বিকশিত হয়েছে।

'পরিপ্রেক্ষিত' শীর্ষক এই অধ্যায়ে সাতচল্লিশ-পূর্ববর্তী আর্থরাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক পটভূমি আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদে সাতচল্লিশ-পরবর্তী পরিপ্রেক্ষিত আলোচনাপূর্বক উপন্যাস-পাঠ বিশ্লেষিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের উপন্যাসে রাজনৈতিক চিন্তার স্বরূপ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিশ্বযুদ্ধ-মন্বন্তর ও জনমানুষ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তরের বাস্তবতা চল্লিশের দশকের সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ ও বাংলা অঞ্চলের জনমানুষের জীবনে ও রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের একটি বড় বাস্তবতা। ১৯৩৯ সালে শুরু হওয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীব্যাপী সামূহিক বিপর্যয় নিয়ে আবির্ভূত হয়। বিশ্বযুদ্ধ ছিল মনুষ্যসৃষ্ট; মন্বন্তর ছিল বিশ্বযুদ্ধজাত এবং নিশ্চিতভাবেই মনুষ্যসৃষ্ট। মনুষ্যসৃষ্ট এই দুই বিপর্যয় বাংলার রাজনৈতিক গতিপ্রবাহের দিক নির্মাণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের উপন্যাসে বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তরের বাস্তবতা, তার চিত্রায়ণ, জনজীবনে এর অভিঘাত, জীবনায়নের পটপরিবর্তন, পক্ষ-বিপক্ষ শ্রেণির প্রশ্ন নানাভাবে রূপায়িত হয়েছে। এর মধ্যে এই বাস্তবতা কীভাবে বাংলার জনগণকে রাজনৈতিক চেতনার ক্রমপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান-আন্দোলনের বাস্তবতা ও চূড়ান্ত পরিণতিতে ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান ও ভারত নামক দুই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে ধাবিত করেছে, তার অন্বেষণ চেষ্টা থাকবে বর্তমান পরিচ্ছেদে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) শেষ হবার একুশ বছরের মাথায় ইয়োরোপে সংঘটিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। দিন-তারিখের হিসেবে ১৯৩৯ সালের পহেলা সেপ্টেম্বর জার্মানি কর্তৃক পোল্যান্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযদ্ধের সূচনা ঘটে। একে একে অনেকগুলো আক্রমণ-প্রতিআক্রমণের মধ্য দিয়ে পুরো ইয়োরোপ এই বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে যায়। একই সঙ্গে ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য (ব্রিটেন) কর্তৃক জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষও হয়ে যায় বিশ্বযুদ্ধের অংশ। গড়ে ওঠে অক্ষশক্তি ও মিত্রশক্তি। ১৯৪১ সালে বিশ্বযুদ্ধ পায় নতুন রূপ। ১৯৪১ সালের জুন মাসে অক্ষশক্তি কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের মধ্য দিয়ে এশিয়াতেও এই যুদ্ধ আন্তঃমহাদেশীয় রূপ লাভ করে। অব্যবহিত পরে একই বছর ডিসেম্বরে জাপানের অক্ষশক্তিতে যোগদান, জাপান কর্তৃক প্রশান্তমহাসাগরীয় দ্বীপ যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন পার্ল হারবারে আক্রমণ, অতঃপর যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রশক্তিতে যোগদান – ইত্যাদি ঘটনা পুরো বিশ্বকে অনিবার্য মৃত্যু, রক্তপাত ও বিপর্যয়ের মুখোমুখি করে। একই সময়ে সুভাষচন্দ্র বসুর (১৯৮৭-১৯৪৫?) কংগ্রেস-ত্যাগ ও অক্ষশক্তির সঙ্গে যোগদান, আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন বিশ্বযুদ্ধের ঔপমহাদেশিক রাজনীতিতেও নতুন মাত্রা যোগ করে। তখন ভারতবর্ষও স্বাধীনতা আন্দোলন ও

ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে উত্তপ্ত। উপরতলার রাজনীতিবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি, সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তহীনতা, ব্যক্তি-উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার বহুমাত্রিক ঘটনাপ্রবাহ সাধারণ জনজীবনেও হানে বহুমাত্রিক অভিঘাত। বৃহৎ ভারতবর্ষের গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ বাংলা প্রদেশেও তখন রাজনীতির নতুন যাত্রার সূচনা। এখানেও ঘটে রাজনীতির উত্থান-পতন, দ্বিধা ও দ্বৈরথ। বিশ্বযুদ্ধ শুরুর অব্যবহিত পূর্বে ১৯৩৭ সালে বাংলার মানুষ প্রথমবারের মতো পায় একজন নির্বাচিত বাঙালি প্রধানমন্ত্রী। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কৃষক-প্রজা পার্টির শের-এ-বাংলা এ কে ফজলুল হক মুসলিম লীগের সঙ্গে জোট করে গঠন করেন, তিনি হন বাংলার প্রধানমন্ত্রী। '১৯৩৭ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত এই সময়কে বাংলার ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায় বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। ১৯৩৫ সালের আইনের আওতার মধ্যে কাজ করতে হলেও প্রশংসনীয়ভাবেই সরকার তাতে উত্তীর্ণ হল।' (কামরুদ্দীন ২০১৪ : ৪৩) এই গৌরবের মধ্যেও কিন্তু ছিল। এ কে ফজলুল হক পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় প্রথমত বাংলার কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গঠন করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। ইতিহাসবিদদের অনেকেই মনে করেন – সেটি হলে বাংলার ইতিহাস অন্যরকম হতে পারতো। কিন্তু কংগ্রেসের দিক থেকে সাড়া না পাওয়ায় মুসলিম লীগের সঙ্গে তাঁকে জোটবদ্ধ হয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করতে হলো। ১৯৩৭ সালেই তিনি প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। যদিও এরও আগে '১৯১৮ সালে তিনি একই সঙ্গে ভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক এবং সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন।' (সিরাজুল ২০২০ : ১০৯) এর মধ্যেও 'ঋণ সালিসি বোর্ড' গঠন (১৯৩৮), 'প্রজাসত্ব আইন' পাশ (১৯৩৯), 'কলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন' পাশ (১৯৩৯), 'মহাজনি আইন' পাশ (১৯৪০), 'ফ্লাউড কমিশন' গঠন (১৯৪০) করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রদ করার প্রচেষ্টা, 'স্কুল বোর্ড' গঠন ও 'মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড' গঠন (১৯৪০), রাজবন্দিদের মুক্তির ব্যবস্থা – ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বাংলার জনমানুষের দীর্ঘ দিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের বাস্তায়ন-চেষ্টা ফজলুল হক মন্ত্রিসভার উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত তাঁর এই অগ্রযাত্রাকে বেশিদূর এগুতে দেয়নি। ভারতীয় কংগ্রেস শুরু থেকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেনের অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। এবং ব্রিটেনের যুদ্ধকালীন সরকারি নীতিকে সমর্থন করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে কংগ্রেসশাসিত সাতটি প্রদেশের মন্ত্রিসভা ১৯৩৯ সালেই পদত্যাগ করে। কিন্তু মুহম্মদ আলি জিন্নাহর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ প্রথমত কংগ্রেসর বিরোধিতার প্রতিক্রিয়া ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পক্ষে সুবিধাপ্রাপ্তির আশায় ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন দিতে থাকে। জিন্নাহ হাজির করে দ্বিজাতিতত্ত্বের। তারই পরামর্শ ও ছক অনুযায়ী ১৯৪০ সালেল ২৩শে মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের অধিবেশনে এ কে ফজলুল হক কর্তৃক 'লাহোর প্রস্তাব' উত্থাপিত হয়। কিন্তু অচিরেই জিন্নাহ ও ফজলুল হকের মধ্যে নীতিগত বিরোধ দেখা দেয়। যুদ্ধ

পরিচালনার জন্য গঠিত সমর-পরিষদে পদাধিকারবলে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার প্রধানমন্ত্রীরা সদস্য হন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার জিন্নাহর লাহোর প্রস্তাবের দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার না করায় তাঁর দলের সকলকে সমর-পরিষদ থেকে পদত্যাগের নির্দেশ দেন। ফজলুল হক সেই নির্দেশ মানতে অস্বীকৃতি জানান। এর মধ্যে ফজলুল হকের ব্যক্তিগত রাজনীতির বিষয় থাকলেও অসংজ্ঞায়িত মুসলিম জাতীয়তাবাদী ধারণার সঙ্গে বাঙালিত্বের স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে; যদিও তা ছিল সাময়িক একটি বিষয়। ফলে তিনি মুসলিম লীগ থেকে পদচ্যুত হন। এরপর ১৯৪১ সালেই ১৮ই নভেম্বর হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে জোট গঠন করে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এই দ্বিতীয় হক-মন্ত্রিসভা, কথিত 'শ্যামা-হক' মন্ত্রিসভা ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু বাংলায় মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে দেখা দেয় বিভাজন। 'লাহোর প্রস্তাবে' উন্মাদনায় বাঙালি মুসলমান তখন নতুন মুসলমান-প্রধান রাষ্ট্রগঠনের স্বপ্নে বিভোর। ফলে ফজলুল হকের পূর্বতন জনঘনিষ্ঠ সরকার এই পর্যায়ে প্রতি পদক্ষেপে প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি হয়। একদিকে কট্টর মুসলমানদের মুসলিম লীগ, অন্য দিকে কট্টর হিন্দুত্ববাদী হিন্দু মহসভা – এই দুয়ের সংঘাতে বাংলার অসাম্প্রদায়িক নেতাখ্যাত ফজলুল হক নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক অগ্রযাত্রার খেই হারিয়ে ফেলে।

একই সঙ্গে বিশ্বযুদ্ধ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়জনিত খাদ্যাভাব বাংলার জনজীবনকে এক গভীরতর সংকটের দিকে ধাবিত করে। ১৯৪১ সালে জাপান কর্তৃক ব্রহ্মদেশ (বার্মা/মায়ানমার) দখল বাংলা অঞ্চলের সংকটকে আরও তীব্র করে তোলে। একদিকে ব্রিটিশ ও আমেরিকার সৈন্যদের জন্য খাদ্যমজুদ করা এবং অন্যদিকে জাপানিদের রসদ বন্ধের জন্য ব্রিটিশ সরকারের 'পোড়ামাটি নীতি' অবলম্বনের ফলে বাংলাদেশের চাল ও খাদ্য অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়, নদীপথের যাতায়াত বন্ধ করার জন্য নৌপরিবহন ধ্বংস করা হয়। এইসব বৈশ্বিক ও ঔপনিবেশিক তৎপরতা বাংলার গ্রাম-শহর-বন্দর এমনকি তিলোত্তমা নগরী কলকাতাতেও তৈরি করে দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর-পরিস্থিতি। এসব পরিস্থিতি মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে ফজলুল হক মন্ত্রিসভাসমেত পদত্যাগ করেন। এরপর ১৯৪৩ সালে খাজা নাজিমউদ্দিনের প্রধানমন্ত্রিত্বে বাংলায় মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করে (১৯৪৩)। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হন সেই মন্ত্রিসভার খাদ্য ও সরবরাহমন্ত্রী। কিন্তু কন্ট্রোল মার্কেট, রেশন ব্যবস্থা, লঙ্গরখানা স্থাপন ইত্যাদি নানা পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষকে ঠেকানো যায়নি। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ 'তেতাল্লিশের মন্বন্তর' বা 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে অভিহিত। ধারণা করা হয় এই মন্বন্তরে ত্রিশ লক্ষ মানুষ, মতান্তরে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ না খেতে পেয়ে মৃত্যুবরণ করে। তৎকালীন সরকারের নানা পদক্ষেপের পক্ষ-বিপক্ষেও ছিল নানা মত। পক্ষ-বিপক্ষের শত-সহস্র যুক্তি-প্রতিযুক্তি থাকলেও দুর্ভিক্ষ যে সংঘঠিত হয়েছিল, এবং এর নির্মম শিকার

হয়েছিল এ-দেশের সাধারণ মানুষ – তা ঐতিহাসিক সত্য। অনাবৃষ্টির ফলে তেতাল্লিশ সালে এমনিতেই ফসলের উৎপাদন হয়েছিল কম। আর সরকারের গৃহীত নীতির কারণে, পুঁজিকেন্দ্রিক ও ব্যবসানির্ভর পদক্ষেপের কারণে তৈরি হয় কৃত্রিম সংকট। দুর্ভিক্ষ দেখা যায় প্রথমত গ্রামে। মানুষ বাঁচার তাগিদে হয় শহরমুখী। কিন্তু শহরও তখন মন্বন্তর-কবলিত। বিশেষত কলকাতা নগর পরিণত হয় মৃত্যুপুরিতে। অন্যান্য বড় শহর যেমন ঢাকার অবস্থাও ছিল অভিন্ন। উক্ত কালপর্বের প্রত্যক্ষদর্শী প্রায় সকলের আত্মজীবনী বা বিশ্লেষণী রচনায় উঠে এসেছে ভয়াবহ চিত্র। প্রসঙ্গক্রমে কয়েকজনের প্রত্যক্ষ বয়ান উল্লেখ করা হলো।

তৎকালীন মুসলিম লীগের রাজনীতির একজন প্রত্যক্ষ কর্মী হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান (২০১৪ : ১৮) উল্লেখ করেন মন্বন্তরের ভয়াবহতা:

> বাংলাদেশের এই দুরবস্থা চোখে দেখেছি, মা মরে পড়ে আছে, ছোট বাচ্চা সেই রা মার দুধ চাটছে। কুকুর ও মানুষ একসাথে ডাস্টবিন থেকে কিছু খাবার জন্য কাড়াকাড়ি করছে। ছেলেমেয়েদের রাস্তায় ফেলে দিয়ে মা কোথায় পালিয়ে গেছে। পেটের দায়ে নিজের ছেলেমেয়েকে বিক্রি করতে চেষ্টা করছে। কেউ কিনতে রাজি হয় নাই। বাড়ির দুয়ারে এসে চিৎকার করছে, 'মা বাঁচাও, কিছু খেতে দাও, মরে তো গেলাম, আর পারি না, একটু ফেন দাও।' এই কথা বলতে বলতে ঐ বাড়ির দুয়ারের কাছেই পড়ে মরে গেছে।

কলকাতা শহরে বসবাসরত আনিসুজ্জামান (২০১৫ : ৫৫-৫৬) তাঁর কৈশোরক স্মৃতি থেকে উল্লেখ করেন:

> ১৯৪৩এ, বেশ স্পষ্টই মনে পড়ে, অনাহারক্লিষ্ট নরনারী শিশুবৃদ্ধ আমাদের পাড়ায় এসে আছড়ে পড়লো। প্রথমদিকে সকলেই কিছু কিছু সাহায্য করতে চেষ্টা করতেন। চাল ঝেড়ে যে খুদ বেরোতো তা ফেলে না দিয়ে ফ্যানের সঙ্গে মিলিয়ে মেজোবু একরকম জাউয়ের মতো তৈরি করতো। তারপর রান্নাঘরের পেছন দিকের দরজা দিয়ে তা ক্ষুধার্তদের দেওয়া হতো। খুদ দূরে থাক, শুধু ফ্যান দিয়েও কুলানো যেতো না। অন্নহীন লোকের সংখ্যা যতো বাড়তে থাকলো, শুভার্থীদের বিপদের আশঙ্কা ততো ঘনিয়ে আসতে লাগলো। যেখানেই কেউ ভাত বা ফ্যান দিতো, সেখানেই মানুষ ভিড় করতো, বন্ধ দরজায় করাঘাত করতো ক্রমাগত। ... জীর্ণশীর্ণ কঙ্কালসার মানুষেরা চোখে না পড়ে পারে নি। দু পায়ে ভর দিয়ে চলতে পারছে না – দুহাত-দু পা ফুটপাতে দিয়ে চতুষ্পদের মতো চলছে; ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে খাচ্ছে; মরে পড়ে থাকছে – সবই কিছু না কিছু দেখতে পেয়েছি। সরকারি গাড়ি নিয়মিত এসে মৃতদেহ সড়িয়ে নিত – তাও আমার অগোচর ছিল না।

তপন রায়চৌধুরী (২০১৯ : ১২৬) তাঁর স্মৃতিকথনগ্রন্থ *বাঙালনামা*য় জানান:

> গ্রামাঞ্চল বা মফস্বল শহর থেকে দলে দলে লোক এসে রাস্তা বা ফুটপাথে বাসা বাঁধতে শুরু করে। কলকাতার রাস্তায় ভিখারি কিছু নতুন দৃশ্য নয়। কিন্তু এই নবাগতরা অন্য ধরনের মানুষ। এক – এদের দেখলেই বোঝা

> যেত যে, ভিক্ষাবৃত্তি এদের স্বাভাবিক পেশা না। অনেক সময়েই দেখা যেত মা-বাপ-ছেলেমেয়ে নিয়ে একটা পুরো পরিবার এসে রাস্তায় আশ্রয় নিয়েছে। কলকাতায় ভিক্ষাবৃত্তির এটা সাধারণ লক্ষণ নয়। দ্বিতীয় কথা – প্রথম প্রথম এরা ভিক্ষা চাইত না। শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকত। ... [কিছুদিনের মধ্যে] রাস্তায় বের হলেই মৃত মানুষ পড়ে আছে দেখা নিত্যকার ঘটনা হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু উক্ত কালপর্বের প্রত্যক্ষদর্শনের মধ্যেও রাজনৈতিক পক্ষপাতের উপস্থিতি ছিল। যেমন তৎকালীন মুসলিম লীগের অন্যতম কর্মী এবং মুসলিম লীগ সরকারের সরবরাহ সচিব বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমদ তাঁর বিশাল আকৃতির (সাড়ে ছয়শ পৃষ্ঠার) *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর* (১৯৬৮) বইয়ে 'আকাল' ও 'আকালের দায়িত্ব' উপশিরোনামে মন্বন্তর বিষয়ে বলতে ব্যয় করেছেন মাত্র সাড়ে তিন পৃষ্ঠা। এবং তিনি এই আকাল বা মন্বন্তরের জন্য মুসলিম লীগ সরকারের কোনো দায় দেখেন না। আবুল মনসুর (২০১৬ : ১৮৩) পুরো বিষয়ের দায় চাপিয়ে দেন ভারত সরকার ও অংশত পূর্ববর্তী ফজলুল হক সরকারের ওপর:

> আসলে আকালের কারণ ঘটাইয়াছিল ভারত-সরকার। যুদ্ধ-প্রচেষ্টার অন্যতম পন্থা হিসাবে তাঁরা বাংলার চাউল যতটা পারিলেন 'সংগ্রহ' করিয়া বাংলার বাইরে সুদুর জব্বলপুরে গুদাম-জাত করিলেন। জাপানীদের হাত হইতে দেশী যানবাহন সরাইবার মতলবে 'ডিনায়েল পলিসি' হিসাবে নদী-মাতৃক পূর্ব-বাংলার সমস্ত নৌকা ধ্বংস করিয়া জনসাধারণের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্য অচল করিয়া দিলেন। চরম প্রয়োজনের দিনেও ভারত সরকার বাংলা-হইতে-নেওয়া চাউলগুলিও ফেরত দিলেন না। বাংলা সরকার (নাযিম-মন্ত্রিসভা) যখন বিহার হইতে উদ্বৃত্ত চাউল খরিদ করিতে চাহিলেন, তখন বাংলাসহ অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু-নেতারা চাউল সরবরাহের প্রতিবাদ করিলেন। কেউ-কেউ স্পষ্টই বলিলেন, খাদ্য-ঘাটতির বাংলাদেশ কেমন করিয়া পাকিস্তান দাবি করে, তা শিখাইতে হইবে।

আবুল মনসুরের মতে, আকালের দুই কারণ : প্রথমত, অবস্থা সম্পর্কে জেনেও সাবধান না হওয়া; দ্বিতীয়ত, জনসাধারণকে সাবধান না করা এবং প্রকৃত অবস্থা গোপন করা। অন্যদিকে অব্যবহিত পূর্ববর্তী মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৩৫১ : ১৪) দায়ী করেন মুসলিম লীগ সরকারকেই:

> সরকারি ঔদাসীন্যের ফলে ১৯৪৩ অব্দে ঠিক ১৮৮৬ অব্দের মতো অবস্থা অতি শোচনীয় হইল। টাকা ফেলিলেও চাউল মিলে নাই। চাঁদা তুলিয়া নানা প্রতিষ্ঠান লোক খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিল। সরকার মনে করিলেন, এই রকম হাজার কয়েক লোক খাওয়াইয়াই জনসাধারণ হাঙ্গামা চুকাইয়া দিবে, তাঁহাদের মাথা ঘামাইবার গরজ হইবে না। পেটের দায়ে মানুষ যে ঘরবাড়ি ছাড়িয়া পথে বাহির হইয়াছে, শহর-মুখো ধাওয়া করিয়াছে, কর্তাদের সেদিকে নজর পড়িল না।

একই বইয়ে তিনি সোহরাওয়ার্দীর এই অব্যবস্থাপনা বা বাইরের প্রদেশ থেকে খাদ্য সংগ্রহ না করার পেছনে পাকিস্তান কায়েমের জাত্যভিমান, সহজ কথায় মুসলমান হয়ে হিন্দু প্রদেশ থেকে সাহায্য গ্রহণ না করাকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। বোঝা যায়, লক্ষ লক্ষ মানুষের অনাহারে মৃত্যু-পরিস্থিতিতেও নেতৃত্বের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব অনুপস্থিত থাকেনি। রাজনীতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ:

> ভাবতে অবাক লাগে এমন এক জাতীয় দুর্যোগ ও গণমৃত্যু সত্ত্বেও মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ফজলুল হকের মতো ধীমান রাজনীতিকদের কেউ অভিযোগের আঙুল তোলেননি। না বিধানসভায়, না ময়দানে জনসভায়। দাবি তোলেননি তাদের ব্যর্থতাজনিত পদত্যাগের। বরং সে সময়কার রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বাংলায় মুসলিম লীগের রাজনৈতিক শক্তি ক্রমবর্ধমান। (আহমদ ২০১৫ : ১৬২)

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবই যে মুসলিম লীগের রাজনীতির ক্রমবর্ধমান শক্তির মূল উৎস, তার উল্লেখ বাহুল্য। সমাজচিন্তক যতীন সরকার (২০১৩ : ১০৪) 'পাকিস্তান আন্দোলনে'র এই জোয়ারকে অভিহিত করেছেন 'মৌতাত' বলে এবং দ্বিজাতিতত্ত্বকে বলেছেন 'সুবিধাবাদের তত্ত্ব' (২০১৩ : ৬৬)। বাঙালি দরিদ্র মুসলমানদের ভাগ্য যে ধর্মীয় রাজনীতির হাতে নিরাপদ নয়, তা বোঝা গিয়েছিল ওই মন্বন্তরের কালপর্বেই। কিন্তু শ্রেণিশোষণের বাস্তবতাকে ধর্মীয় শোষণ দিয়ে চাপা দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে কিছু সাম্প্রদায়িক রাজনীতির নেতা ক্ষমতার রাজনীতিতে সুবিধাপ্রাপ্ত হলেও জনমানুষের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। আর এই জনমানুষের শ্মশানের ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভিত্তিভূমি।

বিশ্বযুদ্ধ একটি বৈশ্বিক বিষয়, মন্বন্তর দৈশিক। চল্লিশের দশকে এই দুই বিষয়কে বাংলা অঞ্চলের একটি অভিন্ন বিষয় হিসেবে পরিচিহ্নিত করা যায়। পুরো ভারত উপমহাদেশের অংশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলায় বিশ্বযুদ্ধ-মন্বন্তরের বাস্তবতা স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের ও একেক শ্রেণির বাস্তবতাতেও আছে বৈভিন্ন্য। বাংলাদেশের উপন্যাসে ঔপন্যাসিকদের অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞান, রাজনৈতিক মতাদর্শ, অর্থনৈতিক ও শ্রেণিগত অবস্থান থেকে এই বাস্তবতার চিত্র নির্মিত হয়েছে তাঁদের উপন্যাসসমূহে। এ-সকল উপন্যাসে পাঠের মন্বন্তরের স্বরূপ এবং জনমানুষের ওপর এর প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্যকে পাঠ করা যায়।

২.১.১. বিশ্বযুদ্ধ-মন্বন্তর : পশ্চিমবঙ্গ

২.১.১.১

সরদার জয়েনউদ্‌দীনের (১৯১৮-১৯৮৬) *অনেক সূর্যের আশা* (১৯৬৭) উপন্যাসে কবি রহমতের উত্তম পুরুষের বয়ানে চিত্রিত হয়েছে চল্লিশের দশকের বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তরের বাস্তবতা। উপন্যাসের সময়পরিসর ১৯৩৯–১৯৪৭। বিশ্বযুদ্ধ নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনে কী ধরনের প্রভাব ফেলেছিল কিংবা তাদের জীবনের গতিকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছিল, তার আত্মজৈবনিক রূপায়ণ দেখা যায় এই উপন্যাসের প্রথমাংশে। কলকাতার একবালপুর লেনের মেস-জীবনে বিচিত্র চরিত্রের-মানুষের সমাবেশ থেকে ওই কালের বাস্তবতায় বহুমাত্রিক মনোভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। কথক রহমত ছাড়াও হায়াত খাঁ, ছমির মিয়া, সাজাহান চৌধুরী, হেনার মা, মফিজ, সাফাজ, কবি নিজাম, আবদুল হামিদ – এমন আরও নানা মানুষের শ্রেণি-অবস্থান অনুযায়ী বিশ্বযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের বাস্তবতায় তাদের জীবনজিজ্ঞাসা ও অস্তিত্বঅন্বেষা অনুধাবন করা যায়। উপন্যাসের শুরুতে রহমত একজন বেকার যুবক, ছমির মিয়া বুক-বাইন্ডিং কারখানার ম্যানেজার, হেনার মা মেসের সস্তায় খাবার সরবরাহকারী, হায়াত খাঁ ডক-শ্রমিক। বেকারত্ব ও অর্থনৈতিক সংকটের কঠিন সময়ে এরা কলকাতায় অবস্থান করে কেবল জীবিকার আশায়। কলকাতা তখন বাঙালি হিন্দু-মুসলমান উভয়ের জীবন-জীবিকার অন্যতম কেন্দ্রস্থল। কিন্তু চাকরি তো সোনার হরিণের চেয়েও দুর্লভ। কোথাও চাকরি নেই – ডক, কারখানা, সরকারি অফিস এমনকি কর্পোরেশনের মেথর – কোথাও না। মেসের একজন সদস্য মফিজ সেই আমলে মেট্রিক পাশ করেও চাকরির জন্য কেবল ছোটে আর ছোটে। এদিকে তার গ্রামের বাড়িতে মা-বাবা-ভাই-বোন উপোস করে দিনপাত করে। মফিজের বাবা চিঠি লেখে : 'বাবা মফিজ, চাকরির কী হইল, কবে নাগাদ পাইবে আশা করিতেছ? আর বুঝি বাঁচি না। দিন দিন জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়াই চলিয়াছে। কিছুই কেনাকেটার মতো পয়সা ঘরে আর নাই।' (সরদার ২০১২ : ২৭) ডক শ্রমিক হায়ত খাঁ – যাকে কথক রহমত এবং আরও অনেকে 'নানা' বলে সম্বোধন করে – সে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। তাঁর কাছে স্পষ্ট ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যবাদী চারিত্র্য এবং এদেশীয় রাজনীতিবিদদের সিদ্ধান্তহীনতা। ততদিনে ইয়োরোপে শুরু হয় বিশ্বযুদ্ধ। ক্রমেই শহর কলকাতার আবহাওয়াও স্বাভাবিক থাকে না। কলকাতার বাতাসে ছড়াতে শুরু করে যুদ্ধ, বোমা, বারুদের নানা খবর ও গুজব।

একবালপুর লেনের 'এ-মেস-জীবন যে বৃহৎ সমাজ-সংসারের ক্ষুদ্র সংস্করণ তা নির্দ্বিধায় স্বীকার করা যায়। এখানে রয়েছে বিচিত্র চরিত্রসম্পন্ন মানুষের সহাবস্থান; যারা কোনো-না-কোনোভাবে সমাজ বা

রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র।' (গিয়াস ২০১৯ : ১০৩) বিশ্বযুদ্ধের বৈশ্বিক বাস্তবতা নগর কলকাতায় তৈরি করে আশ্রয়হীনতার বাস্তবতা। আরেক সদস্য সাফাজের ভাষ্যে – 'কলকাতা শহরে এখন দশদিন খুঁজলে মাথা গুঁজবার ঠাঁই পাওয়া যায় না।' (সরদার ২০১২ : ৩১) তাই সুদূরের ইয়োরোপীয় যুদ্ধ কলকাতার জনজীবনকে করে তোলে আতঙ্কগ্রস্ত। কথক রহমতের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে দেখা যায়:

> সারা কলকাতায় হৈ চৈ পড়ে গেলো, বোমা পড়লে যেমন হৈ-চৈ পড়ে তেমন। কিনা কি জার্মানি অস্ট্রিয়া আক্রমণ করেছে। সারা বিশ্বব্যাপী যে যুদ্ধ বাধবো বাধবো করছিল, তা বেধে গেল। কয়েক দিনের মধ্যেই আরো কয়েকটি রাজশক্তি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লো, যার মধ্যে আমাদের মহান সম্রাট ব্রিটিশ রাজও রয়েছেন। (সরদার ২০১২ : ৩১)

এভাবেই উপন্যাসের কাহিনিতে গল্পের মতো করেই বিশ্বযুদ্ধ প্রবেশ করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হওয়ায় ভারতবর্ষে যুদ্ধ নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা অমূলক নয়। কিন্তু এই অভিঘাত কেবল চিন্তা বা আশঙ্কার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। যুদ্ধের খবরে দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন বৃদ্ধি ছোট একবালপুর লেনের মেসবাড়িতেও আঘাত হানে বিপুল বেগে। যুদ্ধের সামরিক অভিঘাতের আগেই এই নিম্নবিত্ত বেকার যুবকদের জীবনে অর্থনৈতিক অভিঘাত অনিবার্য বাস্তবতা হয়ে উপস্থিত হয় – 'হেনার মা ঝিয়ের চার পয়সার ভাত ছ'পয়সায় চলে গেলো, এক পয়সার ভাজি দু'পয়সা আর সবচেয়ে আশ্চর্য, বিনা পয়সার ডালের দাম এক ঝোঁকেই দু'পয়সা।' (সরদার ২০১২ : ৩১) ওই কালের অভিঘাত প্রায় সকল স্তরের মানুষকে আক্রান্ত করে।

বোঝা যায়, বাংলা অঞ্চলে বিশেষত নগর কলকাতায় বিশ্বযুদ্ধ শুরু থেকেই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের বাস্তবতা তৈরি করে। কিন্তু এ-বিপর্যয় থেকে আপাত মুক্তির জন্য আরেক চিরশৃঙ্খলের পথ তৈরি হয়। যুদ্ধে সেনাসংগ্রহের জন্যে কলকাতার মেয়ো রোডে খোলা হয় রিক্রুটিং অফিস। যুদ্ধভীরু বলে চিরকাল অবজ্ঞাত বাঙালি যুবকদের সুযোগ হয় সেপাই হিসেবে নাম লেখাবার। কিন্তু এ-বড় কঠিন পথ। বেকারত্বে পর্যুদস্ত অনেক বেকার তরুণ বাধ্য হয়েই সামরিক বাহিনীতে নাম লেখায়। উপোস আর অনাহারের নির্মম বাস্তবতায় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের খাতায় নাম লেখানো ছাড়া আর উপায় কী? বিশ্বযুদ্ধ দুর্ভিক্ষকে সঙ্গী করে আনে। তাই দীর্ঘদিন বেকার জীবনের দুর্বিষহ বাস্তবতায় ভোগা মফিজ গোপনে 'যুদ্ধে নাম লেখায়।' তার দেখাদেখি উপায়হীন উপন্যাস-কথক রহমতও নাম লেখায়। কিন্তু এটি যে সম্মানজনক ছিল না তা বোঝা যায় তাদের গোপনীয়তায়, আভ্যন্তর লজ্জাবোধে ও পলায়নপরতার মধ্য দিয়ে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির দোসর হওয়া যে কতটা লজ্জাকর, গ্লানিকর ও বিবমিষাময় তা

মফিজ-রহমতের প্রতিমুহূর্তের আত্মজিজ্ঞাসা ও বাস্তবতার দ্বৈরথ থেকে অনুমান করা যায়। বেকারত্ব থেকে সাময়িক মুক্তি তাদের ধাবিত করে অনির্দেশ্য ভবিষ্যতের দিকে।

রহমত ব্রিটিশ সেনা হিসেবে যোগ দিলে তাকে চলে যেতে হয় লক্ষ্ণৌয়ের এক সামরিক ঘাটিতে। সেখান থেকে বদলি হয়ে পাহাড় বেষ্টিত ছোট শহর ল্যান্সডাউনে। ল্যান্সডউনে অবস্থানকালে বিচিত্র চরিত্রের মানুষের সঙ্গে রহমতের পরিচয়, নর-নারীর সম্পর্ক, জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বহুমুখী ধারণা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতা ও জীবনচেতনার একটি বড় জায়গা জুড়ে অবস্থান করে। উত্তম পুরুষে রচিত হওয়ায় তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই উপন্যাসের প্রধানভাগ। এছাড়া বিভিন্নজনের চিঠিপত্রপাঠ, কথোপকথনসূত্রে বিশ্বযুদ্ধের সামগ্রিক বিপর্যয়, মূল্যবোধের বিপর্যয় ও মানবিক স্খলনের চিত্র উন্মোচিত হতে থাকে। চাকরির প্রয়োজনে যুদ্ধের মধ্যেই কিছুদিনের জন্য তাকে আসতে হয় কলকাতায়। সেইসূত্রে দেখা যায় ১৯৪২ সালের যুদ্ধকালীন কলকাতার বিপর্যস্ত চালচিত্র:

> পথঘাট এক জনঅরণ্য। মিলিটারি ট্রাক, গাড়ি আর গাড়ি, গাড়িই যেন বন-বাদার। পথ চলতে কার বাপের সাধ্য। চল্লিশে রেখে এসেছি বাঙালিদের কলকাতা, খুব বেশি তো ভারতীয়দের, এখন এই বিয়াল্লিশে ফিরে দেখি, দু'বছর পরের কলকাতা যেন খাকি উর্দিপরা নানা রঙের সাহেব সুবা ওয়াকী রমণী ও আরও কত বিদেশিনীদের ভিড়ে হারিয়ে গেছে। (সরদার ২০১২ : ৬৪)

এই কলকাতাকে রহমতের আপন মনে হয় না, এই কলকাতাকে বাঙালির কলকাতা বলে মনে হয় না। আত্মঅধিকারের জায়গাটি যেন হয়ে পড়ে নড়বড়ে ও অস্বস্তিময়।

পুঁজিবহুল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ কেবল মানুষের শারীরিক বা অর্থনৈতিক ক্ষতিই করে না, তার চেতনা ও মূল্যবোধের প্রতিটি অঙ্গকে আক্রান্ত করে। রহমতের বন্ধু সাজার ভাষ্য থেকে জানা যায় – 'কলকাতায় বাস করে সিফিলিসের হাত এড়িয়ে চলা এতো সহজ কথা নয় এখন! এক মুনিঋষি ছাড়া কেউ পারবে না। সে এখন ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে গ্রাম-পোড়ানো আগুনের মতো।' (সরদার ২০১২ : ৬৫) এই হলো বিশ্বযুদ্ধের শোকগ্রস্ত-রোগগ্রস্ত কলকাতা। সিফিলিসের মতো যৌনবাহিত রোগ থেকে রেহাই পায়নি সাত চড়ে রা না করা, যৌন-কথায় লালিমায় তেতে ওঠা নিতান্ত সরল যুবক কমল। এমন আরও শত সহস্র কমল কলকাতার অলিতে-গলিতে সিফিলিসের জীবাণুকে নিজের ভেতর ধারণ করেছে। এখানে ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা কিংবা রিপু বড় কথা নয়, কালের নির্মমতাই দায়ী – যা সর্বগ্রাসী। নারীর জীবনে দেহসর্বস্ব বাস্তবতার কথাও উঠে এসেছে রূপবতী নার্স ডিসিলভার প্রসঙ্গে। যে ছিল নিতান্ত দুঃখিনী একজন নারী, প্রণয়ীর বিরহে গভীরতরভাবে সংবেদনশীল, তাকে দেখা যায় এই যুদ্ধের বাজারে রূপ

ও যৌবনকে বিকিয়ে টাকা উপার্জন করতে। সাজার ভাষ্যে – 'মেয়েমানুষ কলকাতায় এখন খুব সস্তা, দু'টাকা এক টাকা কিংবা আটার দরে বিকোয়, তুমি ইচ্ছে করলে সহজে ফুটপাত থেকেই পিক আপ করতে পারো।' (সরদার ২০১২ : ৮২) জীবন-মৃত্যু-সম্ভ্রম সবই অর্থ ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সমান্তরালে এসে দাঁড়ায়।

বর্তমানে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের অতীত কথা আর যুদ্ধের মধ্যে থেকে যুদ্ধ নিয়ে ভাবার বাস্তবতা এক নয়। যুদ্ধ বাহ্যিক আঘাতের চেয়েও মারাত্মক এর স্নায়ুবিক অভিঘাত। যুদ্ধের সব খবরও যুদ্ধকালে সঠিক হয় না। মানুষের ভয় দ্বিধা ও স্নায়ুবিক ক্ষরণ সংশ্লেষিত হয়ে থাকে এসব খবরের সঙ্গে। কখনো কখনো আহত-নিহতের ঘটনাও মানুষকে সংবেদনশীল করে না। আহত নিহত হওয়ার ঘটনা ও খবর নিছক সংখ্যার মনস্তত্ত্বে পরিণত হয়। বিশ্বযুদ্ধে ভারতের সম্পৃক্ততা যেখানে সাম্রাজ্যবাদজাত, যে-কোনো পক্ষের জয় বা পরাজয়ের ফলে প্রকৃত অর্থে ভারতীয় জনগণের ক্ষতি ছাড়া বিকল্প নেই, সেখানে মৃত্যু-আক্রমণ-প্রতিআক্রমণের সঙ্গে সাধারণ জনগণ একাত্ম হতে পারে না। খবরগুলো হয়ে ওঠে তৃতীয় পক্ষের চোখে দেখা যুদ্ধকাহিনি – 'বার্মা ছেড়ে ভাগতে ভাগতে এখন আসাম ঢুকছে আমাদের কর্তারা। ওদিকে হাজার কয়েক পরাজিত ও বন্দি সৈন্য জাপানিদের সাথে হাত মিলিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে রুখে আসছে নিজের দেশ দখল করবে, ব্রিটিশকে এ দেশ থেকে তাড়িয়ে তবে ছাড়বে। আজাদ করবে দেশের মাটি।' (সরদার ২০১২ : ৮০) ব্রিটিশ সেনা হিসেবে কাজ করেও ব্রিটিশদের পরাজয়ের খবরে যে এক অবচেতন আনন্দ তৈরি হচ্ছে, এর মধ্য দিয়ে এ-যুদ্ধের সঙ্গে বাঙালির বিযুক্ততা চিহ্নিত হয়। একই সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি প্রচ্ছন্ন সমর্থনের পরিচয় পাওয়া যায়।

রহমত যুদ্ধ পরিস্থিতির অংশ এবং বৈষয়িকভাবে খানিকটা সুবিধাপ্রাপ্ত হয়েও পরিপার্শ্বের ভয়াবহতায় সে অবস্থান নেয় যুদ্ধের বিপক্ষে; কিন্তু মনে মনে। 'তাই মনে মনে বললাম, যুদ্ধ তুমি ধ্বংস হও, নিপাত যাও! তোমার কল্যাণ বড় কঠোর অসহনশীল! মানুষকে অমানুষ করে দেয়, ধ্বংস করে দেয়! তাই তুমি দুনিয়া থেকে শেষ হও।' (সরদার ২০১২ : ৮৪) হায়াত খাঁর যুদ্ধবিরোধী অবস্থান স্পষ্ট। বিশ্বযুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী মুখোশকে শনাক্ত করতে পেরেছিলেন শ্রেণিসচেতন হায়াত খাঁ। তাই তাঁর যুদ্ধবিরোধী উচ্চারণ উচ্চস্বরিত ও স্পষ্ট : 'যুদ্ধ লেগেছে, ব্রিটিশের সাথে জার্মানের সেই ইউরোপ দেশে, তাতে ভারতবাসীর কী? বাপুরে! তোমাদের যুদ্ধ তোমরা করো, এতে আমাদের টানছো কেন?' (সরদার ২০১২ : ৯১) হায়াত খাঁ নানার যুদ্ধবিরোধিতা কেবল নিছক যুদ্ধবিরোধিতা নয়, বরং ভারতের ওপর ইংরেজদের ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সচেতন প্রতিবাদ – 'জানো রহমত! ইংরেজ জাতকে

ভারতবাসী কোনোদিনই ক্ষমা করতে পারবে না, পারবেনা এজন্য যে, যে নিষ্ঠুর পরিহাস তারা ভারতবাসীর সঙ্গে করেছে, মর্তলোকে তার কোনো নজির নেই।' (সরদার ২০১২ : ১১৫) কিন্তু উপন্যাসপাঠে জানা যাবে ব্রিটিশ উপনিবেশমুক্তির পর নব্য পাকিস্তানি উপনিবেশে হায়াত খাঁর মৃত্যু হয় পুলিশের গুলিতে, শ্রমিকদের জন্য অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে। ফলে তার যে আদর্শিক অবস্থান তা ছিল যে-কোনো শোষণ, পরাধীনতা ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে।

দুর্ভিক্ষ-কবলিত কলকাতার অর্থনৈতিক মন্দাবস্থার পরিচয় দিতে গিয়ে রহমত জানায় – 'কলকাতায় রাস্তা ঝাড়ু দিলে সোনার দানা পাওয়া যেতে পারে আজকাল কিন্তু আটার দানা পাওয়া যায় না।' (সরদার ২০১২ : ৮১) এই বাস্তবতায় অনিবার্যভাবে যুক্ত হয় বুভুক্ষু মানবগোষ্ঠী:

> এখন কলকাতার ফুটপাতে অসংখ্য ভিখেরি আর অভুক্ত মানুষের দল ছাড়া আর কেউ চলে না। দু'পা না ফেলতেই নির্লজ্জ কঙ্কালেরা একটা শূন্য টিন কি মাটির শানকি নিয়ে এগিয়ে আসবে – ক'দিন খাই না বাবা! দুটো পয়সা দাও। অবশ্য বিকেলে কি রাতে অনেক রাতেও ওরা – ঐ অসভ্যেরা আসে অমনি ভূতপ্রেতের মতো এগিয়ে।' (সরদার ২০১২ : ৮৪)

উপন্যাসবিধৃত এই বিবরণকে পূর্বোল্লেখিত আত্মজীবনীসমূহের উদ্ধৃতির সাথে মিলিয়ে পড়লে বাস্তবতার ভয়াবহতা সহজে অনুমান করা যায়। বিরাজমান বৈষম্যকে এই যুদ্ধ আরও বেশি তীব্র আর দৃশ্যমান করে তুলেছিল অর্থলোলুপতা ও নিঃস্বতার বাস্তবতা। কলকাতার পথে পথে তখন কেবল অনাহারীদের সংখ্যাই বাড়েনি; বরং বেড়েছে সুবিধাবাদীদের সংখ্যাও। এ-সবকিছুর মূলে যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ক্রীড়ানকের ভূমিকা পালন করেছে, তা সংবেদনশীল কবি রহমত তার সংবেদনা দিয়ে অনুভব করে : 'যুদ্ধ! তুমি কী সর্বনাশ সঙ্গে করে এনেছ, দুনিয়াটাকে কী সাংঘাতিক দোযখ করে তুলেছ।' (সরদার ২০১২ : ৮৪) দরিদ্র হয়েছে দরিদ্রতম; হয়েছে উন্মুলিত ও নিরস্তিত্ব। একবালপুরে মেসের সদস্যরা জীবন-জীবিকার সন্ধানে হয়েছে বাস্তুচ্যুত। হেনার মা ঝির কণ্ঠে সেই সত্য লোকায়ত উপমায় উপস্থাপিত হয় : 'যা দিন কাল পড়েছে, তাতে কে কার খবর রাখতে পারে ভাই! লড়াই, দুর্ভিক্ষ মানুষজনকে শিমুলের তুলোর মত উড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে কোথায় কোথায়, কাঁহাকাঁহা রাজ্যি। তাই যে উড়ে গেছে কোথায়, তা কী করে বলবো।' (সরদার ২০১২ : ৮৯) মানুষের উন্মুলিত অবস্থা হেনার মা ঝিয়ের মতো দরিদ্র ও অক্ষরবঞ্চিত নারীর মুখে সার্থক প্রতীকায়নের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। দুর্ভিক্ষ কেবল শহরেই ছিল না, বরং গ্রাম থেকেই এর শুরু। গ্রামের দুর্ভিক্ষচিত্র হামিদের চিঠি থেকে জানা যায় – 'গ্রামের লোকজন কচু-ঘেঁচু শেষ করেছে – এখন মাটির শানকি ঝুলিয়ে নিয়ে ছেলেমেয়েদের হাত ধরে এক এক করে অন্নের অন্বেষণে শহরে মেলা করেছে।' (সরদার ২০১২ : ১২৭) কলকাতার জীবনও

তাই বিপর্যস্ত। গ্রাম থেকে আগত নিরন্ন মানুষে ভর্তি তিলোত্তমা নগরী – 'আজকাল কলকাতা দিয়ে চলাই যায় না। শুধু ছন্নছাড়া চেহারা নিয়ে ভুখা মানুষ হাত পেতে সামনে এসে দাঁড়ায়।' (সরদার ২০১২ : ১৭৭) এর সঙ্গে যুক্ত হয় ব্লাক মার্কেট। মুনাফালোভীদের হাতে বাজার চলে যাওয়ায় সাধারণ পণ্যসামগ্রীও চলে যায় নাগালের বাইরে। বিপর্যয়ের কালে রহমত তাই শ্লেষের অনুষঙ্গে তৎকালীন বাজার ব্যবস্থার কথা জানায়:

> আজকাল ব্লাক মার্কেট বলে একটা মার্কেট চালু হয়েছে বাংলাদেশে। সে মার্কেটটা যে ঠিক কোথায় তা জানা যায় না, তবে প্রায় সবার মুখে ঐ ব্লাক মার্কেট কথাটা আজকাল হরদম ওঠানামা করছে। সবাই বলছে, ক'দিনের মধ্যে দেশে ব্লাক মার্কেট ছাড়া আর মার্কেট থাকবে না। (সরদার ২০১২ : ১৭৮)

দেখা যায়, পার্ক সার্কাসের ঢাকার নাসিম মিয়া বোম্বেতে কিছুদিন লুকিয়ে থেকে হাজি হয়ে ফিরে সেই ভয়ানক অভাব-অভিযোগের দিনে তাঁর কাপড়ের দোকানে পাঁচ টাকার কাপড় পনের টাকায় বিক্রি করে। এমন উদাহরণ মিলবে অজস্র। যুদ্ধ কেবল বাঙালিদের মূল্যবোধকেই বিনষ্ট করেনি, ব্রিটিশ পুলিশ-সৈনিকরাও যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করে শতভাগ। যুদ্ধের কারণে দুর্নীতি তখন সর্বব্যাপ্ত – কঠিন-কঠোর মিলিটারি পুলিশও হয়ে পড়ে দুর্নীতিপরায়ণ। তবে পার্থক্য এটুকু তাদের দুর্নীতির আর্থিক চাহিদা ছিল অন্যদের চেয়ে, দেশীয় পুলিশের চেয়ে বেশি। একদিকে সাজার মতো বাঙালি যুবক সরকারি পণ্য গোপনে বিক্রি করে দেয়; আবার সেই পণ্য পুলিশের কাছে ধরা পড়লে টাকার বিনিময়ে ছাড়িয়েও নেওয়া যায় – নৈরাজ্যের চূড়ান্ত অবস্থা। এইসব ইতিবৃত্ত অঙ্কনের মাধ্যমে শ্রেণিসচেতন সরদার জয়েনউদ্‌দীন অবচেতনে সাম্রাজ্যবাদের প্রতি, ঔপনিবেশিকতার প্রতি ঘৃণাকে প্রকাশ করেছেন আত্মজৈবনিকতার অনুষঙ্গে। উত্তম পুরুষে বর্ণিত হওয়ায় বিশ্বযুদ্ধ মন্বন্তরের বাস্তবতাকে দেখতে হয়েছে ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রহমতের আত্মগত অনুভূতি, যা এক অর্থে জয়েনউদ্‌দীনেরই অনুভূতি।

২.১.১.২

রশীদ করীমের (১৯২৫-২০১১) *উত্তম পুরুষ* (১৯৬১) উপন্যাসের কেন্দ্রে থাকে কলকাতার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবার। চল্লিশের দশকে অপরারপ সকলের মতোই এই পরিবারও বিশ্বযুদ্ধজাত অর্থনৈতিক ও মূল্যবোধগত সংকটের মুখোমুখি হয়। উপন্যাসের কথক সেইরূপ পরিবারের একজন কৈশোরোত্তীর্ণ তরুণ। শ্রেণিগত অবস্থানের কারণে সে দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তরকে দেখে খানিকটা আউটসাইডারের চোখ দিয়ে। অর্থনৈতিক কষ্ট-অভাব তাদেরকে স্পর্শ করে; তবে সেটা দুর্ভিক্ষ পর্যায়ের না। তাই খণ্ড খণ্ড ছবির মধ্য দিয়ে জীবনের অপরাপর সংকটের মতো ওই সময়ের মন্বন্তরচিত্র প্রকাশিত

হয়। যেমন সে বলে : 'এই এক নতুন নিয়ম হয়েছে – সব কিছুতে 'কিউ' করা। 'র‍্যাশন শপ' থেকে শুরু করে 'বাস-স্ট্যান্ড' পর্যন্ত সব কিছুতে 'কিউ'। যুদ্ধ বাধবার পর থেকেই এই নিয়মটা চালু হয়েছে।' (রশীদ ২০১৩ : ৮০) যুদ্ধের বৈনাশিক বাস্তবতা কিশোরদের জীবনের ভেতরও ঢুকে পড়েছিল। *উত্তম পুরুষ* উপন্যাসের একটি ঘটনাকে সেই অবক্ষয় ও নীতিহীন বাস্তবতার দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করা যায়। কথকের দরিদ্র বন্ধু শেখরের পরীক্ষার ফি দেবার জন্য কথক শাকের তার উপহারপ্রাপ্ত শেফার্স কলমটি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেয়। অবস্থাপন্ন সহপাঠী কাঞ্জিলালের কাছে টাকার সহযোগিতা চাইলে কাঞ্জিলাল তার পকেটে থাকা কলমের বিনিময়ে টাকা দিতে সম্মত হয়। এর জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু বন্ধু শেখরকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে এই অনিচ্ছাকৃত কাজ করতে বাধ্য হয়। আশি নব্বই টাকাতেও যে কলম মিলবে না, সেটা পনের টাকাতে বিক্রি করতে হয়। বোঝা যায়, কালোবাজার বা ব্ল্যাক মার্কেটের বাস্তবতা কিশোরদের মূল্যবোধকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। পারিবারিক জীবনে অবক্ষয়ের ফলে শেখরের স্বভাবেও চলে আসে দীনতা। এ-নিয়ে কথক তিরস্কার করতে গেলে শেখর শোনায় নির্মম বাস্তবতার কথা:

> আজকাল আমাদের ভালো করে খাওয়া জোটে না! যুদ্ধ যবে শুরু হয়েছে, চাল-ডালের দাম এত বেড়ে গেছে, আমরা দুবেলা পেট পুরে খেতে পাই না। দেশে একটু জমি-জমা আছে তার থেকেও কিছু পাই না। দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। মা-ও একবেলা খায়। মার কষ্ট দেখলে বুক ফেটে যায়। মনে হয় ছুটে যাই, ভিক্ষে করে কিছু চাল ডাল নিয়ে আসি। শেষ পর্যন্ত লজ্জায় পারি না। লজ্জায় মাথা কাটা যায়। (রশীদ ২০১৩ : ৮৩)

যুদ্ধ কলকাতার নাগরিক জীবনকে ব্যাহত করে দারুণ ভাবে। রান্না করার জন্য প্রয়োজনীয় কয়লার সংকট, নিত্য ব্যবহার্য পানির সংকট দৈনন্দিন সংকটে পরিণত হয়। মুড়ি-মুড়কি দিয়ে সেরে নিতে হয় দুপুরের খাবার। সর্বত্র এক নেই নেই-এর বাস্তবতা। যুদ্ধের বাজারে যুদ্ধের চাকরি উপায়হীন মধ্যবিত্তের কাছে একমাত্র কানাগলি। চাকরিহীনতা থেকে সাময়িক মুক্তির জন্য যুদ্ধের চাকরিতে নাম লেখানো নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের জন্যও ছিল ওঁচা বিষয়। শিক্ষিত শাকের যখন তার মাকে বলে – 'যুদ্ধের সময় কত জায়গায় সেধে লোক নিচ্ছে। ইচ্ছে করলে কালকেই 'এ-আর-পি'তে জয়েন করতে পারি।' তখন শঙ্কিত মায়ের উত্তর : 'ছিঃ বাবা। ও-সব কথা মনে আনতে নেই। যুদ্ধ আজ আছে কাল নেই। যুদ্ধের চাকরিও আজ আছে কাল নেই। তখন কি করবি? লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে এক্ষুণি কাজে ঢুকলে পথে বসবি।' (রশীদ ২০১৩ : ৮৬)

যুদ্ধ ঘরের কাছাকাছি আর দুর্ভিক্ষ যখন দ্বারে দ্বারে; তখনও উচ্চবিত্তদের বিলাসী জীবন বৈষম্যের অনুপাতকে বাড়িয়ে দেয়। উপন্যাসে একটি চরিত্র অনিমার জন্মদিন এবং সেই উৎসবে একেক জনের

উচ্চারণ থেকে দুর্ভিক্ষ ও তৎকালীন বাস্তবতা সম্পর্কে শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গিটি আবিষ্কার করা যায়। একদিকে দুর্ভিক্ষ অন্যদিকে উচ্চমধ্যবিত্তের জন্মদিন-উৎসব সেই সময়কার পরিস্থিতির বিষয়ে তৈরি করে কূটাভাষ:

> বাড়ির লোহার গেটের দুই পাশে দুজন দারোয়ান মোটা লাঠি হতে দাঁড়িয়ে আছে। নিমন্ত্রিতদের সালাম জানাতে অবশ্য কসুর করছিল না, কিন্তু তাদের সত্যকার ভূমিকা কিছুটা ভিন্নরকম ছিল। গেটের ঠিক বাইরেই অসংখ্য দুর্ভিক্ষ-তাড়িত বুভুক্ষু লোলুপ-দৃষ্টিতে উন্মুখ হয়ে এই বাড়িটির অন্দরের দিকে তাকিয়ে ছিল। আলোক-সজ্জা, সুসজ্জিত নর-নারী, কল-হাস্য প্রভৃতির বাহুল্য দেখে আর শুনে তারা সহজেই অনুমান করেছে, এ-বাড়িতে আজ ভোজের আয়োজন আছে। (রশীদ ২০১৩ : ১০৬)

এমনই বিপরীত বাস্তবতায় অনিমার জন্মদিনে আগত মুশতাক অনিমাকেই প্রশ্ন করে : 'দেশে দুর্ভিক্ষ, আর তুমি এমন উৎসব করছ?' অনিমার উত্তর : 'আমি অনাহারে থাকলেই যদি দেশসুদ্ধ লোকের খাদ্য জুটত তাহলে আমি অন্ন স্পর্শ করতাম না।' (রশীদ ২০১৩ ১০৬) এই কথোপকথন থেকে যুদ্ধ-মন্বন্তরের বাস্তবতার মধ্যেও ক্ষুধার্ত-অনাহারী জনতা ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির দৈনন্দিন আনন্দ উদযাপনের স্ব স্ব অবস্থান চিহ্নিত হয়।

উপন্যাসে এমন আরও ছোট ছোট টুকরো অনুষঙ্গে কলকাতা নগরে যুদ্ধের বাস্তবতা প্রকাশিত হয়। যুদ্ধের কারণে 'লাইটিং রেশট্রিকশন' অনুযায়ী চলতি পথে আলোর অভাব দেখা দেয়। কোনো কোনো সময়ে ভিখারিরা মিষ্টির দোকানে হামলা করে ও লুট করে। চারদিকে জাপানি বোমার আতঙ্ক। সব মিলিয়ে এক বীভৎস পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতির মধ্যেও গল্পকথকের মতো মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ আত্মখননে জর্জরিত হয়:

> নারীদের কোলে শিশু, পরনের জীর্ণ বস্ত্র নগ্নতাকে আরো উন্মোচিত করেছে। অনেকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। কি চায়? ভিক্ষা? আমি আরো দ্রুত পা চালিয়ে দি। কেমন যেন প্রেতাত্মার ছায়ার মতো মনে হয় এই দুর্ভিক্ষ-তাড়িত লোকগুলোকে। অন্ধকার জনবিরল পথে ছায়ার মতো ঘুরে বেড়ায়। (রশীদ ২০১৩ : ১১৫)

পূর্বেই বলা হয়েছে, নাগরিক মধ্যবিত্ত বিশ্বযুদ্ধ-মন্বন্তরকে প্রত্যক্ষ করেছে খানিকটা দর্শকের ভূমিকায়। তবে পার্থক্য এই – মন্বন্তরের শিকার মানুষগুলো জানতেই পারেনি মন্বন্তরের মূল কারণ। সেদিক থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণি এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিল। কিন্তু তাদের নড়বড়ে অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে তারাও থেকেছে নিশ্চুপ। অন্যদিকে ধর্মগত স্বার্থ সংরক্ষণে তৎপর শ্রেণি বৃহত্তর মানুষের সংকট সমাধানে ছিল অনেকটাই নিস্পৃহ। অন্তত উপন্যাসে বিধৃত চরিত্রসমূহের ক্রিয়া ও মনোভঙ্গি থেকে তা-ই বোঝা যায়।

২.১.১.৩

হাসান আজিজুল হকের (জ. ১৯৩৯) *আগুনপাখি* (২০০৬) উপন্যাসে রাঢ় বঙ্গের এক নিভৃতচারী গ্রামীণ গার্হস্থ্য নারীর জীবনে বিশ্বযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের অভিঘাত সেই নারীর স্ববয়ানে উঠে এসেছে। আপাত বৈচিত্র্যহীন দিনযাপনের মধ্যেও বৈশ্বিক সংকট একেবারে ঘরের ভেতর হানা দেয়। অর্ধসাক্ষর এই নারীর কোনো নাম নেই এই উপন্যাসে। স্বামী 'কত্তা'-পুত্র-কন্যা-ননদ-শাশুড়িই তার বিশ্ব। যুদ্ধের প্রারম্ভিক পরিস্থিতিতে তখনও নিজ সংসারে সে অপর, জগৎসংসার থেকে সে আরও বেশি অপর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে তার বিয়ে হয়। তখনও তার জীবন ছিল রান্নাঘর-স্বামীসংসারে সীমাবদ্ধ। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার খবরের চেয়েও সে বেশি যন্ত্রণা অনুভব করে অব্যবহিত পূর্বে গ্রামের আগুনলাগার ঘটনায়। তাই সে স্বামীকে বলে – 'তা আবার এ্যাকন সারা দুনিয়ায় যুদ্ধ শুরু হয়েছে বলছ, তা হলোই বা নিজেরা তো কিছুই ট্যার পাবো না। তার চেয়ে জষ্টি মাসে গাঁয়ে যি আগুন লাগল, গোটা হিঁ-দু-পাড়াটো পুড়ে গেল, সি ধাক্কা জানে যেয়ে লেগেছে তোমার এই যুদ্ধর চেয়ে অ্যানেক বেশি।' (হাসান ২০০৬ : ৮৪) সর্বমানবিক এই নারীর কাছে গ্রাম-পোড়ার যন্ত্রণা যুদ্ধের বিশ্ব-পোড়া যন্ত্রণার চেয়ে বেশি। যুদ্ধের অনিবার্যতা থেকে চল্লিশের দশকে গ্রাম-শহর কোনো কিছুই মুক্ত থাকেনি। উড়োজাহাজ-বোমা-কামান-বন্দুক এসব থেকে শত-হাজার মাইল দূরে থেকে জীবনহরণকারী যুদ্ধকে সে অস্বীকার করতে চায়। যুদ্ধকে সে গ্রহণ করতে পারে না। যুদ্ধ তার কাছে মুত্যুর অসীম সংখ্যাতত্ত্ব হিসেবে আবির্ভূত হয়। খবরের কাগজে যুদ্ধের খবর পড়ে তার মনে হয়:

> একের পরে শূন্য দিলে দশ হয়, দুটো দিলে একশ হয় আর তিনটো দিলে হাজার হয় – এই পয্যন্ত জানি আর হাজার হলে কতো হয় তা-ও একটু একটু বুঝতে পারি। কিন্তুক তার পরে য্যাতো শূন্যই দাও, তাতে কতো হয় তা কুনোদিনই শিখতে পারব না। ... এই লেগে কাগজ পড়তে গেলেই বুকের মদ্যে খালি খাঁ খাঁ করে। হায় হায়, তামাম দুনিয়ার সব্বোনাশ হচ্চে! (হাসান ২০০৬ : ৮৫)

গার্হস্থ্য নারীর জীবনে ধ্বনিত হয় এক বিশ্বজনীন মানুষের নিনাদ। যুদ্ধ দূর থেকে চলে আসে খুব কাছে। প্রথম আঘাত আসে পরনের কাপড়ের ওপরে। কত্তা তার মাকে জানায় 'বাজারে আগুন মা, মিহি তাঁতের শাড়ি, চিরকাল যা তোমরা পরে এসেছ, সে আর বাজারে নাই। এ বড়ো বড়ো শহরে, কলকেতোয় এখনো এখানে-ওখানে কিছু থাকতে পারে শহরগঞ্জে কোথাও তাঁতের মিহি শাড়ি নাই।' (হাসান ২০০৬ : ৮৬) সরল এই নারী যুদ্ধের ফলে পণ্যসংকটের কারণ বুঝতে চায়। তার সরল প্রশ্ন – 'যুদ্ধর কুনোকিছু তো একনো ই-দ্যাশে হয় নাই। তাইলে হঠাৎ হঠাৎ এক একটো জিনিস ক্যানে নাই হবে?' (হাসান ২০০৬ : ৮৭) কিন্তু এই প্রশ্নের সদুত্তর না মিললেও কাপড়ের হাহাকার, কেরোসিন তেলের হাহাকার,

খাবারের হাহাকার বেড়েই চলে। এর সঙ্গে দেখা মেলে গোরা মেলিটারি, তাদের জিপগাড়ি আর নারীদের সঙ্গে কদাচার। তার বয়ানেই সে জানায় – 'তাইলে ইবার কেরমে কেরমে যুদ্ধ এসে বাড়ির মধ্যে ঢুকে যেচে।' (হাসান ২০০৬ : ৯১) এর সঙ্গে যুক্ত হয় অনিবার্য আকাল। উপন্যাসের এই পরিচ্ছেদের শিরোনাম হয় 'আকাল আর যুদ্ধুর দুনিয়ায় কেউ বাঁচবে না'। গ্রামের মুদির দোকান বন্ধ, কাপড়-কেরোসিন-কয়লা-লবণের হাহাকার। গ্রামের দরিদ্ররা ভাত নয়, গরু-মোষের জন্য রেখে দেওয়া মাড় চেয়ে নিয়ে যায়। তাই সে বিস্মিত হয় – 'ওমা, আমার কি হবে? জেবনে যি এমন ভাতের আকাল দেখি নাই, শুনি নাই।' (হাসান ২০০৬ : ১০১) কিন্তু তারপরেও সে আশাবাদী। কারণ কৃষিভিত্তিক সমাজে খাদ্যের সম্পর্ক ভূমির সঙ্গে। আর ভূমির ওপর আস্থাশীল এই নারীও মনে করে শহরে সংকট থাকলেও ভূমি ও ফসল গ্রামকে রক্ষা করবে। কিন্তু ফসলের প্রাকৃতিক চক্রেও খাদ্যাভাব আসন্ন হয়ে ওঠে। তাই সে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে:

> শুনছি শহরে চালের দাম দ্বিগুণ হয়েছে, কেনে হয়েছে কে জানে? সি লিকিনি ফাগুন-চোতে হয়েছে। গাঁয়ে তেমন বোঝা যেত না বটে। বোঝা যাবেই বা ক্যানে, গাঁয়ে চালই নাই, তা দাম বাড়ল না কমল জেনে কি হবে? খুব ভয় লাগছে, খুব ভয় লাগছে। (হাসান ২০০৬ : ১০১)

এই গার্হস্থ্য নারীর জবানে ও বয়ানে শুধু প্রান্তিক জীবনের নয়, বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তরকালে প্রান্তিক নারীর অন্তর্গত সত্যকে উন্মোচন করেছেন শিল্পনিষ্ঠ পরিচর্যায়। অত্যাসন্ন যুদ্ধ নিরীহ গ্রামীণ জীবনে একসময় কৌতুকও তৈরি করে। যেমন গ্রামের ছেলেরা গান বাঁধে : 'সারেগামাপাধানি, বোম ফেলছে জাপানি।' জাপানি বোমা পড়বে এই আতঙ্কের মধ্যেও গ্রামীণ জীবনে মিশে থাকে কৌতুক ও কৌতূহল। তার বর্ণনা থেকেই জানা যায় গ্রামে গ্রামে সৈন্যদের জন্য খাবার সংগ্রহের জন্য তৈরি হয়েছে দালাল শ্রেণি। তারা গ্রাম-গঞ্জ থেকে গরু-ছাগল-ডিম-মুরগি কিনে নিয়ে শহরে বিক্রি করছে। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আমেরিকান সৈন্যদের সম্পর্কে সে বলে:

> যুদ্ধু ছাড়া এ্যাকন আর কুনো কথা নাই। গোরা পল্টনের গা থেকে লিকিনি কেমন একটো বোটকা গন্ধ পাওয়া যায়, বললে না কেউ পেত্যয় যাবে সেই বোটকা গন্ধ এ্যাকন সারা দ্যাশে, পল্টন কাছে থাকুক আর না থাকুক। ই গন্ধই এ্যাকন যুদ্ধুর গন্ধ। রুগির ঘরে সেই গন্ধ, ভাতের থালায় সেই গন্ধ, ছেলের গায়ে সেই গন্ধ। চামড়া শুকোনোর গন্ধ। (হাসান ২০০৬ : ১০২)

এই বর্ণনায় যুদ্ধ নিয়ে যেমন কৌতুক আছে, তেমনি কাব্যব্যঞ্জনায় যুদ্ধের সর্বব্যাপকতাও উন্মোচিত হয়েছে। একইসঙ্গে আছে যুদ্ধবিরোধী অবস্থান।

নিয়তির মতো করেই তার জীবনে বিশ্বযুদ্ধ আসে, আসে আকাল। দুর্ভিক্ষকে সে শুধু প্রত্যক্ষ করে না, মোকাবিলা করে জীবনের সত্য জেনে। জীবনের সত্যের মতোই দুর্ভিক্ষ অবলীলায় গ্রাস করে তার যাপিত জীবনকে। পর পর দুই সন ফসল খেতেই মারা যায়। একবার খরায়; অন্যবার বন্যায়। এই নারী তার চোখে দেখা কারণকেই আকালের কারণ হিসেবে বোঝে। স্বামী কত্তার কাছ থেকে শোনে বাইরের দুনিয়ার খবর। মাঠেও দানা থাকে না, ঘরেও থাকে না। শ্রমে-ঘামে গড়ে তোলা সংসার যখন সচ্ছলতার মুখ দেখতে শুরু করে তখনই আঘাত হানে আকালের থাবা। শুধু খাবারেই নয়, দৈনন্দিন জীবনযাপনেও ঘটে ছন্দপতন : 'পালকিটো পড়ে আছে, রং চটে গেয়েছে। কাঠ ভেঙে ভেঙে পড়েছে, ঘোড়া একটো আছে বটে এখনো। ঘোড়ায় চেপে কত্তা কতোদিন কোথাও যায় না!' (হাসান ২০০৬ : ১১২) আকালের অভিঘাতকে সে আরও কয়েকটি বাক্যবন্ধে সংক্ষিপ্ত কিন্তু সবিস্তারে প্রকাশ করেছে:

> দুটি বছর পেরুল। এই দুটি বছর যি কেমন করে গেল সি শুদু আমিই জানি এমন কথা বলতে পারব না। দুনিয়া জাহানে যারা আজো বেঁচে আছে, না খেয়ে শুকিয়ে মরে নাই, রোগে ভুগে মরে নাই, রাস্তায় হুঁটুরে পড়ে মরে নাই – কোনো পেকারে শুদু বেঁচে আছে, তারাই তা হাড়ে হাড়ে জানে। একটি একটি করে দিন আর যেন কাটে নাই, রোজ কেয়ামতের লেগে অপিক্ষেও এর চাইতে ভালো। (হাসান ২০০৬ : ১১৩)

এই নারীর কাছে তার চেনা জগতই তার দুনিয়া-জাহান। এই নির্মম বাস্তবতা প্রতিটি গ্রামের জন্যই প্রযোজ্য। তাই তার বর্ণনার অন্তর্গত অর্থ সর্বব্যাপ্ত অর্থে গৃহীত হয়। উপন্যাসের পরবর্তী অংশে দেখা যাবে বিশ্বযুদ্ধের এই আকাল থেকে সে এবং তার পরিবার প্রাণে বেঁচে গেলেও বিভাজনের রাজনীতি তাকে করে তোলে পরিবার বিচ্ছিন্ন। রাজনৈতিক চেতনার অপরাপর বিষয়গুলো আলাদা রেখেও প্রান্তিক জীবনে দুর্ভিক্ষের গার্হস্থ্য রূপ, সংগ্রামী ছবির অনুপুঙ্খ শিল্পসৃষ্টি হিসেবে *আগুনপাখি* উপন্যাস একটি প্রতিনিধিত্বশীল সৃষ্টি।

২.১.২. বিশ্বযুদ্ধ-মন্বন্তর : পূর্ববঙ্গ

২.১.২.১

কলকাতায় বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তর দুই প্রবল, প্রত্যক্ষ ও আগ্রাসী রূপ নিয়ে হাজির হয়েছিল। কিন্তু কলকাতার বাইরেও এর প্রভাব নিছক কম ছিল না। বরং এর উৎস ছিল গ্রাম। তৎকালীন পূর্ববাংলার গ্রামীণ জীবনের রূপায়ণের মধ্য দিয়ে *সূর্য-দীঘল বাড়ী* (১৯৫৫) উপন্যাসে আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩) সেই খাদ্যাভাব ও তৎপ্রসূত মূল্যবোধের ক্ষয়িষ্ণুতাকে তুলে ধরেছেন। ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামীণ জনপদে দেখা দিয়েছিল খাদ্যাভাব:

এক মুঠো ভাতের জন্যে বড়লোকের বন্ধ দরজার ওপর মাথা ঠুকে ঠুকে পড়ে নেতিয়ে। রাস্তার কুকুরের সাথে খাবার কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়। দৌলতদারের দৌলতখানার জাঁকজমক, সৌখিন পথচারীর পোশাকের চমক ও তার চলার ঠমক দেখতে দেখতে কেউ চোখ বোজে। ঐশ্বর্যারোহীর গাড়ীর চাকায় নিষ্পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারায় কেউ। (আবু ইসহাক ২০০৪ : ৯)

উপন্যাস শুরু হয়েছে অভাবের চিত্র ও মন্বন্তরের বাস্তবতা দিয়ে। মানুষের জীবনে থাকে না স্বাভাবিক ছন্দ। 'তাদের শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে। পেট গিয়ে মিশেছে পিঠের সাথে। ধনুকের মত বাঁকা দেহ – শুষ্ক ও বিবর্ণ।' (আবু ইসহাক ২০০৪ : ৯) উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সংগ্রামশীল নারী জয়গুন ময়মনসিংহ থেকে সস্তায় চাল এনে গ্রামে বিক্রি করে। কৃষিভিত্তিক ময়মনসিংহ অঞ্চলে চাল কিছুটা সস্তা ছিল। নারায়ণগঞ্জে চালের দর ছিল বেশি। ময়মনসিংহ থেকে আরও অন্যান্য নারীর সঙ্গে তাকেও লুকিয়ে চাল এনে শহরে বিক্রি করতে দেখা যায়। পুলিশি হেনস্তারও শিকার হতে হয় তাদের। পুত্র হাসু ও কন্যা মায়মুনকে নিয়েই তালাকপ্রাপ্তা জয়গুনের জীবন। সমাজগঞ্জনা, কুসংস্কার, কৃচ্ছ্রতা আর দারিদ্র্যকে নিয়েই তাদের জীবন। কিন্তু 'আবু ইসহাকের সূর্যদীঘল বাড়ী ভূতুড়ে কুসংস্কারচ্ছন্ন কোনো গৃহকেন্দ্রিক উপন্যাস নয়, উন্মূলিত জয়গুন-পরিবারের জীবন-অন্বেষার কাহিনী। হাসুর শহরের জীবনসংগ্রাম–গ্রামবাংলার অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের সংকেতবহ।' (সৈয়দ আকরম ১৯৮৫ : ১৯) 'উপন্যাস জুড়ে মন্বন্তরের প্রচণ্ডতা আছে, সময়ের পরিসরে স্বাধীনতার স্বপ্নে আশার বাতি জ্বালান জীবনের প্রণোদনা আছে, আছে প্রতিকূলতার সঙ্গে বেঁচে থাকা একটি নারী চরিত্রের স্থির জীবনের বাস্তবতা।' (শহীদ ২০০৩ : ৬৫) তাই চিন্তারাজ্য থেকে অনেক দূরের দৈশিক ও বৈশ্বিক বিশ্বযুদ্ধ তাদের জীবন ও অর্থনীতির সংকটকে আরও তীব্র করে তোলে।

শহরের মতো গ্রামেও অভাবের খাণ্ডবদাহ। নিত্য ব্যবহার্য সবকিছুতেই দেখা দেয় সংকট। চালের সংকট, কাপড়ের সংকট, জ্বালানি তেলের সংকট : 'সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঘরে সাঁঝ-বাতি দেখিয়ে আবার নিবিয়ে দেয় মায়মুন। আবছা অন্ধকারে বসে মাছ কয়টা কুটে লবণ দিয়ে রাখে।' (আবু ইসহাক ২০০৪ : ১৪) টুকরো টুকরো এমন অনেক কর্মক্রিয়া থেকে সংকটের সার্বিক চিত্র অনুধাবন করা যায়। যেমন জয়গুন বলে : 'কি পোড়ার দ্যাশ দ্যাখ্ দেহি। উত্তুরে এডুক হস্তা না অইলে হুকাইয়া তেজপাতা অইয়া যাইতাম না?' (আবু ইসহাক ২০০৪ : ১৫) দুর্ভিক্ষে ঘটে গ্রামীণ জীবনে মূল্যবোধেরও অধঃপতন। যেমন প্রাক্তন স্বামী করিম বক্শ 'দুর্ভিক্ষের বছর বিনা দোষে' জয়গুনকে তালাক দেয়। (আবু ইসহাক ২০০৪ : ১৯) এই খাদ্যাভাবের সঙ্গে তৎকালীন রাজনীতিও দূরাগত বাঁশির সুরের মতো সাধারণের মনে আশার বীজ বপন করে। এই সাধারণের কাছের পেটের ক্ষুধার চেয়ে বড় কোন সত্য থাকে না।

তাই বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনেও তারা যুক্ত হয় খাদ্য-বস্ত্রের নিশ্চয়তার আশায়। টাকায় তখন মাত্র দেড় সের চাল কিনতে পাওয়া যেত। এমন বাস্তবতা থেকে উত্তরণের স্বপ্নে বিভোর হাসুকে বলতে শোনা যায় : 'দ্যাশ স্বাদীন অইব। আর দুকখু থাকব না কারুর, হুনছি আমি। স্বাদীন অইলে চাউলও হস্তা অইব। আগের মত ট্যাকায় দশ সের।' (আবু ইসহাক ২০০৪ : ২১) দুর্ভিক্ষের বাস্তবতার আরও একটি মর্মন্তুদ বর্ণনা পাওয়া যায় জয়গুনের এক শিশুকন্যার অকালপ্রয়াণের বিবৃতিতে:

> তখন দুর্ভিক্ষ সবে দেখা দিয়েছে। দুর্নামের ভয়ে স্বামী পরিত্যাক্তা জয়গুন তখনও ঘরের বার হয়নি। খেতে না পাওয়ায় তার বুকে দুধ ছিল না। দুধের শিশু দুধ না পেয়ে শুক্‌নো পাটখড়ির মত হয়েছিল। শেষে ধুঁকতে ধুঁকতে একদিন মারা গেল। তাকে কবর দিতে কাফনের কাপড় জোটেনি। এই বোম্বে শাড়ীটার অর্ধেক দিয়ে কাফন পরিয়ে যখন কবরে নামান হয় তখন জয়গুন বিলাপ করতে করতে বলেছিল – "আইজ তোরে বউ সাজাইয়া দিলাম।" (আবু ইসহাক ২০০৪ : ২৯)

নিম্নবিত্তের যাপিত জীবনে স্মৃতির ভেতর দগদগে ঘা হয়ে থাকে মন্বন্তরের ক্ষত। এবং এই উপন্যাসের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে ও জীবনসংকটেও অভাব, খ্যদ্যাভাব প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে যায়।

২.১.২.২

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তর কেবল নগর কলকাতাকেই বিপর্যস্ত করেনি, তার অভিঘাত পূর্ববাংলার শহর এবং সেই সঙ্গে গ্রামকেও বিপর্যস্ত করে তোলে। কৃষিজীবন থেকে উন্মুলিত দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রামীণ ও প্রান্তিক মানুষ খাবারের আশায়, বাঁচবার স্বপ্নে শহরমুখী হতে বাধ্য হয়। পরিবর্তিত হয় তাদের পেশা, পরিবর্তিত হয় জীবনযাত্রার ধরন, ধ্বসে পড়ে মূল্যবোধ, জীবনসংগ্রাম পায় নতুন মাত্রা। এমনই জীবনের আলেখ্য নির্মাণ করেন আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯) তাঁর *ক্ষুধা ও আশা* (১৯৬৪) উপন্যাসে। তৎকালীন বৃহত্তর ঢাকা জেলার নরসিংদীর রতনপুর গ্রাম থেকে শহরের দিকে ধাবমান জনতার চিত্র-অঙ্কনের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের শুরু। নিজ গ্রাম নিজ সংসার চেনা প্রতিবেশ চেনা সংসারকে পেছনে ফেলে অজানা প্রত্যাশায় তারা শহরমুখী, এখানে শহর হচ্ছে ঢাকা। গ্রাম তাদের খাদ্যের সংস্থান করতে পারে না। 'বাজার থেকে ধান চাউল উধাও, কাগজের তাড়া শুকনো পাতার শামিল। তাছাড়া একেকজনের শরীরের যা হাল, সুটকির মতো চিমসে গেছে, যেন একেকটি জ্যান্ত কংকাল। কোন্ দিন কে মরে তার ঠিক নেই।' (আলাউদ্দিন ২০০৪ : ৭) গ্রামে খাদ্যাভাব; শোষণপ্রক্রিয়ার অনিবার্য শিকার নিম্ন আয়ের মজুরখাটা মানুষগুলো। এমনই একটি পরিবার হানিফ-ফাতেমা-জহু-জোহার পরিবার। জোহার চোখ দিয়ে পাঠকের সামনে উন্মোচিত হয় দুর্ভিক্ষকালের গ্রামাঞ্চলের বৈষম্যের চালচিত্র। গ্রামের শোষণ, জনপ্রতিনিধি-আড়ৎদার-মজুতদার-মাতব্বরদের

নীচতা-শঠতায় নিঃস্ব-হতাশ মানুষগুলো শহর সম্পর্কে লালন করে উচ্চধারণা : 'এতজন জড়ো হয়েছে, সবার লক্ষ্যই শহর। সেখানে বড় বড় বাড়ি, নায়েব-নবাব, উজির-নাজির, বড় বড় আদমি। এবং ওরা সভ্য, শিক্ষিত, ধার্মিক। কোনোমতে জানটা নিয়ে গিয়ে পৌঁছতে পারলে আর ভাবনা নেই, ওরা বাঁচাবেন।' (আলাউদ্দিন ২০০৪ : ৮) কিন্তু ওই কালপর্বে শহর তাদের জন্য অপেক্ষা করে বিনষ্টির মহার্ঘ্য নিয়ে। শহরে এসেও তারা দেখে অভাবেরই শাহরিক সংস্করণ। শহরে তাদেরই মতো নিঃস্ব আবর্জনার স্তুপের মতো স্যাঁতস্যাঁতে ডেরাঘরে বসবাসকারী এক নারী যখন বলে, 'শহর খুব খারাপ জায়গা, বুঝলা?' তখন ফাতেমার উপায়হীন উত্তর 'গেরামে তো অহন কিচ্ছু নাই বইন, কেমনে থাহুম! দানা নাই পানি নাই, গাছের পাতাও শেষ।' (আলাউদ্দিন ২০০৪ : ২৮) আর শহরের পথে পথে রচিত হয় বৈষম্যের নবনাট্য : 'ঘুপচি চোরাগলি, আলো-আঁধারের খেলা, বেশিরভাগ বাসারই দরোজা বন্ধ। বিশেষ করে, সন্ধ্যার পরেই শুরু হয় ভুখারিদের উৎপাত, কপাট খোলা দেখলে ভীড় জমায় তারা। অনেকেই ভাত চায় না চায় ফ্যান।' (আলাউদ্দিন ২০০৪ : ২৯) সময়ের এই বিনষ্টিকে সমালোচক বিশ্লেষণ করেন এভাবে:

> বিনষ্ট সমাজ, বিনষ্ট আর্থ-রাজনীতি এবং বিনষ্ট মানুষের নিয়ন্ত্রণে বিপর্যস্ত জীবনের গোটা ছবিই উপন্যাসে বিন্যস্ত হয়েছে। জোহার বহির্সংগ্রাম ও অন্তর্সংগ্রামের মাধ্যমে উন্মোচিত হয়েছে একটা সময়-খণ্ডের অসংখ্য মানুষের জীবনরূপ। শ্রেণীচ্যুত, গ্রামবিচ্ছিন্ন পরিবারের সন্তান জোহা শহরে পা ফেলেই উপলব্ধি করে এর জান্তব ও অন্তর্শূন্য রূপ। দুঃখ ও যন্ত্রণার জটিল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পরিপক্ব হয়ে উঠতে থাকা জোহার অন্তর্জগতে একটা প্রত্যাশা ও স্বপ্নের অনুরণন শুরু থেকেই লক্ষ্য করা যায়। (রফিকউল্লাহ ২০০৯ : ১৭৩)

ক্ষুধা ও আশা উপন্যাস কেবল ব্যক্তি জোহার উন্মোচনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, এ ঘটনাপ্রবাহ ও আরও নানা চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তরে আভ্যন্তর রাজনীতির স্বরূপটিও উন্মোচিত হয়। দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার কবলে পড়ে মানবজীবন হয় লাঞ্ছিত, বিশেষত নারীজীবন। জোহার ষোড়শী বোন উচ্ছল কিশোরী জহুকে বিক্রির কথা ভাবে পিতা হানিফ : 'আমরার কাছে থাকলে তো মরব। বেচলে বালা থাকব, আর আমরা দু'পয়সা পাইয়াম। মরলে তো শেষ। মরণের থ্যে এইড্যা মন্দ কি, ভাইব্যা দেহ।' (আলাউদ্দিন ২০০৪ : ২৩) প্রান্তিক মানুষের জীবনবাদিতাও এর মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়। কিন্তু জহুর মা ফাতেমার একক প্রচেষ্টায় সে-যাত্রায় জহু বিক্রি হওয়া থেকে বেঁচে যায়। যদিও কালের গ্রাস থেকে সে বাঁচতে পারে না। মার সঙ্গে অভিমান করে সে আটকে যায় বাদশা নামক যুবকের কপট প্রণয়ের ফাঁদে। একসময় পাচার হয়ে যায় পতিতাপল্লিতে। সেখানে পাচারকারী দলের হোসেনের ক্ষণিক প্রেমও তাকে রক্ষা করতে পারে না। হোসেন দলের লোকের হাতে নিহত হলে জহুর জীবন নিক্ষিপ্ত হয় অন্ধকারের অতল গহ্বরে। শেষ পর্যন্ত চট্টগ্রামের নিষিদ্ধপল্লিতে ঠাঁই হয় তার।

জীবনযুদ্ধে পরাজিত জোহার বাবা হানিফ নিরুদ্দেশ হয়ে যায় এবং গাড়িচাপায় তার মৃত্যু হয়। বেঁচে থাকে কেবল জোহা। ক্ষুধা-বিপর্যয় ও বিসংবাদ সত্ত্বেও স্বপ্ন, সম্ভাবনা ও আশা নিয়ে জোহার মানুষের মতো বেঁচে থাকার সংগ্রামই এই উপন্যাসকে সময়ের স্মারক হিসেবে পাঠকের সামনে উপস্থিত করে। এই ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তরে সঙ্গে রাজনীতির যে প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে, তা জোহার অন্তর্গত উপলব্ধির পাশাপাশি দরবেশ চাচা, পাগলা মাস্টার, মোহাম্মদ আলী, লিনা, অঘোর চ্যাটার্জী, সুজাতা কিংবা ফেরু মুন্সি, লম্পট বাদশা ও মুসলিম লীগ নেতার পুত্র রেজার কর্মক্রিয়া ও উচ্চারণের মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়। বাঙালিদের প্রতি ব্রিটিশ প্রশাসনের বিরূপতা ও বাংলার প্রাদেশিক সরকারের রাজনৈতিক ব্যর্থতা ও অদূরদর্শিতা যে এই দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতিকে তীব্র করে তুলেছিল, তা সকলের জানা না থাকলেও প্রান্তিক সমাজের অনেকের কাছেই সে প্রশ্ন জেগে উঠেছিল। তাই দেখা যায় পাগল বলে কথিত মাস্টারকে প্রশ্ন ছুড়তে:

> আমরা মরি, তাতে লালচামড়ার কি? তার লড়াই, তার রাজ্য রাখতে হবে। এককামে দুই কাম – সেলামালি মাথা খাউজান! এক ঢিলে দুই পাখি। লড়াই চালাও, বাঙালিদের খতম কর। জাত সাপের বিষ মেরে দাও। নইলে কর্ডন দিলে ক্যান? পাঞ্জাবে অনেক খাদ্য, আনতে পারল না? সব বুঝি! এদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে দেশী হারামজাদারা! (আলাউদ্দিন ২০০৪ : ১৩)

যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষকে পুঁজি করে মানুষের অসহায়ত্বকে আরও বাড়িতে তোলে ফেরু মুন্সির মতো গ্রামীণ আড়ৎদাররা। তাই আরেক শোষক সরকারের সঙ্গে করে আঁতাত। এই আঁতাত শোষণের আঁতাত, মানুষকে আরও অসহায় করে দেবার আঁতাত:

> টাকা বানানোতে নেশা আছে এবং সে স্বাদ যে একবার পেয়েছে, তার কাছে একটি বাড়তি অঙ্কও লোমহর্ষক। এখন বর্ষণের কাল, জাল পাততে পারলেই হোল, ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ এসে পড়বে। লঙ্গরখানা তেমনি একটি জুতের জায়গা, তার তদারকের ভার পেলে নির্ঘাত লাল। লোককে ঠাণ্ডা রাখার জন্য অর্ধেক খরচাই যথেষ্ট। বাকি অর্ধেক ভাগাভাগি। (আলাউদ্দিন ২০০৪ : ১১)

তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকার প্রবর্তিত 'লঙ্গরখানা'র ব্যবস্থা যে একটা ব্যর্থ ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছিল, তা এই বিবরণের মধ্য দিয়ে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শহরের উপরিতলের রাজনীতি দেশের সর্বস্তরের মানুষের জীবনায়নে সঞ্চারিত হয়। শহুরে মানুষের ভাব-ভাবনার ইতি ও নেতির ওপরে তাই প্রান্তিক মানুষের জীবনগতি অনেকাংশে নির্ভর করেছে। যুগান্তরের ওই কালে দেশের বাস্তব সমস্যা দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সমকালীন রাজনীতি ও রাজনীতি সম্পর্কে মানুষের চিন্তনক্রিয়া কালের গতি অনুধাবনে সহায়ক। শোষণ, বঞ্চনা, অব্যবস্থাপনা ও অপশাসনের মধ্যেও প্রগতির কথা ভাবে কিছু মানুষ, এই নিয়েই আশা ও স্বপ্নের বীজ বোপিত হয়। এমনই একটি প্রগতিশীল চরিত্র মোহাম্মদ আলী। মুসলিম লীগের

সুবিধাবাদী রাজনীতি তথা উপরিতলের ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির বিরোধী সে। দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের জন্য কাজ করতে সদা তৎপর আলী ক্ষমতার দমনমূলক রাজনীতির দ্বারা নির্যাতিত হয় – নিক্ষিপ্ত হয় কারাগারে। তার অনুভবে প্রকাশ পায় কালের সারসত্য:

> দেশের মুক্তি কোন্ পথে হবে, কি রূপ নিয়ে আসবে স্বাধীনতা? লাখে লাখে মরার পরেও যা থাকবে সেই ন্যুব্জপৃষ্ঠ কুব্জদেহ কংকালেরা সেই স্বাধীনতা নিয়ে করবেই বা কি। তারা কি নতুনভাবে শোষণের স্বীকার হবে না? বিদেশীর জায়গায় দেশীয় প্রভুর? আজকের কন্ট্রাক্টর চোরাকারবারী ও রক্তপিপাসু বণিকেরাই হয়তো হবে আগামীকালের রাষ্টযন্ত্রের পরিচালক! এ এক রোমাঞ্চকর সত্য, অদ্ভুত পরিহাস। স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিল কারা আর কারা করবে তার ফলভোগ। (আলাউদ্দিন ২০০৪ : ৯১)

পরবর্তীকালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা, দেশভাগের রাজনীতির সঙ্গে তার এই আশঙ্কা অনায়াসেই মিলিয়ে পড়া যায়। বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষ কালের বাস্তবতা – ক্ষুধা। কিন্তু শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও জীবনকে সদর্থকভবে দেখা ও সদর্থক রাজনৈতিক ভাবনাই – আশা। এই দুইয়ের মিথস্ক্রিয়ার শিল্পরূপ *ক্ষুধা ও আশা*।

২.১.২.৩

বৃহত্তর নোয়াখালী-ফেনী অঞ্চলের দুই নিভৃত গ্রাম বাকুলিয়া-তালতলির নিস্তরঙ্গ জীবনায়নে বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তরের অভিঘাত চিত্রিত হয়েছে শহীদুল্লা কায়সারের (১৯২৭-১৯৭১) মহাকাব্যিক উপন্যাস *সংশপ্তকে* (১৯৬৫)। ঔপন্যাসিক 'নিবেদন' অংশে জানিয়ে দেন আত্মঅভিজ্ঞতার আলোকেই রচিত হবে এই উপন্যাস : 'ছোটবেলা থেকে এদেশের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে যেভাবে দেখেছি কলমের আঁচড়ে ঠিক তেমনি এঁকেছি।' ভূমিকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থায় অভ্যস্ত বাকুলিয়ার মিয়া ও সৈয়দ পরিবারের মধ্যে যে সম্পর্ক ও দ্বন্দ্বের সূচনা, তা বৃহত্তর ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের আর্থরাজনৈতিক ক্রমপরিবর্তনেরই অনিবার্য প্রতিফল। সৈয়দ পরিবারের আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়-পড়ুয়া জাহেদের রাজনৈতিক চিন্তা, পাকিস্তান-আন্দোলনের উন্মাদনা, শ্রেণিবৈষম্য ও শোষণ – এসবকিছুকে প্রকটিত করে তোলে বিশ্বযুদ্ধ-মন্বন্তরের বাস্তবতা। অব্যবস্থাপনা ও গ্রামের প্রতি কেন্দ্রের অদূরদর্শিতা তখনও বিদ্যমান ছিল। গ্রামীণ জীবনের দুর্দশার চিত্র ও কেন্দ্র-প্রান্তের দূরত্বের সম্পর্কের কথা উপস্থাপিত হয় গ্রামের সচেতন শিক্ষক অহিংস চেতনায় বিশ্বাসী সেকান্দরের চিন্তনক্রিয়ায়। দূরদেশ থেকে লব্ধ দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী জাহেদকে সে দেখায় নিজ দেশ, নিজ গ্রাম ও নিজ সমাজের দীনহীন চিত্র। এর মধ্য দিয়ে তৎকালীন সরকারের অব্যবস্থাপনার চিত্রও উপস্থাপিত হয়:

রাস্তাঘাটের মেরামতই বল, আর পয়পরিষ্কারই বল, এ সব কারও মাথা ব্যথা নয়। কেই বা একটু নজর দেয় গরীব দুঃখীর দিকে। তোমারাও সব রইলে বিদেশে। বুঝি জাহেদের চিন্তাটাই অনুসরণ করেই বলল সেকান্দর। অভিযোগ ম্লান ওর স্বরে।' (শহীদুল্লা ২০১০ : ১৩২)

জাহেদ-সেকান্দরের কথোপকথনে স্ব স্ব রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণেরও উন্মোচন ঘটে। সেকান্দর নিজ গ্রামে অবস্থানসূত্রে উপলব্ধি করে সমস্যার মূলকে। জাহেদের উপলব্ধি বহিরারোপিত; শ্রেণিকেন্দ্রিক নয়, বরং অনেকখানি সম্প্রদায়কেন্দ্রিক। জাহেদ চায় মুসলমানদের উন্নতি; সেকান্দর চায় মানুষের মুক্তি। খাদ্যাভাব, শিক্ষার অভাব, শ্রেণিবৈষম্য এগুলোই যে বাংলার প্রধান সমস্যা, তা সেকান্দর তার প্রত্যক্ষ যাপিত জীবনের মধ্য দিয়ে নির্ণয় করতে পারে। বিশ্বযুদ্ধ-মন্বন্তরের আগেও দরিদ্রদের খাদ্যের অভাব ছিল। আম্বরি-লেকুদের মতো দরিদ্র পরিবারগুলোতে প্রধান সংকট পেটের ক্ষুধা। তত্ত্বের পক্ষ-বিপক্ষমূলক আলাপের মধ্যেই জাহেদ-সেকান্দররা শুনতে পায় : 'খালি খাই খাই। পেটে যেন দোজখের আগুন লেগেছে! কাল তো গিলেছিস এক খোরা ভাত। তবু চিল্লাস? (শহীদুল্লা ২০১০ : ১৩৩) এই চিরায়ত দুঃখ অভাব ও বঞ্চনার মধ্যেই বিশ্বযুদ্ধ আবির্ভূত হয় এই নিস্তরঙ্গ গ্রামজীবনে। উপন্যাসে বিধৃত ওই অঞ্চল বার্মার নিকটবর্তী হওয়ায় যুদ্ধের দামামা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করে জনাঞ্চলবাসী। নিত্যসঙ্গী হয়ে ওঠে জাপানি বোমার আতঙ্ক; সামরিক প্রয়োজনে দখল হয় গ্রাম; একে একে পরিণত হতে থাকে বিরানভূমি। বিশ্বযুদ্ধ কেবল ইয়োরোপ-এশিয়া-বার্মা-কলকাতায় সীমাবদ্ধ থাকে না; শুধু অলীক আতঙ্ক নয়, অর্থনৈতিকভাবেও প্রান্তিক ও গ্রামীণ জীবনে যুদ্ধের অভিঘাত গভীর। একদিকে বিপর্যয়, অন্য দিকে দেখা যায় ব্যবসায়ী রামদয়ালের ফুলে ফেঁপে ওঠার চিত্র:

চালডাল সুপুরির আড়তদারি, কন্ট্রোলের তেল চিনি কাপড়ের ডিলারি, কত রকমের কারবার রামদয়ালের। যুদ্ধের বাজারে ফেঁপে উঠেছে রামদয়ালের ব্যবসা। এক এক গুদাম, এক এক দোকান পৃথক পৃথক আত্মীয়-কর্মচারীর জিম্মায়, কিন্তু সবটার উপর রামদয়ালের তীক্ষ্ণ নজর। (শহীদুল্লা ২০১০ : ১৯৩)

এত নীচতা-শঠতা ও লোলুপতার মধ্যেও মালুর মতো সাধারণ সংগীতপ্রিয় চরিত্রের ভেতরে শুভসত্তার জাগরণ, অশুভকে প্রত্যাখ্যান লক্ষ করা যায়। চোরাকারবারের টাকা হাতের কাছে পেয়েও সে তা গ্রহণ করে না। মনে করে সেগুলো হারামের টাকা, পাপের টাকা। বরং পাচার হওয়া দরিদ্র নারী-পুরুষের মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে সেই কিশোরহৃদয় অনুভব করে সর্বগ্রাসী ক্ষুধার জান্তব চিত্র : 'মুখগুলো দেখেই বুঝতে পারে মালু, সর্বগ্রাসী ক্ষুধায় পেট ওদের পুড়ছে। তবু চাওয়াটাকে যেন সামান্যের মাত্রায় সীমাবদ্ধ রাখতে বিশেষ চেষ্টা ওদের; এক খোরা ভাত অথবা একটা পয়সা। বেশি কিছু নয়।' (শহীদুল্লা ২০১০ : ২০২) এবং তার চোখ দিয়েই দেখা যায়:

ওরা চলেছে পঙ্গপালের মতো। মায়ের কোলে শিশু। মেয়েদের কোলে এবং মাথায় বাসন খোরা হাঁড়ি পাতিল। পুরুষদের কাঁধে বালিশ, মাথায় কোরা ভর্তি দা, কুড়োল, ছেনি, ছোটখাট করাত, যার যা সম্পত্তি। ... যেতে যেতে ওরা খোরা বাড়িয়ে দেয় একমুঠো খুদ অথবা চালের জন্য। হাত বাড়িয়ে দেয় একটি পয়সার জন্য। ... ভাতের অভাবে ফেন চায়। (শহীদুল্লা ২০১০ : ২০২)

শহীদুল্লা কায়সার উদার মানবতাবাদী চরিত্র সেকান্দর মাস্টারের প্রেক্ষণবিন্দু ব্যবহার করে এই যুদ্ধকে অভিহিত করেন 'কালো যুদ্ধ' বলে, 'সর্বনেশে' যুদ্ধ বলে:

যেন লক্ষ কোটি শকুনি পাখা বিস্তার করেছে আকাশে। যে আলোয় আলোকিত থাকত পৃথিবী সে আলোটা আড়ালে পড়েছে। পৃথিবীময় শকুনি পাখার অন্ধকার ছায়া। শকুনির হিংস্র কুটিল দৃষ্টি আগুন ঝরিয়ে চলেছে, সে আগুনে মাটি পুড়ছে। মানুষ, জানোয়ার, পৃথিবীর সভ্যতা, পৃথিবীর সবুজ পুড়ে খাক হচ্ছে। শকুনির জিহ্বা বেয়ে টপটপ বিষ ঝরছে। সে বিষ মাটিতে মিশে মানুষের গায়ে লেগে ছড়িয়ে চলেছে রোগ মহামারি দুর্ভিক্ষ।' (শহীদুল্লা ২০১০ : ১৯৬)

বিশ্বযুদ্ধের বাস্তবতা সবকিছুকে লণ্ডভণ্ড, তছনছ করে দেয়। গ্রামীণ সমাজগঠনকে করে তোলে বিত্রস্ত। যে মিয়া-সৈয়দ পরিবারের মধ্যে আভিজাত্যের লড়াই চলে, সেই দুই পরিবারও হয়ে যায় গ্রামচ্যুত। এক সময়ের রেঙ্গুনে কুলির কাজ করা ও ফেলু মিয়ার কর্মচারী রমজান হয়ে ওঠে বিশ্বযুদ্ধের সুবিধাভোগী। যুদ্ধের ও খাদ্যাভাবের সুযোগ নিয়ে সে মজুদদারী ও নারীপাচারের মতো অন্যায় কাজে যুক্ত হয়। গ্রামগুলো হয়ে যায় মনুষ্যশূন্য। তাই বিধ্বস্ত মনে সেকান্দর শিষ্য মালুকে বলে – 'শূন্য ভিটিগুলো দেখে মনে হয় খোলা বুকে মাতম করছে না ওরা, ওরা অভিশাপ দিচ্ছে, অভিশাপ। ধিক্কার দিচ্ছে তোকে, আমাকে সবাইকে, সমগ্র মানবজাতিকে। মাটির অভিশাপ। আমি তাকাতে পারি না। চোখ বুজে হাঁটি।' (শহীদুল্লা ২০১০ : ১৯৮) যুদ্ধকালে যুদ্ধের সত্যের সঙ্গে তৈরি হয় যুদ্ধের নানা ধরনের গুজব। এসব গুজবের মধ্য দিয়ে তৎকালীন বাস্তবতায় মানুষের মনস্তাত্ত্বিক স্বরূপকেও চিহ্নিত করা যায়:

জাপানিরা নাকি বোমা মেড়ে উড়িয়ে দিয়েছে চট্টগ্রাম। ফেনী শহরেও বোমা পড়েছে। ট্রাংক রোডের উপর কে নাকি জাপানিদের দেখে এসেছে স্বচক্ষে। স্বচক্ষের বর্ণনাটাও ছড়িয়ে পড়েছে মুখে-মুখে : থ্যাবড়া নাক, ইয়া ইয়া জোয়ান, চোখ এক রকম নেই বললেই চলে। বাচ্চা ছেলেদের ধরে ধরে কাঁচাই চিবিয়ে খায় ওরা। (শহীদুল্লা ২০১০ : ২০৪)

যুদ্ধের প্রত্যক্ষ বাস্তবতায় নির্ণীত হয় এই বিপ্রতীপতার কূটাভাষ:

গোটা তালতলি গ্রাম জনশূন্য। কিন্তু, তালতলির বাজার মানুষের ভিড়ে, বেচাকেনার ধুমে জমজমাট। কত কুলি মজুর কাজ করে চলেছে আশপাশের রাস্তায়, সামরিক ঘাঁটিতে। কনট্রাক্টটার, ওভারসিয়ার, বিল বাবু,

> গুদাম বাবু – সাহেব আর বাবুর অন্ত নেই। একটু দূরেই রয়েছে মিলিটারি ছাউনি। চায়ের স্টলগুলো দিন-রাত্রি সরগরম। চায়ের পেয়ালা চামচের টুংটাং, বাংলা হিন্দি ইংরেজি মাদ্রাজি। বিচিত্র বোল – তালতলির হাওয়া নতুন সঙ্গীত। (শহীদুল্লা ২০১০ : ২০৭)

আর এভাবেই একেকটি গ্রাম, আনন্দ-দুঃখের, অভাব-অনুযোগের গ্রাম, কৃষিভিত্তিক সামন্তশাসনের গ্রাম নিঃশেষ হয়ে যায় যুদ্ধের অভিঘাতে। যে গ্রাম একসময় সেকান্দর-লেকু-হুরমতি-রাবু-আরিফা-মালু-রানুদের দ্বারা ছিল জমজমাট, দুই গ্রামে কেবল পড়ে থাকে মানবধর্মে অবিচল বিশ্বাসী সেকান্দর মাস্টার। কেউ পাড়ি জমায় কলকাতায়, কেউ অজানায়। এ-চিত্র শুধু বাকুলিয়া-তালতলির নয়; বিশ্বযুদ্ধ-মন্বন্তর বাংলার সামূহিক গ্রামীণ জীবনকে এমনই অন্তঃসারশূন্য করে তোলে।

২.১.২.৪

হুমায়ূন আহমেদের (১৯৪৮-২০১২) দুই খণ্ডের *মধ্যাহ্ন* (২০০৮) উপন্যাস ইতিহাস-আশ্রিত কথাশিল্পের এক বড় প্রকল্প। এর কালপরিসর ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭। হুমায়ূন তাঁর স্বভাবসুলভ গল্পবলার ভঙ্গিতে উপন্যাসসৃষ্ট চরিত্রসমূহের মধ্য দিয়ে কাল, কালের স্বভাব ও কালের মানুষের মনস্তত্ত্বকে ধরবার চেষ্টা করেছেন। পূর্বময়মনসিংহ-নেত্রকোণা অঞ্চলের তথা ভাটি বাংলার জীবনায়নে প্রান্তিক জনমানুষ চিত্রিত হয়েছে এই উপন্যাসে। উপন্যাসের ঘটনাক্রম যখন চল্লিশের দশকে এসে উপস্থিত হয়, তখন অনিবার্যভাবে উপস্থিত হয় বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তরের বাস্তবতা। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের আরেকটি অঞ্চল তথা ময়মনসিংহে যুদ্ধের অভিঘাত ও অভাবের চালচিত্রটি বুঝে নেওয়া যায়। প্রথমেই আসে যুদ্ধ-প্রসঙ্গ। যুদ্ধ সংঘটিত হয় অনেক দূরে, কিন্তু তার প্রভাব পড়ে এই প্রান্তিক গ্রামীণ জীবনেও। তখন বাজার আর সাধারণ বাজার থাকে না। পরিণত হয় যুদ্ধের বাজারে। উকিলমুন্সি-রাধারমণের দেশে যুদ্ধের কারণে কেরোসিনের দাম প্রতিদিনই বাড়তে থাকে। দেয়াশলাইয়ের দাম হয় তিনগুণ। বাজারে বলাবলি হতে থাকে কয়েকদিনের মধ্যে এক ফোঁটা কেরোসিনও পাওয়া যাবে না। গ্রামীণ মানুষও বুঝতে শুরু করে সব কেরোসিন চলে যাবে ফৌজদের কাছে। দূরবর্তী যুদ্ধ আর দূরের থাকে না, চলে আসে জীবনের দৈনন্দিনতায়। হুমায়ূন বিবৃতির মতো করেই জানিয়ে দেন : 'বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তরের সূচনা হলো। ভয়াবহ এই মন্বন্তরে বঙ্গদেশে ত্রিশ লক্ষ মানুষ না খেয়ে মারা যায়। বিশ্বযুদ্ধের পাওনা এভাবেই তাদের শোধ করতে হয়।' (হুমায়ূন ২০০৮ : ২১৯)

*সংশপ্তকে*র রামদয়ালের মতো *মধ্যাহ্নে*র একটি চরিত্র এককড়ি সাহা। যুদ্ধের কারণে তাঁর ব্যবসা ফুলে ফেঁপে ওঠে। সে নিজেও তার এই হঠাৎ উন্নতির কারণ খুঁজতে থাকে:

> চালের দাম এতটা বাড়বে তিনি চিন্তাও করেন নি। বার্মা থেকে চাল আসা বন্ধ এটা ঠিক। দেশের চাল গেল কোথায়? এককড়ি খবর পেয়েছেন কোলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ভুখা মানুষের না-কি ঢল নেমেছে। তারা ভাত চায় না। তাদের একটাই আকুতি – একটু ফ্যান দেন। অবস্থা যেদিকে যাচ্ছে তাতে মনে হয় না ফ্যানও পাওয়া যাবে। ঘরে ভাত রান্না হলে তবেই না ফ্যান হবে। (হুমায়ূন ২০০৮ : ২৮৩)

একই গ্রামে দেখা যায় আরেক বাস্তবতা। ভাতের অভাবে দরিদ্র মানুষেরা জঙ্গল খুঁড়ে বনআলু কিংবা কচুশাক সিদ্ধ করে খেতে শুরু করে। এমনকি নমশুদ্ররা আগে যারা হাঁসের খাবার শামুক ঝিনুক খেত না, তারাও সেসব খেতে শুরু করে। এই বাস্তবতার সংবেদনশীলতাকে আরও তীব্র করে তোলে কৈবর্ত নরেশের মেয়ে লক্ষ্মীর ভাত খেতে চাওয়ার প্রসঙ্গ এবং এককড়ি সাহার হৃদয়হীনতা; শেষে লাবুসের সহৃদয় উপস্থিতি। নরেশের মেয়ে লক্ষ্মী ভাত খাবে বলে তার বাবার কাছে আবদার করেছে। পনের দিন ধরে সে ভাত খায় না। তাই এককড়ি সাহার আড়তে নরেশ আসে এক ছটাক চালের জন্য। নরেশ যখন বলে, 'কর্তা একটু ব্যবস্থা করেন।' তখন এককড়ি জানায় – 'আইজ তরে এক ছটাক চাউল দিলাম, কাইল আসব পঞ্চাশজন। তখন উপায়?' তখন নরেশ মেয়ের জন্য অন্তত লবণের ছিটা দিয়ে হলেও খানিকটা ভাত প্রার্থনা করে। কিন্তু ভাত মেলে না। অর্ধেক দিন তারা ভাতের আশায় আড়তের সামনেই অপেক্ষা করে। এই ঘটনা শুনে সহৃদয় লাবুস তাদের জন্য পেট ভরে খাবারের ব্যবস্থা করে। এই আকালের কালেও গ্রামীণ জীবনে লাবুস চরিত্র অঙ্কন হুমায়ূনের অধিবাস্তব শিল্পনিরীক্ষার ফসল। লাবুস বলে, 'ক্ষুধার্থ মানুষেরা যখন আরাম করে খিচুড়ি খাবে, সেই দৃশ্য দেখে আমিও আনন্দ পাব। আনন্দে আমার চোখে পানি আসবে। এরচে' বড় কিছু আছে?' (হুমায়ূন ২০০৮ : ৩৪৫) এ-যেন দুর্ভিক্ষ কালের এক ইউটোপীয় পরিচর্যা। এবং এটা হুমায়ূনের দ্বারাই সম্ভব। আপাত তত্ত্বহীন এই গল্পে দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর কালের সমীকরণহীন বাস্তবতাই প্রকাশিত হয়েছে।

উক্ত কালপর্ব (১৯৪২–৪৩) অতিবাহিত হবার পরেও দুর্ভিক্ষের স্মৃতি মানুষের মনে দীর্ঘদিন পর্যন্ত বিরাজমান থাকে; কখনো কখনো তা বৃহৎ রাজনীতির অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে। যেমন, আবুল মনসুর আহমদের (১৯৯৮-১৯৭৯) *জীবনক্ষুধা* (১৯৫৫) উক্ত কালপর্বের উপন্যাস হলেও পেটের ক্ষুধার চেয়ে জাতীয় রাজনীতিতে ব্যক্তির ক্ষুধা প্রাধান্য পেয়েছে। যদিও তাঁর অন্য রচনায় – যেমন, *ফুড কনফারেন্স* (১৯৪৪) – মন্বন্তরের প্রত্যক্ষতা উপস্থাপিত হয়েছে। আবার, একই কালপর্বের ঘটমান জীবন আবুল ফজলের (১৯০৩-১৯৮৩) *রাঙ্গা প্রভাত* (১৯৫৫) উপন্যাসের উপজীব্য হলেও মন্বন্তর চিত্র সেখানে দেখা যায় না। উপন্যাসের স্থানিক পটভূমি বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চল। তাহলে কি চট্টগ্রাম অঞ্চলে মন্বন্তরের ব্যাপকতা ছিল না? – এমন প্রশ্নের জন্ম হয়। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের (১৯৪৩-১৯৯৭) *খোয়াবনামা*

(১৯৯৬) উপন্যাসের ঘটনাক্রম ও তাৎপর্যের জায়গা ভিন্ন হলেও নিজগিরিডাঙ্গার কৃষক তমিজ-(বিমাতা) কুলসুমদের জীবনে 'আকাল' নাম্নী মন্বন্তর তখন অবিচ্ছেদ্য বাস্তবতা। বিশ্বযুদ্ধ-মন্বন্তরের রাজনীতি ও বাস্তবতাকে উপজীব্য করে শিল্পনির্মাণের প্রয়াস দেখা যায় ঘটনার অব্যবহিত পরেই। বিশেষত পাকিস্তান কালপর্বে এ সংক্রান্ত গল্প-উপন্যাসের প্রাচুর্য সেই সাক্ষ্য দেয়। ওই কালপর্বেও সাহিত্যিক-ঔপন্যাসিকরা স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গি, রাজনৈতিক ও শ্রেণিঅবস্থানের ভিত্তিতেই সময়কে উপস্থাপন করেছেন। তাই অনেক চিত্র জানা গেলেও সবটা জানা যায় না। এই বিষয়টাকে চিহ্নিত করেছেন যতীন সরকার। তাঁর (২০১৩ : ৪২) মতে:

> পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বকালের যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা – পর পর সংঘটিত এ-কয়েকটি দুর্যোগের ঘূর্ণাবর্তে সৃষ্ট অশান্ত সমাজ-পরিবেশ অনেক কথা-সাহিত্যিককেই সৃষ্টি-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু দুর্যোগের আগুন নিয়ে খেলতে গিয়ে অনেকেই তাঁদের নিরুত্তাপ নির্লিপ্ততা বজায় রাখতে পারেন নি, সুস্থ ইতিহাস-চেতনার অভাবে আগুনে তাঁরা শুধু উত্তপ্তই হন নি। কেউ কেউ পুড়ে ভস্মসাৎও হয়ে গেছেন।

তাঁর এই বক্তব্য অনেক প্রশ্নের জন্ম দেয়। শুধু মন্বন্তর-বাস্তবতার প্রসঙ্গে নয়, চল্লিশের দশকের জটিল সমীকরণের রাজনীতিতে সাহিত্যিকদের ব্যক্তি-অবস্থানের যৌক্তিকতা ও অযৌক্তিকতার প্রশ্নও এই বক্তব্যে উত্থাপিত হয়। পরবর্তী পরিচ্ছেদের আলোচনায় রাজনীতির অপরাপর ঘটনাপ্রবাহ অনুসন্ধানসূত্রে ঔপন্যাসিকদের রাজনৈতিক অবস্থান ব্যাখ্যায় সেই প্রশ্নসমূহের উপস্থাপন ও উন্মোচনের চেষ্টা থাকবে।

উপর্যুক্ত উপন্যাসপাঠ থেকে বোঝা যায়, চল্লিশের দশকের বাংলাদেশের জনজীবনে বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তরের বাস্তবতা একটি সর্বব্যাপ্ত বিষয়। আলোচ্য উপন্যাসগুলোর সবগুলোর কেন্দ্রীয় বিষয় বিশ্বযুদ্ধ-মন্বন্তর না হলেও উক্ত কালপর্বের জীবনায়নকে শিল্পের আধারে ধারণ করতে হলে এই ভয়াবহ বাস্তবতাকে অস্বীকার বা এড়িয়ে যাবার সুযোগ নেই। এর সঙ্গে তৎকালীন রাজনীতির যোগ প্রত্যক্ষ। বৃহত্তর ভারতবর্ষীয় রাজনীতির অংশ হিসেবে বাংলার রাজনীতিও এই বাস্তবতা দ্বারা অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। এর ভুক্তভোগী হতে হয়েছিল রাজনীতি থেকে বহুদূরে থাকা সাধারণ জনমানুষকে। একই সময়ে ভারতবর্ষে 'ক্রিপ্স্ মিশন' (১৯৪২), 'ভারত ছাড় আন্দোলন' (১৯৪২), আজাদ হিন্দ ফৌজের তৎপরতা (১৯৪৩) যেমন সংঘটিত হয়েছিল, আবার ১৯৪০ সালের 'লাহোর প্রস্তাবে'র মধ্যে মুসলিম জনতা নতুন রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্নে ছিল বিভোর। মূলধারার ইতিহাস অন্তত সেই সাক্ষ্য দেয়; সেখানে মন্বন্তরের প্রকৃত চিত্র অনুপস্থিত থাকে। উল্লেখ থাকে কিছু তথ্যের। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য:

> ইতিহাসের যে বিভিন্ন ধরনের বয়ান (ন্যারেটিভ) থাকে তা কেবল দলিলনির্ভর বা পরিচিত ক্রীড়ানকদের কথনেই থাকে তা নয়; ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন ন্যারেটিভ আমরা অন্যত্রও দেখতে পাই। এগুলো ইতিহাস-বর্ণনার বিকল্প নয়। বরঞ্চ এগুলো একাদিক্রমে প্রচলিত ইতিহাসের পরিপূরক এবং সেই ইতিহাসে অনুপস্থিত ভাষ্য। (আলী ২০২২ : ৬০)

সেই বিবেচনা থেকে জন-ইতিহাসের অনুসন্ধানে আকর-ভূমিকা পালন করতে পারে উক্ত কালপরিসর কেন্দ্রিক কথাসাহিত্য – বিশেষত উপন্যাস। কারণ উপন্যাসের বড় প্লাটফর্মে বাংলা অঞ্চলের এই বড় জন-ইতিহাসকে আটানো সম্ভবপর হয়। প্রাত্যহিক জীবনে, ব্যক্তি ও জনমনস্তত্ত্বে এই বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত সুদূর প্রসারী। উপন্যাসপাঠ ও ইতিহাসপাঠ – উভয়সূত্র থেকে অনুধাবন করা যায় এই সময়পর্বে বিপর্যয়ের প্রধান শিকার গ্রামের মানুষ; এবং গ্রাম থেকে শহরে যাওয়া নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি। অন্যদিকে শহুরে উচ্চবিত্ত কিংবা গ্রামের সম্পদশালীরা পরিস্থিতির সুবিধাভোগী। ফলে একটি সত্য উন্মোচিত হয় – তা হলো – বিপর্যয়ে বৈষম্যের চূড়ান্ত ও নগ্ন রূপ। শ্রেণিগত বৈষম্য ও শোষেণের এই পরম্পরা শেষ পর্যন্ত পুরো ভারতবর্ষ এবং বাংলা ও বাংলার মানুষকে ধাবিত করে সম্প্রদায়গত ও ধর্মগত রক্তাক্ত বিভাজনের দিকে।

আলোচিত উপর্যুক্ত উপন্যাসসমূহে বিশ্বযুদ্ধ-মন্বন্তরের রাজনৈতিক অভিঘাত উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকদের স্ব স্ব শ্রেণি-অবস্থান, রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক অবস্থানও বিবেচনাযোগ্য। যেমন, কলকাতার শাহরিক বাস্তবতা নির্মাণে সরদার জয়েনউদ্‌দীন তাঁর *অনেক সূর্যের আশায়* রহমত-হায়াত খাঁ-ছমির-হেনার মা প্রমুখ চরিত্রের অনুষঙ্গে বিশ্বযুদ্ধের যে বাস্তবতাকে সামনে আনতে চান, তাতে চরিত্রসমূহের শ্রেণি-অস্তিত্ব সুস্পষ্ট হলেও শ্রেণি-উত্থান নেই। বরং রহমতের আত্মকথনে নির্লিপ্ত মধ্যবিত্তসুলভ অবস্থান প্রকটিত হয়েছে। জয়েনউদ্‌দীন বামপন্থি রাজনীতিতে আস্থাশীল থাকলেও তাঁর কেন্দ্রীয় চরিত্র রোম্যান্টিক ভাবালুতায় আক্রান্ত। অন্যদিকে আবুল মনসুর আহমদের *জীবন-ক্ষুধা*র হালিম বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তরকে দেখেছে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসেবে। নিজে কৃষক-প্রজা পার্টির কর্মী হিসেবে সচেতন শ্রেণিচেতনা দিয়ে সে ওই বাস্তবতাকে বিবেচনা করেছে। কিন্তু হালিমের মধ্যে যে শ্রেণি-রূপান্তর ঘটে, তা শেষপর্যন্ত প্রত্যক্ষত শোষিতের পক্ষে না থেকে সম্প্রদায়ের পক্ষে চলে যায়। হালিমের এই রাজনৈতিক অবস্থানের রূপান্তরকে ঔপন্যাসিকের রূপান্তরের সমরূপ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। যদিও হালিম ও আবুল মনসুর উভয়ের মুসলিম লীগে যোগদান তৎকালীন আর্থরাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে কার্যকারণসূত্রে আবদ্ধ – তা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। বরং শহীদুল্লা কায়সারের মধ্যে অর্থাৎ *সংশপ্তক* উপন্যাসের চরিত্রায়ণে শ্রেণিসচেতনতা স্পষ্ট।

শ্রেণিরাজনীতিতে আস্থাশীল শহীদুল্লা কায়সার পূর্ববাংলার গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে সমাজকাঠামোর অভ্যন্তরে বিদ্যমান বৈষম্য, ধর্মীয় মূল্যবোধ, সামন্তচিন্তার সঙ্গে পুঁজিবিকাশের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে নির্মাণ করে মন্বন্তরের বিপর্যয়ের বাস্তবতাকে নির্মাণ করেন। সৈয়দবাড়ি-মিয়াবাড়ির সম্পর্ক, ফেলু মিয়ার সঙ্গে তালতলির রামদয়ালের সম্পর্ক, এমনকি ফেলু মিয়া ও তার লাঠিয়াল রমজানের সম্পর্ক যে অবস্থায় বিদ্যমান ছিল, তাতে শিক্ষা ও উৎপাদনশীলতা থেকে দূরে থাকা ফেলু মিয়ার পতন ছিল অনিবার্য। বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তর তার পতনের বাস্তবতাকে এগিয়ে এনেছিল মাত্র। অন্যদিকে সামন্তবাদের অসংগতিই রমজানকে সুবিধাবাদী হতে এবং দ্রুত উন্নতির পথ তৈরি করে দেয়। রমজান এরই সূত্র ধরে মন্বন্তরের বাস্তবতাকে কালোবাজারি ও নারীপাচারের অনুষঙ্গে ব্যবহার করতে পারে। *সংশপ্তক* উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের শ্রেণি-অবস্থান স্পষ্ট, যদিও তিনি কোনো তত্ত্বকে আরোপ করেননি। সমাজগতির স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে শনাক্ত করে বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ওই কালের প্রবণতাগুলোকে তুলে এনেছেন।

হাসান আজিজুল হক তাঁর *আগুনপাখি*তে এক প্রান্তিক নারীর চোখ দিয়ে যে বিশ্বযুদ্ধকে দেখেন, তাতে সরাসরি রাজনীতির উপস্থিতি না থাকলেও এটা স্পষ্ট যে – বিশ্বযুদ্ধের রাজনীতি থেকে দূরে থাকা প্রান্তজনরা কত গভীরভাবে ওই রাজনীতির শিকার। *আগুনপাখি*র পাঠ এক অর্থে বিঔপনিবেশিক পাঠ। কারণ ঔপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে সম্পৃক্তি-সূত্রে সৃষ্ট মন্বন্তর প্রান্তজনের ঘরে এসে হানা দেয়; প্রান্তিক নারী 'মেতর বউ' প্রতিমুহূর্তে তার কথন, জীবনায়ন ও চিন্তন থেকে সেই ঔপনিবেশিকতাকে অস্বীকার করে। এটি কেবল বিশ্বযুদ্ধ-মন্বন্তর প্রশ্নেই নয়, পরবর্তী রাজনৈতিক ধারাবাহিকতাতে সেই অস্বীকার জারি থাকে। *সূর্য-দীঘল বাড়ী*র জয়গুনের চরিত্রায়ণেও বিঔপনিবেশিক পাঠ উপলব্ধি করা যায়। পূর্ববঙ্গের এই প্রান্তিক নারী মন্বন্তরের কঠিন বাস্তবতায় জীবন নির্বাহের জন্য যে সংগ্রামশীল জীবনকে যাপন করে, তাতে ঔপনবেশিক শাসনের অন্তঃসারশূন্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

আলোচিত উপন্যাসগুলোর মধ্যে নারী চরিত্রগুলোই ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামোর ভঙ্গুরতাকে চিহ্নিত করে দেয়। অথচ পুরুষ চরিত্ররা তাদের চেয়ে বেশি রাজনীতি-সচেতন, ক্ষমতাকাঠামোর কাছাকাছি তাদের অবস্থান। কিন্তু তাদের রাজনৈতিক অবস্থান ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ নয়। *ক্ষুধা ও আশা* উপন্যাসের মধ্যেও জোহার মতো নিম্নবর্গের চরিত্র নির্মাণে শক্তিশালী শ্রেণিরাজনীতি রূপায়ণের সুযোগ ছিল। কিন্তু ঔপন্যাসিকের মধ্যে সেই প্রতিশ্রুতি লক্ষ করা যায় না। বরং এখানে বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তরে বিভিন্ন শ্রেণির কেবল উপস্থিতি ঘটে – উত্থান, রূপান্তর বা পরিবর্তন নেই। এখানে ঔপন্যাসিকের

রাজনৈতিক অবস্থানের দোদুল্যমানতা প্রকাশিত হয়। একই ঘটনাক্রম – অথচ ঔপন্যাসিকের অবস্থানগত বৈভিন্ন্যে রাজনৈতিক চিন্তা পায় বিচিত্র মাত্রা। বর্তমান পরিচ্ছেদে উপন্যাসপাঠ থেকে কেবল ওই কালের বাস্তবতার একমাত্রিক চিত্র পাওয়া যায় না; বরং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্যে বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তরের বাস্তবতার একাধিক প্রান্তকে আবিষ্কার করা যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্বাধীনতার স্বপ্ন ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি

চল্লিশের দশকের ভারতীয় উপমহাদেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক ইতিহাসে স্বাধীনতার স্বপ্ন ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সমান্তরালভাবে অবস্থান করেছে। এই স্বাধীনতার স্বরূপ, সংজ্ঞার্থ ও তাৎপর্য নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে আছে বহুকৌণিক প্রশ্ন; সাম্প্রদায়িক রাজনীতিরও আছে পক্ষ-বিপক্ষ। কিন্তু চল্লিশের দশকে এ-দুটোই ঘটে যাওয়া বাস্তবতা। সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের মতো বাংলা অঞ্চলে ও বাংলার জনজীবনে এই বাস্তবতার অভিঘাত সুদূরপ্রসারী। মূলধারার ইতিহাসে যে কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক ঘটনাক্রমের উল্লেখ পাওয়া যায়, জনজীবনে তার প্রভাব-ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অনেক বেশি গভীর ও বহুপ্রান্তস্পর্শী। চল্লিশের দশকের তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তির জন্য সাম্প্রদায়িক যূথবদ্ধতার উর্বরতা বাড়িয়েছে; কিন্তু এটি কোনো আকস্মিক বিষয় ছিল না।

ঐতিহাসিকভাবে ভারতীয় উপমহাদেশে ছিল বিভিন্ন ভাষাভাষী নানা জাতি ও ধর্মগোষ্ঠীর বসবাস। রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অংশ হিসেবে শাসনকাঠামোর দিক থেকে ভারতে মুসলিম শাসন ছিল ছয় শতকব্যাপী। কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী বাংলা অঞ্চল বিশেষত পূর্ববঙ্গ শাসনতান্ত্রিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিল। সমাজে চিরাচরিতভাবে শাসন-শোষণও চলমান ছিল। বাংলা অঞ্চলে দুই সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমান শতকের পর শতক ধরে পাশাপাশি বসবাস করে আসছিল। একই সঙ্গে প্রাচীন যুগ থেকেই বঙ্গ জনপদ তথা পূর্ববঙ্গ প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক মানদণ্ডে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় বহন করে চলেছে। এই জনাঞ্চলের মানুষের জীবনায়নের স্বাতন্ত্র্য অপরাপর জনজাতি থেকে তার স্বতন্ত্র সভ্যতাকে নির্দেশ করে। ফলে ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বাংলা অঞ্চলে বিরাজ করা স্বাভাবিক। কিন্তু বিশ শতকের শুরু থেকে এই মুক্তির আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সাম্প্রদায়িক বোধ সংশ্লেষিত হতে থাকে। রাজনীতির বোধের সঙ্গে ক্ষমতার সম্পর্ক জড়িত। সাম্প্রদায়িকতা একটি রাজনৈতিক বোধ; ধর্মীয় বোধের চেয়েও রাজনীতির সঙ্গেই তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। কারণ, ধর্ম অনেকটা ব্যক্তিগত ও সামাজিক। কিন্তু রাষ্ট্রসম্পর্কের সঙ্গে ক্ষমতাসম্পর্ক জড়িত। 'উপমহাদেশের মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধে সামাজিক বিভেদের উপকরণ থাকলেও তাতে সাম্প্রদায়িক বিরোধের প্রবণতা অধিকাংশ সময়ে ছিল গৌণ। ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য

চেতনায় যেই মাত্র রাজনৈতিক উপকরণ সংযোজিত হলো, তখনই তা সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও বিরোধের শক্তিশালী উৎস হয়ে দাঁড়াল।' (মমতাজুর ১৯৯৪ : ১৫) প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে এর শুরু বিশ শতকে দৃশ্যমান হলেও সমাজ-অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যে এর বীজ সুপ্ত ছিল। ভারতীয় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রধান দুটি পক্ষ – হিন্দু ও মুসলমান। চল্লিশের দশকে দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রভাবে জাতীয়তার প্রশ্নের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হয়। কংগ্রেসের এক জাতি নীতি – ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এবং মুসলিম লীগের দুই জাতি হিন্দু-মুসলমানের ধারণা পুরো ভারতের নানা জনগোষ্ঠীকে জাতীয়তার বিষয়ে নতুনভাবে ভাবিত করে। 'সাম্প্রদায়িকতা নামের জিনিসটা দাঁড়াতেই পারতো না যদি সম্প্রদায়কে জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা না করে জাতীয়তার প্রধান ভিত্তি যে ভাষা সেই সত্যটাকে মেনে নেওয়া হতো।' (সিরাজুল ২০২০ : ১৩) কিন্তু তা হয়নি। দুই পক্ষের জাতীয়তার ধারণায় ভাষা প্রাধান্য পায়নি। একপক্ষের (কংগ্রেস) ছিল ভাষাকে প্রাধান্য না দেবার প্রবণতা, তাতে বহুভাষাভাষীর বহু জাতির ধারণা তৈরি হবার আশঙ্কা। অন্য পক্ষ (মুসলিম লীগ) জাতীয়তার সকল উপাদানকে বাদ দিয়ে কেবল ধর্মকে গ্রহণ করেছিল। জাতীয়তার প্রশ্নটি তখন জরুরি ছিল। কারণ সামনে ছিল স্বাধীনতার হাতছানি। বহুজাতি-গোষ্ঠী-সম্প্রদায়-সংস্কৃতি ও ধর্মের সমবায়ে গঠিত ভারত উপমহাদেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কম সময়ের ব্যবধানে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে রূপ নেয়। ফলে জাতীয়তার ধারণা অমীমাংসিত থেকে যায় এবং তা সাম্প্রদায়িকতার দিকে ধাবিত হয়। এ-প্রসঙ্গে বাংলাদেশের অন্যতম রাজনৈতিক বিশ্লেষক বদরুদ্দীন উমর (২০১৫ : ২১) তাঁর *সাম্প্রদায়িকতা* (প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৬) বইয়ে উল্লেখ করেন : 'ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা নিঃসন্দেহে জাতীয়তারই বিকৃতি।' তিনি (২০১৫ : ১১-১২) দুই সম্প্রদায়ের সংকটকে প্রধানত দেখেন অপরিচয়ের সংকট হিসেবেঃ

> আমাদের দেশে হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় এবং সামাজিক চিন্তার ব্যবধান অনেক। এই ব্যবধানের ফলে এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক পর্যায়ে যে পরিমাণ লেনদেন হওয়ার কথা কোনো দিনই তা হয়নি। ... হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় এবং সামাজিক ব্যবধানকে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী প্রয়োজনে সক্রিয় প্রচেষ্টায় তারা পরিণত করেছে রাজনৈতিক বিরোধে। এ পরিণতির নামই সাম্প্রদায়িকতা।

অর্থাৎ ভারতীয় উপমহাদেশের এবং বাংলা প্রদেশের সাম্প্রদায়িক সংকটের আভ্যন্তর কারণ সমাজ-সংস্কৃতিজাত। এর সঙ্গে যুক্ত অর্থনীতির শোষণমূলক বিন্যাস। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে বৃহত্তর রাজনৈতিক পটভূমিতে। ফলে বাংলার রাজনীতিতে এই সাম্প্রদায়িক সংকটকে অস্বীকার করা যায় না। কারণ এর শেকড় অনেক গভীরে প্রোথিত। ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যার পরিচিহ্নায়নকে সংকীর্ণ করে দেখা

হয়েছে বলে মনে করেন মোহাম্মদ আজম। একই সঙ্গে তিনি সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও হিন্দু-মুসলমান বিরোধের সমান্তরাল বিবেচনাকে পরিভাষাগত সমস্যা বলে অভিহিত করেন। তাঁর (২০১৭ : ৪৯) মতে:

> ভারতীয় উপমহাদেশের সম্প্রদায়-সমস্যা অতি পুরোনো। হিন্দু-বৌদ্ধ যুগেও এ সংকট তীব্র ছিল, তবে তীব্রতর হয়েছে হিন্দু-মুসলমান আমলে। বহু-বিচিত্র জাতিগোষ্ঠীর এ অঞ্চলে সম্প্রদায়ের ধারণা এবং সম্প্রদায়-সংকট আসলে অতি বিচিত্র এবং অতি জটিল। জাতপাত-বর্ণের সমস্যা আছে, অনার্য-আর্য সংঘাতের বহু ধরন ও স্তর আছে, আছে ভাষাগোষ্ঠী ও নৃগোষ্ঠীর পারস্পরিক সংঘাত। কিন্তু মূলত গত একশ বছরের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে এ অঞ্চলের সাম্প্রদায়িক সমস্যা বলতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যাকেই বোঝানো হয়েছে। এই সর্ববিস্তারী ধারণা ও বোধ গভীরভাবে ক্ষতিকর।

কিন্তু বর্তমানকালে অর্থাৎ একুশ শতকে সেই সংকট-ধারণায় সীমাবদ্ধতার প্রশ্ন উত্থাপিত হলেও গত একশ বছরে বিশেষত চল্লিশের দশকে বাংলার রাজনীতি ও তৎপ্রসূত ফলাফল হিসেবে বাংলা বিভাজনের ঘটনায় হিন্দু-মুসলমান বিরোধের রাজনীতিই যে প্রধান অনুষঙ্গ, সেটি একটি দৃশ্যমান বাস্তবতা। সন্দেহ নেই – এই সংকট গভীরতর। কিন্তু সংকট তৈরি হয়েছিল এবং সেটাই কালের বাস্তবতা। প্রধানত অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্নে বাংলার শোষিত জনগণকে লাহোর প্রস্তাবের দ্বিজাতিতত্ত্ব আকৃষ্ট করে। উনিশ শতকে বাংলায় হিন্দু মধ্যবিত্ত গড়ে ওঠে। মুসলমান মধ্যবিত্তের গড়ে ওঠার কাল বিশ শতক। অপরদিকে সামন্তমূল্যবোধ তখনও বাংলা অঞ্চলে বেশি সক্রিয়, বিশেষত পূর্ববঙ্গে। শহরের পরিস্থিতির সঙ্গে গ্রামের পরিস্থিতিরও ভিন্নতা বিদ্যমান থাকে। এসব বাস্তবতায় বৃহত্তর রাজনীতি বাংলার জনমানুষকে নতুন নতুন প্রশ্নের মুখোমুখি করে। এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার মধ্য দিয়েই বাংলার জনমানুষ পেতে চেয়েছে তার কাঙ্ক্ষিত মুক্তি, দেখতে শুরু করে স্বাধীনতার স্বপ্ন। এমন প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই বাংলাদেশের উপন্যাসে তৈরি হয়েছে রাজনীতির স্বতন্ত্র ভাষ্য। এক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকদের শ্রেণি অবস্থানটিও বিচার্য। এ-প্রসঙ্গে বাংলাদেশের উপন্যাসের অন্যতম গবেষক রফিকউল্লাহ খানের (২০০৯ : ১৬৮) অভিমতটি স্মরণযোগ্য:

> কোনো বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলের সকল মানুষের জীবনের ভবিতব্য সেই অঞ্চলের রাজনীতি, রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। একজন প্রকৃত ঔপন্যাসিকের জীবননীতি ও শিল্পনীতির মূলে যে বৈজ্ঞানিক বিশ্বদৃষ্টি এবং অভিজ্ঞতার অঙ্গীকার ক্রিয়াশীল থাকে, তা জীবনের প্রতি শিল্পীর বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গিরই ফল।

সাতচল্লিশপূর্ব সময়পর্বের রাজনীতিকে উপজীব্য করে নির্মিত হয়েছে যেসব উপন্যাস, সেগুলোর বেশিরভাগই প্রকাশিত হয়েছে ওই রাজনীতির স্বপ্নভঙ্গের কালে – পাকিস্তান শাসনামলে। ঔপন্যাসিকদের অনেকে তৎকালীন রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন, কেউ কেউ দেখেছেন দূর থেকে, আবার কেউ কেউ আক্রান্তও হয়েছেন। আবার ওই কালপর্ব থেকে দূরবর্তী সময়ে বেড়ে ওঠা

ঔপন্যাসিক সেই কালের রাজনীতিকে উপন্যাসে ধারণ করতে চেয়েছেন কালের অমোঘ বাস্তবতার বিবেচনায়। বর্তমান পরিচ্ছেদের আলোচনায় আলোচ্য সময়পর্বের ঘটনাক্রমের মধ্যে বাংলাদেশের জনজীবনে স্বাধীনতার স্বপ্ন ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির স্বরূপ-সন্ধানে যে কয়েকটি প্রতিনিধিত্বশীল উপন্যাস পাঠপর্যালোচনার আওতাভুক্ত করা হয়েছে, সেখানে মিলবে বিচিত্র স্বর ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়। এই পরিচ্ছেদে উপন্যাসসমূহের আলোচনার ক্রম নির্ধারণে প্রথম প্রকাশের তথ্যকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

২.২.১

আবুল মনসুর আহমদের (১৮৯৮-১৯৭৯) *জীবন-ক্ষুধা*কে (১৯৫৫) ঔপন্যাসিকের আদর্শিক রাজনীতির সাহিত্যিক রূপ বলা যায়। চল্লিশের দশকের স্বাতন্ত্র্যবাদী বাংলাদেশের সাহিত্য-আন্দোলনের অন্যতম বলে পরিচিহ্নিত আবুল মনসুর যে রাজনৈতিক জীবনকে যাপন করেছেন, সাহিত্যে তার প্রতিফলন ঘটেছে। *জীবন-ক্ষুধা*র মধ্যে যে হালিম চরিত্রকে পাওয়া যায় সে ময়মনসিংহের অধিবাসী, কৃষকের সন্তান, ডেপুটি হবার স্বপ্ন নিয়ে স্নাতকোত্তীর্ণ অর্থাৎ বিএ পাশ। চাকরির অন্বেষণে কলকাতার পথে-ঘাটে দিন-রাত্রিযাপন, বাড়িতে বেকার হিসেবে প্রত্যাগমন, ঢাকার অদূরে মীরপুর নামক স্থানে স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার হিসেবে চাকরি লাভ – এসবের মধ্য দিয়ে বাংলা নিম্নমধ্যবিত্ত গ্রামীণ পরিবার থেকে উঠে আসা একজন শিক্ষিত মুসলমানের স্বাভাবিক পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এর সঙ্গে যুক্ত হয় রাজনৈতিক অভিজ্ঞান। কৃষক-প্রজা পার্টির একজন একনিষ্ঠ আদর্শিক কর্মী হয়ে হালিম সর্বত্র কৃষক-প্রজার জন্য কাজ করে, তাদের সঙ্গে সম্মেলন করতে গিয়ে মীরপুরের বড় সাহেবের সঙ্গে বিরোধের জেরে তাকে চাকরিও হারাতে হয়। তারপর আদর্শ থেকে দূরে সরে যাওয়া হালিম পাট কোম্পানির এজেন্টের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। নিজের জীবনের পরিবর্তন ঘটে। ব্যক্তিগত জীবনে স্ত্রী নঈমার সঙ্গে যেমন দূরত্ব ও অতঃপর বিচ্ছেদ তৈরি হয়, অন্যদিকে মীরপুরের সাহেবজাদী লুৎফুন্নেসার সঙ্গে ব্যক্তিত্বগুণে হালিমের ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। উপন্যাসে ব্যক্তি হালিম অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে। কিন্তু হালিমের রাজনৈতিক তৎপরতা তাকে ব্যক্তিগত প্রত্যাশা থেকে জাতীয় প্রত্যাশার দিকে ধাবিত করে। পাকিস্তান-আন্দোলনের প্রতি একসময়ের তীব্র বিরোধী হালিমের দৃষ্টিভঙ্গিতে আসে পরিবর্তন। এই পরিবর্তনও সামাজিক কার্যকারণের ভিত্তিতেই রূপায়িত। হালিম মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও প্রথমত সে মুসলিম লীগকে মনে করত একটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান। তার কাছে স্বাধীনতার প্রধান অর্থ কৃষক শ্রমিক ও শোষিতের মুক্তি। এ-নিয়ে মীরপুরের ছোটসাহেব ইংরেজি শিক্ষিত ও মুসলিম লীগপন্থি আহ্বাবের সঙ্গে যেমন বিতর্ক হয় হালিমের, তেমনি এক সময়ের সহযোদ্ধা মজিদের আজাদ হিন্দ্

ফৌজের সঙ্গে সম্পৃক্তিসূত্রে ব্রিটিশ বিরোধিতা প্রসঙ্গেও তার অবস্থানগত বিরোধ দেখা যায়। কিন্তু শোষক-শোষিতের শ্রেণি-সম্পর্কের মধ্যে ঢুকে পড়ে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের সমান্তরাল ধারণা। তিরিশ পালায় বিভক্ত এই উপন্যাসে প্রথম চব্বিশ পালায় হালিমের ব্যক্তিজীবন কৃষক-প্রজা পার্টির রাজনীতির অনুষঙ্গে রূপায়িত হয়েছে। কিন্তু পঁচিশতম পালা থেকে তার রাজনৈতিক চিন্তা নতুন মোড় নেয়। ১৯৪৫ সালের কেন্দ্রীয় পরিষদ নির্বাচনেও হালিম মুসলিম লীগকে ভোট দেয় না। কিন্তু মুসলমানদের প্রতি হিন্দু সম্প্রদায়ের পৌনঃপুনিক বিরোধমূলক মনোভাব তাকে ভাবিয়ে তোলে। সে ভাবে:

> হিন্দুরা সকলেই পাকিস্তান-দাবির বিরোধিতায় একমত। পাকিস্তান-দাবি একটা রাজনৈতিক দাবি। এর পক্ষে-বিপক্ষে লোক যাইবে রাজনৈতিক আদর্শের বিচারে। সুতরাং এর বিপক্ষে যেমন মুসলমান-হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের লোক থাকা স্বাভাবিক, এ দাবির পক্ষেও তেমনি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু কই। তার জানা শোনা একজন হিন্দুকে ত সে পাকিস্তান-দাবি সমর্থন করিতে দেখে নাই। পাকিস্তান-দাবির বিরুদ্ধতায় হিন্দুরা সবাই একজোট কেন? এ দাবি অন্যায় বলিয়া কি? না, মুসলমানরা দাবি করিতেছে বলিয়াই হিন্দুরা বিরুদ্ধতা করিতেছে? (আবুল মনসুর ১৯৯৮ : ৪২০)

এমন আরও অনেক প্রশ্ন বিভিন্ন ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে তার চিন্তনরাজ্যে ক্রিয়াশীল থাকে। নিজে অসাম্প্রদায়িক হওয়া সত্ত্বেও অপরপক্ষের সাম্প্রদায়িক তৎপরতা তাকে সম্প্রদায়-সচেতন করে তোলে। 'নিজের উদার জাতীয়তাবাদের আদর্শকে যতই সে আকড়াইয়া ধরিয়াছে, হিন্দুদের একরোখা লীগ-বিরোধী প্রচার ততই হালিমের দৃঢ়তা শিথিল করিয়াছে।' (আবুল মনসুর ১৯৯৮ : ৪২০) এর সঙ্গে যুক্ত হয় পাকিস্তান-আন্দোলনে জড়িত থাকায় হিন্দু জমিদার কর্তৃক মুসলমান কর্মচারীর চাকরি হারানো, হিন্দু কর্মকর্তা কর্তৃক মুসলমান অধীনস্তকে শাস্তি দেওয়ার বিভিন্ন খবরাখবর। আর এভাবেই 'সারত বামপন্থী' (নুরুল ২০১১ : ৫৮) হালিম হয়ে ওঠে পাকিস্তান-আন্দোলনের একনিষ্ঠ সমর্থক। এ-নিয়ে তার কোম্পানির বড় কর্তা হ্যারিসনের সঙ্গেও সে তর্কে জড়ায়। পাকিস্তান-আন্দোলনের যৌক্তিকতা ও এর স্বরূপবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সে অধিকতর পাঠ গ্রহণ করে। প্রথমত পাকিস্তান-দাবির আন্দোলনের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক বিভাজন তাকে স্বস্তি দেয় না। তার সেই কৃষক-আন্দোলন সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের নিচে চাপা পড়ছে ভেবে দুঃখিতও হয়। হালিম একসময় এই বিভাজনকে প্রাকৃতিক নিয়ম মনে করে সান্ত্বনা পেতে চায়। সে জনতার মধ্যে পাকিস্তান-আন্দোলনের যৌক্তিকতা সম্পর্কে বোঝাতে সমর্থ হয়। ফলে জনগণের মধ্যেও জমিদারি ব্যবস্থা উচ্ছেদ ও পাকিস্তান-আন্দোলনের মধ্যে বিরোধ থাকে না। কিন্তু জনতার কোনো কোনো অংশের প্রশ্ন থেকে পাকিস্তান-আন্দোলনে প্রান্তিক জনগণের অবস্থানটিও বোঝা যায়। যেমন আলোচনার একটি পর্যায়ে কৃষক আলী 'ধানের আটির শেষ গোছাটা

ধাক্কা মারিয়া ছাড়িয়া দিয়া বলে : যদি খাজনাই দিতে লাগে তবে পাকিস্তান হৈয়া লাভ কি?' (আবুল মনসুর ১৯৯৮ : ৪২৫) প্রান্তিক কৃষকের এই ভাবনাস্রোতকে নিজেদের মতো করে ব্যবহার করতে পেরেছিল মুসলিম লীগের বুর্জোয়া শ্রেণির অংশবিশেষ। হালিম নিজেও ততদিনে মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত। তার শহরে বাড়ি হয়, গাড়ি হয়, দেখা পায় অর্থ, প্রাচুর্য আর সামাজিক সম্মানের। পাকিস্তান-আন্দোলনকেই একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে সে তার এলাকায় মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করে। এরই ধারাবাহিকতায় সে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগকে জয়ী করে আনে – অধিষ্ঠিত হয় জেলা মুসলিম লীগের সভাপতির আসনে। এরপর ১৬ই আগস্টে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ আহূত 'ডাইরেক্ট একশন ডে' তে ময়ময়নসিংহেও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে মুসলিম লীগের তৎপরতায় মুসলমান কৃষক শ্রমিকদেরও আন্দোলন সংগ্রাম ও মিছিলে সম্পৃক্ত করা হয়। ওইদিন কলকাতায় সংঘটিত দাঙ্গার খবর দূরবর্তী ময়মনসিংহ জেলাকেও সংক্রমিত করে। 'উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে রেষারেষির ভাব বাড়িয়া যায়। এই শহরের দাঙ্গায় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যতটা শত্রুভাব সৃষ্টি না হইয়াছিল, কলিকাতার সংবাদে তার দশগুণ বাড়িয়া যায়।' (আবুল মনসুর ১৯৯৮ : ৪৩৩) আর এই সামূহিক বিপর্যয় নেমে আসে হালিমের ব্যক্তিজীবনেও। মূলত পাকিস্তান-আন্দোলনে জড়িত থাকার কারণে ব্যবসায়িক ষড়যন্ত্রের শিকার হয় সে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর হালিম আবারও ফিরে আসে স্বাভাবিক জীবনে।

জীবন-ক্ষুধা মূলত বর্ণনাপ্রধান উপন্যাস। সমালোচকদের কেউ কেউ (রফিকুল ইসলাম) একে উপন্যাস বলতে চান না। (আবুল মনসুর ১৯৯৮ : ভূমিকা-সাত) উপন্যাসে হালিম নামক মুসলমান যুবকের রাজনৈতিক চিন্তার ক্রমপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তৎকালীন রাজনীতিতে মুসলমান যুবকদের সংশ্লিষ্টতার কার্যকারণ সূত্র নির্মাণ করতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক। এই ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক দেখাতে চান পাকিস্তান-আন্দোলনের প্রতি মুসলমান তরুণদের যৌক্তিকতার পাল্লাটি কীভাবে ভারি হয়ে ওঠে। এই রাজনৈতিক বিবর্তনের সঙ্গে আবুল মনসুরকেও পড়া যায়। এককালের (১৯২২) ময়মনসিংহ জেলা কংগ্রেসের সভাপতি (নুরুল ২০১১ : ৪৪), নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি ও কৃষক-প্রজা সমিতির অন্যতম উদ্যোক্তা আবুল মনসুর যিনি ছিলেন মুসলিম লীগের তীব্র বিরোধী (আবুল মনসুর : ২০১৬), তিনিই পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪১ সালে মুসলিম লীগে যোগ দেন। এসব নানা দৃষ্টান্ত-সহযোগে এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের আত্মজীবনও অনেকখানি খুঁজে পাওয়া যায়। '*জীবন-ক্ষুধা* উপন্যাসটিকে আংশিক আত্মজৈবনিক উপন্যাস বলা চলে; কারণ উপন্যাসের নায়ক হালিম আবুল মনসুর আহমদের মতোই গৃহস্থ, গ্রাজুয়েট এবং কৃষক আন্দোলনের নেতা। আবুল মনসুর আহমদের

মতো হালিমের রাজনৈতিক পরিণতিও ঘটে পাকিস্তান আন্দোলনে।' (রফিকুল ২০১৫ : ৩৫) এ-প্রসঙ্গে যতীন সরকারের (২০১৩ : ৬৩) অভিমতও প্রায় অভিন্ন:

> আবুল মনসুর আত্মস্মৃতি-মূলক গ্রন্থ 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর'-এ তাঁর নিজের রাজনৈতিক চিন্তার বিবর্তন-ধারার যে বস্তুগত পরিচয় উদ্ঘাটিত, 'জীবনক্ষুধা' তারই কথাশিল্পগত রূপ। ... 'জীবনক্ষুধা'র হালিমের মধ্যে আবুল মনসুরের আত্মবিবর্তনেরই প্রতিবিম্বন।

আবুল মনসুর আহমদের জীবনপ্রবাহের সঙ্গে উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহের সাদৃশ্যেও চেয়েও জরুরি আবুল মনসুরের চেতনাবোধের রূপায়ণ। একসময়ের মুসলিম লীগের রাজনৈতিক অবস্থানের ঘোরতর বিরোধী আবুল মনসুর আহমদের মুসলিম লীগে যোগ দেওয়াও চল্লিশের দশকের ঐতিহাসিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সচেতন শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক অবস্থানকে চিহ্নিত করে। তাঁর এই রূপান্তর কোনো আকস্মিক বিষয় ছিল না। এজন্য তাঁর জীবনদর্শনে বস্তুবাদ, অজ্ঞেয়বাদ বা অধ্যাত্মবাদের অনুপস্থিতির ফলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে সমালোচক আখ্যায়িত করেছেন 'প্র্যাগম্যাটিক' [প্রায়োগিক] হিসেবে। (যতীন ২০১৫ : ৪০) কারণ সর্বতোভাবে তাঁর অবস্থান ছিল বাংলাদেশের পক্ষে। এই বাংলাদেশের প্রশাসনিক নাম যখন যেমনই থাকুক না কেন – পূর্ববঙ্গ, পূর্ববাংলা, পূর্ব পাকিস্তান কিংবা বাংলাদেশ – তিনি এই জনাঞ্চলের আর্থরাজনৈতিক সাংস্কৃতিক পরিচয়কেই সর্বাগ্রে বিবেচনায় রেখেছেন। এর পরিচয় পাওয়া যায় ১৯৪৪ সালের পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁস সোসাইটির মূল সভাপতির অভিভাষণে, যেখানে তিনি বাংলার মুসলমানকে কেবল ভারতীয় অপরাপর জনগোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র হিসেবে দেখননি, বরং অপরাপর মুসলমান জনগোষ্ঠী থেকেও স্বতন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এই ধারণাকে সমালোচক দ্বিজাতিতত্ত্বের পরিবর্তে 'ত্রিজাতিতত্ত্ব' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। (আনিসুজ্জামান ২০১৫ : ১৯২) ফলে তাঁর *পাক-বাংলার কালচার* বইটি (১৯৬৬) স্বাধীন বাংলাদেশে *বাংলাদেশের কালচার* নামকরণে কোনো সংকট থাকে না। '১৯৭১-এ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়কেও তিনি ভারত বিভাগের বা দ্বিজাতিতত্ত্বের নিগেশন হিসেবে নয়, বরং ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের বিলম্বিত বাস্তবায়ন হিসেবে দেখেছেন।' (মোরশেদ ২০১৫ : ১৬৭) এই রাজনৈতিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে *জীবন-ক্ষুধা*র হালিম চরিত্রের রাজনৈতিক রূপান্তরের কার্যকারণ খুঁজতে ঔপন্যাসিক সত্তার সংশ্লিষ্টতা দুর্লক্ষ নয়। আরেক বিবেচনায় – 'আদর্শের সঙ্গে সন্ধি করে হালিমের উচ্চবিত্ত শ্রেণিতে উল্লম্ফনের প্রয়াস বা জাতে ওঠার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা নবজাগ্রত বাঙালি মুসলমান সমাজের বৈশিষ্ট্য।' (রফিকুল ২০১৫ : ৩৫) আবুল মনসুর মূলত হালিমের মধ্য দিয়ে চল্লিশের দশকের বাঙালি মুসলমানের আর্থরাজনৈতিক অবস্থা ও অবস্থানটি রূপায়িত করেছেন। তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের একটি শিল্প-আখ্যান হিসেবে *জীবন-ক্ষুধা*কে বিবেচনা করা যায়। এ-প্রসঙ্গে নাজমা জেসমিন চৌধুরীর অভিমতটিও স্মর্তব্য:

> তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এই উপন্যাসে বিধৃত। তিনি যে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সেই আন্দোলনের ধারাকেই 'জীবনক্ষুধা'য় রূপায়িত করেছেন। ফলে উপন্যাসে কিছু অবাস্তব ঘটনা থাকা সত্ত্বেও তা ছাপিয়ে একটা রাজনৈতিক বাস্তবতা প্রধান হয়ে ওঠে। (নাজমা ১৯৯১ : ২৮৯)

আবুল মনসুর সাহিত্যসৃজনকে নতুন কালের নতুন চেতনার আদলে নির্মাণ করতে চেয়েছেন। যে কারণে উপন্যাসগঠনে দোভাষী পুথির আদল নিছক শিল্পের বিষয় হয়ে থাকে না। 'তিনি অধিকতর রাজনৈতিক, সে রাজনীতি জনলিপ্ত ও গণতান্ত্রিক, আর গণতান্ত্রিকতার অবলম্বন বাস্তবের ভাষা ও সংস্কৃতি।' (মোহাম্মদ আজম ২০১৮ : ৫৯) উপন্যাসে ময়মনসিংহ অঞ্চলের ভাষার ব্যবহারেরও একটি রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে – পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববাংলার জনসংস্কৃতি ও ভাষাবোধের স্বাতন্ত্র্যের রাজনীতি। একই সঙ্গে এটি একটি অঞ্চলে বৃহত্তর রাজনৈতিক বাস্তবতার স্বরূপ পরিচিহ্নায়নে আরেকটি বড় ভূমিকা পালন করেছে। এখানেও স্বাতন্ত্র্য আছে। কিন্তু এর উপন্যাস হয়ে ওঠার অন্যতম দিক হচ্ছে ব্যক্তি-হালিমের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলাভাষী মুসলমানের প্রত্যাশা ও পরিবর্তনের রূপায়ণ। 'ব্যক্তি-মানুষের জীবনক্ষুধার সঙ্গে জাতির জীবনক্ষুধার সম্পর্ক স্থাপন করে তৈরী একটি বিশেষ তত্ত্বই 'জীবনক্ষুধা'র আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত আখ্যানের আধারে পরিবেশিত।' (যতীন ২০১৩ : ৬১) উপন্যাসে যদিও জাতীয়তার প্রশ্নটি মীমাংসিত নয়। কিন্তু এই প্রশ্নে পূর্ববাংলার জনমানুষ তথা মুসলমান সম্প্রদায়ের উত্তাপটি সহজে শনাক্ত করা যায়। সম্প্রদায়-চেতনা প্রধান হলেও উপন্যাসে শ্রেণির অবস্থান-পরিচয় অবচেতনভাবে প্রকাশিত হয়। বৃহত্তর রাজনীতি কীভাবে ব্যক্তির আদর্শিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটায়, তারও দৃষ্টান্ত হালিমের ক্রমপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করা যায়। চল্লিশের দশকে পূর্ববঙ্গের অমীমাংসিত কিন্তু বাস্তব রাজনৈতিক বোধের ঔপন্যাসিক রূপায়ণ হিসেবে *জীবন-ক্ষুধা* গুরুত্বপূর্ণ।

২.২.২

আবু ইসহাকের (১৯২৬-২০০৩) *সূর্য-দীঘল বাড়ী* (১৯৫৫) উপন্যাসের বাস্তবতা ঢাকার নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলের নিরন্ন মানুষের বাস্তবতা। চল্লিশের দশকে বাংলার দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তরকবলিত দরিদ্র জনজীবনে স্বাধীনতা বা পাকিস্তান-আন্দোলন বড় কোনো আদর্শ নিয়ে উপস্থিত হয়নি। দূর থেকে আগত রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের খবর নিরন্ন মানুষের কাছে ধরা দেয় কেবল অনাহার থেকে মুক্তিপ্রাপ্তির স্বপ্ন নিয়ে। তাদের কাছে এই মুক্তি রাজনৈতিক মুক্তি নয়। তারা রাজনৈতিক গণতন্ত্র বোঝে না; তাদের কাছে এই স্বাধীনতা মানে কেবল 'রাজার পরিবর্তন'। তাই জয়গুনদের ট্রেনযাত্রায় সাধারণ মানুষের কথোপকথনে সেই অভিব্যক্তিই প্রকাশিত হয়:

যে লোকটি খবরের কাগজ পড়ছিল, সে জোরে পড়তে আরম্ভ করে, ১৫ই আগস্টের মধ্যে ভারতবাসীর হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইবে –

– ও মশাই, ওডা ক্যার ছবি? একজন জিজ্ঞেস করে।

– জিন্নাহ সা'বের। খবরের কাগজের পাঠক বলে।

আবার তর্ক। একজন বলে, জিন্না সা'বই রাজা অইব। খুব বড় মাথার লোক।

অন্য দিক থেকে আর একজন বলে – গান্ধী অইব এই দেশের রাজা।

এ নিয়ে কিছুক্ষণ তর্ক চলে। মাঝ থেকে একজন বলে – সুভাষ বসু থাকলে সে-অই রাজা অইতেন।

– আইচ্ছা মামু, স্বাধীন অইলে খাজনা দিতে অইবনি?

– না, না, খাজনা দিলে দেশ আবার স্বাধীন অইল কি?

অপর একজন বলে – না মিয়া, রাজার খাজনা মাপ নাই, দিতেই অইব।

জয়গুন মন দিয়ে শোনে সব কথা। একটি কথাই তার ভালো লাগে, আশা জাগে মনে – চাল সস্তা হবে, কারো কোন কষ্ট থাকবে না। (আবু ইসহাক ২০০৪ : ২১)

দরিদ্র মানুষের এই মনোভাবনা দীর্ঘকাল ধরে ঔপনিবেশিকতা ও দাসত্ব আক্রান্ত মানুষের মনোভাবনা। একসময় তাদের জীবনে আসে '১৫ই আগষ্ট শুক্রবার, ১৯৪৭ সাল।' চারদিকে শোনা যায় চিৎকারের ধ্বনি। জয়গুনের কিশোরপুত্র হাসু চমকে উঠে এই ভেবে – 'হিন্দু-মুসলমানে কাটাকাটি শুরু হল না ত!' (আবু ইসহাক ২০০৪ : ২৭) তার কাছে কাটাকাটি এই কারণে আতঙ্কের যে, কাটাকাটি শুরু হলে তার কাজে যাওয়া বন্ধ হবে, রোজগার বন্ধ হবে। সে স্মরণ করে 'গতবছর এমন দিনে মারামারি বেধেছিল। পনেরো দিন সে ঘরের বার হতে পারেনি। তিনদিন না খেয়ে কাটাতে হয়েছে।' (আবু ইসহাক ২০০৪ : ২৭) দরিদ্রমানুষের কাছে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির চেয়ে পেটের ক্ষুধাই বড়। তবুও চারপাশের 'দেশ স্বাধীনে'র উচ্ছ্বাসে সেও সম্পৃক্ত হয়। রেলের ইঞ্জিনের মাথায় পত পত করে উড়তে দেখে সবুজ রঙের নিশান। রেলগাড়ির অনেকের হাতেই সেই নিশান। জাহাজের সামনে ছাদের ওপর ওড়ে সেই নিশান। এবং সর্বত্র শুনতে পায় – 'আজাদ পাকিস্তান – জিন্দাবাদ! কায়েদে আজম – জিন্দাবাদ!'

উপন্যাসের ছোট একটি বর্ণনা থেকে আরও একটি দিক এখানে স্পষ্ট হয়, তা হলো – সাময়িক মুক্তির আনন্দ। যদিও বৃহত্তর রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক ভেদজ্ঞানের ফলাফলই এই কথিত স্বাধীনতা। কিন্তু প্রাথমিক জোয়ারে মানুষের কাছে এ-ছিল মুক্তির বার্তা। আর কলকাতা থেকে অনেক দূরে অবস্থিত পূর্ববঙ্গের ঢাকা শহরে এই ঘটনা মনে হয় আনন্দের একটি উপলক্ষ্য তৈরি করেছিল। সেখানে গৌণ হয়ে পড়েছিল সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ:

> মানুষের বিরাট মিছিল চলছে শহরের রাস্তা দিয়ে। হিন্দু-মুসলমান ছেলে বুড়ো – সবাই আছে মিছিলে। ... শহরের প্রত্যেক বাড়িতে নিশান উড়ছে বড় বড়। সে তার হাতের কাগজের নিশানটার দিকে চায়, আবার চায় দুই পাশে। ডানে হিন্দু পাড়া, বাঁয়ে মুসলমান পাড়া। সব বাড়ীতেই আজ সবুজ নিশান। (আবু ইসহাক ২০০৪ : ২৮)

আর এই উচ্ছ্বাসে হাসুও বাড়িতে এসে মা জয়গুনের কাছে আবদার করে নিশান বানিয়ে দিতে। জয়গুনের কাছে এই নিশানের তাৎপর্য অবোধগম্য। তাই প্রথমে সে লাল রঙের কাপড় দিয়ে নিশান বানাতে উদ্যোগ নেয়। কিন্তু হাসু চায় সবুজ নিশান। শেষে উপায়ান্ত না দেখে জয়গুন সেই সবুজ বোম্বাই শাড়ির বাকি অংশ দিয়েই নিশান তৈরি করে দেয় – দুর্ভিক্ষের বছরে কাফনের কাপড়ের অভাবে যার একটি অংশ দিয়ে মুড়িয়ে অনাহারে মৃত কন্যাকে সৎকার করতে হয়েছিল। সবুজ শাড়ির একাংশ কাফন আর অপর অংশ পতাকা হিসেবে ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক মৃত্যু ও কথিত স্বাধীনতার স্বপ্নকে একটি সমান্তরাল ব্যঞ্জনা প্রদান করেছেন। এমনই বাস্তবতায় তাদের জীবনে স্বাধীনতা আসে; কিন্তু অর্থনৈতিক মুক্তি আসে না। আবু ইসহাকের *সূর্য-দীঘল বাড়ী* রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে পরিচিত নয়। তবে ঔপন্যাসিকের বাস্তব অভিজ্ঞতাজাত (শিরীণ ২০০৪ : ১৯৩) এই উপন্যাসে নিম্নবিত্তের যাপিত জীবনে চল্লিশের দশকের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। আর্থসামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়েছে তৎকালীন রাজনীতি।

২.২.৩

উদার মানবতাবাদী ধারার সাহিত্যশিল্পী আবুল ফজলের (১৯০৩-১৯৮৩) *রাঙ্গা প্রভাত* (১৩৬৪) উপন্যাসে চল্লিশের দশকের বাস্তবতা রূপায়িত হয়েছে ঔপন্যাসিকের আদর্শ প্রতিষ্ঠার অনুষঙ্গ হিসেবে। উপন্যাসের স্থানিক পটভূমি চট্টগ্রামের শঙ্খ নদীর অববাহিকায় একটি জনপদ ইছাখালী ও চট্টগ্রাম শহর। উপন্যাসে বিধৃত স্থানীয় মুসলমান জমিদার মির্জা এনামুল হোসেনের জীবনদর্শন মূলত আবুল ফজলের জীবনাদর্শেরই প্রতিরূপ। তার একমাত্র নাতি কামালের মধ্য দিয়ে সেই আদর্শ একটি সার্থক রূপ লাভ করে। উপন্যাসের ঘটনাক্রমের মধ্য থেকে ধর্মের প্রতি অনুরক্ত গ্রামীণ মুসলমান মধ্যবিত্তের অসাম্প্রদায়িক রূপটি বুঝে নেওয়া যায়। আরবি-ফার্সিচর্চা, কোরানপাঠ ও কোরানের উদার মানবতাবোধ, পারিবারিক ঐতিহ্যের অনুষঙ্গে যে রূপটি উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে, তাতে বাস্তব ভিত্তির চেয়েও লেখকের ইউটোপীয় চেতনা বেশি ক্রিয়াশীল। প্রৌঢ় হোসেন সাহেব পুত্র খালেদের মধ্যে সেই চেতনা বিস্তারে ব্যর্থ হয়ে পৌত্র কামালকেই বেছে নিয়েছে 'যোগ্য মানুষ' হিসেবে গড়ে তুলতে। চল্লিশের দশকের উত্তাল রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ এখানে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত নেই, তবে সেই সময়ে তরুণ

কামালের অবস্থান নির্মাণে শৈশবে পিতামহের পরিচর্যা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। মসজিদের পাকাঘর তৈরি না করা পর্যন্ত নিজেদের পাকাঘর তৈরি না করা, অন্যের স্ত্রীকে অপহরণ করার অপরাধে পুত্র খালেদকে ত্যাজ্য ঘোষণা করা, পৌত্রকে নামাজ পড়তে আগ্রহী করে তোলা, ইসলাম ধর্মের ইতিবাচক দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট করা, মাদ্রাসায় পাঠাতে চেয়েও বাংলা ও ইংরেজি শিক্ষার স্কুলে ভর্তি করানো, স্কুলে পৌত্রের বয়স কমিয়ে দেওয়ার প্রস্তাবের বিরোধিতা করা, বন্ধুপ্রতিম চারুবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ইত্যাদির মধ্যে বাংলা জনাঞ্চলের একজন আদর্শায়িত মুসলমানের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই পরিচয় 'ধর্মের ব্যাপারে সংগ্রাম-বিমুখ একজন শান্তিপ্রিয় মানুষের' (আবুল ফজল ১৩৬৪ : ৩৩) পরিচয়। কিন্তু সময়টা সংগ্রাম-বিমুখ থাকে না। হোসেন সাহেবও কালের গতিকে উপলব্ধি করতে পারে:

> হোসেন সাহেবের কিন্তু গোড়া থেকেই ইচ্ছা ছিলো কামালকে মাদ্রাসায় পড়াবেন – আরবী ফার্সী পড়ে বংশের ধারা যেন সে রক্ষা করতে পারে। ইংরেজী শিক্ষার খাল বেয়ে দেশের অন্তঃস্থলে যে কুমির ঢুকেছে তা যে একদিন আমাদের আদব-কায়দা ও আচার-বিচারকেও নিঃশেষে গ্রাস করবে তাতে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। (আবুল ফজল ১৩৬৪ : ৪৯)

পিতামহের আদর্শকে মান্য করেও কামাল শহরে পড়াশোনাসূত্রে যুক্ত হয় কালের অনিবার্য স্রোতধারায়। অসাম্প্রদায়িক মন নিয়েও তাকে টুকরো টুকরো ঘটনার মধ্য দিয়ে মুখোমুখি হতে হয় সাম্প্রদায়িকতা ও তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে। ইতিহাসের শিক্ষক ইকবাল সাহেব কামালকে খদ্দরের পোশাক পরা নিয়ে ভর্ৎসনা করে। প্রতিবাদে কামাল বলে : 'খদ্দর আমার দেশের জিনিষ স্যার।' (আবুল ফজল ১৩৬৪ : ৮৩) এর জবাবে ইকবাল সাহেব বলে : 'তোর দেশ? স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে? বেটা, এ দেশ তোদের নয়। অসহযোগ-খেলাফতের দিনের শোনা বুলি এখনো তিনি ভোলেননি মনে হচ্ছে।' (আবুল ফজল ১৩৬৪ : ৮৩) কামাল তার স্বাদেশিক চেতনায় আরও দৃঢ়চেতা হয়ে স্পষ্টভাবেই জানায়:

> নিশ্চয়ই আমাদের, শতবার আমাদের, হাজারবার আমাদের। ... আমার জন্ম এ দেশে, আমার বাপের জন্ম এ দেশে, আমার দাদার জন্ম এ দেশে, আমার চৌদ্দপুরুষের জন্ম এ দেশে, এ দেশ আমার নয় তবে কার? ... এ দেশের মাটির ফসল ও জলহাওয়া থেকে যেমন কেউ আমায় বঞ্চিত করতে পারে না, তেমনি অন্য সম্পদ থেকেও আমায় বঞ্চিত করার অধিকার কারো নেই। খদ্দর আমার দেশের জিনিস, দেশের সম্পদ। (আবুল ফজল ১৩৬৪ : ৮৪)

স্পষ্টতই কামালের রাজনৈতিক অবস্থান মহাত্মা গান্ধীর কংগ্রেসীয় রাজনৈতিক আদর্শের অনুগামী। এবং এই আদর্শ কামাল প্রাপ্ত হয়েছে তার আদর্শবাদী পিতামহ মির্জা এনামুল হোসেনের কাছ থেকে। কিন্তু তর্কের এই পর্যায়ে ইকবাল সাহেব 'ওরা'-'আমরা' তথা অপরায়ণ তত্ত্বের অবতারণা করে : 'অধিকার?

অধিকার কোথায় দেখা দেখলি বেটা? হাইকোর্টের চীফ্ জাস্টিস্ থেকে আরম্ভ করে পেয়াদা চাপরাশীর চাকরীটা পর্যন্ত ওরা দখল করে রেখেছে, খদ্দরের পয়সাও ত যায় ওদের পকেটে।' (আবুল ফজল ১৩৬৪ : ৮৪) আর এভাবেই বাংলার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিন্যাসে হিন্দু-মুসলমানের পুঞ্জীভূত সংকটের রূপটি নির্মাণ করেন ঔপন্যাসিক। সমাধান হিসেবে ইকবাল সাহেবের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় : 'এ অবস্থায় ওদের সঙ্গে আমরা পারব কি করে? তাইত আমরা চাই পাকিস্তান, স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র।' (আবুল ফজল ১৩৬৪ : ৮৫) অবচেতনেই অপরতাবোধের নিষ্ক্রমণের উপায় হিসেবে পাকিস্তান-ধারণার জন্ম নেয় মুসলিম জনমানুষের মধ্যে। যদিও এই ধারণার অবয়ব তখন পর্যন্ত ছিল অস্পষ্ট। উপন্যাসের পরের অংশে এই সংকটের ব্যাপকতা আরও নানা সংকটের অনুষঙ্গে উপস্থিত হয়। এদিকে হোসেন সাহেব তাঁর আদর্শে অবিচল। অসুস্থ হয়ে জীবনসায়াহ্নেও কামালকে ডেকে বলে:

> মুসলমানের মত আমাদের হিন্দু প্রজাও আছে আর আছে বহু হিন্দু প্রতিবেশী, দেখতেই পাচ্ছ আমাদের গ্রামেরই আশে পাশে বহু হিন্দুর বাস রয়েছে – তাদের প্রতি সুব্যবহার করবে, ন্যায় ব্যবহার করবে, কোন দিন কোন বৈষম্য দেখাবে না, চিরকাল তারা আমাদের সুখদুঃখের অংশ গ্রহণ করেছে, আমরা নিয়েছি তাদের সুখদুঃখের অংশ। ... শুনছি আজকাল শহরে নানা ফেরকা হয়েছে। কেউ কেউ নাকি হিন্দুর সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখতে চায় না, আবার কোন কোন হিন্দুও নাকি মুসলমানদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে চায়। এই সব থেকে দূরে বহু দূরে থাকবে। ইন্‌সাফ্, ইন্‌সাফ্ বড় কথা। আমাদের হজরত ইন্‌সাফের উপর বড় জোর দিয়েছেন। সকলের সঙ্গে ইন্‌সাফের সঙ্গে ব্যবহার করবে। (আবুল ফজল ১৩৬৪ : ৯৪-৯৫)

এনামুল হোসেন এই আদর্শ নিয়েই মৃত্যুবরণ করে। তার কাছে হজরত মোহাম্মদের বাণী 'হুব্বল ওতানু মিনাল ঈমান – স্বদেশপ্রেম ঈমানের অন্তর্গত' স্বাদেশিক চেতনার মূল ভিত্তি। এর সঙ্গে কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের চেতনার বিরোধ নেই বলেই সেই রাজনীতির প্রতি তার অনুরক্তি। এরই মধ্যে রায় পাড়ার চারুবাবুর সঙ্গে কামালের পরিচয় ঘটে। চারুবাবু পেশায় আইনজীবী, শহরে অবস্থান করে। অসহযোগ আন্দোলনে জেলখাটা চারুবাবু আরেক আদর্শায়িত চরিত্র। এনামুল হোসেন ইসলাম ধর্মাবলম্বী আর চারুবাবু হিন্দু ধর্মাবলম্বী – পার্থক্য এটুকুই; কিন্তু দুজনই উদারমানবতাবাদী, সদর্থক রাজনীতিতে বিশ্বাসী। চারুবাবুর কন্যা মায়া ও পুত্র মুকুলও সদর্থক ও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী এবং রুচিশীল। কিন্তু বাস্তবের দুনিয়ার হিন্দু-মুসলমানের রেষারেষির খবর চাপা থাকে না। আর এই রেষারেষিকে এনামুল হোসেন মনে করে 'মাতালের পাগলামী'। কারণ কোরানের সেই বাণীই তার অসাম্প্রদায়িক চেতনার মূল ভিত্তি : 'তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার। .. ধর্মে কোনো জবরদস্তী নাই।' (আবুল ফজল ১৩৬৪ : ১০৩) কারণ সম্প্রীতির উদাহরণ তার আশৈশব অভিজ্ঞতা। তাদের মসজিদ করার জায়গা যেমন দান করেছিল চারুবাবুর দাদা মশায়, তেমনি চারুবাবুর পিতার শ্রাদ্ধে

মির্জা পরিবার কয়েক মণ মাছ, সরু চাল ও কয়েকটি খাসি উপহার পাঠিয়ে সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। এমন সুন্দর উদাহরণ বাংলার সব অংশের বাস্তবতা না হলেও ঔপন্যাসিকের আদর্শায়িত চেতনার প্রকাশে এসব কাম্য দৃষ্টান্ত। কিন্তু চারুবাবুর কাছ থেকেই জানা যায় সমকালের উত্তপ্ত ঘটনাপ্রবাহ : 'কলকাতায় দাঙ্গায় হিন্দুরা জ্বালিয়েছে মসজিদ আর মুসলমানরা পুড়িয়েছে মন্দির।' (আবুল ফজল ১৩৬৪ : ১০৬) এটি বাংলার কেন্দ্রের বাস্তবতা। এদিকে প্রান্তেও হিন্দু পণ্ডিতের কণ্ঠে উচ্চারিত হতে থাকে : 'হিন্দুকে হিন্দু রক্ষা না করলে কে রক্ষা করবে?' কিন্তু আদর্শবাদী চারুবাবু মনে করে : 'হিন্দু নামের কলঙ্ক যারা তারাই আবার হিন্দুকে রক্ষা করবে? এরা আবার গীতা পাঠও করে? হিন্দুকে রক্ষা করার এ যদি উপায় হয় তা হলে হিন্দুর ধ্বংস হয়ে যাওয়াই ভালো।' (আবুল ফজল ১৩৬৪ : ১২৩) এই উচ্চারণে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ আছে। চারুবাবু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তার অবস্থান নির্মাণে প্রথমত নিজ সম্প্রদায়েরই সমালোচনা করেছে। আরও কয়েকটি ছোট ঘটনা এর সঙ্গে যুক্ত করা যায়। যেমন মুকুলের স্কুলে সাম্প্রদায়িকতার কবলে পড়া দরিদ্র মুসলমান ছাত্র য়ুনুসের বঞ্চিত হওয়ার ঘটনা শুনে চারুবাবু বলে : 'য়ুনুস ছেলেটা যদি এখন একটা কাট্টা মুসলিম লীগার হয়ে পড়ে তা হলে কি তাকে দোষ দেওয়া যায়? এভাবেই কি আমরা মুসলিম লীগার তৈরী করিনি ও করছি না?' (আবুল ফজল ১৩৬৪ : ১২৫-১২৬) এমন কয়েকজন আদর্শিক ব্যক্তি ধর্মের উর্ধ্বে উঠতে পারলেও উত্তাল সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আঘাতে তারা হয়েছে ক্ষত-বিক্ষত। অখণ্ড ভারতের বিভাজন তারা রোধ করতে পারে না। সাতচল্লিশ-পূর্ববর্তী এই সংকট সাতচল্লিশ-পরবর্তীকালে আরও তীব্র হয়ে ওঠে। সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় নিহত হতে হয় চারুবাবুকে। কামাল-মায়ার আদর্শায়িত জীবনেও নেমে আসে গভীরতর সামাজিক সংকট। বাইরের তরঙ্গক্ষুব্ধ রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে ভেতরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও দূরত্বকেও তারা বুঝে নিতে চেয়েছে। কামাল-মুকুল-মায়া সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অবস্থান সত্ত্বেও পরস্পরের দূরত্বকে চিহ্নিত করতে চেয়েছে। উত্তাপ ছড়িয়েছে কামালের অভিমানী কণ্ঠে:

> গেছ কোনদিন আমাদের বাড়ী? খেয়েছ কোনদিন কোন মুসলমান ... ?
>
> তাই ত, তাই ত। চমকে উঠল ভাই-বোন দুজনেই। কথাটা ত কিছুমাত্র মিথ্যা নয়। তাদের এই বয়স পর্য্যন্ত তারা কখনো কোন মুসলমান বাড়িতে খেয়েছে বলেই মনে করতে পারল না। যদিও তাদের চার পাশের অধিকাংশ প্রতিবেশীই মুসলমান।
>
> মায়ার পাল্টা প্রশ্ন : 'কোন দিন যেতে বলেছ? কোনদিন নিমন্ত্রণ করেছ খেতে?' (আবুল ফজল : ১৯৬)

এমন প্রশ্ন ও প্রতিপ্রশ্নের অবসান ঘটে মুকুলের স্বীকারোক্তিতে:

> মুকুলই হঠাৎ মৌনতা ভঙ্গ করে বলে উঠল : আমাদের সমস্ত দুর্ভাগ্যের জন্য সম্পূর্ণ এবং ষোল আনা আমরাই কি দায়ী নই? সুদীর্ঘকাল ধরে যে ইতিহাস আমরা রচনা করেছি, তারই ত এই পরিণতি! আমরা কি মানুষকে মানুষ হিসেবে স্বীকার করেছি? ... যেখানে দৈনন্দিন খাওয়া-পরাটা পর্য্যন্ত এক সঙ্গে চলে না, অতি সাধারণ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক বা স্বাভাবিক আত্মীয়তাটুকুও গড়ে উঠতে পারে না, সেখানে জাতি গড়ে উঠবে কি করে? (আবুল ফজল : ১৯৭)

লক্ষণীয় বিষয়, এই স্বীকারোক্তি একজন হিন্দু যুবকের কণ্ঠে উচ্চারিত হলো। ঐতিহাসিকভাবে বাংলা অঞ্চলে হিন্দু-আধিপত্যের বিপরীতে ঔপন্যাসিক এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন বলে মনে হয়। হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই উভয়কে জানতে পারলেই এই দূরত্ব নিরসন সম্ভব; সেই জায়গায় সুবিধাজনক অবস্থানে থাকা হিন্দুপক্ষকেই প্রথমে হাত বাড়াতে হবে – এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায় উক্ত উচ্চারণে।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, *রাঙ্গা প্রভাত* আবুল ফজলের আদর্শের ঔপন্যাসিক রূপায়ণ, যে আবুল ফজল 'অরাজনৈতিক সাহিত্যিক' (আনিসুজ্জামান ২০০৯ : ৫৮) হিসেবে পরিচিত। এখানে ঔপন্যাসিক চল্লিশের দশকের বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক তরঙ্গক্ষুব্ধ সময় ও চেতনাপর্বকে নির্বাচন করেছেন বটে, কিন্তু চল্লিশের দশকের রাজনৈতিক উত্তাপের চেয়ে বিশ ও তিরিশের দশকের 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র আদর্শকে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। পরবর্তীকালে প্রকাশিত (১৯৭২) *মানবতন্ত্রের* আবুল ফজলই এনামুল হোসেন-চারুবাবু-কামাল-মায়ার জীবনচেতনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। 'ধর্মের চেয়ে মানবতা বড়' (আবুল ফজল ১৯৭৯ : ৯) – এই সারকথা যে *রাঙ্গা প্রভাতে* প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তিনি *মানবতন্ত্রের* শুরুতে তার ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন। ফলে মির্জা এনামুল হোসেনের মতো কামাল আবুল ফজলেরও মানসপুত্র। তার মধ্য দিয়ে আবুল ফজল মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন। 'কামালের ব্যক্তিকথা প্রকারান্তরে বাঙালি মুসলমানের আত্মবিকাশের নিগূঢ় ইতিহাসের আশ্রয়েই গড়ে উঠেছিলো। জীবনবাদী ঔপন্যাসিক কামালের উত্তাধিকার-উৎস, মানস-সংগঠন প্রভৃতি প্রসঙ্গ সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করেছিলেন।' (রফিকউল্লাহ ২০০৯ : ৭৮) বাঙালি মুসলমানের রাজনীতির স্বরূপ অন্বেষায় এই বোধের যোগটিও গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তান-আন্দোলন বা দ্বিজাতিতত্ত্বের ধারণায় বাঙালি মুসলমানের অবস্থান যে আকস্মিক নয়; বরং মানবতাবোধের বিকাশের ধারার মধ্যেই সেই রাজনীতির বোধ সংস্থাপিত হয়, তা *রাঙ্গা প্রভাতে* অঙ্কন করতে চান আবুল ফজল। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উত্তাল পর্বেও প্রগতিশীল মুসলমানদের ইহলৌকিক ও মানবতাবাদী ধারার যোগ ওই সময়পর্বের সমগ্রতাসন্ধানে বিশেষ ভূমিকা পালন করে, এখানেই *রাঙ্গা প্রভাতের* রাজনৈতিক গুরুত্ব। অন্য বিবেচনায়, পাকিস্তান-

পর্বের আইয়ুবি দশকে চল্লিশের পাকিস্তান-আন্দোলনের উত্তাল সময় চিত্রণে এই সমন্বয়বোধের সংশ্লেষণ ঔপন্যাসিকের মানস-প্রবণতায় পাকিস্তানায়নের প্রভাবকেও বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে।

২.২.৪

রশীদ করীমের (১৯২৫-২০১১) *উত্তম পুরুষ* (১৯৬১) উপন্যাসে কলকাতার মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারে চল্লিশের দশকের রাজনীতির উন্মোচন রূপায়িত হয়েছে। একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে মধ্যবিত্ত মুসলমানের সামাজিক সাম্প্রদায়িক অবস্থান। ষাটের দশকে সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত মাসিক সমকাল পত্রিকায় যখন এই উপন্যাসের প্রতিটি পরিচ্ছেদ নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছিল, তখনই এই উপন্যাসের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ ওঠে। (সাযযাদ ২০১৩ : ২৬৪) কিন্তু উপন্যাস পাঠে দেখা যাবে ঔপন্যাসিক তাঁর শৈশব ও শ্রেণিবাস্তবতাকেই উপন্যাসের আধারে ধরতে চেয়েছেন। 'চেনাজানা গণ্ডির বাইরে কখনও তিনি এক পা-ও ফেলেননি, তেমনি পক্ষপাতদুষ্টতা ছিল না নির্দিষ্ট মতবাদের প্রতি, নির্মোহ এবং নিস্পৃহভাবে তিনি যেন ওপর থেকে তাকিয়ে জীবনকে যেভাবে দেখেছেন, সেভাবেই চিত্রিত করেছেন।' (হামিদ ২০১৩ : ১০) সময়ের বাস্তবতায় যদি উপস্থিত থাকে সাম্প্রদায়িকতার উপাদান, সেক্ষেত্রে সময়ের ভাষা হিসেবে উপন্যাসেও তার রূপায়ণ ঘটতে পারে। গল্পকথক শাকের তার বেড়ে ওঠার মধ্যে অনুভব করেছে সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বাস্তবতা। পড়াশোনা, সামাজিক অবস্থান, এমনকি খেলাধুলার ক্ষেত্রেও সে চিহ্নিত করতে পেরেছে তার ধর্মীয় পরিচয়। যেমন, সে যে ক্লাবের হয়ে ফুটবল খেলতো অর্থাৎ রেইনবো ক্লাব সেখানে দলের সে ছিল একমাত্র মুসলমান খেলোয়াড়। না চাইলেও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কারণে চিন্তার মধ্যে অনায়াসে ঢুকে পড়েছে মুসলমানিত্বের ধারণা। জরির টুপি, চুড়িদার পাজামা, শেরওয়ানি পরে ঈদের নামাজ পড়া, দোয়া পড়ে দাদির ফু দেওয়া, গলির মুখে খানকাহ্-পাকের সিড়িতে সিজদা দেওয়া – ইত্যাদির মধ্য দিয়ে কলকাতার মুসলিম জীবনের কিছু যাপিত ধর্মীয় অনুষঙ্গের পরিচয় পাওয়া যায়। আবার নাম নিয়েও পড়তে হয় সাম্প্রদায়িক তিরস্কারের। যদিও বিষয়গুলো বড় বিষয় নয়, তবে ছোট ছোট ঘটনাপুঞ্জই বড় ঘটনার দিকে নিয়ে যায় সম্প্রদায়চিহ্নিত মানুষগুলোকে। যেমন শাকেরের নাম নিয়ে সহপাঠী সুকান্ত বলে : 'তোর নাম শাকের কেন রে? তোদের নামগুলোই কেমন যেন বিদঘুটে। রোজ শাক খাই তাই তোর নামটা তবু কোনমতে মনে আছে।' (রশীদ ২০১৩ : ২৯) আবার আরেক ছেলে বলে ওঠে : 'মুসলমানদের নামগুলো মুখস্ত না করলে যদি কিছুতেই মনে না থাকে! আরে বাবা, বসে বসে যদি কতকগুলো নামই মুখস্ত করব তো হরিনাম দোষ করল কি।' (রশীদ ২০১৩ : ২৯) এভাবে সাংস্কৃতিক পার্থক্যগুলো গোষ্ঠীগত ও সম্প্রদায়গত ঐক্য তৈরি করে। আর ফলাফল হিসেবে তৈরি হতে থাকে

সাম্প্রদায়িক অপরতাবোধ। একই সমাজে একই শহরে পাশাপাশি বসবাস সত্ত্বেও থেকে যায় অপরিচয়ের সংকট। অধীত শিক্ষার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের অনেকের মধ্যে সেই অচেনার সংকট দূর করার চেষ্টা থাকলেও জগদ্দলের মতো সমাজে চেপে থাকা রক্ষণশীলতা থেকে সমাজ মুক্ত হতে পারে না। তাই দেখা যায় সহপাঠী সলিল শাকেরকে তার বাড়িতে দুপুরের খাবার গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেও একথা বলে নেয় শাকের যেন নিজেকে হিন্দু পরিচয় দেয়। অর্থাৎ বাহ্যত হিন্দু-মুসলমান আলাদা না করা গেলেও ধর্মীয় পরিচয়টি একটি বড় বিষয় তখন পর্যন্ত। কারণ সলিল এসবের বাছবিচার না করলেও তার মা গোঁড়া। এরপরেও সলিলের সাবলীল অসাম্প্রদায়িক ভাবনাস্রোতের প্রত্নকাঠামোতে সাম্প্রদায়িক চিন্তনক্রিয়া চাপা পড়ে না। সলিল বলে : 'তুই তো দেখতেও হিন্দুর মতো। কে বলবে বাঙালি নোস।' শাকের বলে : 'আমি বাঙালি নই কি রে?' সলিল বলে : 'বাঃ তুই তো মুসলমান!' (রশীদ ২০১৩ : ৪৭) এই উচ্চারণের মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্রের (১৮৭৬-১৯৩৮) *শ্রীকান্ত* (১৯১৭) উপন্যাসের (প্রথম খণ্ড) সেই বাঙালি বনাম মুসলিম বালকদের খেলাধুলার আদলে বৈষম্যের রূপটি অঙ্কন করতে চান ঔপন্যাসিক। কলকাতা শহরে এই বিভাজনের মনস্তত্ত্বই শেষপর্যন্ত দুই সম্প্রদায়কে বৃহত্তর রাজনীতির গভীরতর সংকটে পতিত করে। মুসলমান মধ্যবিত্তের সংখ্যালঘুর ধারণার আরও একটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। শাকের সহপাঠীদের পরিসরে পানিকে জল, আব্বা-আম্মাকে বাবা-মা, বড় ভাইকে বড়দা বলে সম্বোধন করে। স্কুলের মৌলভি এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে শাকেরের মনোলোক থেকে উৎসারিত হয় সময়ের বাস্তবতা:

> স্কুলের শতকরা পঁচানব্বই জন ছেলে হিন্দু। আমাদের মুখে আব্বা আম্মা ভাইজান এ-সব সম্বোধন শুনলে তারা সকলেই এমন বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে যে মনে হয় তারা যেন কস্মিনকালেও এমনধারা অসংস্কৃত উক্তি শ্রবণ করে নি। তারা যে নিজেরাই কেবল হতবুদ্ধি হয়ে যায় তাই নয়, তাদের সেই বোবা দৃষ্টি হতবুদ্ধি করেও দেয়। তবে এ-অপরাধে আমি একাই অপরাধী নই। স্কুলের সবকটি মুসলমান ছেলেই সমান দোষী। এক'শ জোড়া চোখের বিদ্রূপের মোকাবিলা মাত্র পাঁচজোড়া চোখ কি করে করবে। তাই দেখেছি, মৌলভী সাহেব পর্যন্ত পণ্ডিত মশাইয়ের সঙ্গে যখন বাক্যালাপ করেন তখন তাঁর জবানও বদলে যায়। তাঁকেই বা দোষ দেবে কে? স্কুল-গভর্নিং বডির সব কটি সদস্যই হিন্দু। মৌলভী সাহেবের চাকরির মায়া তো আছে। (রশীদ ২০১৩ : ৫৮)

তাই দেখা যায় কাবাব-পরটা খেতে চেয়েও পণ্ডিত মশাইয়ের ভয়ে ইচ্ছা পরিবর্তন করে মৌলভী সাহেব হালুয়া-পুরি দিয়ে সকালের নাস্তা সারে। ছাত্রদের নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রেও এমন কথা ওঠে – মৌলভি সাহেব নাকি শাকেরকে বেশি নম্বর দিয়েছে, কেবল মুসলমান হওয়ার কারণে। কারণ ওই স্কুলের মুসলমান ছেলেরা কখনো ভালো অবস্থান তৈরি করতে পারে না।

গোষ্ঠীগত ও বর্গগত বৈষম্যের বোধ নির্মাণ করে চরিত্রসমূহের ক্রিয়া ও চিন্তনের ভেতর দিয়ে ঔপন্যাসিক সময়ের সংকটটি প্রকাশ করতে চান। এক্ষেত্রে রশীদ করীম নিজে কলকাতার মধ্যবিত্ত শ্রেণির অংশ হওয়ায় সেই শ্রেণিকেই তর্ক-বিতর্কের কেন্দ্রে স্থাপন করেন; প্রান্তিক কণ্ঠস্বর এখানে অনুপস্থিত। উপন্যাসে দেখা যায় – মধ্যবিত্ত শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান উভয়পক্ষই স্ব স্ব অবস্থানের ভিত্তিকে জোরালো করতে চায় বিভিন্ন আসরে তর্ক ও বিতর্কের মধ্য দিয়ে। দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতার মধ্যেও উদযাপিত হয় অনিমার জন্মদিন-উৎসব। আমন্ত্রিত হয় হিন্দু মুসলমান সকল বন্ধু। শাকেরকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় উৎসাহী মুসলিম লীগার বলে। আলোচনায় এসে পড়ে পাকিস্তান-প্রসঙ্গ। আগত অতিথিদের মধ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসের ছাত্র ডি-কে বলে পরিচিত দিলীপ কুমার শাকেরকে আক্রমণ করে মুসলমানদের আত্মঅধিকারের প্রসঙ্গ তুলে। সে বলে : 'জানতে পারি কি, এই আত্ম বলতে আপনারা কি বোঝেন?' (রশীদ ২০১৩ : ১০৮) শাকেরের জবাব : 'আপনার প্রশ্নে "আপনারা" বলে যে সম্প্রদায়ের উল্লেখ করলেন, তাদেরকেই বুঝি। ... অর্থাৎ ভারতবর্ষে মুসলমান বলে যে জাতি আছে তাদেরকেই বুঝি।'

জাতীয়তার প্রশ্নে তাদের তর্কটি কথোপকথনের আদলে উপস্থাপন করা যেতে পারে:

: তেমন কোনো জাতি আছে না কি। ভারতবর্ষীয় বলে একটা জাতির উল্লেখ ইতিহাসে আছে বটে।

: যে ইতিহাস ইংরাজ আর হিন্দু লিখিত সেই ইতিহাসে!

: জিজ্ঞেস করি, এই আমাদের সঙ্গে – বোধকরি, 'কাফের' নামেই আপনি আমাদের ভালো চিনবেন – সে যাই হোক, এই অধমদের সঙ্গে আপনাদের পার্থক্যটা কোথায় যে পৃথক জাতিত্বের দাবি করছেন? ... আপনি বোধ করি জানেন, পঞ্চাশ ষাট বছর আগেও এখনকার মুসলমানই আর যাই থাকুক না কেন, ঠিক মুসলমান ছিলেন না।

: আমরা সৈয়দ – এবং আপনারা আমাদের এতই আপন যে সৈয়দ শব্দটির তাৎপর্য কি বোধ করি তাও জানেন না। ... বাঙালি মুসলমানেরা কয়েকপুরুষ আগেও অমুসলমান ছিলেন। হয়তো ছিলেন। কিন্তু তাঁরা হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন এ কারণে নয় যে হিন্দু-মুসলমান এক। পৃথক বলেই এক ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করবার প্রশ্ন ওঠে।

: আপনি কি বলতে চান, ধর্ম আলাদা হলেই জাতি আলাদা হয়।

: হ্যাঁ। অনেক সময় তাই হয়।

: দ্বি-জাতিতত্ত্বের একটা ভিত্তি থাকতে হবে তো। আপনাদের ভিত্তিটা কি? ... আপনাদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্যটা কোথায়?

: পার্থক্য সর্বত্র। একটা প্রমাণ দিতে পারি। এত বড় বাংলা সাহিত্য – অথচ মুসলমান জীবনের চিত্র কোথাও দেখতে পান?

: সে চিত্র তুলে ধরবার দায়িত্ব মুসলমান সাহিত্যিকদের, আমাদের নয়। আপনাদের জীবন সম্পর্কে আমরা ভালো জানি না।

: আমাদের জীবন সম্বন্ধে আপনারা ভালো জানেন না সে কথা খুবই সত্য। কিন্তু এ কথার আর একটি অর্থ এই যে আমাদের জীবন আপনাদের জীবন থেকে পৃথক, তাই জানেন না। তাই নয় কি? সুতরাং পার্থক্যটা যে-কোথায় আমাকে আর সে প্রশ্নের জবাব দিতে হবে না। তাছাড়া পার্থক্য বিশ্লেষণ আর ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, কারণ জাতিত্বের সর্বাধুনিক আর সর্বাপেক্ষা বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা অনুসারে কোনো এক দল লোক যদি নিজেদের এক বলে অনুভব করে তাহলেই তাদের এক পৃথক জাতি বলে স্বীকার করতে হবে। ভারতীয় মুসলমানরা তাই অনুভব করে।

: না! তারা তা করে না।

: আমরা নিজেরা শতবার শতরূপে বলছি আমরা আলাদা, আমরা স্বতন্ত্র, তবু আপনি বলবেন, আলাদা নই। আপনাদের এই হাস্যকর জেদের জন্যই আমাদের রাজনৈতিক অচলাবস্থার কোনো মীমাংসা হচ্ছে না। নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আপনারা খুব সৌভ্রাতৃত্বের কথা বলেন। (রশীদ ২০১৩ : ১০৮–১১০)

তাদের বিতর্ক থেকে চল্লিশের দশকে মুসলমানদের মধ্যে যে নবতর জাতিত্বের ধারণার জন্ম হয়েছিল, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এখানে এক পক্ষের কাছে যা কেবলই গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত, অন্য পক্ষের কাছে তা-ই জাতি বলে অভিহিত হচ্ছে। মুসলিম লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত সকলেই শাকেরের মতো জিন্নাহর মতবাদকে অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে। তাই শাকের শেষ পর্যন্ত সমর্পিত হয় জিন্নাহর আপাত সাম্যনীতির বক্তব্যের কাছে : 'পৃথক হলেই আমাদের শত্রুভাবাপন্ন হতে হবে, এমন কথা মনে করবার কোনো কারণই নেই। কায়েদে আযম বহুবার বলেছেন : Live and let live. পাকিস্তান হবার পর দুই রাষ্ট্রের মধ্যে পরম মিত্র ভাব গড়ে তোলা হবে, কায়েদে আযম সে আশাই করেন।' (রশীদ ২০১৩ : ১১১) জিন্নাহর বাহ্যত এমন উচ্চারণেই তৎকালীন শিক্ষিত মুসলমান তরুণসমাজ উজ্জীবিত হয়েছিল। তারা শান্তিই প্রত্যাশা করেছিল। তারা মনে করত, পাকিস্তানে হিন্দু-মুসলমান সকলেরই সমান স্থান হবে। কিন্তু মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবিকে সঙ্গে নিয়েই তাদের এই সাম্যচিন্তা ক্রিয়াশীল ছিল। এর সঙ্গে তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক জোয়ার প্রত্যক্ষভাবে ক্রিয়াশীল থাকলেও, পরোক্ষে বা গভীরতর অর্থে দীর্ঘদিনের অবদমন ও বৈষম্যের মনস্তত্ত্বটিই প্রধান, যা এই উপন্যাসেও ছোট ছোট ঘটনা থেকে জানা যায়। আলোচনার শেষে অনিমা স্বীকার করে নেয়:

তোমার মতের সাথে আমার মতের মিল নাই। কিন্তু আমি বলব তুমি তোমার বক্তব্য যোগ্যতার সঙ্গে নিবেদন করেছ। তোমাদের পাকিস্তান দাবীর পিছনে যে কেবল নেতিবাচক বিতর্ক আর মনোমালিন্যই নেই, বরং তার চাইতে অনেক গভীর আর মৌলিক জীবনাদর্শের প্রশ্ন জড়িত আছে, সে কথা আমার কোনোদিনই মনে হয় নি। (রশীদ ২০১৩ : ১১৩)

মধ্যবিত্ত তরুণদের এই বাহাস মূলত ওই কালপর্বে রাজনীতির প্রতি তাদের সক্রিয় সচেতনতার পরিচয় দেয়। স্পষ্টতই এখানে সম্প্রদায়কেন্দ্রিক জাতীয়তার প্রশ্নটি মুখ্য হয়েছে, শ্রেণির তর্ক ওঠেনি। এর কারণ – শ্রেণির বিবেচনায় *উত্তম পুরুষে*র চরিত্ররা প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত। 'শ্রেণী হিসাবে মধ্যবিত্তরা একইসঙ্গে সচেতন ও ভাবপ্রবণ। শ্রেণীচরিত্রের এই দ্বৈত বৈশিষ্ট্য শাকেরের চরিত্রেও লক্ষ্যণীয়। ... অতীত-প্রীতি নিম্ন-মধ্যবিত্তের আত্মাভিমানের নিকট দোসর; এবং সে হিসাবে শাকের ঐ শ্রেণীর যথাযথ প্রতিভূ।' (সিরাজুল ২০১৩ : ৩১) ফলে সহজেই ধর্মভিত্তিক বা সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যভিত্তিক রাজনীতি তাদের বেশি আকর্ষণ করতে পেরেছিল। যদিও তাদের কেউই অনুশীলনশীল (practicing) ধর্মচর্চাকারী নয়, কিন্তু দৃশ্যমান ছোট ছোট পার্থক্য পাকিস্তান-আন্দোলনের আনুকূল্যে বড় আকার ধারণ করে। এই শ্রেণি তত্ত্ব দিয়ে খুঁজেছে রাজনীতির সূত্র ও সম্ভাবনা। মুসলমানদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বিষয়ে শাকের মনে কোনো হীনমন্যতাকে প্রশ্রয় দেয় না। পাকিস্তান-আন্দোলন প্রশ্নেও তার অবস্থান স্পষ্ট। *উত্তম পুরুষ* উপন্যাসে অপরাপর বিষয়ের সঙ্গে রাজনীতির এই দিকটিতে মধ্যবিত্তমানসের স্বরূপটি উপলব্ধি করা যায়।

২.২.৫

আলাউদ্দিন আল আজাদের (১৯৩২-২০০৯) *ক্ষুধা ও আশা* (১৯৬৪) উপন্যাস মূলত চল্লিশের দশকের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত গ্রামীণ জীবন থেকে আগত জোহা ও তার পরিবারের অস্তিত্বসংগ্রাম ও জীবনের জয়-পরাজয়ের ইতিবৃত্ত রূপে রচিত হয়েছে। এর সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত হয় চল্লিশের দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সেই বাস্তবতায় বিভিন্ন পক্ষ-বিপক্ষ। কোনো কোনো চরিত্র নির্মাণে ঔপন্যাসিকের পক্ষপাতিত্ব আছে কিন্তু কালের বাস্তবতা অনুসন্ধানে ওই চরিত্রগুলোর রাজনৈতিক অবস্থানেরও যুক্তি আছে।

শহরে ভবঘুরে জীবনের একপর্যায়ে জোহার স্থান হয় মুসলিম লীগের নেতা ও আইনসভার সদস্য আলী মর্তুজা চৌধুরীর ঢাকাস্থ বাড়িতে, গৃহভৃত্য হিসেবে। সেই সূত্রে ওই পরিবারের অপরাপর সদস্য চৌধুরীপুত্র রেজা ও কন্যা লীনার সঙ্গে পরিচয় ঘটে জোহার। একই সঙ্গে লীনার বন্ধু মোহাম্মদ আলীর যাতায়াত ও তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে তার অবস্থানটিও চিহ্নিত করা যায়। মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে সখ্য গড়ে ওঠে সুজাতা ও তার পরিবারের। সেই সূত্রে সুজাতা, তার আইনজীবী পিতা অঘোর চ্যাটার্জী, ভাই অরুণ, পিসিমার সঙ্গে পরিচয়। এসব চরিত্রের কর্মতৎপরতায় এবং পারস্পরিক কথোপকথনে সেই সময়ের রাজনৈতিক অস্থিরতায় প্রত্যেকের শ্রেণি-অবস্থান স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমেই

বলা যাক, আলী রেজা চৌধুরীর কথা। তাকে ঔপন্যাসিক খানিকটা নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করেছেন। রেজা ধূমপায়ী, সে কথা বলে তুতলিয়ে এবং রাজনীতি করার উদ্দেশ্য হিসেবে থাকে মন্ত্রী হওয়া। এবং সে মুসলিম লীগের রাজনীতি করে। এটুকুতেই একজনের চারিত্র্য নির্ণয় করা যথেষ্ট নয়, অন্তত রাজনৈতিক চারিত্র্য বোঝার জন্য। অপরাপর মুসলিম লীগারদের মতো সেও কংগ্রেস বিরোধী এবং মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী। বিংশ শতাব্দীর রাজনীতির গতিধারা সম্পর্কে সে পূর্ণমাত্রায় ওয়াকিবহাল। তার মতে:

> কংগ্রেসী নেতারা জেল খাটতে পারেন, এবং তাঁরা পেট্রিয়টও বটে; কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে যদি কেউ দ্বিখণ্ডিত করে থাকে সেও তো তাঁরাই। গান্ধীজি এর মূল। তিনি কংগ্রেসকে হিন্দুয়ানির দুর্গে পরিণত করেছেন। (আলাউদ্দিন ২০১৩ : ৮৭)

এই প্রসঙ্গে উঠে আসে লক্ষ্ণৌ চুক্তি, অসহযোগ আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলনে কংগ্রেসের অবস্থানের প্রসঙ্গ। সে আরও বলে : 'আসলে – ইণ্ডিয়ার সংকট ইণ্ডিয়া ও ব্রিটিশের মধ্যে ততটা নয় যতটা আছে হিন্দু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে। পাকিস্তান স্বীকার করে না লওয়া পর্যন্ত কোন নিষ্পত্তি হতে পারে না, হবেও না।' (আলাউদ্দিন ২০১৩ : ৮৭) আর সে যেহেতু বুর্জোয়া রাজনীতিতে বিশ্বাসী, তাই বিপ্লবীদের প্রতি তার রোষ বেশি।

ওদিকে মোহাম্মদ আলী রেজাদের ছাত্র সংগঠনে যুক্ত থাকলেও সে রাজনৈতিভাবে বামপন্থি চিন্তায় আস্থাশীল। তাই বৃহত্তর জাতীয়তাবাদী রাজনীতির চেয়ে সে শোষিত মানুষের রাজনীতিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। সে নিরন্ন মানুষের খাবারের দাবিতে ভুখা মিছিল ও জনসভা করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু ক্ষমতায় তখন মুসলিম লীগ সরকার, খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী। ভুখা মিছিল বের করলে মুসলিম লীগের দুর্বলতা প্রকাশ পাবে। আর মুসলিম লীগের নেতৃত্বে সংঘটিত হতে থাকা পাকিস্তান-আন্দোলনের যৌক্তিতা নিয়েও প্রশ্ন উঠবে। এই বিবেচনায় দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় একের পর এক ব্যর্থ হওয়ার পরেও মুসলিম লীগ সরকার তাদের দায় স্বীকার করে না। একইভাবে তাদের অনুসারী রেজা-মজিদরা আলীর ভুখা মিছিলকে সমর্থন করে না। এই কারণে আলী মুসলিম লীগের রাজনীতি পরিত্যাগ করে এবং বেরিয়ে যাবার আগে সে তা অবস্থানের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে:

> অস্ত্রযুদ্ধে ফ্যাসিস্টদের আমরা হারাবো, কিন্তু মানুষকে বাঁচানো সবচেয়ে বড় যুদ্ধ। তোরা যদি বলিস ভুখমিছিল বার করলে, সহস্রকণ্ঠে বাঁচবার দাবির আওয়াজ তুললে তা মন্ত্রিসভার বিপক্ষে যাবে, সেক্ষেত্রে আমি জবাব দেবো আমরা কোনো মন্ত্রীর লেজুড় নই; আমরা আজাদীর সৈনিক, আমাদের স্বার্থ সমগ্র দেশের স্বার্থ, জাতির স্বার্থ। (আলাউদ্দিন ২০১৩ : ১১৯)

এখানে আলীর উচ্চারণের মধ্য দিয়ে একসময়ের সক্রিয় বামরাজনৈতিক আলাউদ্দিন আল আজাদের কণ্ঠস্বর অনুধাবন করা যায়। তবে এই উপন্যাস সেই সক্রিয়তার শব্দভাষ্য হয়ে ওঠেনি। এখানে রাজনীতির অনেকগুলো প্রান্তের মিথস্ক্রিয়া ঘটেছে।

আরেকটি চরিত্র অঘোর চ্যাটার্জী। প্রাজ্ঞ এই ব্যক্তি অনুধাবন করে ঘটমান রাজনীতির কার্যকারণ। অঘোরবাবুর বাড়িতে মুসলমান যুবক হয়েও আলীর ছিল সহজ যাতায়াত। কিন্তু সুজাতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও উগ্রসাম্প্রদায়িক শঙ্করের অযাচিত হস্তক্ষেপের ফলে অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে অঘোরবাবুর মুখোমুখি হয় আলী। আলী ধর্মীয় পরিচয়ে মুসলমান। আর মুসলমান জনগোষ্ঠী তখন পাকিস্তান-আন্দোলনের উত্তাল ধারায় প্রবাহিত। এমন পটভূমিতে আলীকে অঘোরবাবু জানায় হিন্দু-মুসলমানের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব-সম্পর্ক ও আসন্ন ভবিষ্যতের বস্তুবাদী কার্যকারণ:

> তোমরা পাকিস্তান পাচ্ছ, তার মানে ভারত ভাগ হয়ে যাচ্ছে আর আমরা হচ্ছি চিরতরে বিচ্ছিন্ন। ... হ্যাঁ আমরা কেউ কিছুছু করতে পারি না। না হিন্দু না মুসলমান না ইংরেজ। এ ইতিহাসের পরীক্ষা। হোয়াট বেঙ্গল থিংক্স টু-ডে ইণ্ডিয়া থিংক্স টুমোরো। মিথ্যে, মিথ্যে। অহমিকা, আত্মগরিমা। এর মূল্য আমাদের দিতে হবে। কিন্তু ধ্বংস ও মৃত্যুর শেষে মুক্ত স্বাধীন ভারতে বাঙালী পঙ্গু হয়ে থাকবে এযে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনা। আচ্ছা, তোমরা বাংলাকে, সমগ্র বাংলাকে পাকিস্তান বানাতে পারো না? ... না, না তোমরা তা পারবে না। তোমাদেরকে আমরা ঘৃণা করেছি, বলেছি জানোয়ার, পশু। তোমাদেরকে ম্লেচ্ছ নেড়ে আর যবন আখ্যায় ভূষিত করেছি। তোমরা আমাদের নেবে কেন, নিতে পারো না। তাইতো বেশি কিছু চাও না একতিল। তোমরা তোমাদের ভাগটুকু, প্রাপ্যটুকুই শুধু নেবে; এমনি প্রচণ্ড তোমাদের অভিমান! (আলাউদ্দিন ২০১৩ : ১১১)

'অঘোর চ্যাটার্জীর ইতিহাস-অন্বেষা ও আত্মবিশ্লেষণ-সূত্রে *ক্ষুধা ও আশা* উপন্যাসের জীবনার্থেও মৌল সূত্র উন্মোচিত হয়েছে।' (রফিকউল্লাহ ২০০৯ : ১৭৪) স্ত্রী মায়ার কাছে সে ব্যক্ত করে বাংলা অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে হিন্দু সম্প্রদায়ের অবস্থান, যা এক অর্থে আত্মবিশ্লেষণ ও গভীরতরভাবে আত্মস্বীকারোক্তি : 'মুসলমানদের আমরা কতটা প্রচণ্ড ঘৃণা করে এসেছি, সেই বক্তিয়ার খিলজির গৌড়বিজয়ের সময় থেকেই! যেখানে ভালো ব্যবহার করেছি সেখানে হয় আছে কোনো স্বার্থ আদায়ের চেষ্টা নয় কোন নিশ্চিত প্রতারণা।' (আলাউদ্দিন ২০১৩ : ১১১) ইতিহাসের এই বাস্তবতা চল্লিশের দশকের দুই পক্ষকে মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড় করিয়ে দেয়। ইতিহাসের স্বাভাবিক চলনে অঘোর এবং আলী উভয়ের সামনে পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠা অনিবার্য বাস্তবতা হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকে। এক পক্ষের কাছে স্বাধীনতার স্বপ্ন; অন্যজনের কাছে দেশহারানোর বেদনা, অপর হয়ে যাবার যাতনা। যদিও আলীর রাজনৈতিক লক্ষ্য কেবল পাকিস্তানের প্রতি নিবদ্ধ থাকেনি। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র জোহার বৃত্তপূরণে

এইসব রাজনীতিচেতনার বৈচিত্র্য উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক আলাউদ্দিন আল আজাদ মূলত কালের বৃত্তটিকে পূর্ণতা দিতে চেয়েছেন। উপন্যাস হিসেবে *ক্ষুধা ও আশা* খানিকটা কেন্দ্রচ্যুত হয়েছে, কিন্তু রাজনীতির শৈল্পিক প্রয়াসে অনেকখানি সার্থক হয়ে উঠেছে।

২.২.৬

শহীদুল্লা কায়সারের (১৯২৭-১৯৭১) *সংশপ্তক* (১৯৬৫) উপন্যাসে পটভূমি সামন্তমূল্যবোধ পরিস্রুত গ্রামীণ সমাজ। মুসলমান-প্রধান বাকুলিয়া ও হিন্দু-প্রধান গ্রাম হিসেবে তালতলি পরিচিহ্নিত হলেও ঔপন্যাসিক প্রথমত সমাজের শ্রেণির সংকটকেই প্রধান হিসেবে উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন; সাম্প্রদায়িকতাকে নয়। তাই উপন্যাসের শুরুতে দেখা যায় এক গ্রাম্য সালিশসভা, যেখানে সন্তানসম্ভবা তরুণী হুরমতির বিরুদ্ধে কথিত অনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিচার করতে দেখা যায় গ্রামের ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত ফেলু মিয়াকে। ধর্মীয় কুসংস্কার, নারীলাঞ্ছনা, দরিদ্র শ্রেণিকে শোষণ এই চিরায়ত কাঠামোর মধ্যেই বন্দি ছিল বাকুলিয়ার সমাজপ্রতিবেশ। লেকুর সঙ্গে রমজানের বিরোধ, ফেলু মিয়ার মোসাহেবগিরি, একই বংশের শিক্ষিত সেকান্দর মাস্টারের সঙ্গে বিরোধ – এ-সবই একটি সমাজের আর্থসামাজিক পরিস্থিতির স্বভাবগতির ফলাফল। অন্য আরেকটি পরিবার সৈয়দ পরিবার, ইসলাম ধর্মের অতীত ঐতিহ্য যাদের আত্মঅহমের একটি জায়গা। উভয় পরিবারের অনেক সদস্য গ্রামীণ জীবন থেকে শাহরিক জীবনে অভ্যস্ত, যারা তৎকালীন ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও কেউ কেউ চাকরিরত। ফলে সমাজ-অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মেই সামন্তমূল্যবোধও তখন পরিবর্তমান। কেবল শিক্ষা থেকে দূরে থাকা ভূমিনির্ভর ফেলু মিয়া এই সামন্ত অচলায়তনকে টিকিয়ে রাখতে চায়। সে অপর গ্রাম তালতলির রামদয়াল দত্তের সঙ্গে অর্থ-ভূমি-প্রতিপত্তি নিয়ে মানসিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। রামদয়াল ব্যবসায়ী মানুষ – তার গতি পুঁজির দিকে। ফেলু মিয়া ভূস্বামী – ভূমিতেই সে স্থির। ফলে এখানে শ্রেণি দুইটি। আবার একই গ্রামের একই ধর্মের হওয়া সত্ত্বেও ফেলু মিয়া, রমজান, লেকু-কসির, সেকান্দর মাস্টার ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে। অন্যদিকে মিয়া ও সৈয়দ পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও ধর্মীয় ও বংশীয় আভিজাত্যের দ্বন্দ্ব সেখানে বিরাজমান। 'বাকুলিয়ার আশি ঘর প্রজার মাঝে পঞ্চাশ ঘরই সৈয়দ অথবা মিঞাদের প্রজা।' (শহীদুল্লা ২০১০ : ৭২) এইরূপ শ্রেণিদ্বন্দ্বের বড় ভিত্তি হচ্ছে অর্থনৈতিক বিন্যাস ও কাঠামো। এমনই সমাজকাঠামোতে চল্লিশের দশকের বৃহৎ ভারতের রাজনীতি নতুন মাত্রা নিয়ে আবির্ভূত হয়। সমাজে শাসক-শাসিত-শোষক-শোষিত – এই বিন্যাসের মধ্যেও মানুষ জড়িয়ে যায় বৃহত্তর রাজনীতির জটিল সমীকরণে। চল্লিশের দশক এমন অনেক গ্রামীণ বাঙালি মুসলমানকে দেখায় স্বাধীনতার স্বপ্ন। কিন্তু এই স্বাধীনতার স্বরূপটি কেমন, তা অজানা ছিল

গ্রামীণ পরিসরের অনেক 'পরাধীন'-শোষিত শ্রেণির কাছেই। যেমন, এই গ্রামের হুরমতি-লেকু-আম্বরি কিংবা বালক মালু কাছে তা অচেনা। বাকুলিয়া গ্রামে স্বাধীনতার এই স্বপ্ন বয়ে নিয়ে আসে সুদূর আলিগড় ও কলকাতা থেকে সৈয়দপুত্র জাহেদ। জাহেদের স্বাধীনতার স্বপ্নের তাত্ত্বিক সূত্র কেন্দ্রীয় রাজনীতি থেকে প্রাপ্ত হলেও সে একে স্বসমাজের বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতের ওপরই স্থাপন করতে চায়। তার স্বপ্নের শুরুটা এমন – সেকান্দরকে সে বলে:

> ওই যে দেখছ দখিনের ক্ষেত। অজস্র খোপের মতো, হাজার আলের কাটাকুটি, ও সব থাকবে না। গোটা দক্ষিণ ক্ষেতে থাকবে বড় জোর চার পাঁচটা সীমানা। চাষ চলবে কলের লাঙ্গলে। ফসল উঠবে যারা চাষ করবে তাদেরই ঘরে। জমিদার-তালুকদার-মহাজনের খবরদারি চলবে না। ডায়নামো বসবে। বিজলি বাতি জ্বলবে গাঁয়ের ঘরে ঘরে। ক্লাব ঘর থাকবে, রেডিও থাকবে গাঁয়ে গাঁয়ে। স্কুল থাকবে প্রতি গ্রামে, কৃষকের ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া শিখবে বিনে মাইনেয়। (শহীদুল্লা ২০১০ : ১২৭)

এমন কল্পনা যে কাউকে মুগ্ধ করতে বাধ্য। জাহেদের উচ্চারণে পাওয়া যায় বিশ্বাসের দৃঢ়তা : 'স্বাধীনতা মানে ওই নতুন গ্রাম।' (শহীদুল্লা ২০১০ : ১২৮) 'লাহোর প্রস্তাব', 'দ্বিজাতিতত্ত্ব', 'পাকিস্তান-আন্দোলন' ইত্যাদি শব্দবন্ধ দিয়ে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের রাজনীতিকদের চরিতার্থতার উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন, গ্রামীণ ভিত্তিমূলের সামন্তপরিবারের এই শিক্ষিত মুসলমান তরুণের কাছে স্বাধীনতার প্রথমত ও প্রধানত অর্থ ছিল এই নতুন গ্রামের স্বপ্ন। এ-প্রসঙ্গে চল্লিশের দশকের রাজনীতির অন্যতম গবেষক আহমদ রফিক (২০১৫ : ১৭) বলেন:

> বঙ্গদেশে চল্লিশের দশকে রাজনীতির খেলা, লীগ কংগ্রেসের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব আর মোহাম্মদ আলী জিন্নার তথাকথিত দ্বিজাতিতত্ত্বের বাহারি পাকিস্তানি বেলুন যা দেখে মুগ্ধ বাঙালি মুসলমান। এ মুগ্ধতার পেছনে আসলে ছিল বিরাজমান আর্থ-সামাজিক বৈষম্য থেকে মুক্তির স্বপ্ন।

শহীদুল্লা কায়সার একজন পাকিস্তান-আন্দোলনের কর্মীর কণ্ঠে যে বস্তুবাদী উচ্চারণ করান, তাতে ঔপন্যাসিকের নিজস্ব আদর্শের যোগ আছে। তাই জাহেদের অবস্থান ও চিন্তার রূপান্তর হয়েছে দ্বন্দ্বময়। এই দ্বন্দ্বকে আরও ঘনীভূত করে উপন্যাসের আরেকটি চরিত্র – সেকান্দর মাস্টার; সে বাকুলিয়া গ্রামেরই সন্তান, তালতলি স্কুলের শিক্ষক। অর্থনৈতিক আভিজাত্য নেই তার; কিন্তু রাজনৈতিক উত্তরাধিকার আছে। জাহেদের নানা অর্থাৎ ফেলু মিয়ার বাবা বড় মিয়ার সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২১) অংশ নিয়ে সেকান্দরের বাবাও কারাবরণ করেছিল। অসহযোগ আন্দোলন ও খেলাফত আন্দোলনের যৌথতার কালে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় যেভাবে মিলিতভাবে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়েছিল, এর মতো বড় দৃষ্টান্ত আর পাওয়া যায় না। তাই জাহেদের সুন্দর-স্বপ্ন-গ্রামের আন্দোলনে যখন জেগে ওঠে হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব – স্বরাজ-স্বাধীনতার দ্বন্দ্ব – তখন সেকান্দরের অসাম্প্রদায়িক উত্তরাধিকারী মন

তাতে সায় দেয় না। বহিরাগত দ্বিজাতিতত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যালোচনায় না গিয়েও সেকান্দর বাস্তবতা দিয়ে অনুভব করে এর সীমাবদ্ধতা ও অপপ্রয়োগের আশঙ্কা। আর সেকান্দরের সামনে সাম্প্রদায়িক ভেদজ্ঞানের চেয়েও দৃশ্যমান শ্রেণিশোষণের বাস্তব চিত্র। সে দেখে কীভাবে প্রশাসনকে ব্যবহার করে ফেলু মিয়ারা লেকুদের পদানত করে রাখে, কীভাবে অর্থসংকটে পড়লে মহাজন রামদয়ালের কাছেই এরা শরণাপন্ন হয় এবং উচ্চ সুদে ঋণ নেয়, কীভাবে ফেলু মিয়াদের রিরংসার শিকার হয়ে তাদের দ্বারাই অন্যায্য শাস্তিগ্রহণ করতে বাধ্য হয় হুরমতিরা। তাই সেকান্দরের কাছে ধর্মের চেয়েও বড় মানুষ – মানুষের মুক্তি। কিন্তু বৃহত্তর আন্দোলনে জাহেদের কাছে সেসব গৌণ বিষয়ে পরিণত হয় : 'কার একটা ভিটি গেল, কার এক টুকরো জমি বেহাত হলো সেসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় এখন?' (শহীদুল্লা ২০১০ : ১৩৫) জাহেদ-সেকান্দরের তাত্ত্বিক ও আদর্শিক কথোপকথনে গ্রামীণ ভূমিকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থার সংকটগুলো প্রকাশিত হয়। সেকান্দরের কাছে মানুষের মুক্তি মানে 'রৌদ্রে যাদের ক্ষেত পোড়ে, ক্ষিধেয় যাদের পেট জ্বলে, অকালমৃত্যু যাদের কপালের লিখন – তাদের মুক্তি।' (শহীদুল্লা ২০১০ : ১৫৫) সকল মুসলমানকে যখন জাহেদ একই শ্রেণিতে ফেলতে চায়, তখন শ্লেষের অনুষঙ্গে সেকান্দর বলে : 'সৈয়দপুত্র তুমি, মাতুল ফেলু মিয়া আর লেকু, ফজর আলী তোমরা সবাই এক সারিতে, এক শ্রেণীতে বঞ্চিতের দলে, হা হা হা।' (শহীদুল্লা ২০১০ : ১৫৫)। শ্রেণি-সম্প্রদায়-জাতির প্রশ্নে সেকান্দর মীমাংসিত। জাহেদের বিবেচনায় মুসলমানদের শত্রু দুইটি – ইংরেজ আর হিন্দু মহাজন। জাহেদের 'মুসলিম লীগের সেন্টিমেন্ট, আলীগড়ের পড়াশুনা আর নিরন্তর স্বাধীনতার জয়গান নিশ্চিতই গ্রামীণ অর্থনীতির শ্রেণীশোষণের বাইরে একমুখী উপনিবেশবিরোধী মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রেক্ষাপট থেকেই এসেছে।' (শহীদ ২০০৩ : ৭২) সেকান্দরের বিবেচনায় ইংরেজ বিতাড়নই স্বাধীনতার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়; এর সঙ্গে সেখানে যোগ হবে শিক্ষা-জমি-রুটি-রুজি-জীবনের নিরাপত্তা। সেকান্দর চরিত্র সম্পর্কে রণেশ দাশগুপ্তের (২০১২ : ১৪৩) মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য:

> সেকান্দর মাষ্টার বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামেরই সাধক কর্মী চরিত্রের প্রতিভূ। সেকান্দর হচ্ছে সেই কর্মীদের একজন যারা মুক্তিসংগ্রামকে তার মহাবৈপ্লবিক বিশ্বপরিপ্রেক্ষিতেও পল্লী গ্রামের সাধারণ মানবমানবীর নিজস্ব অভিজ্ঞতালব্ধ সংগ্রাম বলে প্রমাণিত করেছে।

সেকান্দরের কাছে আজাদী বা স্বাধীনতার অর্থ ব্যাপক, গভীর ও সামূহিক:

> স্বাধীনতা একটি ব্যাপক, একটি সম্পূর্ণ চিন্তাধারা, একটি সামগ্রিক জীবনবোধ। জীবনের সব ক্ষেত্রেই এর রয়েছে একটা অর্থ, তাৎপর্য। সেটা হলো জাগরণ এবং পুনর্গঠন-নৈতিক-আধ্যাত্মিক, সামাজিক-অর্থনৈতিক-সর্বক্ষেত্রে। তার মানে সংগ্রামটা হবে কঠিন, দীর্ঘস্থায়ী, প্রস্তুতি চলবে ঘরে-ঘরে। (শহীদুল্লা ২০১০ : ১৭৫)

ভূমিঘনিষ্ঠ এই সচেতন ভূমিপুত্র সেকান্দর তাই দ্বিধাহীনভাবে উচ্চারণ করতে পারে : 'প্রথমে মানুষ, তারপর ধর্ম। মানুষের জন্যই তো ধর্ম।' (শহীদুল্লা ২০১০ : ১৫৬) এই সর্বমানবিক দার্শনিক উচ্চারণটিকে পুরো উপন্যাসের মর্মবাণী হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এই উচ্চারণের অব্যবহিত আগের কথোপকথন থেকে জাহেদের মনস্তত্ত্বটিও বুঝে নেওয়া যায়:

> সহসা দু'হাত বাড়িয়ে সেকান্দরের পথটা আগলে দাঁড়ায় জাহেদ, হাতের মুঠোতে চেপে ধরে ওর জামার গলাটা। তারপর তীরের মতো ছুড়ে মারে প্রশ্নটা, বলো, তুমি মুসলমান কি না?
>
> না।
>
> তবে তুমি কী?
>
> মানুষ।
>
> অপমানবোধে মুখটা লাল হয়ে যায় জাহেদের। তুমি কি বলতে চাও আমি মানুষ নই?
>
> না। তুমি মুসলমান।
>
> আলবৎ। আমি প্রথম মুসলমান তারপর মানুষ।
>
> ...
>
> আমি মুসলমান। আমি মুসলমান। এ পরিচয় আমার গৌরব, অগৌরব তো নয়ই। (শহীদুল্লা ২০১০ : ১৫৬)

মানুষ-বাঙালি-মুসলমান – এই ত্রিশঙ্কু জিজ্ঞাসা চল্লিশের দশকের বাঙালি মুসলমান তরুণদের করেছে ক্ষত-বিক্ষত এবং তারা শেষ পর্যন্ত ধাবিত হয়েছে মীমাংসাহীন উত্তরের দিকে, তৈরি হয়েছে মুসলিম জাতীয়তাবাদ। দ্বিজাতিতত্ত্ব উপরমহলের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তজাত হলেও এই নিভৃত গ্রামে কীভাবে দ্রুতই জনপ্রিয়তা পেয়ে গেল? এর জন্য কি উর্বর কোনো ক্ষেত্র সমাজকাঠামোর মধ্যেই সুপ্ত হয়ে ছিল? এমন প্রশ্নের উত্তর উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের শ্রেণি-অবস্থান ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উপন্যাসপাঠেই দেখা যাবে রামদয়ালের ব্যবসায়িক স্ফীতি। মিয়াদের এক সময়ের নায়েব রামদয়ালদের পূর্ববংশ নানা কসরত করে মিয়াদের সম্পত্তি করায়ত্ত করেছে বলে অভিযোগ ফেলু মিয়ার। ফলে দ্বন্দ্বের জায়গাটি অর্থনৈতিক। কিন্তু সেই দ্বন্দ্বকে সাম্প্রদায়িক খাতে প্রবাহিত করতে শক্তির যোগান দেয় দ্বিজাতিতত্ত্ব। আবার এই ফজর আলী-লেকুরা মিয়াদের দ্বারাই নানা অন্যায়-জুলুমের শিকার হয়। সেখান থেকে বাঁচতে তারা রামদয়ালেরও মহাজনি কারবারের শিকার হয়। আরেকটি প্রসঙ্গ ছোট কিন্তু অনুপেক্ষণীয় নয় – তা হলো মালুকে তালতলির শ্যামাচরণ দত্ত উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হলে সে স্বাভাবিকভাবে একদিন ক্লাসের প্রথম বেঞ্চে বসে। আর তা দেখে ভট্টাচার্যি বাড়ির যতীন ভর্ৎসনা করে বলে : 'ব্যাটা ম্লেচ্ছ, ফার্স্ট বেঞ্চে বসেছিস কেন? ঠেলে দিল সেকেন্ড বেঞ্চে।' (শহীদুল্লা ২০১০ : ১৩৮) আরেক সহপাঠী সুগ্রীব তাকে উপহাস করে 'নেড়ে' বলে। তখনও বালক মালুর কাছে অজানা 'ম্লেচ্ছ' বা 'নেড়ে' শব্দের অর্থ। কিন্তু সবাই একই স্বভাবের না। তাই দেখা যায়

রানু, অশোক এরা মালুকে গ্রহণ করে জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে। আরও একটি বিষয়, তা হচ্ছে দুই গ্রামের দৃশ্যমান অবয়ব। মুসলমান-অধ্যুষিত বাকুলিয়ার গঠন বিশৃংখল – সংকীর্ণ রাস্তা। অন্যদিকে তালতলি সুবিন্যস্ত, পরিপাটি; সেখানে বাড়ির সামনে ফুলের বাগান থাকে, ক্লাবঘর থাকে, মেলা বসে, গানবাজনা হয় এবং দুই গ্রামের একটি স্কুলও সেখানে। পরস্পর নিকটবর্তী এই দুই গ্রামের গঠনকাঠামো দুইয়ের অর্থনৈতিক অবস্থাকে নির্দেশ করে। আর অর্থনৈতিক বিন্যাসে যখন থাকে বৈষম্য, তখন ক্ষোভ ও বিসম্বাদ নানা উপায়ে প্রকাশিত হয় – এক্ষেত্রে হয়েছে সাম্প্রদায়িক চিন্তার অনুষঙ্গে। তাই নিস্তরঙ্গ গ্রামে সাম্প্রদায়িকতাজারিত 'স্বাধীনতা আন্দোলন' যে জোয়ার সৃষ্টি করেছিল, তা ছিল বাস্তবতাঃ

> গাঁয়ের মানুষ মসজিদের সুমুখে বসে তর্কের ওসিলায়। একটু গরম হয় ওরা। সেও কালে ভদ্রে। সহজে যেমন বিশ্বাস করে না ওরা, তেমনি সহজে তা বের হয় না ওদের মুখ দিয়ে, হুজুগ হাঙ্গামাকে বাপদাদার পরামর্শমতো দূরে রেখেই চলে ওরা। কিন্তু মনের বাতাসটা যখন দোলা দিয়ে ওঠে, ওরা তখন কালবৈশাখী, কোনো বাধা মানে না ওরা। এমনিতে ঠাণ্ডা রক্ত, কিন্তু সে রক্ত যখন চনচনিয়ে গরম হয়ে ওঠে ওরা তখন বেদিশা।
>
> সে ঠাণ্ডা রক্তের মানুষগুলো মেতে উঠল কি এক উন্মাদনায়। মেতে উঠল ফজর আলী। মেতে উঠল মৃধা বাড়ির সেই রহমত বুড়োও। গরুর গাড়িটা নিয়ে জাহেদের সাথে সাথে সেও পাড়ি দেয় এ গাঁ থেকে সে গাঁ। দুর্বল লেকু সেও বসে থাকতে পারে না। (শহীদুল্লা ২০১০ : ১৩৪)

এভাবেই উন্মাদনার মতোই নতুন স্বপ্ন – স্বাধীনতার স্বপ্ন – সাম্প্রদায়িকতার অনুষঙ্গে শহর থেকে গ্রামে কিংবা গ্রাম থেকে আবার শহরে গতিপ্রাপ্ত হতে থাকে।

সাম্প্রদায়িকতার যে বীজ গ্রামে ছিল অঙ্কুরিত অবস্থায় এবং অনেকটাই সহনীয়, তা শহরে বিশেষত নগর কলকাতায় মহীরূহ আকার নিয়ে উপস্থিত হয়। উপন্যাসে এর প্রত্যক্ষ শিকার হয় মালু। সেখানে রাজনীতি সক্রিয়। কিন্তু রাজনীতির বাইরেও সাম্প্রদায়িকতার চিহ্নগুলো দগদগে দৃশ্যমান। উদারচিত্ত অশোকের কলকাতার মেসবাড়িতে হিন্দু পরিচয়ে থাকা মালুর প্রকৃত পরিচয় বেরিয়ে আসলে কৃতঘ্ন মেস-সদস্যদের তীব্র সাম্প্রদায়িক আচরণ তার একটি বড় উদাহরণ। কিন্তু রাজনৈতিক সিদ্ধান্তহীনতার ফলে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস'-উত্তর সহিংসতা সম্প্রীতির সকল সূত্রকে ছিন্ন করে। পারস্পরিক অবিশ্বাস আর অনাস্থাই মানুষের সঙ্গী হয়ে ওঠে। 'নারায়ে তকবির – আল্লাহু-আকবর' কিংবা 'বন্দে মাতরম' শ্লোগানগুলো পরিণত হয় মৃত্যু-আবাহনী নিনাদে। হত্যা-লুটতরাজ, জ্বালাও-পোড়াও এসবই ছিল ওই সময়ের বাস্তবতা। মালুর দেখে : 'রাস্তা আর গলিতে গিস গিস মানুষের ভিড়। কারো হাতে লাঠি, কারো হাতে চেলা ফাড়বার ভোঁতা দা। কারো হাতে ইটের টুকরো। খবর পাওয়া গেছে ওদিক থেকে মুসলমানরা নাকি নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে এগিয়ে আসছে।' (শহীদুল্লা ২০১০ : ২৩৩) সে আরও দেখে :

'ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ঢেলার মতোই রাস্তাময় ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য মরা মানুষ।' (শহীদুল্লা ২০১০ : ২৩৮) ছেচল্লিশের 'গ্রেট কলকাতা কিলিং'-এর ভয়াবহতা ওই সময়পর্বের সকলকেই মৃত্যুময় অনিশ্চয়তায় পতিত করেছিল। *সংশপ্তকের* শহীদুল্লা কায়সার কেবল মৃত্যু বা পতনের কথাই বলেন না, এর থেকে উত্তরণের পথরেখাও চিহ্নিত করেন। মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ কর্মী জাহেদ ও রাবু দাঙ্গাবিরোধী কর্মকাণ্ডে – শান্তিমিছিল, রিলিফ বিতরণে নিয়োজিত হয়। তাদের যৌথ কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়ে পরস্পরের 'কমরেডশিপের' পরিচয় পাওয়া যায়। জাহেদের আভ্যন্তর-পরিবর্তনের সূচনাটাও তখন থেকেই। তত্ত্বের বিবর্তনও কাজের মধ্য দিয়েই সূচিত হয়। এই ঘটনাপর্বের পরেই জাহেদ যেন অনেকটা নিষ্ক্রিয়। সে আর তার পাকিস্তান-আন্দোলন নিয়ে সরব নয়। জাহেদের রাজনৈতিক চিন্তার বিবর্তনক্ষণ বলে ওই সময়কে চিহ্নিত করা যায়। যে মুসলিম জাতীয়তাকে নিয়ে সে একটি উন্নততর সমাজ নির্মাণ করতে চেয়েছিল, সেই জাতীয়তা ততক্ষণে সাম্প্রদায়িকতায় আক্রান্ত হয়েছে। ফলে সে বুঝে নিতে চেয়েছে সংকটের উৎস। উপন্যাসের পরবর্তী অংশে যখন তার প্রত্যাগমন ঘটে, তখন সে আরেক জাহেদ – শ্রেণিসচেতন জাহেদ। জাহেদের মূল লক্ষ্য ছিল বৈষম্যহীন সমাজ। চল্লিশের দশকের অপরাপর শিক্ষিত মুসলমান যুবকের মতো সেও সামনে পেয়েছিল পাকিস্তান-আন্দোলনকে। কিন্তু পাকিস্তান-আন্দোলন তার কাঙ্ক্ষিত সমাজ নির্মাণে ব্যর্থ হয়। ফলে যেখানে জনমুক্তি বাধাগ্রস্ত সেখান থেকে সে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। মূলত জনমুক্তিই প্রধান বিষয় – পাকিস্তানবাদ কিংবা পরবর্তীকালে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ বা তারও পরে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারণা ছিল সেই জনমুক্তি অর্জনের পরিস্থিতিগত অনুষঙ্গ।

শ্রেণিরাজনীতির প্রত্যক্ষ কর্মী ও শ্রেণিসচেতন ঔপন্যাসিক শহীদুল্লা কায়সার উপন্যাসে বাস্তবতার স্বরূপটি যুক্তিপরম্পরা দিয়ে উপস্থাপন করেন। নির্দেশ করেন সব পক্ষেরই কার্যকারণ সম্পর্কসূত্র। তাই জাহেদের অধীত তত্ত্বের বাস্তবতা দিয়ে যেমন সে-সময়ের বাস্তবতাকে আঁকেন, একই সঙ্গে যৌক্তিক কার্যকারণ সম্পর্ক দিয়ে সেকান্দর-মালু চরিত্রকে সৃষ্টি করেন। উপন্যাসে 'জাতিসত্তার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের মুক্তিচেতনা ঔপন্যাসিকের জীবনাদর্শের মৌল প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।' (রফিকউল্লাহ ২০০৯ : ১৭০) তাই দেখা যায় মুসলিম জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী জাহেদের বিশ্বাস হয় রূপান্তরিত এবং ক্রমরূপান্তরিত। জাতীয়তার প্রশ্নে জাহেদ-সেকান্দরের অবস্থান তৎকালীন সময়ের রাজনীতির প্রবণতা সম্পর্কে একটি যুক্তিগ্রাহ্য ধারণা পাওয়া যায়। একই সঙ্গে বৃহৎ রাজনীতিতে শ্রেণির স্ব স্ব অবস্থানও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

২.২.৭

সরদার জয়েনউদ্‌দীনের (১৯১৮-১৯৮৬) *অনেক সূর্যের আশা* (১৯৬৬) উপন্যাসের স্থানিক পটভূমি কলকাতা থেকে উত্তর ভারতের ল্যান্সডাউন শহর পর্যন্ত বিস্তৃত। এছাড়া চিঠিপত্র কিংবা খবরের মাধ্যমে এর ঘটনাক্রমে পূর্ববাংলার বিভিন্ন গ্রাম অঞ্চল ও বার্মাও আওতাভুক্ত হয়েছে। চল্লিশের দশকের উত্তাল রাজনীতির ঘটনাক্রম বিভিন্ন শ্রেণিচরিত্রের চিন্তনক্রিয়ায় কীভাবে ক্রিয়াশীল ছিল, তার একটি রেখাচিত্র এই উপন্যাসে পাওয়া যায়। সরদার জয়েনউদ্‌দীন ব্যক্তিজীবনে কলকাতার দারিদ্র্যময় মেসজীবন যাপন করেছেন এবং একসময় বিশ্বযুদ্ধে সৈনিক হিসেবেও কাজ করেছেন। নানা জাতিগোষ্ঠী শ্রেণিসম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। বাস্তব জীবনের অনেক ঘটনাই যে শিল্পের আধারে এই উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে, তা তিনি মুখবন্ধে জানিয়েছেন। উপন্যাস রচনায় তিনি নিয়েছেন ইতিহাসের শরণ। যদিও ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি সেই রাজনীতির ভাষ্যকার নন। তার রাজনীতি অনেকবেশি সমাজসাপেক্ষ। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়:

> সমাজ-পরিবর্তনের দীপ্র-আকাঙ্ক্ষা হয়তো তাঁর ছিলো না, কিন্তু যে-সমস্ত বিষয় সামাজিক শান্তি-স্থিতি-শৃঙ্খলাকে সংহত-সুন্দর অথবা বিনষ্ট করে তা অঙ্কনেও পরাঙ্মুখ ছিলেন না। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে লগ্ন হয়ে তিনি তাই তাঁর উপন্যাসে সমাজজীবনের সে-সব অসঙ্গতি চিত্রিত করেছেন, যা সময়ে-অসময়ে আমাদের অন্তর্জগৎ আলোড়িত করে, বিক্ষত ও বিপন্ন করে। (গিয়াস ২০১৯ : ৮৬)

আলোচ্য উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র রহমতের মধ্যে ঔপন্যাসিকের সেই আদর্শ ও অবস্থানের অনুরণন অর্থাৎ সামাজিক ও ঐতিহাসিক অনুষঙ্গে রাজনীতির গতিপ্রবাহ উপলব্ধি করা যায়। 'দেশভাগের প্রাক্কালে দেশপ্রেমের প্রবল আবেগ *অনেক সূর্যের আশার* ক্যানভাসে চিত্রিত।' (ফজলুল ২০০৮ : ১৬৬) চল্লিশের দশকে বাংলায় যখন লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে বাঙালি মুসলমানকে মুসলিম লীগ ঐক্যবদ্ধ করার অভিযানে নিয়োজিত, একই সঙ্গে তীব্র দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তর বিরাজমান সেই সময়পর্বে উপন্যাসের চরিত্র রহমত বাংলা থেকে দূরে একটি সেনাক্যাম্পে স্টোর কিপার হিসেবে চাকরিরত। এর মধ্যে কলকাতায় আসা-যাওয়া হয়েছে দুইবার। কিন্তু কলকাতার উত্তাল রাজনীতিকে প্রত্যক্ষ অর্থে দেখা হয়নি। এই রাজনীতিতে ব্যক্তির অবস্থান ও তার পেছনে কার্যকারণ নিরূপণে উপন্যাসের ঘটনাক্রম স্থাপিত হয়েছে কেন্দ্র থেকে দূরে। চল্লিশের দশকের রাজনীতি কেবল বাংলার বিষয় ছিল না; ছিল সর্বভারতীয় বিষয়। এর মাত্রাগত দিকও ছিল ব্যাপক। ফলে কলকাতা থেকে দূরে অবস্থান করেও একজন বাংলাভাষী মুসলমান যুবক তার আত্মপরিচয় ও জাতীয়তার প্রশ্নে একটি বহুজাতিক মিথস্ক্রিয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। একই সঙ্গে চাকরিসূত্রে কলকাতা অবস্থানকালে রহমতের অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রকাশিত হয়

তৎকালীন রাজনীতিতে চরিত্রসমূহের শ্রেণি-অবস্থান। যেমন একবালপুর মেসের ডক-শ্রমিক হায়াত খাঁ, যে সর্বতোভাবেই ব্রিটিশবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও ঔপনিবেশিকতাবিরোধী। বামপন্থি রাজনীতিতে সক্রিয় শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম এই নেতা প্রাথমিক পর্যায়ে লাহোর প্রস্তাবের সাম্প্রদায়িক আহ্বানে যুক্ত হতে পারেনি। সে মনে করতো – কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ভারতের দুই মধ্যবিত্তের স্বার্থসংরক্ষণকারী সংগঠন। ফলে ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাব বা ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড় আন্দোলন' কোনোটিতেই সে জনস্বার্থ বা শ্রমিকের স্বার্থরক্ষার বিষয়টি খুঁজে পায় না। তাই সে তার সঙ্গের রাজনৈতিক কর্মীদের জানায়:

> জিন্না সাহেব জানিয়েছেন, কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্টের সঙ্গে মুসলমানদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমি মনে করি শ্রমিকদেরও নেই। কেননা, শ্রমিক আর মালিকের গোলমালের সাথে কুইট ইন্ডিয়ার প্রস্তাবের কোনো আপোস হয়নি। একই সময় দুটো ঘটনা ঘটছে এই যা। আমরা শ্রমিকেরা যা চিন্তা করব, সে হচ্ছে জনসাধারণের কাজ। এর বিরুদ্ধে যে যাচ্ছে আমরা তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করব, জেহাদ করব, সে ব্রিটিশই হোক, কংগ্রেস রাজই হোক কিংবা মুসলিম লীগই হোক। বর্তমানে তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্বন্ধ থাকবে না। (সরদার ২০১২ : ১০১)

হায়াত খাঁদের এ আন্দোলন প্রকৃত অর্থে পরাধীনতার বিরুদ্ধে মুক্তির সংগ্রাম। এখানে সাম্প্রদায়িক বিভাজন নেই। কিন্তু চল্লিশের দশকের রাজনীতির বিচিত্র মাত্রা থাকায় হায়াত খাঁও মুসলিম লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে যায়। কমিউনিস্ট পার্টিও এক সময় পাকিস্তান-আন্দোলনকে সমর্থন দেয়। (সিরাজুল ২০১৬ : ৩৮-৩৯) তবে তার ভিত্তি কখনো সাম্প্রদায়িক ছিল না; ছিল অর্থনৈতিক, যা তার আন্দোলনের মূল ভিত্তি। তাদের সংগ্রাম ছিল গরিব মানুষের ডাল-ভাতের সংগ্রাম। ১৯৪২ সালের ক্রিপ্স্ মিশনের প্রস্তাবের বিপক্ষে মুসলিম লীগের বিশেষত জিন্নাহর অবস্থান শ্রমিক শ্রেণিকে নতুন ভাবনায় ভাবিত করে। তাই জিন্না সম্পর্কে হায়াত খাঁ নানার মন্তব্য:

> স্বাধীন পাকিস্তান দাবি থেকে তিনি একচুলও এদিক-ওদিক হবেন না। সেটা গরিব শ্রমিকের মরণ-বাঁচনের দাবি। জিন্নাহ্ সাহেবের সেই বক্তৃতা ও নারাজি আমাকে আবার তাঁর নীতি ও উদ্দেশ্যেও প্রতি আকৃষ্ট করে। (সরদার ২০১২ : ১১৭)

বোঝা যায় মুসলিম লীগ, জিন্না, লাহোর প্রস্তাব ইত্যাদির মূল ভিত্তি সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় বিবেচনা কার্যকর থাকলেও জনমানুষ, দরিদ্র, প্রান্তজন কিংবা শ্রমিক শ্রেণির কাছে সেগুলোর আলাদা আবেদন ছিল। কেবল ধর্মের আকর্ষণেই নয়, বাস্তব অর্থনৈতিক অবস্থা ও অবস্থান বিবেচনাতেও মুসলিম লীগের বিভিন্ন তৎপরতার সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ত থাকার কিছু বাস্তব ভিত্তি তৈরি হয়। তাই তথ্যের মতো করেই ঔপন্যাসিক কথক রহমতের মনোভাবনা থেকে জানিয়ে দেন : 'সারা মুসলিম ভারত আর

অসংখ্য অনুন্নত হিন্দু সমাজ আজ এ সমস্যাকে কেন্দ্র করেই জিন্নাহ্ সাহেবের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।' (সরদার ২০১২ : ১১৭) 'এ সমস্যা' হচ্ছে গরিব মানুষের ডাল-ভাতের সমস্যা। পাকিস্তান এমন একটি ধারণা ছিল, যা একেক শ্রেণির কাছে ছিল একেক রকম। পাকিস্তান ধারণার সুস্পষ্ট অবয়ব না থাকায় কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ একে একেকভাবে ব্যবহার করতে পেরেছিল। ফলে পাকিস্তান-ধারণা দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত শোষিত মানুষের মনে একটি 'স্বাধীনতার স্বপ্ন' এঁকে দিতে সক্ষম হয়েছিল – সাময়িক সময়ের জন্য হলেও। হায়াত খাঁর কাছে থাকা একটি বইয়ের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে ঔপন্যাসিক পাকিস্তান-ধারণার সেই শ্রেণিগত তাত্ত্বিক দিকটি উপস্থাপন করেন:

> এমন একটা দেশ হবে পাকিস্তান, যে দেশের জনগণ সবরকম অন্যায় অবিচার এবং শোষণ থেকে হবে মুক্ত, ব্যক্তিস্বার্থ, অদম্য লালসা এবং দারিদ্র্যের ভয় থাকবে না তাদের। এটা এমন দেশ হবে, যে দেশের অধিবাসীগণ অপরের শ্রমার্জিত অর্থ ভোগ না করে নিজে শ্রম করে অপরকে সুখে রেখে আনন্দ পাবে। যে দেশে সম্পদ এবং বড় ঘরে জন্ম মানুষের কোনোরূপ সহায়তা আনবে না এবং দারিদ্র্যও দেবে না কোনো প্রতিবন্ধকতা। যেখানে নগণ্য দরিদ্রের সন্তানও তার মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তি অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণের ও বড় হবার সুযোগ-সুবিধা পাবে। সে দেশে দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও কুশিক্ষার কোনো প্রবেশাধিকার থাকবে না। অসংখ্য কোটিপতির দেশ সে না হতে পারে; কিন্তু সে দেশে একটা লোকও অভুক্ত থাকবে না। (সরদার ২০১২ : ১১৮)

এ যেন স্বর্গরাজ্য– এক অদ্ভুত স্বপ্নলোক। এই স্লোগানধর্মী বিবৃতি যে কোনো শোষিত মানুষকে আকৃষ্ট করতে বাধ্য। ফলে হায়াত খাঁ সে দিকে ধাবিত হবে সেটা স্বাভাবিক। অথচ এই হায়াত খাঁ নিহত হয় 'স্বপ্নার্জিত' বাস্তব পাকিস্তানের স্বপ্নভঙ্গের কালে। এবং উপন্যাস শুরুই হয়েছে সেই তথ্য দিয়ে। হায়াত খাঁ সম্পূর্ণত অসাম্প্রদায়িক হওয়া সত্ত্বেও সে সাম্প্রদায়িক অপরাজনীতির শিকার হয়। পুরো উপন্যাস ফ্ল্যাশ-ব্যাকের পটভূমিতে রচিত। এই স্বপ্নভঙ্গের ইতিবৃত্ত রচিত হবে পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই। এই উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড *বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ* (১৯৭৫) উপন্যাসে সেই ইতিবৃত্ত জানা যাবে।

উপন্যাসের আরেকটি শ্রেণি হচ্ছে শিক্ষিত মুসলিম বাঙালি তরুণ। তাদের অবস্থান কলকাতায়। তখন 'মুক্তি' পত্রিকা কেন্দ্র করে পাকিস্তান-আন্দোলনের এক উন্মাদনা। 'মুক্তি' পত্রিকার স্বভাব-বৈশিষ্ট্য ও এর কর্মতৎপরতা দেখে বোঝা যায় এর দ্বারা তৎকালীন 'আজাদ' পত্রিকাকেই নির্দেশ করা হয়েছে। মাওলানা আকরাম খাঁ-র সম্পাদনায় 'দৈনিক আজাদ' ছিল মুসলিম লীগের অন্যতম মুখপত্র। 'মুক্তি' পত্রিকার একজন লেখক উপন্যাসের কথক রহমত। সেই সূত্রে কলকাতায় এসে মুক্তি পত্রিকার কার্যালয়ে গেলে কবি নিজাম, কাজী গিয়াস উদ্দীন, তরুণ হামিদ প্রমুখের সঙ্গে দেখা হয় রহমতের। কথোপকথন সূত্রে সময়ের উত্তাপ তথা মুসলমান বাঙালিদের প্রত্যাশিত স্বাধীনতার স্বরূপকে বুঝে

নেওয়া যায়। পাকিস্তান-স্বপ্নে বিভোর এই তরুণদের কাছে কংগ্রেস-মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলন পরিণত হয় অগ্রহণযোগ্য বিষয়ে। তারা তৎকালীন কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতা মাওলানা আবুল কালাম আজাদকে মুসলমান হয়েও কংগ্রেসের সঙ্গে থাকার সমালোচনা করে। তাদের আলোচনা-সমালোচনা-আড্ডা-গল্প সবকিছুর কেন্দ্রে থাকে পাকিস্তান-জিন্না ও 'স্বাধীনতা'। মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র গঠনের প্রশ্নে কংগ্রেসের নীতিগত বিরোধিতার মধ্যে তারা অনুসন্ধান করে সাম্প্রদায়িকতার ঐতিহাসিক পরম্পরা। এমনই একটি আলোচনায় হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি কাজী গিয়াসের তিরস্কারসূচক প্রশ্নবান ছুড়তে দেখা যায়:

> ভারতবর্ষের আজাদি আন্দোলনের প্রত্যেকটি ধাপে বিরোধিতা করেছো মুসলমানদের। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষতক তোমরা চেষ্টা চালিয়েছো, কী করে ইংরেজ জাতকে দিয়ে মুসলমানদের পর্যুদস্ত করা যায়। অত্যন্ত দুঃখের কথা – এটুকু পর্যন্ত বোঝনি যে ইংরেজকে এদেশ থেকে তাড়ানো মানেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ। ফকির বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, সর্বোপরি সিপাই বিদ্রোহ – এর প্রতি ক্ষেত্রেই খয়ের খাঁ হয়ে মাসতুতো ভাই হয়ে প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজের কোল ঘেঁষে এগিয়ে গিয়েছো, সে কিসের স্বপ্নে, কিসের আশায়? আজ আবার বুদ্ধিজীবী সেজে সেই একই চেষ্টাকে অন্য রূপে সাজিয়েছে। মুসলমানদের পিঠে হাত বুলিয়ে হিন্দু কংগ্রেসের পতাকা-তলে অর্থাৎ বলির যূপকাষ্ঠে নিয়ে যাবার চেষ্টায় মেতেছে। একটিও মুসলমান বেঁচে থাকা পর্যন্ত তা হতে পারবে না। পিঠে হাত বুলিয়ে হিন্দুরাজ কায়েম চলবে না। মুসলমানরা স্বতন্ত্র জাত, সে হিসেবে স্বতন্ত্র হবে তাদের দেশ, জিন্নাহ সাহেবের এ মর্মবাণী ভারতবর্ষে প্রতি মুসলমানের ঘরে প্রতিধ্বনিত হবে। (সরদার ২০১২ : ১২৪)

এর মধ্য দিয়ে মুসলমান তরুণদের মধ্যে পাকিস্তান ও সাম্প্রদায়িক চিন্তার তীব্রতা অনুমান করা যায়। মুসলিম লীগ-কর্মী হামিদের শৈশবের স্মৃতিরোমন্থনে গ্রামীণ সংস্কৃতিতে হিন্দু-মুসলমানের পাশাপাশি বসবাস সত্ত্বেও দূরত্ব ও অপরায়ণের সূত্রটির উপস্থাপন করেন ঔপন্যাসিক। সাম্প্রদায়িকতার বিষয়টি যে অধুনা কোনো বিষয় নয়; বরং বঙ্গীয় সমাজের কাঠামোতে সংস্কৃতির গুপ্তভাঁজে সুপ্ত হয়েছিল, তারও ইঙ্গিত আছে হামিদের শৈশবকথনে:

> আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা। আমাদের ওখানকার হিন্দুদের সবচেয়ে বড় উৎসব। পূজার অনেক আগে থেকেই যার আয়োজন হতো, দেশ-বিদেশ থেকে সবাই ছুটি পেয়ে মহা আনন্দ কোলাহলে বাড়ি আসতো, গ্রামখানা অলংকার ভারে আর রঙ-বেরঙের নতুন কাপড়ে ঝলমল করতো। তারপর পূজোর তিন চারটি দিন সে কী যে মহা আনন্দের তোলপাড়, ঢাক-ঢোল – আর ধূপ-ধূনায়, হুলুধ্বনি আর জাঁকজমকে হৈ হৈ করে হেসে উঠতো গ্রাম। আমরা শুধু অচ্ছুৎ হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে ওদের আনন্দ দেখেছি। কিন্তু গাঁয়ের আনন্দে অংশগ্রহণ করতে পারিনি। (সরদার ২০১২ : ১২৬)

শহর-কলকাতায় সাম্প্রদায়িকতা তখন ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে থাকে। সম্প্রদায়চেতনা যদিও পুরোনো বিষয়; কিন্তু এটা যে পারস্পরিক স্বার্থমূলক বিরোধের দিকে চলে যাচ্ছে, তা চল্লিশের দশকের শুরু থেকেই দৃশ্যমান হতে থাকে। কলকাতা শহরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দোকানের নামে সাম্প্রদায়িক শব্দের ব্যবহার বাড়তে থাকে। ঔপন্যাসিকের ঝোঁক অবশ্য পাকিস্তান-আন্দোলনের দিকেই। রহমতকে ঔপন্যাসিকের মানসচরিত্র মনে করলে অন্তত তাই মনে হয়। তার শ্রেণি-অবস্থান সেদিকেই তাকে ধাবিত করে। কিন্তু পাকিস্তান প্রশ্নে সে অন্ধ নয়। তাই জাতীয়তা বিষয়ক ধারণার জন্য রহমতকে স্থাপন করা হয় উত্তাপের কেন্দ্র থেকে দূরে। ল্যান্সডাউনে পাঞ্জাবের অধিবাসী মুসলমান সৈনিক ফজলুল করিমের তীব্র ধর্মীয় স্বজাত্যবোধ, গোবিন্দ বল্লভের সঙ্গে ধর্মীয় রাজনীতি বিষয়ক তর্ক এবং রহমতের সঙ্গে জীবনযাপনের আভ্যন্তর বৈভিন্ন্য – এসবের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান-আন্দোলন, মুসলিম জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে রহমত একটি ভারসাম্য অবস্থায় উপনীত হয়েছে। ফজলুল করিম সম্পর্কে রহমতের ভাবনা:

> ওকে মিলিয়েই আমরা দু'জনই মাত্র ল্যান্সডাউন হাসপাতালে মুসলমান বাবু আর সবাই হিন্দু। তাই আমরা দু'জনই এক রুমেই নিশি যাপন করি। ধর্মের কি বাঁধন! কোথায় পাঞ্জাব আর কোথায় বাংলাদেশ, এদের দুটি মনকে এক করে বেঁধে দিলো, আলাপ না জমতেই বন্ধুত্ব না গড়তেই। এমন যে, একটায় টঙ্কার দিলে আর অমনি বাজে। যদিও খাবার সময়ে সে গেঁহুর রুটি আর চানার ডাল নয় তো খাসি কা গোশ্ পেলে বেহেশতের মেওয়া হাতে পায় আর সেসব আমার গলা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে চায় না। আমি চাই দুটো গরম ভাত, আর একটু মাছের ঝোল। যা সামনে এলে ওর গা ঘিন ঘিন করে বমির বেগ লাগে। (সরদার ২০১২ : ১৪২)

স্পষ্টতই ধর্ম অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও খাদ্যাভ্যাস ও রুচিগত স্বাতন্ত্র্য দুই জনের মধ্যে সাংস্কৃতিক পার্থক্যকে নির্দেশ করে। রহমত নিজেও উপলব্ধি করতে পারে তারা এক জাতির মানুষ নয়। তাই রহমতের চিন্তাপ্রবাহে বয়ে যায় : 'আমি বাংলাদেশের মানুষ তাই বাঙালি, ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস আছে, এক আল্লা মানি, রাসুলে মোহাম্মদের তরিকায় দীক্ষিত, অতএব মুসলমান।' (সরদার ২০১২ : ১৪২-১৪৩) চল্লিশের দশকে বাঙালি মুসলমানের জন্য এ ছিল এক বড় দ্বিধা। কিন্তু ঔপন্যাসিক কালের কথা রূপায়ণ করতে গিয়েও কালোত্তর চেতনাকে উপন্যাসে সংশ্লেষিত করেন। তাই তার এই মীমাংসিত ভাবনাস্রোতকে আদর্শায়িতই মনে হয়। বরং ফজলুল করিমের পরবর্তী উক্তিটি বাঙালিদের সম্পর্কে অপরাপর জাতির মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের মনোভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে : 'বাঙালি তো হিন্দু হ্যায়!' (সরদার ২০১২ : ১৪৩) এমন বাক্যবাণে জর্জরিত হয়ে যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে আটকে গিয়েছিল ওই সময়ের মুসলমান বাঙালি। বৃহৎ ভারতে কংগ্রেসের এক জাতি-নীতির বিপরীতে জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্ব মুসলমানদের আকৃষ্ট করে। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীও ইতিহাসের ব্যাখ্যায় এমন অভিমত ব্যক্ত করেন:

> কংগ্রেস দাবী করতো ভারতবর্ষে তখন দু'টি পক্ষ ছিল, ব্রিটিশ ও কংগ্রেস। জিন্নাহ বলেছেন দু'টি নয়, পক্ষ আসলে তিনটি, ব্রিটিশ, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ। তাঁর রণনীতি দাঁড়ালো মুসলমানদেরকে একটি স্বতন্ত্র পক্ষ হিসেবে দাঁড় করানো, এবং সম্প্রদায় নয়, স্বতন্ত্র জাতি বলে চিহ্নিতকরণ। (২০১৬ : ২৩১)

এটি কেবল তত্ত্বের জায়গাতে সীমাবদ্ধ থাকে না। যেমন ফজলুল করিমকে একইসঙ্গে ইংরেজবিদ্বেষী তারচেয়েও বেশি হিন্দুবিদ্বেষী হিসেবে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। বাংলা অঞ্চলে মুসলমানদের মধ্যে জিন্না-প্রীতি ছিল, কিন্তু পাঞ্জাব অঞ্চলে তার ছিল তীব্র রূপ। পাকিস্তান-ধারণার পেছনেও বাংলা অঞ্চলে সাম্প্রদায়িকতার চেয়ে অর্থনৈতিক শ্রেণির বিষয়টি মুখ্য ছিল। কিন্তু ভারতের অন্যত্র তা তীব্র জাতিবিদ্বেষ ও সম্প্রদায়বিদ্বেষে রূপ নেয়। ফজলুল করিমের উচ্চারিত বচন ও দেহভঙ্গি দেখে অন্তত তা-ই মনে হয়। ঔপন্যাসিক বিদ্বেষের এই পটভূমিটি বাংলা অঞ্চলের বাইরে রূপায়িত করে বিদ্বেষের মাত্রাকে তীব্রতা দান করতে সক্ষম হয়েছেন। জিন্নাহর সমালোচনা করে একদিকে গোবিন্দ বল্লভ যেমন বলে : 'জিন্নাজিই আংরেজকা ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসির অন্ধ সমর্থক এবং সেজন্যই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়ী হতে পারেছে না।' (সরদার ২০১২ : ১৬৫) অপরদিকে ফজলুল করিম বলে : 'মহাত্মা গান্ধীও মানুষ নয় – একজন হিন্দু, একজন গোঁড়া হিন্দু।' (সরদার ২০১২ : ১৬৬) ফজলুল করিমের তর্কও তেমনি আক্রমণাত্মক। তবে রহমত তার আক্রমণের সহগামী না হলেও উপন্যাসে বয়ানে সে যেন সেই আক্রমণাত্মক তর্ককে উপভোগ করে। গোবিন্দ বল্লভ তর্কে পরাস্ত হলে রহমত খানিকটা আরাম বোধ করে। সেই অনুভূতি কৌশলে নিজের মাধ্যমে প্রকাশ না করে বিষ্ণু চরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে। বিষ্ণু চরণ এদের সকলের বয়সে ছোট এবং জাতিতে শূদ্র। বর্ণাশ্রম বিষয়ক তর্কের এক পর্যায়ে রহমত জানায় : 'চেয়ে দেখলাম, গোবিন্দ বল্লভের সেই অমিত দেশ ভক্তির তেজ থেমে এসেছে, বিষ্ণু চরণের মুখে যেন নতুন বিশ্বাসে উল্লসিত হয়ে উঠছে।' (সরদার ২০১২ : ১৬৭) রহমত যেন একটু দূরে অবস্থানের মধ্য দিয়ে ফজলুল করিমের তর্কসূত্রে সাম্প্রদায়িকতার সূত্রটি উন্মোচন করতে চায়:

> কংগ্রেস সারা ভারতে হিন্দু রাজত্বের স্বপ্ন দেখে, সেটা কমিউন্যাল না, আর আমরা যারা মুসলিম-প্রধান উত্তর এবং পূর্বাঞ্চলের সামান্য অংশে হিন্দু শাসনের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বকীয় আজাদির কথা বলি, তখন আমরাই হই কমিউন্যাল। বাহবা! (সরদার ২০১২ : ১৬৮)

অর্থাৎ এখানে দেখা যায় – সাম্প্রদায়িকতা দিয়ে সাম্প্রদায়িকতাকে খণ্ডন করার চেষ্টা। এর ফলাফল ভালো হয়নি। এ-ধরনেরই একটি তর্কযুদ্ধ একসময় হাতাহাতিতে রূপ নেয়। গুরুতর আহত হয় গোবিন্দ বল্লভ। সামরিক আইনে বিচার হয় ফজলুল করিমের। এবং তাকে জেলে যেতে হয়।

রহমতের জীবনেও আসে নানা মাত্রিক পরিবর্তন। বন্ধু সাজার স্ত্রী লুসি সাইপ্রিনের হঠাৎ লেন্সডাউনে আগমন, রহমতের আতিথ্য গ্রহণ; অতঃপর প্রণয়সম্পর্কে রহমতের সাড়া না পেয়ে ল্যান্সডাউন ত্যাগ – এসব ঘটনা ব্যক্তি-রহমতের মধ্যে মানুষ-নারী সম্পর্কে ধারণার নতুন নতুন মাত্রা যোগ করে। একসময় কল্যাণ নামক স্থানে এক মাতৃসদনে কর্মরত থাকতে দেখা যায় মিস সাইপ্রিনকে। এরপর রহমতের বদলি হয় কলকাতায়। সাইপ্রিনকেও সে কলকাতায় নিয়ে আসে। শুরু হয় রহমতের নতুন কলকাতা-জীবন। রহমতের এই কলকাতা বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ববর্তী কলকাতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিশেষত রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ, রাজনীতি বিষয়ে বোধের পরিবর্তন ও রাজনৈতিক কর্মযজ্ঞ তৎকালীন কলকাতার নাগরিকদের অনিবার্যভাবে রাজনীতিসচেতন করে তোলে। এবং এই রাজনীতি ক্রমে পরিণত হয় সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে। রাজনীতি থেকে দূরে থাকা মানুষগুলোও পরিণত হয় সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মীতে। এর মধ্যে একই রাজনৈতিক চিন্তার মানুষের মধ্যেও দেখা যায় আদর্শিক দ্বন্দ্ব।

১৯৪৪ সালের ডিসেম্বরে রহমত ও সাইপ্রিন কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে। বন্ধু সাজাকে না পেয়ে হেনার মা ঝির আশ্রয়েই রাখা হয় সাইপ্রিনকে। হায়াত খাঁ তখন বামপন্থি রাজনীতি থেকে মুসলিম লীগের রাজনীতিতে সক্রিয়। এর ইঙ্গিত অবশ্য আগেই ছিল রহমতের কাছে পাঠানো হেনার মার চিঠিতে। হায়াত খাঁর সংগ্রাম ছিল শ্রমজীবী দরিদ্র মানুষের জন্য অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। মুসলিম লীগ সেই সংগ্রামে হায়াত খাঁকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল। তার মধ্যে যদিও সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য অনুপস্থিত ছিল, কিন্তু তার সাথের কর্মী হেনার মা ঝির চিঠি থেকে সাম্প্রদায়িক আবহ অনুমান করা যায়:

> তোমার নানা মুসলিম লীগের লোকজনদের সাথে আজকাল খুব উঠবোস করছে, আমার তাতে ভালোই লাগে। নিজের জাতের কথাই আলাদা। ধর্মের টান একটা আছে তো সেটা যাবে কোথায়! (সরদার ২০১২ : ২০৬)

চল্লিশের দশকে এভাবেই মুসলিম লীগ তার শক্তি বৃদ্ধি করতে পেরেছিল। অন্যদিকে মুসলিম লীগের রাজনীতির ভেতরেও রক্ষণশীল ও উদার – দুই ধারা ছিল। তাই দেখা যায় পুঁজিপতিদের পরিচালনায় 'মুক্তি' পত্রিকার মালিকের সঙ্গে লেখা চুরি নিয়ে নিজামের সংঘাত, সহযোগী সম্পাদক গিয়াস উদ্দীনের চাকরিচ্যুতি এসব ঘটনা পাকিস্তান-আন্দোলনের ভেতরকার পক্ষ-বিপক্ষ সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়। এরপর রহমত কলকাতায় নিজাম-গিয়াসের সন্ধানসূত্রে সন্ধান পায় কলকাতার ধর্মতলায় 'নতুন দিন' পত্রিকার। উপন্যাসের 'নতুন দিন' পত্রিকার কর্মতৎপরতার সঙ্গে বাস্তবের তৎকালীন 'মিল্লাত' পত্রিকার সাযুজ্য পাওয়া যায়। ঔপন্যাসিকের ভাষ্যে 'নতুন দিনে'র অফিস পরিণত হয়েছিল পাকিস্তান-আন্দোলনের এক নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্রে। ওই সময়ের তরুণ মুসলিম লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান

(২০১৪ : ৪০) তাঁর আত্মকথনে 'মিল্লাত' পত্রিকা সম্পর্কে যা লিখেছেন, তা থেকেও 'নতুন দিন'কে 'মিল্লাতে'র প্রতিরূপ ভাবা যায়:

> মুসলিম লীগ অফিসের নিচের তলায় অনেক খালি ঘর ছিল। তাই জায়গার অসুবিধা হবে না। হাশিম সাহেব নিজেই সম্পাদক হলেন এবং কাগজ বের হল। আমরা অনেক কর্মীই রাস্তায় হকারী করে কাগজ বিক্রি করতে শুরু করলাম। ... বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কাছে কাগজটা খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করতে লাগল। হিন্দুদের মধ্যেও অনেকে কাগজটা পড়তেন। এর নাম ছিল 'মিল্লাত'।

উপন্যাসেও দেখা যায় – নিজাম-গিয়াস-হামিদের মতো তরুণ বুদ্ধিজীবীদের পাশাপাশি তরুণ চিত্রশিল্পী ভীমরুল-জামরুলের সঙ্গে রহমতের পরিচয় ঘটে। অব্যবহিত পূর্ববর্তী মন্বন্তর সত্ত্বেও মুসলিম লীগ তৎকালীন বাঙালি মুসলমানের একমাত্র রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। জিন্নাহ্‌র আহ্বানে গড়ে ওঠে মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড। শুধু পুরুষ নয়, শিক্ষিত নারীরাও মুসলিম লীগে মহিলা ন্যাশনাল গার্ড তৈরি করে। তাদের পারস্পরিক কথোপকথনে নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতা আঁচ করা যায়। যেমন কাজী গিয়াস বলে : 'মুসলিম লীগ বাংলাদেশে মানুষের চিত্ত এমনভাবে জয় করতে পারবে তা কেউ কখনো ভাবতে পারে নাই।' (সরদার ২০১২ : ২৪৩) কবি নিজাম জানায় : 'আসলে মানুষের মনটাই অমন আজাদি-পাগল হয়ে উঠেছে। জিন্না সাহেব উপলক্ষ মাত্র।' (সরদার ২০১২ : ২৪৩) এটাই হয়তো প্রধান বাস্তবতা এবং বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমানদের পাকিস্তান-আন্দোলনের প্রতি ঝুঁকে যাওয়ার অন্যতম কারণ। দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে মুক্তির স্বপ্নই বাঙালি মুসলমানের কাছে স্বাধীনতার স্বপ্ন। শুধু মুসলমানিত্ব নয় বরং এর সঙ্গে বৈষম্যের যুগ্মতায় সেই আন্দোলন একটি সামূহিক রূপ লাভ করে। ফুলকুড়ি আন্দোলনের কর্মী সমগ্র বাংলাদেশ চষে বেড়ানো ভীমরুল জানায় : 'কী বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, কী যুবক, কী যুবতী, এমনকি স্কুল-পাঠশালার ছেলেরা তক আজাদি আন্দোলনে মাতাল হয়ে উঠেছে, তা লক্ষ করেছি। তার মধ্যে খুব কমজনই জিন্না সাহেবকে জানে বা চেনে।' (সরদার ২০১২ : ২৪৩) পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে – জিন্নাকে চেনা জানার চেয়েও যাপিত জীবনের বৈষম্যমুক্তি, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বশাসিত হবার প্রত্যাশাই বৃহত্তর মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে একধরনের জোয়ার তৈরি করেছিল। তারই প্রাতিষ্ঠানিক নাম পাকিস্তান-আন্দোলন। ওই আলোচনায় ওস্তাদজি কণ্ঠে যেমন প্রকাশ পায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য তার অত্যাগ্রহ : 'আমি বুঝতে পারছি, পাকিস্তান কায়েম হবার আর বেশি দেরি নেই। কেননা, মানুষ যখন তার ন্যায্য অধিকার বুঝতে পারে, তখন এ দুনিয়ায় কারো সামর্থ্য নেই সে অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করে।' (সরদার ২০১২ : ২৪৩-২৪৪) অর্থাৎ পাকিস্তান-আন্দোলনকে তারা বিবেচনা করে ন্যায্যতার মানদণ্ডে। তবে এই ন্যায্যতা-অন্যায্যতার অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার ধারণা জড়িত। যদিও উপন্যাসবিধৃত তরুণ-গোষ্ঠীর জীবনাচরণ ধর্মীয় মূল্যবোধ-সর্বস্ব

নয়। তারা গান করে, ছবির প্রদর্শনী করে, নারীরা আলোচনায় অংশ নেয়। মূলত ইসলাম ধর্মের চেয়েও মুসলিম জনগোষ্ঠী হিসেবে অধিকারচেতন হওয়া, হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনা এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও মুক্তি তাদের লক্ষ্য।

এর মধ্যে রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে যুক্ত হয় ১৯৪৫ সালের কেন্দ্রীয় ও ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন। কেন্দ্রে বাংলা প্রদেশের মুসলমানদের জন্য মনোনীত ছয়টি আসনে মুসলিম লীগের প্রার্থী নির্বাচিত হয়। কিন্তু সবার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু ছিল প্রাদেশিক নির্বাচন। এই নির্বাচনে জয়-পরাজয়ের ওপর যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভাগ্য নির্ভর করছিল, তা সকল পক্ষেরই জানা ছিল। ফলে কলকাতা সরগরম হয়ে ওঠে আসন্ন 'ইলেকশন'কে কেন্দ্র করে। 'খবরের কাগজের অফিসগুলো মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে।' (সরদার ২০১২ : ২৫১) এই নির্বাচন ও পাকিস্তান-আন্দোলন সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। ঔপন্যাসিক মুসলিম লীগের রাজনীতির সঙ্গে শ্রেণিগত তাৎপর্য নিয়ে হৃদয় বর্মণের সম্পৃক্তি অঙ্কনের মধ্য দিয়ে বাংলার আর্থরাজনৈতিক বিন্যাসের আরেকটি প্রান্তকে সামনে নিয়ে আসেন। পূর্ববাংলার মাছ ব্যবসায়ী জেলেদের ঘরের সন্তান হৃদয় বর্মণ। বর্ণহিন্দুদের কাছ থেকে আজন্ম অশ্রদ্ধা পেয়েছে বলেই সে মুসলিম লীগের সঙ্গে কাজ করে। কারণ 'যেনতেন প্রকারে বর্ণ হিন্দু রাজ প্রতিষ্ঠা হতে দেবে না সে বাংলাদেশে। বর্ণ হিন্দু রাজ প্রতিষ্ঠা হলে, ছোট জাতের হিন্দুদের চিরজীবন একেবারে অচ্ছ্যুত হয়েই কাটাতে হবে। এটা বর্মণের বদ্ধ ধারণা।' (সরদার ২০১২ : ২৫১) বোঝা যায় – বঞ্চিত, নিম্নবিত্ত, নিম্নবর্ণের বাঙালিদের কাছে পাকিস্তান চাওয়ার সঙ্গে সর্বভারতীয় রাজনীতির চেয়েও বাংলার একটি নিজস্ব রাজনীতিই ছিল মুখ্য। এই প্রসঙ্গে নিম্নবর্ণের রাজনীতির তৎকালীন নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের (১৯০৪-১৯৬৮) তৎপরতা স্মরণ করা যেতে পারে; যদিও উপন্যাসে সেই তৎপরতার উপস্থাপন ঘটেনি। এরপর আসে ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন। এই নির্বাচন এক অর্থে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় মুসলমান জনগোষ্ঠীর সমর্থন আদায়ের নির্বাচন। মুসলিম লীগ তার সর্বশক্তি দিয়ে এই নির্বাচনে জয়ের জন্য কাজ করে। তাদের কর্মপরিধি সুদূর গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। উপন্যাসেও সেই তৎপরতা চোখে পড়ে। নির্বাচন উপলক্ষ্যে 'নতুন দিনে'র অফিস থেকে মুসলিম লীগের প্রচারপত্র বিতরণ করা হতো বিভিন্ন জেলা ও গ্রাম পর্যায়ে। এমনি বাস্তবতায় পাবনা অঞ্চলের 'মুসলিম লীগের সালার' হিসেবে হ্যান্ডবিল নিতে আসে ছমির মিয়া। এই সেই ছমির মিয়া, যে হেনার মা ঝি এর সাথে অশালীন আচরণ করেছিল। সেখানে ব্যর্থ হলে প্রতিশোধ হিসেবে হেনাকে সঙ্গে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছিল; এবং এক সময় হেনাকে বিক্রি করে দিয়েছিল দেহব্যবসার নিষিদ্ধপল্লিতে। সেই ছমির মিয়া নির্বাচনযজ্ঞে মুসলিম লীগের পাবনা অঞ্চলের নেতা। ফলে মুসলিম লীগের সঙ্গে প্রান্তিক পর্যায়ে কেমন শ্রেণিচরিত্রের নেতৃত্ব জড়িত ছিল,

তা প্রকাশিত হয়। নিজাম-গিয়াস যে প্রেক্ষণবিন্দু থেকে পাকিস্তান-আন্দোলনকে দেখে, যে লক্ষ্য নিয়ে মুসলিম লীগের রাজনীতি করে, ছমির সেই নীতি আদর্শ থেকে অনেক দূরে। তার মুখ দিয়েই উচ্চারিত হয় তার অবস্থান:

> এলাকাটা গুছিয়ে এনেছিলাম, আপনারা মাটি করলেন দেখছি। ওদিকে মালাউনরা লাখে লাখে নয় – কোটিতে কোটিতে হ্যান্ডবিল ছাড়ছে। শুধু হ্যান্ডবিল নয় – তার সঙ্গে নোট তক গাঁথা। টাকার ছড়াছড়ি সাহেব! হাল হাতিয়ার না হলে লড়ি কী দিয়ে বলুন তো! শালা ওয়ারটাইমে যা দু'পয়সা এদিকে-ওদিকে হাতিয়ে করেছিলাম, তা দেখছি বুড়ো শা'র পৈথানে যাচ্ছে ধুচ্-চ। (সরদার ২০১২ : ২৫৭)

তাই রহমত স্বগতোক্তি করে : 'সে লোকের চরিত্র বলতে কিছু নেই, একেবারে বেপথের বখাটে ছোকরাকে হার মানায়, সে হয়ে গেলো সালার! কী যে হবে দেশের তা আল্লাই জানে।' (সরদার ২০১২ : ২৫৭) এমন নানা শ্রেণির অবস্থান অনুযায়ী কর্মকাণ্ড সংঘটিত হতে থাকে এবং রাজনীতি ও ধর্ম সেখানে ব্যবহৃত হতে থাকে।

নির্বাচনে মুসলিম লীগ অভূতপূর্ব বিজয় অর্জন করে। পুরো ভারতে বাংলা ও পাঞ্জাবেই মুসলিম লীগ বিজয় অর্জন করে। তবে পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ জিতলেও বাংলার মতো নিরঙ্কুশ নয়। তাই সেই ফজলুল করিমও চিঠিতে লেখে : 'তোমহারা বেঙ্গল তো ইলেকশানমে কামাল কর দিয়া। আমরা আশা করেছিলাম, পাঞ্জাবই ভালো করবে, কেননা মুসলিম লীগের এতো শক্তি আর কোথায় আছে? এখন দেখছি, সিন্ধু ফ্রন্টিয়ার, পাঞ্জাব সব বাংলার মুসলমানদের কাছে হার মেনে গেছে।' (সরদার ২০১২ : ২৫৮) পাঞ্জাবের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছিল ভয়াবহ। ফজলুল করিমের চিঠিতেই সেই আঁচ পাওয়া যাচ্ছিল। প্রথম দিকে পাঞ্জাবের দাঙ্গা ছিল কলকাতার মানুষের কাছে নিছক খবর। পত্রিকার হকারকেও তাই বলতে শোনা যায় : 'পাঞ্জাবে দাঙ্গা লেগেছে, মজার খবর! খবর – খবর – পাঞ্জাবে দাঙ্গা লেগেছে!' (সরদার ২০১২ : ২৬০) রহমতের প্রেক্ষণবিন্দু ব্যবহার করায় কেবল শিখ বা হিন্দুদের আক্রমণের ফলে যে হতাহতের ঘটনা ঘটেছে সেই খবর পাওয়া যায়, অপর পক্ষের খবর পাওয়া যায় না। এই দাঙ্গার বিষবাষ্প পাঞ্জাব থেকে দ্রুতই পুরো ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। বিহারের খবরও পাওয়া যায়। এরপর কলকাতা। অসাম্প্রদায়িক নগর বলে পরিচিত কলকাতা দেখে আগুনের লেলিহান শিখা, আর পথে-ঘাটে লাশ ও রক্তের স্রোতধারা। খুব স্বল্প শব্দচয়নে জয়েনউদ্দীন ভয়াবহতার চিত্রটি এঁকেছেন : 'ক'দিন হলো কলকাতায়ও অমনি আগুন জ্বলছে। রাস্তাঘাট ম্যানহোলে ভরা মানুষের লাশ।' (সরদার ২০১২ : ২৬৪) এটুকুই। এরপর রিলিফ ক্যাম্পের কথা। সেখানে মিসেস সাইপ্রিন আহত ও আশ্রয়হীন নারী শিশুদের পরিচর্যা করে। মিসেস সাইপ্রিন খ্রিস্টধর্মাবলম্বী হয়েও কাজ করে মুসলিম লীগের জন্য।

এটি রহমতকে বিস্মিত করে। এবং এই সাইপ্রিন ঝুঁকি সত্ত্বেও বিপদসংকুল পথ দিয়ে যাতায়াত করে। প্রতিপক্ষ দাঙ্গাকারীদের ছোড়া বোমার আঘাতে সে নিহত হয়। মিলিটারির মধ্যেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আবহ ছড়িয়ে পড়েছিল। যেমন মিলিটারির বেলায়েত খাঁ রাতে খুন করতে আসে ব্যানার্জিকে। ভয়ংকর এক সময় অতিবাহিত করে ছেচল্লিশের কলকাতা।

রহমত একসময় মিলিটারি থেকে অবসর নেয়। সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণের ইচ্ছা পোষণ করে। ভ্রমণ করে লাহোর-দিল্লি-আগ্রা-ফতেপুর সিক্রি। তারপর দিল্লিতে অবস্থানকালে জানতে পারে : 'ব্রিটিশ সরকার এদেশ ভাগ-বাঁটোয়ারাটাই ঠিক করেছেন। অতএব দেশ ভাগ অবশ্যম্ভাবী।' (সরদার ২০১২ : ২৭৫) দেশভাগ হলেও বাংলা-ভাগ তখনও স্পষ্ট ছিল না। মুসলমানদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল – কলকাতা পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু কলকাতা যখন ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় তখন চিরচেনা শহরটি মুহূর্তেই অপর হয়ে যায় মুসলমানদের কাছে। রহমতেরও কলকাতায় নিজেকে বিদেশি বলে মনে হতে থাকে। এ হচ্ছে চল্লিশের দশকের রাজনীতির পরিণতির সূচনাভাগ। কিন্তু উপন্যাসের শেষে নিজ বাসভূম ছেড়ে নতুন বাসভূম পূর্ববঙ্গে যাওয়ার মধ্যে জনতার যে উচ্ছ্বাসচিত্র উপস্থাপিত হয়, তাতে ঔপন্যাসিকের পক্ষপাত স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

> তখন সুবেহ সাদিকের আলোয় আলোয় পুব আকাশে আলোর বন্যায় নেয়ে উঠছে, ঝলমল করে রেঙে উঠছে দিগন্ত। মনে মনে কেবলই ভাবছি, ঐখানে, ঐ আলোর পারে সে দেশ – সে স্বপ্নের দেশ – সে আজাদ দেশ আমার! যেখানে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই, নেই অভুক্ত জন-মানব। গরিব-কাঙাল, রাজা-জমিদার সব যেখানে সমান, সব একই মানুষ! (সরদার ২০১২ : ২৮০)

এ অবস্থানকে অবান্তর বলে মনে হয় না। চল্লিশের দশকের তরুণ শিক্ষিত মুসলমানদের পক্ষপাতের ফলাফলই তো পাকিস্তান। 'রহমতের এ অনুভবই ছিল পাকিস্তান-আন্দোলনের সঙ্গে মানসিকভাবে যুক্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের অনুভব। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পাকিস্তানি নায়করা এ-অনুভবই সঞ্চারে সক্ষম হয়েছিল মেহনতি মানুষের মনেও।' (যতীন ২০১৩ : ১০৫) আর এই উপন্যাসের প্রকাশকাল (১৯৬৬) আইয়ুবি কালো দশকের (১৯৫৮-১৯৬৮) কাল পরিসরে। এই বাস্তবতাকেও বিবেচনায় নিতে হয়। পাকিস্তান-আন্দোলনের রাজনীতির প্রতি রহমতের আশ্রয়ে জয়েনউদ্দীনের সমর্থন ওই কালেরই বাস্তবতা। উপন্যাসের মুখবন্ধে শেষ বাক্যটিই এই উপন্যাসের ঔপন্যাসিকের রাজনীতি অভীপ্সার সূত্রটি ধরিয়ে দেয়, আর তা হলো:

> এ উপন্যাস পাঠ করে যদি কারো ভালো লাগে, মহাশান্তির আবাস-ভূমি পাকিস্তান চেয়ে যাঁরা আন্দোলন করেছেন, তাঁদের সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা, ন্যায়-নীতির কথা যদি কারো মনে মুহূর্তের জন্য জেগে ওঠে, তাহলে আমার শ্রম সফল হবে বলে মনে করব। (সরদার ২০১২ : ৭)

এখানে 'মহাশান্তি' শব্দউচ্চারণে কোনো শ্লেষ আছে কিনা তা বোঝা গেল না, তবে ঔপন্যসিকের প্রতিশ্রুতির জায়গাটি জানা হলো। স্বপ্নের স্বাধীনতা অর্জনের পর অচিরেই স্বপ্নভঙ্গ ঘটেছে জয়েনউদ্‌দীনের মতো অসংখ্য মুসলিম বাঙালি তরুণের। উপন্যাসের শুরুতে স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রে পাট-কারখানায় শ্রমিক আন্দোলনে হায়াত খাঁর নিহত হওয়া সেই বার্তা দেয়। এই স্বপ্নভঙ্গ আরও বিস্তৃতভাবে বিধৃত হয়েছে তাঁর *বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ* উপন্যাসে, কিন্তু সাতচল্লিশের বাস্তবতাকে তিনি এই উপন্যাসে স্বীকার করেছেন। বলা যায় এই উপন্যাসে সাতচল্লিশ-পরবর্তীকালের মোহভঙ্গের মনস্তত্ত্ব দিয়ে উপন্যাস শুরু হলেও সাতচল্লিশ-পূর্ববর্তী রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ব থেকে ঔপন্যাসিক বিচ্যুত হননি।

২.২.৮

শ্রেণিরাজনীতির একজন সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে সত্যেন সেন (১৯০৭-১৯৮১) তাঁর *উত্তরণ* (১৯৭০) উপন্যাস পরিকল্পনায় প্রধানত শ্রেণির সমস্যাকেই প্রধান করে দেখেছেন। তিন পর্বে বিভক্ত মহাকাব্যধর্মী এই উপন্যাসে মালেক চরিত্র নির্মাণ করতে গিয়ে মালেকের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন, আর্থসামাজিক বাস্তবতা রূপায়ণে সম্পূর্ণত শ্রেণিসচেতন দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেছেন ঔপন্যাসিক। দ্বিতীয় পর্বে কলকাতায় আগমনের পর ১৯৪৬ সালের উত্তাল পাকিস্তান-আন্দোলন ও আগস্টে দাঙ্গার মুখোমুখি হয় মালেক। কিন্তু প্রথম পর্বে নির্মিত হয় সাম্প্রদায়িকতার চেয়েও বড় সংকট শ্রেণিশোষণের বাস্তবতা। কৈশোরে মালেক দেখেছে কোর্টের পেশকার হিসেবে চাকরিরত বাবা নাজিম কীভাবে স্ত্রীকে নির্যাতন করে। উপর্যুপরি নির্যাতনে ভারসাম্য হারিয়ে মালেকের মা আমেনা পর্যবসিত হয় পাগলে, পাঠিয়ে দেওয়া হয় বাপের বাড়ি। মা ও ছোটভাই রফুর পুরো দায়িত্ব পড়ে ম্যাট্রিক-পাশ মালেকের ওপরেই। জাহাজে সারেং হিসেবে চাকরিরত দুঃসম্পর্কের মামা কদমালীর আশ্রয়ে সুকানির চাকরি পায় সে। নদীপথে মালামাল পরিবহণের ফ্লাটে জীবন কাটতে থাকে। কিন্তু সেখানেও রচিত হয় শোষণের ইতিকথা। খোরাকির অর্ধেকের কম সে মায়ের কাছে পাঠাতে পারে। বাকিটা কদমালী সারেঙের শোষণে বেহাত হয়। এই অবস্থা ফ্লাটের অপরাপর সকল খালাসি, সুকানির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। পারিবারিক সংকটে আবদ্ধ ও রাজনীতি থেকে অনেক দূরে থাকা মালেকের সঙ্গে পরিচয় ঘটে খালাসি রহমানের সঙ্গে। রহমানের কাছ থেকেই সে জানতে পারে কৃষক আন্দোলন ও কৃষক সমিতির কথা। স্বশিক্ষিত রহমান তার সামনে শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে। শোষণের প্রতিবাদ

করায় একসময় রহমান বিতারিত হয় এবং মালেকও কাজ ছেড়ে দেয়। উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে কাজের আশায় মালেক আসে শহর কলকাতায়। কলকাতা তখন রাজনৈতিক আন্দোলনে মুখর একটি শহর। কিন্তু রহমানের কাছ থেকে শ্রেণিরাজনীতির প্রাথমিক পাঠ নিলেও কলকাতার পাকিস্তান-আন্দোলন কেন্দ্রিক রাজনীতি তার কাছে অচেনা। রহমানের রাজনীতির সঙ্গে এই ধর্মের রাজনীতিকে কোনোভাবেই মেলাতে পারে না মালেক। তার প্রয়োজন কাজ করে খাওয়া ও পরার সংস্থান। মালেকের একটি চাকরি জোটে কলকাতার অদূরে আগরপাড়ার একটি কেমিক্যাল কারখানায়। রাজনীতি সম্পর্কে মালেকের সরল সমীকরণের পরিচয় পাওয়া যায় উপন্যাসের এই বর্ণনায়:

> ১৯৪৬ সাল। পাকিস্তান আন্দোলনের জোয়ার তখন কূল ছাপিয়ে উপছে উঠতে চাইছে। জায়গায় জায়গায় রাস্তায় রাস্তায় মিছিল, ঘরে বাইরে সর্বত্র এই নিয়ে আলোচনা। একজন খাঁটি মুসলমান সন্তান হিসাবে মালেক অবশ্যই 'পাকিস্তানে'র স্বপক্ষে। পাকিস্তান অবশ্যই হওয়া দরকার এবং যথাসম্ভব তাড়াতাড়িই হওয়া দরকার। তা হলে এদেশের মুসলমানরা সুখ পাবে, শান্তি পাবে। সমস্ত দিক দিয়েই তাদের উন্নতি হবে, এ বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এই মোটা কথাটাই বোঝে, এর বাইরে আর কিছু জানেও না, বোঝেও না। (সত্যেন ২০১৪ : ২৮৯)

আর এই সরল চিন্তায় দাঙ্গার ভয়াবহতা তাই মালেককে স্তম্ভিত করে তোলে। দুই সপ্তাহব্যাপী কলকাতার দাঙ্গা থেকে বাঁচতে তাদের উদ্বাস্তু জীবনের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা সেই কালপর্বে কলকাতার বাস্তবতার ভয়াবহতাকে নির্দেশ করে। দাঙ্গা শেষ হলেও দাঙ্গার রেশ কাটে না। ঔপন্যাসিক এই পর্যায়ে মানবিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে সেই পরিস্থিতির বর্ণনা দেন :

> দাংগা থেমে গেছে সত্য, কিন্তু মানুষের মনে বিদ্বেষের আগুন ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জ্বলছে। শহরের আবহাওয়া সেই ধোঁয়ায় কলুষিত ও বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। এখানে এখন মানুষ বলে কোন প্রাণী নেই, আছে একদল হিন্দু আর একদল মুসলমান। ধর্মের পায়ে, সাম্প্রদায়িকতার পায়ে এরা এদের মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দিয়েছে। কাজে এবং চিন্তায় কে কতদূর বর্বর হতে পারে, দু'দলের মধ্যে তাই নিয়ে চলেছে প্রতিযোগিতা। (সত্যেন ২০১৪ : ২৯৪)

কিন্তু এর মধ্যে কারখানার ম্যানেজার ও কংগ্রেস কর্মী মনোজ আতর্থীর সহানুভূতি ও অসাম্প্রদায়িক অবস্থান মালেককে সিক্ত করে। মনোজই মালেকের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় সাম্প্রদায়িক সংঘাতের ফলে ইংরেজদের স্বার্থসিদ্ধির কুটিল-জটিল সমীকরণকে:

> বুঝলে মালেক, ইংরেজের ষড়যন্ত্র সার্থক হয়েছে। ওদের ফাঁদে পা দিয়ে আমরা ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি কাটাকাটি করে মরছি। আর ওরা একপাশে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে আর আনন্দে হাততালি দিচ্ছে। (সত্যেন ২০১৪ : ২৯৫)

মনোজ আতর্থীকেও চাকরি থেকে বিদায় নিতে হয় রাজনীতি-সংশ্লিষ্টতার জেরে। নতুন ম্যানেজার হয় গগন চৌধুরী। মালেক বিস্মিত হয়ে দেখে কেবল মুসলমান হবার কারণে হিন্দু ম্যানেজার কর্তৃক কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘটনা। সে নিজেও একসময় চাকরিচ্যুত হয় একই কারণে। এই ছিল ছেচল্লিশের কলকাতার নির্মম বাস্তবতা। আবারও সে বেরিয়ে পড়ে ভাগ্যের অন্বেষণে। একসময় বন্ধু হাসেমের পরামর্শে কাঁঠালপাতা বিক্রি, তরকারি বিক্রির কাজও সে করে। আবারও মনোজ আতর্থীর সহযোগিতায় কাজ মেলে কাশীপুরে সিদ্দিকুর রহমানের পিতলের কারখানায়। এরপর ভারতের অন্যান্য সকলের মতো মালেকও দেখে ১৯৪৭, বাংলা বিভাগ, আরও সংঘর্ষ এবং আরও রক্ত। এই উপন্যাসে রাজনীতি না বোঝা মালেকের জীবনায়নের মধ্য দিয়ে শ্রেণির রাজনীতি ও ধর্মের যুগ্মীভবনে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির স্বরূপটি স্পষ্ট হয়ে যায়। স্বধর্মীয় হয়েও কদমালী কর্তৃক খালাসিদের শোষিত হবার চিত্র, ভিন্ন ধর্মী হবার পরেও মনোজ আতর্থীর মহানুভবতা, দাঙ্গার সময় একই শ্রেণির শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধতার শক্তি বিশেষত সুন্দরালির ভূমিকা, পঞ্চাশের মন্বন্তরে গোপনে ঘোষবাড়ি থেকে মালেকের পরিবারের সাহায্যপ্রাপ্তি ইত্যাদি ঘটনাপুঞ্জ মূলত সম্প্রদায় সমস্যার চেয়েও শ্রেণির সমস্যাকেই প্রধান করে তোলে। 'দাঙ্গা, পাকিস্তান-আন্দোলন, মালেকের দ্বন্দ্বময় পাকিস্তান সমর্থন – প্রভৃতির উন্মোচন প্রসঙ্গে সত্যেন সেন সমকালীন সমাজ-রাজনৈতিক জীবনের সমগ্র চিত্র অঙ্কন করেছেন।' (রফিকউল্লাহ ২০০৯ : ১৭৯) সামগ্রিক চিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক তৎকালীন রাজনৈতিক সংকটের মূলকে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছেন। মালেকের মতো উপন্যাসের পাঠকও নিরন্তর আত্মজিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে প্রতিটি বাস্তবতাকে মোকাবিলা করে ঔপন্যাসিকের আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গিকে পাঠ করতে পারে।

সত্যেন সেন সর্বতোভাবে একজন শ্রেণিসচেতন সাহিত্যিক। 'সৃষ্টিশীল সত্যেন সেনের সমগ্র সত্তার উপর ছিল মার্কসবাদী রাজনীতির একক অধিকার। ফলে তাঁর সমগ্র সাহিত্যভাণ্ডার হয়ে উঠেছিল মার্কসবাদী রাজনৈতিক দর্শনেরই শব্দভাষ্য। ... সত্যেন সেনের 'মাঠের কাজ'-এর মতোই তাঁর 'লেখার কাজও' তাঁর বিশ্বাস অর্থাৎ রাজনৈতিক বিশ্বাসের মাপকাঠিতে বিচার্য।' (কুদরত ২০১৩ : ১৬৩) *উত্তরণ* উপন্যাসে – পাকিস্তানি সামরিকশাসনের কালে রচিত হওয়া সত্ত্বেও – তাঁর রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির অটলতাই শব্দরূপ লাভ করেছে। এখানে প্রান্তিক পর্যায়ের মুসলমান যুবকের চরিত্র নির্মাণে এবং তার রাজনীতি-সচেতনতা সৃষ্টিতে শ্রেণিরাজনীতির বোধই ক্রিয়াশীল থাকে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের অপরাপর ঔপন্যাসিকদের মতো এখানে সত্যেন সেনের পাকিস্তান-আন্দোলনের কোনো পক্ষের প্রতি মোহাবেশ তৈরি হয়নি; আবার মোহভঙ্গও ঘটেনি। উক্ত কালপর্বের প্রধান সমস্যা শ্রেণিসমস্যাকে তিনি যথাযথভাবে শিল্পের অনুষঙ্গে শনাক্ত করতে পেরেছেন। বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণই এর প্রধান কারণ। ফলে

চল্লিশের দশকের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বৃহৎ পরিসরে শ্রেণিরাজনীতিচেতনার উপস্থিতি শোষিত মানুষের স্বাধীনতার স্বপ্নের নতুন সংজ্ঞার্থ দাঁড় করায় *উত্তরণ* উপন্যাস।

২.২.৯

শওকত আলীর (১৯৩৬-২০১৮) *ওয়ারিশ* (১৯৮৯) উপন্যাস একটি পরিবারের নিজ বাসভূমি থেকে সমূলে উৎখাত হওয়ার আখ্যান। স্থান – অখণ্ড ভারতের দিনাজপুর জেলা। ঔপন্যাসিক শওকত আলীর পৈতৃক নিবাস সেই দিনাজপুরের রায়গঞ্জ। (শওকত ২০১৮) উপন্যাস বিধৃত এলাকার নাম মোহনগঞ্জ মহকুমা। উপন্যাসের চূড়ান্ত পর্যায় সাতচল্লিশ-পরবর্তী বাস্তবতায় সাম্প্রদায়িক সংকট ও রায়হানের পিতা মুর্শেদ আলীর প্রধানের সপরিবারে ভারত ত্যাগ করে পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসা। রাজনীতিকে শিল্পের আধারে ধারণ করতে ঔপন্যাসিক সময়খণ্ডকে ভেঙে ভিন্ন ভিন্ন সময় ও তিন প্রজন্মের সংযোগসূত্র রচনা করেছেন এই উপন্যাসে। শিল্পের সঙ্গে রাজনীতির ঘটেছে যুগ্মীভবন:

> হিন্দু-মুসলমান নানা চরিত্রের স্বভাব ও চেতনা উন্মোচনের মধ্য দিয়ে লেখক তাঁর দ্রষ্টাচক্ষুর যাকে বলে surplus of seeing, উন্মীলন ঘটিয়েছেন বলে নেহাৎ ডকুমেন্টেশন হয়ে ওঠেনি কাহিনি। বরং রাজনীতি আর সংস্কার-সংস্কৃতি নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্বসংকট একটি আনুভূমিক বস্তুপ্রতিবেশ রচনা করেছে। (আকতার ২০১২ : ২১০)

শওকত আলীর লেখক-সত্তা সম্পর্কে আরও উল্লেখ্য:

> কিছু কিছু লেখক আছেন যাঁরা জীবন সম্পর্কে, চারপাশের জগৎ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে দেন; আমাদেরকে তাঁরা যা দেন তা হচ্ছে দেখার চোখ, সমাজকে বোঝার যুক্তি এবং অনুভব করার মতো হৃদয়। এই ধরনের লেখকদের মধ্যে সৃষ্টিশীল লেখকরাই অন্যতম। কথাসাহিত্যিক শওকত আলী সেই ধারার লেখক। (আলী ২০২২ : ৬০)

উপন্যাসের শুরু মুর্শেদ আলী প্রধানের জন্মক্ষণ থেকে। মুর্শেদ তার পিতা জওহর আলী প্রধানের বংশের একমাত্র জীবিত পুত্র সন্তান। দুই মায়ের কাছে আদরে-প্রশ্রয়ে বড় হয় সে। গৃহশিক্ষক মৌলভির সঙ্গে বিবাদ, যদু পণ্ডিতের পাঠশালায় গমন, অতঃপর মোহনগঞ্জ সদ্য প্রতিষ্ঠিত হাইস্কুলে পড়াশোনার মধ্য দিয়ে মুর্শেদের বেড়ে ওঠা। এরই মধ্যে বই পড়ার প্রতি মুর্শেদের তীব্র আকর্ষণ, সেইসূত্রে রাজনীতির প্রতি আগ্রহ ও সম্পৃক্তি এবং একই সঙ্গে গণিতের প্রতি অনীহা প্রভৃতি অনুষঙ্গে মুর্শেদের চারিত্র্য সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। গণিতের প্রতি অনীহা ইঙ্গিতবাহী অনুষঙ্গ। কারণ রাজনীতির গাণিতিক সমীকরণে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয় মুর্শেদের অধীত বিদ্যা ও পরিস্রুত চেতনাজাত জ্ঞান ও বিশ্বাস। সময় ও সমাজগতির পরিবর্তনটিও স্পষ্ট হতে থাকে। ছোট মোহনগঞ্জে থানা হয়, পোস্টঅফিস হয়,

সাবরেজিস্ট্রি অফিস হয়, মুন্সেফ কোর্ট বসে এবং শেষতক রেলস্টেশনও স্থাপিত হয়। ফলে এই অবকাঠামেগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর রাজনৈতিক চিন্তাও প্রবেশ করে মোহনগঞ্জে। উপন্যাস-বিধৃত ঘটনা থেকে জানা যায় ভারতের ও বৈশ্বিক বাস্তবতায় মুর্শেদের অবস্থান:

> সময়টা ১৯২০। এক বছর আগে জালিওয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা ঘটেছে। মহাত্মা গান্ধী কী করেন সেদিকে সবাই তাকিয়ে আছে। সকলের আশা এই লোকটি কিছু করবে। ওদিকে ইয়োরোপের যুদ্ধ-পরবর্তী ডামাডোল তখনো থিতিয়ে আসেনি। রুশ দেশে নাকি শ্রমিক-কৃষক রাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে – এমনই সব খবরে কাগজ ভর্তি থাকে। ফলে খবরের কাগজ এখন দারুণ আগ্রহের বস্তু। সন্ধেবেলাতে রেলস্টেশনে গেলে দিনের কাগজ দিনে পাওয়া যায়। নইলে পরের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। মুর্শেদের আর তর সয় না। একখানা ইংরেজী আর একখানা বাংলা, দু'খানা কাগজ যতোক্ষণ পড়া শেষ না হচ্ছে, ততক্ষণ ইস্কুলের পড়া শিকেয় তোলা থাকে। খবরের কাগজ তাকে ভেতরে ভেতরে চঞ্চল করে তোলে। 'একবার বিদায় দে মা' গানটি হঠাৎ হঠাৎ শোনা যায়। শুনলে তার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। (শওকত ২০১২ : ২৩)

দেশ, রাজনীতি ও কংগ্রেসের রাজনীতির প্রতি এভাবেই মুর্শেদের ঘনিষ্ঠতা। বন্ধু বিভুরঞ্জনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাসূত্রে বুঝতে চেষ্টা করে ধর্ম-রাজনীতির আরও নানা দিক। বিভুর পরিবারের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ হয় মুর্শেদ। ফলে সম্প্রদায় সম্পর্কিত চেনাজানার শুরুটি কৈশোর কাল থেকেই ঘটে তার। বিভিন্ন বিতর্কেরও মুখোমুখি হয় সে। যেমন বিভুর কাকা নীরঞ্জনের এক প্রশ্নে সে উত্তর দেয় : 'সবচেয়ে বড় ধর্ম মানবধর্ম, স্রষ্টা একজনই।' (শওকত ২০১২ : ২৬) কৈশোরক এই উচ্চারণের অনুরণন দেখা যায় তার বাকি জীবনেও। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বানে মোহনগঞ্জও উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। স্কুলের ছেলেরা কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগ দেয়; মুর্শেদও যুক্ত হয়। স্বাধীনতা, স্বরাজ, সত্যাগ্রহ, অহিংস কর্মসূচি, বিদেশি পণ্য বর্জন – এইসব ঘটনাপ্রবাহে মুর্শেদের মন সবসময় কৌতূহলী ও প্রশ্নশীল। বিভুর বোন দীপার কাছ থেকে সে গ্রহণ করে অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম প্রতীক চরকা। কংগ্রেসের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকেও সে যুক্তি দিয়ে ঘটনার পরম্পরা বুঝে নিতে চায়। বিভুর মতো অনেকেই যখন ভাবে স্বাধীনতা অত্যাসন্ন, কারণ গান্ধীজি বলেছেন, তখন মুর্শেদ মনে করে:

> এখনো বহু ধাপ পার হতে হবে। স্বাধীন হবো বললেই স্বাধীন হওয়া যায় না, তার আগে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে, শিক্ষিত হতে হবে। প্রতিটি মানুষের আত্মশক্তি জাগ্রত না হলে চরম আত্মত্যাগ সম্ভব নয় – আর তা না হলে, স্বরাজও অসম্ভব। (শওকত ২০১২ : ৩৭)

এসব মুর্শেদের আদর্শায়িত ধারণা। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। বরং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পোষণ করে শ্রেণিসচেতন বিভু। প্রকাশ করে অপ্রিয় কিন্তু সত্য আলাপ:

ভারতীয় সত্তায় বিশ্বাস করতে হলে তোমাকে ভাই হিন্দু হতেই হবে। আর তুমি যদি হিন্দু হও, তাহলে অন্য একজন মুসলমান হবে। আর মুসলমান হলে তার পক্ষে ভারতীয় সত্তায় বিশ্বাসী হওয়া অসম্ভব। কেননা তার উপনিষদ নেই, পুরাণ নেই, রামায়ণ মহাভারত নেই। সে জানে না ভরত রাজা বা ভরত মুনি কে ছিলো, কীভাবে ব্রহ্মাবর্ত আর্যাবর্ত অতিক্রম করে ভারত নামটা গোটা উপমহাদেশে বিস্তৃত হয়েছে। (শওকত ২০১২ : ৭৩)

বিভু কোনো পক্ষকে সমর্থন করে না; কিন্তু সে রাজনীতির বাস্তবতাটা অনুভব করে। তার মতে বঞ্চনার বোধই পাকিস্তান-আন্দোলন জোরদার হওয়ার কারণ। সে এও বোঝে এই আন্দোলনের মাধ্যমে শোষিত মানুষের ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে মুসলিম বুর্জোয়া শ্রেণি ক্ষমতায় আরোহণ করতে চায়। ফলে মুসলিম লীগ বা কংগ্রেস উভয়ের জাতীয় মুক্তি বা জাতীয়তার ধারণাকেই তার কাছে হাস্যকর মনে হয়।

মুর্শেদের দ্বন্দ্ব শুধু বাইরে নয়, ঘরেও। তার স্ত্রী সালমা পাকিস্তানকে সমর্থন করে। ছেচল্লিশের নির্বাচনের সময় তার বাড়ি মুসলিম লীগের অন্যতম ঘাঁটিতে পরিণত হয়। সালমার এই মুসলিম লীগের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্তির পেছনেও আছে সম্প্রদায়জনিত অপমানিত হওয়ার বেদনাবোধ। মুর্শেদ-সালমার পুত্র রায়হানের বয়ানে উঠে এসেছে সেই তথ্যসূত্র। পৈত্রিক বাড়ির ওয়ারিশ সূত্রেই রায়হানের ঢাকা থেকে সপুত্রক মোহনগঞ্জ গমন। পুরো উপন্যাসের কাঠামো আরও নানা অনুষঙ্গে রায়হানের দৃষ্টিকোণ ও অভিজ্ঞতা থেকেই রূপায়িত হয়। মধুসূদন আযার্চদের বাড়ি থেকে আপ্যায়িত হয়ে ফেরার পথে রায়হান তার পুত্র রঞ্জুকে শোনায় সালমার রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার প্রারম্ভিক ঘটনাটি এবং ঘটনাটি এই আচার্য বাড়িকে কেন্দ্র করেই:

তোমার দাদী, মানে আমার মা, তখন নতুন বউ। প্রথম বেড়াতে গিয়েছেন স্বামীর অন্তরঙ্গ বন্ধুর বাড়িতে – সঙ্গে শাশুড়ি। চেয়ারে বসিয়ে খুব আদর আপ্যায়ন মিষ্টিমুখ ইত্যাদি হলো। বিদায় বেলায় পানের খিলিটি পর্যন্ত মা হাতে তুলে নিয়েছেন। হাতে নিয়েছেন, কিন্তু তখনও মুখে তোলেন নি। মনে মনে ইচ্ছে, ফেরার পথে পানটি মুখে দেবেন। খিড়কির দরজার কাছে পৌঁছেছেন ঐ সময় শুনলেন, মধু কাকার মা বউ-মাকে ডেকে বলছেন, অ বউ মা চেয়ার দু'খানা গঙ্গাজলে ধুয়ে তারপর ঘরে তুলো বাছা।

কথা ক'টি মায়ের কানে আসে। স্বামীকে ততদিনে কিছুটা চিনেছেন তিনি – তাঁর কথাবার্তা চালচলনের সঙ্গে নিজেকে মানাতে তাঁর এমনিতেই কষ্ট হচ্ছিলো – তার ওপর ঐ রকম একটা ঘটনা। মা দারুণ অপমানিত বোধ করেন সেদিন। বামুন বাড়ির মিষ্টি পেটের ভেতর রাখতে তাঁর খুব কষ্ট হয়েছিলো। মনে হচ্ছিলো, বমি হয়ে গেলে তাঁর ভালো লাগবে। তিনি হাতের পানটা মুখে না দিয়ে ছুড়ে ফেলে দেন পায়ের নিচে। (শওকত ২০১২ : ৪৪-৪৫)

এরপর ওইদিন রাত থেকেই সালমা নতুনভাবে পড়াশোনা শুরু করে। তার হাত ধরে বাড়ির অন্দরমহলে অর্থাৎ নারীদের মধ্যে শিক্ষালাভ শুরু হয়। এবং এই সম্প্রদায়জনিত অপমানের বোধ তাকে মুসলিম লীগের রাজনীতির দিকে ধাবিত করে। ফলে মোটাদাগে যে রাজনীতির ইতিবৃত্ত ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়, জনজীবনের যাপিত জীবনে তার সঙ্গে অসংখ্য গল্প যুক্ত থাকে। সাতচল্লিশপূর্ব রাজনৈতিক পটভূমির সেই গল্পগুচ্ছ ফ্ল্যাশব্যাকের মাধ্যমে উপন্যাসের প্রথমপর্বে শিল্পরূপ পেয়েছে। এর পরের পর্বগুলোতে সাতচল্লিশ-পরবর্তী নতুন বাস্তবতার নতুন নতুন সমস্যা ও অভিজ্ঞতার শিল্পভাষ্য নির্মিত হয়েছে।

২.২.১০

বাংলাদেশের বগুড়া জেলার পূর্বাংশে কাৎলাহার বিলকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা জনজীবন, জীবন-অভিজ্ঞান ও জীবনবাস্তবতার পটভূমিতে রচিত আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের (১৯৪৩-১৯৯৭) মহাকাব্যিক উপন্যাস *খোয়াবনামা* (১৯৯৬)। উপন্যাসে বিধৃত কাল চল্লিশের দশকের মধ্যভাগ। ইলিয়াসের প্রথম উপন্যাস *চিলেকোঠার সেপাইতে*ও (১৯৮৬) কেন্দ্রচরিত্র ওসমানের অবচেতন-মনস্তত্ত্বে থাকে দেশবদল ও উদ্বাস্তুজীবনের অপূর্ণতার বাস্তবতা। *খোয়াবনামায়* সমকালীন রাজনীতিই উপন্যাসের প্রত্যক্ষ বাস্তবতা। কিন্তু এর সঙ্গে মাঝি-সম্প্রদায়ের তমিজের বাপের অর্ধজাগরণ অবস্থা ও স্বপ্নব্যাখ্যার ক্ষমতার বাস্তবতা সেই সময়ের রাজনীতি-অর্থনীতির অদ্ভুত স্বপ্নলোকের বাস্তবতার সঙ্গে পাঠককে একীভূত করে রাখে। এই উপন্যাসে থাকে না টাইপ চরিত্র; শ্রেণি-চরিত্র নির্মাণেও সাধারণীকরণ ঘটে না। বরং ওই সময়ের আর্থরাজনৈতিক বাস্তবতায় প্রতিটি চরিত্র তার পরিপার্শ্ব-পরিস্থিতির কার্যকারণসূত্রে উপস্থিত থাকে এই উপন্যাসে। কাৎলাহার বিলকে কেন্দ্র করে রানীর পাড়া, পাড়-রানীর পাড়া, তরণীহাট, গিরিডাঙা, নিজগিরিডাঙা, গোলাবাড়ির হাট, পোড়াদহের মেলা – এসব স্থানিক পরিচয়ের মধ্যে যে মানুষগুলো উপস্থিত থাকে, তাদের স্ব স্ব অবস্থান তৎকালীন রাজনীতির একটি স্পষ্ট চিত্র পাঠকের সামনে উন্মোচিত করে। অর্থাৎ তমিজ-তমিজের বাপ-কুলসুম-ফুলজান-হুরমতুল্লাহ-গফুর-কালাম-বৈকুণ্ঠ – এরা প্রান্তিক শ্রেণিভুক্ত হলেও শ্রেণির মধ্যেও থাকে বহু স্তর। মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও কলুদের সঙ্গে মাঝিরা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চায় না; এমনকি কলুদের মুসলমানিত্বেও সংশয় প্রকাশ করে। তমিজ মাঝিপুত্র, তাই শরাফতের কাছে জমি বর্গা নিয়ে চাষ করলেও আরেক চাষি হুরমতুল্লাহ সহজভাবে মেনে নেয় না। এই সামাজিক বা গোত্রগত দ্বন্দ্বের মূল খুঁজলেও অর্থ আর প্রতিপত্তির সম্পর্কই আবিষ্কৃত হয়। আবার শোষক শ্রেণির মধ্যেও বিচিত্র স্তর ও বিন্যাস। যেমন : পুরো গ্রামের এক জমিদার আছে, তার নায়েব আছে – পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, জোতদার শরাফত মণ্ডল, তার দুই পুত্র সরকারি সাবরেজিস্ট্রার অফিসের কেরানি আজিজ ও মুসলিম লীগ কর্মী কাদের। অর্থনৈতিক

বিন্যাসে প্রত্যেকে যার যার ধর্মীয় অবস্থান নিয়তির মতোই মেনে আসছিল। কিন্তু ক্রমেই ধর্মীয় পরিচয় ও অর্থনৈতিক অবস্থান তুল্য বিচারে চলে আসতে থাকে। নায়েব ও শরাফতের কথোপকথন – নায়েবের শ্লেষ ও শরাফতের আপাত বিনয় – কাৎলাহার বিল নিয়ে মিথের ধর্মকেন্দ্রিক বিনির্মাণ মূলত আর্থরাজনৈতিক ঘনায়মান পরিবর্তনকে নির্দেশ করে। আরও কিছু পরিবর্তন যেমন বহু কথিত জুম্মাঘরকে 'মসজিদ' বলতে শুরু করা, উর্দু ভাষায় মোনাজাত করা – নতুনতর রাজনৈতিক পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী। পাকিস্তানের জন্য যে গান গাওয়া হয় যেমন : 'ভারতবর্ষে কায়েম করো আজাদ পাকিস্তান। মোসলমানের সকল দুঃখ হইবে অবসান॥' (আখতারুজ্জামান ২০০৮ : ৫৪৬), এতে মুসলিম জনমানুষের দীর্ঘদিনের অপ্রাপ্তি ও বৈষম্য থেকে মুক্তির কথাই বিবৃত হয় স্বতঃস্ফূর্ত গতিতে।

পাকিস্তান-আন্দোলনের উত্তেজনা সংক্রমিত হয় গ্রামাঞ্চলেও। শ্রেণিগত ও সম্প্রদায়গত উভয় শোষণের বাস্তবতা সেখানে বিরাজমান। কিন্তু প্রান্তের শিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত শ্রেণিকে কেন্দ্রের ভাষাতেই কথা বলতে শোনা যায়। ফলে মূল সমস্যায় না গিয়ে সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে সমস্যা ঘনীভূত হতে থাকে। যেমন 'টাউনে'র ডাক্তার আমিরুদ্দিনের কণ্ঠে শোনা যায় মুসলিম লীগের মুখস্থ বুলি : 'মোসলমান হলো হিন্দু জমিদারের প্রজা, হিন্দু উকিলের মক্কেল, হিন্দু মহাজনের খাতক, হিন্দু মাস্টারের স্টুডেন্ট, হিন্দু ডাক্তারের পেশেন্ট।' (আখতারুজ্জামান ২০০৮ : ৪২৯) এটাও এক বাস্তবতা। সে আরও যোগ করে : 'মোসলমান সব ভালো ভালো শিক্ষিত মানুষের ধারণা, মোসলমান কখনো ভালো ডাক্তার হতে পারে না।' (আখতারুজ্জামান ২০০৮ : ৪২৯) কিন্তু এইসব উত্তেজনায় গা না ভাসানো লোকও ছিল। যেমন শিমুলতলার ছোটমিয়া। সে বলেঃ

> মোসলমান ডাক্তার যদি ভালো হয় তো হিন্দু পেশেন্ট কি তার কাছে না গিয়ে পারবে? টাউনের চোখের ডাক্তার দুজনেই তো মোসলমান, হিন্দুরা তাদের দিয়ে চোখ দেখায় না? কলকাতার সবচেয়ে বড়ো দাঁতের ডাক্তার তো মোসলমান, তার পেশেন্টদের মধ্যে হিন্দুর হার কতো বেশি তা হিসাব করে দেখেছেন? (আখতরুজ্জামান ২০০৮ : ৪২৯)

শহুরে ও গ্রামীণ, শিক্ষিত-স্বল্পশিক্ষিত-অশিক্ষিত এমন বিভিন্ন শ্রেণির মুসলিম লীগারদের মধ্যেও ছিল দৃষ্টিভঙ্গিগত ও স্বার্থগত পার্থক্য। ডাক্তার আসিরুদ্দি যখন ভাবে পাকিস্তান হলে মুসলমান জমিদারদের মধ্যে সমাজকল্যাণের প্রবণতা বাড়বে, গ্রামীণ মুসলিম লীগার কাদের বরং তার প্রতিবাদ করে : 'পাকিস্তানে জমিদারি সিস্টেম উচ্ছেদ করা হবে। বিনা খেসারতে জমিদারি উচ্ছেদ করা হবে। পাকিস্তানের নিয়ম হবে জমি তার লাঙল যার। পাকিস্তানে আমিরে গরিবে ফারাক থাকবে না।' (আখতারুজ্জামান ২০০৮: ৪২৯) আবার এই কাদেরের ধারণাও পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয় নিজ

শ্রেণিস্বার্থে। কারণ সেও জোতদারপুত্র। মুসলিম লীগের রাজনীতিতে প্রান্তিক শ্রেণি বা তলের তল শ্রেণি ছিল বরাবরই উপেক্ষিত। তারা কেবল ব্যবহৃত হয়েছিল। পাকিস্তান-আন্দোলনের মুসলমানরা উচ্চবিত্ত বা হিন্দু জমিদারের সাপেক্ষে মুসলমানদের শোষিত হওয়ার বাস্তবতাকে বিবেচনায় নিয়েছিল। কিন্তু আরও প্রান্তিক, ভূমিহীন চাষী, শ্রমিক শ্রেণি বা অন্যান্য 'নিচু' পেশার মানুষের শোষিত হওয়ার বাস্তবতাকে ততটা আমলে নেয়নি। এর অন্যতম কারণ সেই প্রান্তিক শ্রেণি অনেক ক্ষেত্রে স্বধর্মীয় অপেক্ষাকৃত উঁচু শ্রেণি দ্বারা নির্যাতিত। যেমন মাঝি কলুরা কতোটা মুসলমান সেই নিয়েই শরাফত মণ্ডল সন্দেহ পোষণ করে। অর্থনৈতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট মনস্তত্ত্বটিই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। যে কারণে শহুরে মুসলিম লীগের উঠতি দাপুটে নেতাকর্মীদের সঙ্গে পুত্র কাদেরের ঘনিষ্ঠতা হলেও শরাফতের আগ্রহ ভূমির দিকে, আভিজাত্যের দিকে, খানদানের দিকে। তাই সে শিমুলতলার মিয়াদের অতিথি করতে পারলেই নিজেকে ধন্য মনে করে। কারণ এই মিয়ারা দীর্ঘ দিন থেকে দিঘাপাতিয়ার রাজাদের তরফ থেকে খাজনা আদায়ের দায়িত্ব পালন করে। অর্থাৎ শ্রেণিঅবস্থান অনুযায়ী রাজনৈতিক অবস্থান নির্ধারিত হয়।

রাজনৈতিক উত্তেজনা গ্রামীণ অর্থনীতিতেও পরিবর্তন নিয়ে আসে। কাদেরকে গোলাবাড়ি হাটে কেরোসিন তেলের দোকান করে দেওয়া হয়। সেই দোকান একদিকে মুসলিম লীগের রাজনীতির গ্রামীণ অংশের একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়, অন্যদিকে সেই সূত্রে ব্যবসাও জমে উঠে। এর সঙ্গে কলুপাড়ার গফুর কলু পেশা পরিবর্তন করে কাদেরের কাজে যুক্ত থেকে নিজের উন্নতি করে। কাদেরের দোকানের উন্নতির বিবরণটি এরকম:

> এক বছরেই দোকানের সাইজ বড়ো করে ফেলেছে, আগে টাউন থেকে সপ্তাহে দুইবার ৬/৭টা করে তেলের টিন আসত টমটমে করে, এখন জোড়া জোড়া গোরুর গাড়ি ভর্তি টিন এনেও আশেপাশের চাহিদা মেটাতে পারে না। (আখতারুজ্জামান ২০০৮ : ৩৫০)

একসময় কাদেরকে শহরে বাড়ি ভাড়া করে কন্ট্রাকটারি করতে দেখা যায়। অল্প সময়ের মধ্যে আজিজ পরিণত হয় বড়সাহেবে আর কাদের ছোটসাহেবে। একই সঙ্গে এক অদৃশ্য প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে দীর্ঘ দিন ধরে ব্যবসা করতে থাকা মুকুন্দ সাহা।

মুসলিম লীগের রাজনীতিতেও কিছু গুণগত পরিবর্তন আসে। বিশেষত সোহরাওয়ার্দীর পর বাংলার মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আবুল হাশিম দায়িত্ব গ্রহণ করলে কিছু পরিবর্তন দৃশ্যমান হয়। নবাব কিংবা উচ্চশ্রেণির মুসলিম সামন্তশাসকদের নিয়ন্ত্রণ থেকে আবুল হাশিম মুসলিম লীগকে

গণতান্ত্রিক করার দিকে মনোযোগ দেন। যেমন বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সভায় আবুল হাশিম তাঁর বক্তৃতায় বলেন:

> বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ তিন স্থানে বন্ধক রয়েছে, স্যার সলিমুল্লাহর সময় থেকে নেতৃত্ব বন্ধক আছে আহসান মঞ্জিলে, প্রচার বন্ধক রয়েছে দৈনিক আজাদের মালিকের কাছে। আর আর্থিক বন্ধক রয়েছে ইস্পাহানীর নিকট। আমি চেষ্টা করব ঐ তিন বন্ধকসমূহ থেকে মুসলিম লীগকে মুক্ত করতে এবং বাংলার মধ্যবিত্তকে তাদের যোগ্যস্থানে বসাতে। (উদ্ধৃত, মফিদুল ১৯৯০ : ৫৭)

তাঁর প্রচেষ্টায় মুসলিম লীগ অনেক বেশি প্রান্তকে স্পর্শ করতে পেরেছিল। আবার কৃষক-প্রজা পার্টিরও অনেকে মুসলিম লীগে যোগ দিয়েছিল। রাজনৈতিক স্বার্থের অনেকগুলো প্রান্ত তৈরি হয়। *খোয়াবনামায়* মুসলিম লীগের জেলা পর্যায়ের নেতা ও আসন্ন প্রাদেশিক নির্বাচনে মনোনয়ন-প্রত্যাশী ইসমাইল হোসেন আবুল হাশিমের নীতিতেই পরিচালিত। তাই দেখা যায় যে লীগ অফিস ছিল আগে খান বাহাদুর সৈয়দ আলি আহমদের বাড়িতে, ইসমাইলের প্রচেষ্টায় অফিস করা হয় ঝাউতলার একটি ভাড়া বাড়িতে। 'লোহার প্যাঁচানো সিঁড়ি দিয়ে দোতলার সেই খুপরি ঘরে উঠতে খান বাহাদুর হাঁপিয়ে যায়। ফর্সা টকটকে মানুষ, লাল হয়ে যায়।' (আখতারুজ্জামান ২০০৮ : ৪৬০) ইসমাইল কলকাতা থেকে ইংরেজি শিক্ষিত, সে খান বাহাদুরের সমপর্যায়ের না হলেও নিজ শহরে তার আছে 'হোসেন মঞ্জিল'সহ আরও অনেক সম্পদ ও প্রতিপত্তি। পারিবারিকভাবে উচ্চকোটির মানুষদের সঙ্গেই তার সম্পর্ক। কিন্তু তার বর্তমান লক্ষ্য নির্বাচন। নির্বাচন তখন বাহ্যিকভাবে ছিল মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রসৃষ্টির উপায়; আভ্যন্তরভাবে তা মধ্যবিত্ত মুসলমানদের ক্ষমতাগ্রহণের সিঁড়ি। তাই নির্বাচনে জয়লাভের জন্যই হোক বা মুসলিম লীগের গুণগত পরিবর্তনের জন্যই হোক, সে উপন্যাসে সর্বত্র প্রান্তিক মুসলমানদের পক্ষে সরব। জোতদার-চাষির তেভাগা-দ্বন্দ্বে সে অবস্থান গ্রহণ করে মধ্যপন্থার। কর্মীদের সে বলে:

> একটু সবুর করো, পাকিস্তান হয়েই জোতদারদের আঁটো করা হবে। এ্যাসেমব্লিতে জমিদারি উচ্ছেদের বিলের সঙ্গে তেভাগার বিলও তোলা হবে। 'মিল্লাত' পত্রিকায় এরকম কথা লেখাও হয়েছে। বিল একবার এ্যাক্টে পরিণত হলে জোতদাররা বাপ বাপ করে দুই ভাগ ধান তুলে দেবে আধিয়ারদের গোলায়। কোনো আধিয়ারকে উচ্ছেদ করা যাবে না। (আখতারুজ্জামান ২০০৮ : ৪৬৪)

অথচ এই ইসমাইলকেই দেখা যায় বাঙালি নদীর পূর্ব পারের অধিবাসী তেভাগা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত গায়েন কেরামত আলীকে খুঁজে বের করার জন্য কাদেরকে দায়িত্ব দিতে। আবার এক জনসভায় কেরামতের তেভাগার গানকে মুসলিম লীগের গান বলে চালিয়ে দেয় সে। এমনকি নিজের ভোটের প্রয়োজনে নামাজের বিষয়ে বরাবর অনাগ্রহী ইসমাইল মাঝি পাড়ার মসজিদে নামাজ পড়ার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। অর্থাৎ রাজনীতির প্রয়োজনে ধর্মের ব্যবহার এখানে স্পষ্ট। মাঝি-কামারদের দ্বন্দ্বে আফসার

খুন হলে মাঝি পাড়ার তমিজের বিরুদ্ধে ডাকাতের মামলা দেওয়া হলে ইসমাইল মাঝিদের সমর্থন আদায়ের জন্য কালাম মাঝির সঙ্গে কথা বলে, তার বাড়িতে সকালের নাস্তা ও দুপুরের খাবার গ্রহণ করে। হিন্দু বন্ধুদের সঙ্গে সখ্য কিংবা মন্বন্তরের সময় অজয় দত্তের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করা সত্ত্বেও কেবল রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য ইসমাইলও হিন্দু-বিদ্বেষী বক্তব্য থেকে নিজেকে বিরত রাখেতে পারেনি:

> হিন্দু জমিদাররাই তো কৃষকদের শোষণ করে আসছে ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকে। পলাশির অম্রকুঞ্জে নবাব সিরাজুদ্দৌলার পতনের পর থেকে ব্রিটিশের পায়রাবি করে তারাই তো মুসলমানদের অর্থসম্পদ, মানইজ্জত নিয়ে বাঁচার পথে বাধা দিয়ে আসছে। মুসলমান কৃষককে সংঘাতের পথে ঠেলে দিয়ে তারা বিভেদ সৃষ্টি করছে মুসলমানদের মধ্যে। এতে স্বার্থ হাঁসিল হচ্ছে কার? (আখতারুজ্জামান ২০০৮ : ৪৯৯)

ফলে শ্রেণির প্রশ্নের মোড়কে সাম্প্রদায়িকতাই প্রধান হয়ে ওঠে। পাকিস্তান-আন্দোলনের ভেতরে যে স্বাধীনতার স্বপ্নের কথা বলা হয়, রাজনীতিসচেতন প্রান্তিক মানুষ সেখানে দেখে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন। ধর্মীয় বিবেচনার চেয়েও গুরুত্ব পায় জাগতিক লাভালাভ ও শ্রেণিস্বার্থের দরকষাকষি। ধর্মকে ব্যবহার করে শ্রমজীবী মানুষকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করা হলে তারা প্রতিবাদও করে। যেমন কল্পিত মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের আসন্ন বৈষম্য প্রকাশিত হয় আলীম মাস্টারের প্রশ্ন-উচ্চারণের মধ্য দিয়ে : 'জাকাতের কথা ওঠে কেন বাপু? চাষাক ভিক্ষা দেওয়ার কথা ওঠে কেন? চাষার পাওনাটা দিয়া দিলেই তো মিট্যা যায়। চাষার যা খাটনি, আদ্দেক ফসলে তার পোষায়, তুমিই কও বাপু?' (আখতারুজ্জামান ২০০৮ : ৪৭১) মুসলিম লীগের রাজনীতির বুর্জোয়া চরিত্র ও শোষিত শ্রেণির স্বপ্নভঙ্গের ইঙ্গিত এই প্রশ্নের মধ্যেই পাওয়া যায়।

১৯৪৬ এর ১৬ই আগস্টে শুরু হওয়া কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রান্তিক মানুষকেও আক্রান্ত করে। কলকাতার দাঙ্গায় হিন্দুদের হাতে খুন হয় আবদুল আজিজের সম্বন্ধী আবুল আহসান। আজিজ সঙ্গে থাকলেও প্রাণে বেঁচে যায়। কারণ তাকে এক হিন্দু দোকানদারই দোকানে টেনে নিয়ে জীবন বাঁচায়। আবার এই খুনের নৃশংসতার ঘটনার শ্রোতা হয়ে বৈকুণ্ঠ গিরি ভাবে : 'ঐ খুনীদের ঘাড়ের ওপর ভবানী সন্ন্যাসীর খাঁড়া যদি নেমে না আসে তো সেটা সন্ন্যাসীর হাতে রেখে কী লাভ?' (আখতারুজ্জামান ২০০৮ : ৫৫৯) পরবর্তীকালে তমিজের বাপের সঙ্গে বৈকুণ্ঠের কথোপকথনেও সেই সরল লোকায়ত ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রান্তিক ও লোকায়ত জীবনধারার মানুষের কাছে তখনও মানবধর্মই বড় ধর্ম হিসেবে বিরাজমান ছিল। কেন্দ্রের দাঙ্গা বিষয়ে প্রান্তের মানুষ প্রথমত ছিল আউটসাইডার। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেকে মুক্ত থাকে না পূর্ববাংলার এই নিভৃত পল্লি। দৈনিক আজাদ পত্রিকা কলকাতার

উত্তাপ নিয়ে গ্রামেও ঢুকে পড়ে। মুকুন্দ সাহা তা আঁচ করতে পারে। মুসলিম লীগ কর্মী কাদেরও চায় না অশান্তি। সেও বৈকুণ্ঠর মত সরল মানুষকে বিপদ থেকে বাঁচাতে চায়। কিন্তু দাঙ্গা-উত্তেজনা-রক্তপাত ঘটে, যা সেই কালখণ্ডের ঐতিহাসিক বাস্তবতা।

ইলিয়াস চল্লিশের দশকের রাজনীতির স্বরূপ নির্মাণে বহুস্তরিক শ্রেণির বিষয়েই বেশি জোর দেন। একদিকে তমিজ-বৈকুণ্ঠ প্রান্তিক মানুষ হওয়ায় যেমন তারা সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে, কাদের-মুকুন্দ সাহা মধ্যশ্রেণি হওয়ায় তাদের দ্বন্দ্বটিও মধ্যম মাত্রার। অপরদিকে ঔপন্যাসিক জানিয়ে দেন 'জমিদারবাবুর বড়ো ছেলে হলো খান বাহাদুর আলি আহমদের গেলাসের ইয়ার। বন্ধুকে খুশি করতে সমস্ত ক্ষমতা খাটাবে।' (আখতারুজ্জামান ২০০৮ : ৫৬৫) শ্রেণিবৈষম্যের সঙ্গে উপরতলার শ্রেণিস্বার্থ রক্ষার বিষয়টি শৈল্পিক পরিচর্যায় প্রকাশ করেন ইলিয়াস। চল্লিশের দশকে মুসলিম লীগের রাজনীতিতে তেভাগা একটি বড় বাস্তবতা, যা সামন্তবাদী মুসলিম লীগের রাজনীতির জন্য একটা বাধাও বলা যেতে পারে। জন্ম থেকেই মুসলিম লীগ একটি সামন্তস্বার্থরক্ষাকারী দল। চল্লিশের দশকে একে মধ্যবিত্তদের স্বার্থরক্ষার দলে রূপান্তরিত করার চেষ্টা চলে। কিন্তু সেখানে প্রান্তিক ও প্রলেতারিয়েতদের স্বার্থ-বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট সমাধান ছিল না। মৌখিকভাবে, বক্তৃতায়, পত্রপত্রিকার কলামে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ যে সাম্যের পাকিস্তানের কথা বলেছিলেন, তা ভীষণভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল মুসলিম লীগের জোতদার-অংশকে। কারণ, কাগজে কলমে তারাও প্রজা। কিন্তু ভূমিহীন প্রজা, কৃষক, বর্গাচাষী আর শত সহস্র বিঘা জমির জোতদার প্রজার মধ্যে স্বার্থগত পার্থক্য স্পষ্ট হতে থাকে তেভাগা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। উত্তরবঙ্গের পশ্চিমাংশ জুড়ে অর্থাৎ দিনাজপুর, জয়পুরহাট, নওগাঁ, রাজশাহী অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলন জোরদার হয়। *খোয়াবনামা*য় বিধৃত রাজনীতিতে এই তেভাগা একটি দিক-নির্ণয়ী অনুষঙ্গ। শহরকেন্দ্রিক – মফস্বল শহর বগুড়া – রাজনীতিরও একটা চিত্র পাওয়া যায় ইসমাইলের বাড়িতে মুসলিম লীগের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আলাপ আলোচনায় সেই তেভাগার উদ্বেগ, শ্রেণিস্বার্থ এবং রাজনীতির অভ্যন্তরীণ পক্ষ-বিপক্ষ স্পষ্ট হয়। গণ্যমান্যদের মধ্যে থাকে ডাক্তার শামসুদ্দিন খোন্দকার, যে কৃষক-প্রজা পার্টির হয়ে নির্বাচন করে এমএলএ হয় এবং বছর তিনেক পরে মুসলিম লীগে যোগ দেয়। আছে সাদেক উকিল, তিন হাজার বিঘার জমির মালিক আদমদিঘির মজিদ সরকার, আলতাফ মণ্ডল ও আরও অনেকে। মুসলিম লীগের মধ্যে তেভাগা আন্দোলনের কৃষকদের অন্তর্ভুক্তিকরণ কিংবা সাঁওতাল ও কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্তির বিরোধিতা করে উপস্থিত প্রায় সকলে; আর জনমানুষের পক্ষে একাই কথা বলে ইসমাইল। অবশ্য এখানে জনমানুষ হচ্ছে মুসলিম জনমানুষ। শামসুদ্দিনের কথায় উঠে আসে দীর্ঘ ঔপনিবেশিক দাসত্বের স্বরূপঃ

> জমিদারের অত্যাচার সহ্য করা যায়। কেন না তার আগামাথা আছে, নিয়মকানুন আছে। কিন্তু ছোটলোকেরা তো নিয়ম জানে না, আইন মানে না। না কী? এগুলো হলো বেয়াদব, বেয়াদবের জুলুম গায়ে জ্বলে। জ্বলে না? এখন মুসলিম লীগের ওয়ার্কাররা যদি এদের সঙ্গে থাকে তো পার্টি করতে পারবেন? (আখতারুজ্জামান ২০০৮ : ৪৫৩)

সাদেক উকিলের কাছে থাকে ইসলামিক সমাধান:

> ছোঁড়াদের ডেকে বলে দাও, তোমরা ইসলামের কথা বলো। মাথা গরম না করে পাকিস্তান হাঁসেলের কথা বলো। ইসলাম গরিবের হক আদায় করে। ইন পাকিস্তান উই উইল ইনট্রোডিউস জাকাত। ইসলাম ইজ এ ফুল কোড অফ লাইফ। আর কোনো রিলিজিওনে গরিবেকে এতো রাইট দেওয়া হয়েছে? আবার কারো প্রপার্টি লুটপাট করাও ইসলাম এ্যাপ্রুভ করে না। (আখতারুজ্জামান ২০০৮ : ৪৫৪)

এইসব অভিযোগে ইসমাইলের বিপরীত অবস্থান জেনে সাধারণ গ্রামীণ মুসলিম লীগ কর্মী ও জোতদারপুত্র কাদেরের মনস্তত্ত্বেও ইসমাইল সম্পর্কে তার প্রেক্ষণবিন্দু প্রকাশিত হয়:

> জেলার পশ্চিমে অনেকটা এলাকা জুড়ে আধিয়াররা ধান কেটে তুলেছে নিজের ঘরে। তুলুক। কিন্তু নিজেরাই ধান মেপে এক ভাগ দিতে চায় জোতদারকে আর দুই ভাগ নেবে নিজে। তা এ উৎপাত তো অনেক দিন থেকেই হচ্ছে। টাউনের মানুষ ইসমাইলের তাতে কী? (আখতারুজ্জামান ২০০৮ : ৪৫৪)

তিনহাজার বিঘা জমির মালিক মজিদ সরকার যোগ করে:

> হামাগোরে সর্বস্বান্ত কর্যা দিলো। আরে হামার বর্গাচাষা হামার জমির ধান লিয়া গেলো লিজের ঘরত, আবার শুনি ওই চাষা বলে হামারই পার্টির মানুষ। মানুষ হাসে, ইগলান কী পার্টি করো গো? ... হামাক সর্বস্বান্ত কর্যা ফ্যালালো। (আখতারুজ্জামান ২০০৮ : ৪৫৫)

তেভাগা আন্দোলনে জড়িত মুসলিম লীগের কর্মীদের উদ্দেশ্য নিয়ে তারা সংশয় প্রকাশ করে। কমিউনিস্টপন্থি, তেভাগা-আন্দোলনকারী ও মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিষ্কার হতে চায়। উষ্মা প্রকাশ করে কমিউনিস্টদের সঙ্গে আধিয়ারদের সম্পৃক্ততায়। যেমন আলতাফ মণ্ডল অভিযোগ করে:

> কিসের মোসলমান? ওঠাবসা সব সাঁওতালগোরে সাথে। সাঁওতালরা আগে কী সুন্দর বর্গা করিচ্ছিলো, ওরা জমিত হাত দিলেই ফসল, ভাগাভাগির সময় কোনো ক্যাচাল নাই। আপনের এই ছোঁড়াগুলার পাল্লাত পড়্যা ওরাও এখন ধান তোল নিজের ঘরত। (আখতারুজ্জামান ২০০৮ : ৪৫৬)

কমিউনিস্টপন্থি এই মুসলিম লীগ কর্মীদের জোতদার নেতারা অভিহিত করে 'চ্যাংড়া-প্যাংড়া' বলে এবং যে-কোনো উপায়ে তাদের পিটিয়ে গ্রামছাড়া করার সংকল্প ব্যক্ত করে। দ্বিজাতিতত্ত্বের রাজনীতিতে সক্রিয় থেকেও শিক্ষিত ইসমাইল শোনায় সম্মিলনের ও বৈষম্যমুক্তির বাণী:

পাকিস্তান হাঁসেল হলে জমিদার মহাজনের জুলুম থাকবে না। তখন হিন্দু মুসলমানের ভেদ লোপ পাবে। আমরা বাঙলার হিন্দু, বাঙলার মুসলমান স্বাধীনচেতা জাতি। বাঙলার রাজা নবাব সুলতানরা দিল্লীর কাছে কখনো মাথা নত করে নি। আজ এই বাঙলাকে ভাগ করার চক্রান্ত চলছে। বাঙলা ভাগ হলে হিন্দু, মুসলমান – সমস্ত বাঙালির মেরুদণ্ড ভেঙে পড়বে। বাঙলাকে লুটেপুটে খাবে পশ্চিমা বেনিয়ারা। আপনারা ভায়ে ভায়ে মারামারি করে, দাঙা করে বাঙলাকে টুকরো করে ফেলতে দেবেন না। (আখতারুজ্জামান ২০০৮ : ৫৭৭)

এই চিন্তা ও কর্মের সঙ্গে যুক্ত হয় কমিউনিস্ট কর্মী অজয় দত্ত। হিন্দু-মুসলমান চাষির স্বার্থে সমর্থন দেয় ইসমাইলকে। ইসমাইল অজয়ের কাছে সহজেই হয়ে যায় 'ইসমাইলদা'। স্লোগান ওঠে : 'গান্ধি জিন্নার মিলন চাই, হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই।' (আখতারুজ্জামান ২০০৮ : ৫৭৭) কিন্তু মুসলিম লীগের রাজনীতি প্রান্তিক মানুষকে যে স্বপ্ন দেখায়, তার কোনোটিই পূরণ করতে পারে না। প্রকৃত অর্থে ভোট ও ক্ষমতার রাজনীতিতে সেই দলের এমন কোনো আদর্শও ছিল না। বরং বাড়তে থাকে সাম্প্রদায়িকতা। নিহত হয় মানুষ। তেভাগায় জড়িত হয়ে তমিজকে হতে হয় গ্রামছাড়া ফেরারি। কামারপাড়া-মাঝি পাড়ার সংঘাত রূপ নেয় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায়। কামারপাড়ায় আগুন দেয় মাঝি পাড়ার কালাম মাঝির ভাতিজা আফসার। আর তার প্রতিশোধ গ্রহণ করে দশরথ ও তার দল। ছুরির আঘাতে নিহত হয় আফসার। আর এই সহিংস ঘটনায় কামার পাড়া থেকে স্লোগান ওঠে 'বন্দে মাতরম'; ওদিকে কলু ও মণ্ডল পাড়া থেকে আসে 'নারায়ে তাকবির'। স্বপ্নের স্বাধীনতা আন্দোলন ও তার রাজনীতি গ্রামীণ জনপদে এই 'উপহার'টুকু দেয়। অসাম্প্রদায়িক লোকায়ত মানুষ বৈকুণ্ঠও ছিল আফসারের সঙ্গে। শত চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারেনি আফসারকে। অথচ হিন্দু হওয়ার দরুন কালাম মাঝি তাকেই অভিযুক্ত করতে শুরু করেছিল, কিন্তু মৃত্যুর আগে আফসার বৈকুণ্ঠের সহযোগিতার কথা বলায় সে বেঁচে যায়।

একটি অঞ্চল তার স্বাতন্ত্র্য নিয়েই হয়ে উঠেছে বৃহৎ দেশের ও জাতির জীবনায়নের আনুলিপিক সংস্করণ। '*খোয়াবনামা* একটি দলিল, রাজনীতির ইতিহাস। শোষিত-শোষক শ্রেণীর ইস্তেহার, গ্রামীণ অর্থনীতির অনুপুঙ্খ বৃত্তান্ত। মাঝি, চাষী থেকে শুরু করে সব শ্রেণীর মানুষের বিন্যস্ত জীবনেতিহাস।' (মোস্তফা ২০১৪ : ৬৩) বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলের রয়েছে নিজস্ব বিশ্বাস, লোকাচার, লোককথা ও উপকথা। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর ঔপন্যাসিক দক্ষতায় বৃহৎ আখ্যানের মধ্যে সেগুলোকে সংশ্লেষিত করেন সমাজে ব্যক্তির শ্রেণি-অবস্থান, শ্রেণির বহুমাত্রিক স্তর, সম্পর্কের টানাপোড়েন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সমকালীন রাজনীতি ও তার রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের অনুষঙ্গে। সেই বিবেচনাতেই এই কাৎলাহার বিলের জন্মের ইতিহাসের সঙ্গে মিশে থাকে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ভবানী পাঠক ও তার সহযোগী কথিত মুনসি বয়তুল্লার শৌর্য-বীর্যখচিত ঘটনার ইতিকথা। ইলিয়াস

লোকায়ত পুরাণের অনুষঙ্গে উপন্যাসবিধৃত সমাজের প্রতিটি অংশের ভেতর ঢুকে মূলত প্রান্তের রাজনীতির সারসত্যকে নিরূপণ করেছেন *খোয়াবনামা* উপন্যাসে। এখানে দৃশ্যমান কেন্দ্রের রাজনীতি আছে। কিন্তু কেন্দ্রের রাজনীতিই শেষকথা নয়। কীভাবে কেন্দ্রে রাজনীতি প্রান্তে বিকশিত হতে পারল, প্রান্তকে প্রভাবিত করতে পারল, প্রান্তের কোন পটভূমিতে তা সম্ভব হলো তার শিল্পিত আখ্যান হিসেবে *খোয়াবনামা*কে বিবেচনা করা যেতে পারে।

২.২.১১

হাসান আজিজুল হকের (১৯৩৯-২০২১) *আগুনপাখি* (২০০৬) এক গার্হস্থ্য নারীর মহাকাব্যিক আখ্যান। সেই নামহীন ও সংসারসাপেক্ষ নারীর হয়ে ওঠার মধ্যে জগৎসংসারের নানামাত্রিক পরিবর্তন ঘটে। সেইসব পরিবর্তনের দিকে ওই নারী তথা মেতর বউয়ের (মেজ বউ) উচ্চারিত সরল প্রশ্নে কালের জটিল ও কুটিল সত্যগুলো উন্মোচিত হয়। রাজনীতি থেকে যোজন যোজন দূরে থাকা এই নারীর ভাবনাস্রোত বৃহৎ রাজনীতির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। বহিরাঙ্গণের ও উপরমহলের বৈষম্য এই উপন্যাসে বিধৃত রাঢ় অঞ্চলে তলের দিককার সম্প্রীতির মধ্যে জীবন-যাপন করা মানুষদের ভাবিত করে। যেমন হিন্দু ও মুসলমানের তফাৎ কী, এমন প্রশ্নে ভাবিয়ে তোলে এই গ্রামীণ গার্হস্থ্য নারীকে। কারণ এমন প্রশ্নের কথা তার চিন্তনরাজ্যে অনুপস্থিত। তার অভিজ্ঞতার ভেতর থেকে সে হিন্দু ও মুসলমানকে দেখতে চায়। একটি বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত হলো:

> ছোটবেলায় দেখেছি, আমাদের গাঁয়ে মোসলমান ছিল বেশি, হিঁদু ছিল কম। আর আমার শ্বশুর বাড়ির গাঁয়ে হিঁদু বেশি, মোসলমান কম। খুব কম। ই হলো গাঁয়ে গাঁয়ে তফাৎ। তবে সেই তফাতের লেগে উ গাঁয়ে আমাদের কুনো অসুবিদা হয় নাই, ই গাঁয়েও কোনো অসুবিদা নাই। মারামারি হরহামেশা হিঁদুতে হিঁদুতে হচে, মোসলমানে মোসলমানে হচে, আবার হিঁদু-মোসলমানেও হচে।
>
> ...
>
> তাপরে দেখেছি, হিঁদু কামার কেস্তে কাটারি কুড়ুল বানিয়ে দিচে, লাঙলের ইশ, ফাল তৈরি করে দিচে, হিঁদু ছুতোর মিস্ত্রি দরজা জানলা তৈরি করে দিচে, হিঁদু নাপিত-বউ এসে দু'পা ভিজিয়ে কতো যত্ন করে হাত-পায়ের নোখ কেটে দিচে, হাড়ি-বউ এসে সোমায় সোমায় রাত জেগে সন্তান খালাস করে দিয়ে যেচে। সারা জেবন সে সন্তানের মায়ের মতুই থেকে যেচে। কই হিঁদু বলে তো কিছুই আটকাইচে না, সব কাজই হচে। উদিকে মোসলমানরা চাষের কাজ করছে, মুনিষ খাটছে, মোসলমান রাজমিস্ত্রি স্কুল বোডিং বানাইচে, মোসলমান করাতিরা কাঠ চেরাই করচে, ঘর ছাইয়ে দিচে, সবাই সব কাজ করচে। তফাৎ কোথা হচে আমি বুঝতে পারচি না। তবে হ্যাঁ কতকগুলিন কাজ মোসলমানরাই বেশি করে, কতকগুলিন হিঁদুরা বেশি করে। ই

> গাঁয়েরই স্কুলে একজনাও মোসলমান মাস্টার নাই। ওস্তাদজি তো ইস্কুলের মাস্টার লয়। চাষাভুষো মুনিষ মোসলমানই বেশি। ক্যানে তা কি আর আমি জানি! (হাসান ২০০৬ : ৫১)

এই বয়ান থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট তা হলো সমাজে শ্রমের বণ্টনব্যবস্থা। এই শ্রমের বণ্টনব্যবস্থার সঙ্গে দীর্ঘদিনের আর্থসামাজিক পরম্পরা জড়িত। কিন্তু চারপাাশের সাম্প্রদায়িক বিবেচনা এই সরল দেখার মধ্যেও প্রশ্ন তৈরি করে। যেমন বর্ণনার শেষ চারটি বাক্য। শিক্ষা-অর্থ-ক্ষমতা – এই তিনের বিভাজনই শেষ পর্যন্ত সম্প্রদায়গত দ্বন্দ্বের দিকে নিয়ে গেছে বৃহত্তর মানুষকে। কিন্তু পার্থক্য-দ্বন্দ্ব আর সহিংসতা এক বিষয় নয়। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সামাজিক ও শ্রেণিগত বিভেদ যেমন ছিল, তেমনি অর্থনৈতিক কারণেও তারা ছিল পরস্পরসাপেক্ষ। এই নারী মুহূর্মুহূ সহিংস রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে হয়ে পড়ে স্তম্ভিত, বিস্মিত এবং আরও বেশি প্রশ্নাকুল। যে নারী জিন্নাকে চেনে না, গান্ধিকে চেনে না, প্যাটেলকেও চেনে না সে শোনে ছেচল্লিশের দাঙ্গার ভয়াবহ সব খবর। দাঙ্গায় কলকাতায় বাবুর্চির চাকরিরত গ্রামের রায়েদের বড় ছেলে নিহত হয়। গ্রামের লোকের ভাষায় 'হিঁদু মোসলমানের হিড়িকে কাটা পড়েছে'। তখন এই নারী ভাবে – 'বাসে চাপা পড়ে, টেরেনে কাটা পড়ে, কলকেতায় মানুষ কাটা পড়েছে মানে কি? মানুষ কি কদু-কুমড়ো যি বঁটির ছামনে ধরলম আর ঘ্যাঁস করে কেটে ফেললম।' (হাসান ২০০৬ : ১৩২) কলকাতার এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রায়েদের বড় ছেলের নিহত হবার ফলে নিভৃত গ্রামের একটি দরিদ্র রায়পরিবার আরও সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। কলকাতার দাঙ্গার কথা শুনে তার ভাবনাস্রোতের বয়ানটি হয় এমন:

> হিঁদু-মোসলমানে হিড়িক মানেই হচে হিঁদুকে মোসলমান মারবে, মোসলমানে হিঁদু মারবে। আর কিছু দেখাদেখি নাই, পাঁচজনা হিঁদু কলকেতার রাস্তায় একটো মোসলমানকে একা বাগে পেলে তো পিটিয়ে কিম্বা ছোরা ঢুকিয়ে মেরে ফেললে আবার পাঁচজনা মোসলমান একটো হিঁদু দেখতে পেলে চিনুক না চিনুক, কিছু করুক না করুক, তাঁকে তরোয়াল নাইলে টাংগি, নাইলে যা দিয়েই হোক মেরে ফেললে। (হাসান ২০০৬ : ১৩৩)

যে নারীর কাছে ঘর থেকে বের হওয়াই বড় মুক্তি সেখানে দেশের স্বাধীনতা, শাসকের বদল, লড়াই কৌতূহলোদ্দীপকই বটে। তাই আবারও তার প্রশ্ন : 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। লড়কে তো লেঙ্গে, কিন্তুক নিয়ে করেঙ্গাটা কি?' (হাসান ২০০৬ : ১৩৪) কেন্দ্রের উত্তরহীন এই লড়াই অচিরেই প্রান্তে চলে আসে সমরসাজে : 'এ্যাকন যেন গাঁয়ের পর গাঁ উঠে বসেছে, মোসলমানরা মাথায় ফ্যাটা বেঁধেছে, হিঁদুরা কপালে সিঁদুর লেপেছে, রাগে সবারই চোখ টকটকে লাল। বাঁশের ঝাড়ে ঢুকে বাঁশ কেটে লাঠি বানাইছে, কামারশালে যেয়ে টাঙি সড়কি এই সব বানিয়ে নিছে।' (হাসান ২০০৬ : ১৪০) এভাবে শান্তি আর সম্প্রীতির গ্রাম হয়ে ওঠে অশান্ত। বৃহত্তর রাজনীতিতে বিভাজন হয়ে ওঠে অনিবার্য। তখনও সে

এর কার্যকারণ খুঁজে পায় না। সে তার চারপাশের জগৎকে যে প্রশ্নে মধ্য দিয়ে চিনে নিতে পেরেছিল, দেশভাগের পর উত্তরহীন প্রশ্ন নিয়েই তাকে সব হারানোর বেদনা বহন করতে হয়।

হাসান আজিজুল হক সাতচল্লিশের রাজনীতির সুবিধাভোগী নন; ভুক্তভোগী। তাঁর অপরাপর কথাসাহিত্যে এই দেশ-হারানোর বেদনা নানা আঙ্গিকে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু *আগুনপাখি*র শক্তির জায়গাটি অনন্য। একজন প্রান্তিক, গার্হস্থ্য, স্বল্পশিক্ষিত নারীর দর্শন ও জবানে সেই দেশ-হারানোর বেদনা ট্র্যাজিক মহিমা নিয়ে রূপায়িত হয় এই উপন্যাসে। এই নারীর মধ্যে অনেকে ঔপন্যাসিকের মাতৃপ্রতিমার আবিষ্কার করেছেন (আলমগীর ২০১৫ : ২০৮); তথাপি এই নারী সর্বমানবিক বোধে উত্তীর্ণ হয়। চল্লিশের দশকের ঘটমান রাজনীতি সম্পর্কে তার উচ্চারণে কালের সত্যই উন্মোচিত হয় : 'ইংরেজরা যা চেয়েছিল তাই হলো। হিন্দু-মুসলমান দুই জাতকে চিরদিনের মতো একে-অপরের শত্রু করে দিলে। পাকিস্তানের নাম করে জিন্না ইংরেজদের কাজটিকেই করে দিলে আর ক্ষমতার লোভে পড়ে নেহেরু-রাও তাই করলে।' (হাসান ২০০৬ : ১৪৫) এই উচ্চারণ কেবল তার একার নয়; বেদনাহত ঔপন্যাসিকেরও।

২.২.১২

ঔপন্যাসিক হিসেবে হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২) কখনোই রাজনীতির প্রত্যক্ষ ভাষ্যকার নন। এমনকি যেসব উপন্যাসে অনিবার্যভাবে রাজনৈতিক ঘটনাক্রম প্রবেশ করে, সেসব ক্ষেত্রেও দেখা যায় রাজনীতি-বিষয়ে হুমায়ূনের রাজনৈতিক অবস্থান ও উচ্চারণ নিম্নকণ্ঠ। তাঁর বৃহদায়তনিক উপন্যাস *মধ্যাহ্নে*র (২০০৮) কালপরিসর ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ – প্রথম বঙ্গভঙ্গ থেকে দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গ। স্থান কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে। উপন্যাসের স্থানিক পরিচয় থেকে জানা যায় – বান্ধবপুর গ্রাম, যার উত্তরে গারো পাহাড়, ময়মনসিংহ জেলার একটি গ্রাম, যেখানে অধিকাংশ মানুষ হিন্দু ধর্মবলম্বী এবং সংখ্যায় অল্প মুসলমানরা জনখাটা মানুষ। বলা যায়, পূর্ববাংলার ভাটি অঞ্চলের এক নিস্তরঙ্গ গ্রাম। কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী হলেও বান্ধবপুরের সমাজ আছে, পরিবর্তনশীল বৃহত্তর রাজনীতির অভিঘাত সেখানেও পৌঁছায়। ঔপন্যাসিক যেভাবে দুই বঙ্গভঙ্গের মধ্যবর্তী সময় ও সমাজকে বেছে নিয়েছেন, তাতে রাজনীতি অনিবার্যভাবেই উপন্যাসের কাঠামোতে জায়গা করে নেয়। কিন্তু এই বৃহৎ প্রকল্পেও নিজস্ব ধরনের গুণেই কেন্দ্র থেকে দূরের জায়গার মতোই হুমায়ূনের রাজনৈতিক অভিপ্সা থাকে পরোক্ষ। সমাজগতির নিয়ম মেনে চরিত্রায়ণের মধ্য দিয়ে উপন্যাস একেকটি রাজনৈতিক ঘটনাক্রম অতিক্রম করে। সেখানে হুমায়ূন চরিত্রনির্মাণে এমন কিছু চমৎকারিত্ব তৈরি করেন, যেগুলোকে আপাত-ইউটোপীয় মনে হলেও

সমাজগতির মূল স্রোতে অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে উপস্থিত থাকে। তাই *মধ্যাহ্ন* উপন্যাস পাঠে রাজনীতির এক ভিন্নপাঠ পড়া সম্ভব; যেখানে রাজনীতি এক অর্থে নেই, কিন্তু রাজনীতি আছে গভীরতরভাবে ও অন্তর্নিহিতভাবে।

হুমায়ূন আহমেদ তাঁর *মধ্যাহ্ন* উপন্যাসে সময়ে সময়ে জানিয়ে দেন সন-তারিখসহ বড় ঘটনাগুলোর কথা। যেমন ১৯০৫ সালের উল্লেখ উপন্যাসে স্পষ্টভাবেই আছে, আছে ১৯১১ (বঙ্গভঙ্গ রদ), ১৯১৯ (জালিওয়ানওয়ালাবাগের গণহত্যা), ১৯২৬ (রবীন্দ্রনাথের ময়মনসিংহে আগমন), ১৯৩৯ (দ্বিতীয় বিশ্বযদ্ধের সূচনা), ১৯৪০ (লাহোর প্রস্তাব), ১৯৪২ (ক্রিপ্স্ মিশন, ভারত ছাড় আন্দোলন) ইত্যাদি। কিন্তু এইটুকু উল্লেখ ছাড়া পুরো উপন্যাসের চরিত্রসমূহ তাদের নিজস্ব পরিপার্শ্বসাপেক্ষ ও সমাজনিয়ন্ত্রিত। যেহেতু বান্ধবপুর হিন্দু-অধ্যুষিত এবং মুসলমানরা গরিব, তাই সেখানে হিন্দু-আধিপত্য থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু উপন্যসের শুরুটা হয়েছে প্রথাগত সাম্প্রদায়িকতা বা অসাম্প্রদায়িকতা দিয়ে নয়। হরিচরণ সাহা বলে এক গ্রামীণ ব্যবসায়ী যে অধিবাস্তবতাড়িত হয়ে এক মুসলমান বালককে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করায় এবং সেজন্য সে সমাজচ্যুত হয়। এই হরিচরণই হিন্দু-মুসলমানিত্বের ঊর্ধ্বে উঠে এক আধ্যাত্মিক মহিমা নিয়ে উপন্যাসের শুরু থেকেই পুরো উপন্যাসের আবহকে ঠিক করে দেয়। হিন্দু-অধ্যুষিত হলেও বান্ধবপুরে একটি জুম্মাঘর আছে। সেখানে পাওয়া যায় মাওলানা ইদরিসকে। এই ইদরিসও উপন্যাসের আরেক মহিমাসম্পন্ন চরিত্র। আছে লাবুস – যে হরিচরণ ও ইদরিসের স্নেহধন্য। আছে শশাংক পাল – বান্ধবপুরের জমিদার, যার এলাকায় গরু কাটা নিষিদ্ধ। আছে ধনুশেখ, যে ছিল একজন লঞ্চের টিকেট বিক্রেতা, নানা তৎপরতা ও কূটকৌশলের মধ্য দিয়ে হয়ে ওঠে বড় ব্যবসায়ী। অসহযোগ আন্দোলনের কালে প্রকাশ্যে গরু জবাই নিষিদ্ধ শশাংক পালের জমিদারিতে ধনু শেখ বলে : 'দেশ তো মুসলমানের। দিল্লির সিংহাসনে কি কোন হেন্দু ছিল? ছিলাম আমরা। হেন্দুরা দেশ স্বাধীন কইরা দিব। আমরা গদিতে বসব। এরার চোখের সামনে গরু কাইট্টা খাব। হেন্দুরা পেসাদ পাইব। হা হা হা।' (হুমায়ূন ২০০৮ : ৯৭) সাম্প্রদায়িক সংকটগুলো ধীরে ধীরে দানা বাধতে থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে হুমায়ূন তাঁর সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে বলেন:

> ভারতবাসীরা যুদ্ধে কোন পক্ষ সমর্থন করবে ঠিক বুঝতে পারে না। হিন্দু-মুসলমান দুই পক্ষে ভাগ হয়েছে। এক পক্ষ ব্রিটিশ রাজকে সমর্থন করলে অন্য পক্ষ তা করতে পারে না। কোলকাতার মুসলমানদের কেউ কেউ অদ্ভুত স্লোগান দিতে শুরু করেছে –

কানমে বিড়ি / মুখ মে পান / লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। এই লড়াই কার বিরুদ্ধে? ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে, না-কি হিন্দুদের বিরুদ্ধে? (হুমায়ূন ২০০৮ : ২১৩)

হুমায়ূনের এই উচ্চারণের মধ্যে কেন্দ্রীয় রাজনীতির প্রতি খানিকটা ব্যঙ্গ আছে আর দূরত্ব তো আছেই। হুমায়ূনের শিল্পমননের অসাম্প্রদায়িক চেতনা একটি শক্তিশালী ও আভ্যন্তর উপাদান। কিন্তু একে তিনি চরিত্রের ওপর চাপিয়ে দেন না। সাম্প্রদায়িক সংকটের কার্যকারণকে শনাক্ত করেই তিনি অসাম্প্রদায়িক অবস্থানের পরিচয় দেন। তার চরিত্র (লাবুস) তাই খুব সহজেই বলতে পারে : 'লাশের আবার হিন্দু-মুসলমান কী? লাশ নামাজ কালাম পড়ে না। মন্দিরে ঘণ্টাও বাজায় না।' (হুমায়ূন ২০০৮ : ২২০) আবার বৃহত্তর রাজনৈতিক ময়দানে সরাসরি প্রবেশ না করে ছোট ছোট অনুষঙ্গ থেকে বড় ঘটনার স্বরূপ বুঝতে চান হুমায়ূন। যেমন বান্ধবপুর গ্রামে কোনো পাকিস্তান-আন্দোলন নেই। গ্রামের মানুষ ভারতও বোঝে না, পাকিস্তানও বোঝে না। কিন্তু তারা দেখেছে শশাংক পালের শোষণ ও স্বেচ্ছাচারিতা। ফলে ধনু শেখরা হয়ে উঠেছে কুটিল, ধূর্ত ও ভয়ানক সাম্প্রদায়িক। বান্ধবপুরে বৃহত্তর রাজনীতি সক্রিয় না থাকলেও সমাজের অভ্যন্তরীণ বৈষম্যের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এবং ক্ষমতা-কাঠোমোর অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের ফলাফল হিসেবে বৃহত্তর রাজনীতির গ্রাম্য সংস্করণ ঘটে। এর মধ্যেও ব্যতিক্রম হয়ে পুরো উপন্যাসে ছায়া হয়ে থাকে হরিচরণ সাহা, তার মানসপুত্র লাবুস এবং মাওলানা ইদরিস।

সমাজে কীভাবে ব্যক্তিস্বার্থের মধ্যে বড় রাজনীতি বসত গাড়তে পারে, তার একটি বড় দৃষ্টান্ত এই উপন্যাসের ধনু শেখের কর্মতৎপরতা। পাকিস্তান-আন্দোলনের তত্ত্ব কিংবা আদর্শ কোনো কিছুর ধারে কাছে না গিয়েও ধনু শেখ মুসলিম লীগার হয় কেবল নিজের স্বার্থে। তার কাছে পাকিস্তান কায়েম ও হিন্দু-হত্যা সমার্থক হয়ে ওঠে। লাবুসের সঙ্গে ধনু শেখের এক কথোপকথনে আদর্শ থেকে তার বিচ্ছিন্নতা ও কপটতা প্রকাশিত হয়:

: সোহ্‌রাবর্দীর নাম শুনেছ?

: জি না

: তিনি এখন আমাদের নেতা। আমি তার নাম দিয়েছি কাটাকুটি নেতা।

: কেন।

: কারণ তিনি গোপনে দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা বলেন। তাঁর মন্ত্র হিন্দু কমাও।

: মুসলমান কমাও, এই মন্ত্র কি কেউ বলে?

: সব হিন্দু নেতাই মনে মনে এই মন্ত্র জপ করে। কেউ কেউ প্রকাশ্যে বলে।

: গান্ধিজি কি বলেন?

: গান্ধিজি চুপ থাকেন। মাঝে মাঝে গান্ধিপোকার মত পাদ দেন। তখন সব জ্বলেপুড়ে যায়। হা হা হা। (হুমায়ূন ২০০৮ : ২৩১)

হুমায়ূন চরিত্রের হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে তার শ্রেণি-অবস্থান ঠিক করেন। আরোপিত তত্ত্বের পরিবর্তে লোকায়ত জীবনে রাজনীতি সম্পর্কে মানুষের ভাবনাস্রোতকে গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপন করেন। এর মধ্য দিয়ে জনমানুষের মনস্তত্ত্বটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন মাওলানা ইদরিসের ভাবনা থেকে বৃহত্তর দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ রাজনীতি সম্পর্কে যে পর্যবেক্ষণটি পাওয়া যায়, সেখানে তথ্যের কমবেশি থাকতে পারে, কিন্তু তা হয়ে ওঠে সংবেদনাঘন:

> হিন্দু-মুসলমান বিরোধ বাড়ছে। কেন বাড়ছে তিনি জানেন না। উড়া উড়া শোনা যাচ্ছে – মুসলমানদের জন্যে আলাদা দেশ হবে, হিন্দুদের জন্যে আলাদা দেশ। মুসলমানের দেশে কোনো হিন্দু থাকতে পারবে না। মন্দির থাকতে পারবে না। সব মন্দির শুদ্ধ করে মসজিদ বানানো হবে। হিন্দু দেশেও একই ব্যবস্থা। তবে তাদের ব্যবস্থা আরেকটু জটিল। হিন্দুরাজ্যে ভাগ ভাগ থাকবে – এক ভাগে ব্রাহ্মণ, আরেক ভাগে ক্ষত্রিয় ... । শুধু অস্পৃশ্যদের জন্যে আলাদা দেশ হবে। অস্পৃশ্যরা সেই দেশে থাকবে। সেই দেশের নামও না-কি ঠিক হয়েছে 'হরিজন দেশ'। নামটা দিয়েছেন মহাত্মা গান্ধি। তিনি হবেন হরিজন দেশের রাজা। (হুমায়ূন ২০০৮ : ২৩৪)

অপরদিকে বৃহৎ রাজনীতির সুযোগ নিয়ে ধনু শেখ হিন্দু কমানোর নীতি গ্রহণ করে। হিন্দু ব্যবসায়ী এককড়ির সাহার দোকানসহ হিন্দুবাড়ি পেট্রোল দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করে। এমনকি মসজিদে আগুন দেবার পরিকল্পনা করে যাতে একটি বিশ্বাসযোগ্য সংঘাতমূলক পরিস্থিতি তৈরি হয়। অন্যত্র দেখা যায় – দাঙ্গাহাঙ্গামা করার জন্য লোক ভাড়া করে ধনু শেখ। উদ্দেশ্য যে-কোনো উপায়ে বান্ধবপুরকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করা। কারণ তার বিবেচনায় : 'স্বাধীন পাকিস্তান বিরাট ভালো কাজ। তার জন্যে কিছু রক্তপাত হতেই পারে। স্বাভাবিকভাবে একটা শিশুর জন্ম দিতে গিয়েও মায়েদের প্রচুর রক্ত দেখতে হয়। সেখানে নতুন দেশের জন্ম হচ্ছে। সহজ কথা নয়।' (হুমায়ূন ২০০৮ : ৪০০) ভারত-পাকিস্তান হবার ঠিক পূর্বমুহূর্তে ধনু শেখ বান্ধবপুরের ইমাম নিয়ামতকে নির্দেশ দেয় জুম্মার খুতবায় মুসলমানদের দাঙ্গায় উস্কানীমূলক বক্তৃতা দিতে। কিন্তু নিয়ামত শুভবুদ্ধির পরিচয় দেয়। সমাজ-পতিত মাওলানা ইদিরিসকে মসজিদে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ জানায়। সম্প্রীতির বাণী উচ্চারণ করে ইদরিস। দাঙ্গা প্রতিরোধে মাওলানা ইদরিস সুরা হুজুরাতের তের নম্বর আয়তের উদ্ধৃতি দিয়ে বলে:

> হে মানুষ আমি তোমাদের এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সে-ই আল্লাহর কাছে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন যে বড় সাবধানী। আল্লাহ সবকিছু জানেন, খবর রাখেন। (হুমায়ূন ২০০৮ : ৪০৭)

অত্যাসন্ন দাঙ্গা থেকে রক্ষা পায় বান্ধবপুর। এমন শুভবোধ নিয়েই হুমায়ূনের মাওলানা চরিত্ররা বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠিত স্রোতের বিপরীতে উল্টোস্রোত তৈরি করে। তাঁর মাওলানারা সর্বাংশে ধর্মজীবী নয়। অর্থাৎ বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে মাওলানারা যেভাবে চিহ্নিত হন, হুমায়ুন তার পরিবর্তে, সমাজের আর দশ জন মানুষের মতো তাদের ভালো-মন্দের সহানুভূতিশীল মানুষ হিসেবে নির্মাণ করতে চেয়েছেন। ফলে তারা সমাজে 'অপর' হয়ে থাকেনি। মাওলানা চরিত্র নির্মাণে হুমায়ূনের এই স্বাতন্ত্র্যকে মোহাম্মদ আজম (২০২০ : ১৮২) সাফল্য হিসেবে দেখেছেন:

> এক. নিজের রচনায় মওলানাদের সমাজের অর্গানিক সমগ্রের অংশ হিসাবে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে বিরল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়দান। দুই. অন্যদের জন্য পথনির্দেশ। পরবর্তীকালীন নানাজনের নানামাত্রিক চর্চা থেকে ধারণা হয়, তিনি প্রবলভাবে এদিকে বহু মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছেন।

বোঝা যায় – হুমায়ূন প্রথাগত প্রপঞ্চচালিত নন, বরং তিনি নিজেই নতুন প্রপঞ্চ তৈরি করেন। সুদূর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৃহত্তর রাজনীতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও দ্বন্দ্ব নির্মাণেও তিনি সেই পরিচয় দিয়েছেন।

বৃহত্তর পরিবর্তনের পাশাপাশি ছোট ছোট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বান্ধবপুর গ্রামে ইতি আর নেতির দরকষাকষি চলে। প্রান্তিক অঞ্চলে কারা মুসলিম লীগের নেতৃত্ব দিত, কী উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগের সঙ্গে যুক্ত ছিল ধনু শেখ তার একটি বড় দৃষ্টান্ত। সমাজে বিরাজমান ধর্মীয় বৈষম্যের সুযোগ নিয়েছে নীতিহীন ধনু শেখরা। এর আগে এই সুযোগ নিয়েছিল শশাংক পালের মত জমিদারেরা। কিন্তু অশুভ শক্তির বিপরীতে হরিচরণ-লাবুস-ইদরিসদের উপস্থিতি সমাজে ভারসাম্য রক্ষা করতে পেরেছে। 'হিন্দু-মুসলমানে মিলে একটা যে অভিন্ন সংস্কৃতি, তলার দিকে গড়ে উঠেছিল, শত কংগ্রেসি-লীগ রাজনীতির ডামাডোলেও যেটা পুরোপুরি ধসে যায়নি, সে রকম কোনো শুভ-নীতিবোধসম্পন্ন অস্তিত্বকেই আমাদের 'মধ্যাহ্ন' অর্থাৎ 'স্বর্ণযুগ' বলছেন লেখক।' (বিনায়ক : ২০১৬) হুমায়ূনের পক্ষ শুভবোধের দিকে। তাই ষড়যন্ত্রের পরিস্থিতি তৈরি হলেও লেখক তা বাস্তবায়িত হতে দেন না। হুমায়ূন বাস্তবতাকে মান্য করেই *মধ্যাহ্নের* বান্ধবপুরকে খানিকটা রক্ষা করতে পেরেছেন। কিন্তু বাংলাদেশের অপরাপর অনেক অঞ্চলে শ্রেয়-অশ্রেয়ের দ্বন্দ্বে শ্রেয়ের বিজয় সবসময় হয়নি। রক্তপাত থামানো যায়নি। হুমায়ূনের এই ভাবনালোককে তৎকালীন বাস্তবতায় ইউটোপীয় বলে মনে হতে পারে। কিন্তু হুমায়ুন কালের সত্যকে প্রান্ত থেকে দেখিয়ে একটি নতুন পাঠ নির্মাণ করতে চেয়েছেন এবং পেরেছেন।

অপরাপর সাহিত্যের মতো বাংলাদেশের উপন্যাসে সাতচল্লিশ-কেন্দ্রিক ঘটনাক্রমে সম্প্রদায়গত, গোষ্ঠীগত ও বর্গগত দ্বন্দ্ব বড় জায়গা জুড়ে আছে। কখনো কখনো এই তিনের পার্থক্যকে আলাদা করা কঠিন হয়ে যায়। এই তিনের সঙ্গে যুক্ত হয় জাতি, জাতীয়তা ও জাতীয়তাবোধের ধারণা। ফলে ইতিহাসকে শিল্পের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে গিয়ে ঔপন্যাসিকদের হাতে ইতিহাসের বিচিত্র নির্মাণ ও পাঠ তৈরি হয়েছে। উপর্যুক্ত উপন্যাসসমূহ পাঠ ও পর্যালোচনাপূর্বক বলা যায় – চল্লিশের দশকের রাজনীতি এক অমীমাংসিত ও অনিবার্য বাস্তবতা। এর পক্ষ-বিপক্ষের পরিপ্রেক্ষিত নির্মাণে সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে ঔপনিবেশিক শাসনক্রিয়া। কিন্তু সম্প্রদায়, সম্প্রদায়চেতনা ও জাতীয়তার প্রশ্নে হিন্দু ও মুসলমান দৃশ্যমান পক্ষ-বিপক্ষে পরিণত হয়েছে, যারা উভয়ই বাংলাভাষী জনমানুষ। উপন্যাসবিধৃত চরিত্র ও ঘটনাক্রমের মধ্য দিয়ে সেই প্রশ্নের মীমাংসা পাওয়া যায় না ঠিক, কিন্তু বিচিত্র প্রান্ত ও শ্রেণি-অবস্থানের মিথস্ক্রিয়ায় বাংলাদেশ ভূখণ্ডের জনজীবনের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার সামূহিক রূপটি ধরা যায়। কখনো সূক্ষ্ম আবার কখনো স্থূলভাবে অনুধাবন করা যায় শিল্পসত্তা পেরিয়ে ঔপন্যাসিকের রাজনৈতিক অবস্থান। উপন্যাস রচনার কাল, ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, জন্মস্থান-বেড়ে ওঠা – প্রভৃতি বিষয়ও ঔপন্যাসিকের রাজনৈতিক অভিজ্ঞানে সংশ্লেষিত হয়েছে। এখানে উপন্যাসগুলোর স্থানিক পটভূমির বৈভিন্ন্য স্পষ্ট। আলোচ্য উপন্যাসসমূহের কোনোটির পটভূমি তৎকালীন বাংলার কেন্দ্র কলকাতা, কোনোটির পটভূমি ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, কোনোটির চট্টগ্রাম, কোনোটি দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, নোয়াখালীর মতো প্রান্তিক পটভূমি।

আলোচিত উপন্যাসগুলোর মধ্যে বেশিরভাগই পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে রচিত। ঔপন্যাসিকদের অনেকেই চল্লিশের দশকের রাজনৈতিক ঘটনাক্রমকে প্রত্যক্ষ করেছেন। ফলে পাকিস্তান রাষ্ট্রে অবস্থান করে একদিকে পাকিস্তান রাষ্ট্রকে স্বীকার করা, অন্যদিকে ষাটের দশকে উত্তাল বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নিজের অবস্থান চিহ্নিত করার দ্বন্দ্ব উপন্যাসের নির্মাণেও প্রকাশ পেয়েছে। *খোয়াবনামা* ও *আগুনপাখি* স্বাধীন বাংলাদেশে রচিত হলেও উক্ত উপন্যাসদ্বয়ের লেখকদ্বয় পঞ্চাশ ও ষাটের দশকেরই সাহিত্যিক বলেই বিবেচিত; *মধ্যাহ্ন* এখানে খানিকটা ব্যতিক্রম। আবুল মনসুর আহমদ, আবুল ফজল কিংবা আবু ইসহাক পূর্ববঙ্গে অবস্থানসূত্রে যেভাবে অনেকটা সরলরৈখিক বিবেচনায় সাতচল্লিশের রাজনীতি ও তৎসঞ্জাত ঘটনাপুঞ্জকে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, রশীদ করীম, শওকত আলী ও হাসান আজিজুল হকের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। কারণ তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দেশহারানোর বেদনা। আবার, সত্যেন সেন ও শহীদুল্লা কায়সার সমাজতান্ত্রিক আদর্শের অনুসারী হলেও তাঁদের জীবনাভিজ্ঞতার বৈভিন্ন্য ছিল; এক্ষেত্রে জীবনায়নে ধর্মীয় পরিচয়কেও বিবেচনায় নিতে হয়। সরদার

জয়েনউদ্‌দীন বামপন্থি বলে পরিচিত হলেও আলোচ্য উপন্যাসে তার কোনো ছাপ দেখা যায় না। বরং পাকিস্তান আমলে রচিত *অনেক সূর্যের আশায়* পাকিস্তান-আন্দোলনের প্রতি সমর্থন এবং এর পরবর্তী খণ্ড হিসেবে বাংলাদেশ আমলে রচিত *বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ*য়ে পাকিস্তান-কাঠামোর অচলাবস্থা অঙ্কনের মাধ্যমে ঔপন্যাসিকের শিল্পনির্মাণে রচনাকালের রাজনৈতিক বাস্তবতার অভিঘাত ইঙ্গিতায়িত হয়। অর্থাৎ ঔপন্যাসিকদের উক্ত কালপর্বের রাজনীতিকে দেখার ও উপস্থাপন করার ধরনে বৈচিত্র্য স্পষ্ট। উপন্যাসগুলোতে যে বিষয়টি অভিন্ন, তা হলো – চল্লিশের দশকে পাকিস্তান-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতার স্বপ্ন ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি-প্রশ্নে বাংলাদেশের স্বর, বাংলাদেশের জনমানুষের বহুস্তরিক ও সামবায়িক কণ্ঠস্বর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দেশভাগ ও উদ্বাস্তু-সমস্যা

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টে পাকিস্তান ও ১৫ই আগস্টে ভারত নামক দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা উপমহাদেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক ঘটনা। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে এই দুই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার ঘটনা কেবল পূর্ববর্তী চল্লিশের দশকে সংঘটিত রাজনৈতিক তৎপরতার অনিবার্য ফলাফল নয়; বরং ঐতিহাসিক পরম্পরার মধ্য দিয়ে বাংলা অঞ্চলে বসবাসকারী জনমানুষ সাতচল্লিশের মুখোমুখি হয়। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ যে রাজনৈতিক ঘটনার জন্ম দিয়েছিল, তা নানা দৈশিক ও বৈশ্বিক ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭-এ এসে অনিবার্য রূপ ধারণ করে। এর মধ্য দিয়ে বাংলা অঞ্চলে ঘটে যায় আরও একটি বড় ঘটনা – দেশভাগ। 'দেশভাগ' শব্দ উচ্চারণের মধ্য দিয়ে যে প্রশ্নটি প্রথমেই আসে, তা হলো – দেশ বলতে কী বোঝানো হচ্ছে, কোন দেশ ভাগের কথা বলা হচ্ছে? রাষ্ট্রের ধারণার মধ্যে একটি প্রাতিষ্ঠানিক অবয়ব আছে। কিন্তু দেশ বলতে যে ধারণা, তা একটি জনাঞ্চলের মানুষের মধ্যে বিরাজমান স্বদেশের ধারণা – যা অনেকখানি অনুভূতিসাপেক্ষ। 'দেশচেতনা কোনো রাষ্ট্র-ধারণা বা শাসন-ধারণা নয়।' (দেবেশ ২০১৬ : ৭৪) কিন্তু দীর্ঘ প্রায় দুশো বছর একই ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামোর আওতায় থাকার ফলে ভারত সম্পর্কে একটি অখণ্ড দেশ-ধারণাও বিরাজমান আছে। সেই বিবেচনায় দেশভাগ বলতে সমগ্র ভারত-উপমহাদেশ ভাগের একটি ধারণা প্রচলিত আছে। কিন্তু ভারত তো কখনোই একক দেশধারণায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কংগ্রেস-কথিত একক ভারতীয় জাতীয়তাবাদে একে যৌক্তিকভাবে প্রতিষ্ঠা দেওয়া যায়নি। ফলে একটি বৃহৎ দেশ ভারত সাতচল্লিশে ভাগ হয়ে তিন ভূখণ্ডের দুই দেশে পরিণত হলো – এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আছে একমাত্রিক ভারতসাপেক্ষতা। দেশভাগকে ভারত-ভাগের প্রতিরূপ হিসেবে বিবেচনার মধ্যে একটি পূর্বতন ঔপনিবেশিক মানসিকতা যেমন উপলব্ধি করা যায়, তেমনি ওই ঘটনার পর সত্তর বছর অতিক্রান্ত হলেও এই ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রবণতার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী ক্রিয়াশীলতার উপস্থিতি দাবি করা যায়। বাংলাদেশের জনমানুষের কাছে 'দেশভাগ' বলতে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয় বাংলা-ভাগের বাস্তবতা। যদিও পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ এক দেশভুক্ত কিনা, এই নিয়ে ভিন্ন বিবেচনার সুযোগ আছে। দেশভাগ সংক্রান্ত প্রায় সকল আলোচনায় 'দেশত্যাগ', 'দেশবদল', 'দেশচ্যুতি', 'দেশহারানো', 'দেশছাড়া' প্রভৃতি শব্দবন্ধগুলো দিয়ে একটা বিপুল শ্রেণির মানুষের বাস্তুত্যাগের সংকটকে চিহ্নিত করা হয়। ওই শব্দবন্ধগুলোই চিহ্নিত করে দেয় যে, বাংলার

অন্তর্ভুক্ত দুই অংশ এক দেশভুক্ত নয়। এক দেশভুক্ত হলে ত্যাগ বা বদলের প্রসঙ্গ আসতো না। দুই বাংলা বিভিন্ন সময়ে একই প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে বিরাজমান থাকলেও, দুই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর একই ভাষা তথা 'অভিন্ন বাংলা'র দাবি জারি থাকলেও দুই অঞ্চলের ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক এমনকি ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য প্রাগৈতিহাসিক ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে সুচিহ্নিত। তারপরেও ১৯৪৭-কে দেশভাগের সাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। একইভাবে পূর্ববঙ্গের জনগণের শোষণমুক্তির আন্দোলন ও উপনিবেশমুক্তির স্মারক হিসেবেও ১৯৪৭-এর তাৎপর্য অনুসন্ধান করা হয়। এ-নিয়ে ভাবনাগত ভিন্নতা ও বিতর্ক বিরাজমান। বর্তমান অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে পূর্ববাংলার ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য আলোচিত হয়েছে। বর্তমান পরিচ্ছেদের আলোচনার আওতায় বাংলা-ভাগের ফলে বাংলা অঞ্চলের জনমানুষের মনস্তত্ত্ব, তৎপরতা, সংকট ও সমস্যা প্রাধান্য পাবে। এক্ষেত্রে এই আলোচনার উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হবে বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকদের রচিত সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিত্বশীল উপন্যাস।

'দেশভাগ' শব্দটির রয়েছে একটি পরিভাষাগত ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত। সাতচল্লিশ-পূর্বাপর সময়ে পার্টিশন, স্বাধীনতা, পাকিস্তান কায়েম, মুক্তি, নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, বাটোয়ারা কিংবা বর্ডারিং-এর বাংলা পরিভাষা হিসেবে বহুল প্রচলিত শব্দ 'দেশভাগ'। কিন্তু 'দেশভাগের' কালে তৎকালীন জনমানুষের কাছে বিশেষত পূর্ববাংলা-প্রান্তের জনগণের কাছে তা দেশভাগ হিসেবে প্রচলিত ছিল না। পঞ্চাশের দশকের উপন্যাসপাঠে সেই বাস্তবতাটি প্রকাশিত হয়। মূলত ষাটের দশক থেকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের শাসক শক্তির বিপরীতে যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকশিত হয়, তার বয়ানে দেশভাগ গৃহীত হতে থাকে। যদিও এই বাঙালি জাতীয়তাবাদ পূর্ববাংলার আর্থরাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতেই বিকশিত; তথাপি পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণনীতির বিপরীতে এক কল্পিত অখণ্ড সাংস্কৃতিক 'বাংলা দেশ'-চেতনা ওইকালের জাতীয়তাবাদী চিন্তায় অবচেতনভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। একাত্তর-পরবর্তী বাংলাদেশ-পর্বে 'দেশভাগ' শব্দটি সাতচল্লিশের রাজনীতির সমার্থক হিসেবে গৃহীত হয়। দেশভাগ শব্দগত ও রাজনৈতিকভাবে রূপ লাভ করে একটি বাঙালি জাতীয়তাবাদী বয়ানসৃষ্ট ফলাফল হিসেবে। বাংলাদেশের উপন্যাসেও দেখা যায় – পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে সাতচল্লিশকে বিবেচনা করা হয়েছে 'স্বাধীনতা' ও নতুন রাষ্ট্রপ্রাপ্তি হিসেবে; অন্যদিকে, একাত্তর-পরবর্তী উপন্যাসে একই ঘটনাক্রম 'দেশভাগ' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। অর্থাৎ একই রাজনৈতিক ঘটনা পরবর্তীকালে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তার সাপেক্ষে বিবেচিত ও সংজ্ঞায়িত হয়েছে। দেশভাগের ফলে যে স্বভূমি-ত্যাগ, দাঙ্গা, হত্যা, উদ্বাস্তু-পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তা ঐতিহাসিকভাবে সমর্থিত। এই ভাগের প্রক্রিয়াগত ত্রুটি জন্ম দিয়েছিল এক বিপর্যয়কর পরিস্থিতির। এর দায় একই সঙ্গে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি কিংবা ক্রিয়াশীল স্থানীয় রাজনৈতিক শক্তি – কোনো

পক্ষ এড়াতে পারে না। কিন্তু দেশভাগের সঙ্গে যে অখণ্ড দেশ-চেতনা জড়িত, তার ভৌগোলিক ও চেতনাগত ঐক্যের পরিধি এখন পর্যন্ত অনির্ণীত। রাজনৈতিকভাবে নতুন দুই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে নতুন সীমানা নির্ধারণ তখন ছিল অনিবার্য। ব্রিটিশ আমলা সিরিল জন র‍্যাডক্লিফ সেই সীমানা নির্ধারণের দায়িত্ব পালন করেন। বিভিন্ন জনশুমারিতে মানুষের সাম্প্রদায়িক অবস্থান তৈরি করা হয়েছিল; ধর্ম-সম্প্রদায় ও বর্ণপরিচয়ে বিভক্ত করা হয়েছিল, যা ছিল মূলত ঔপনিবেশিক শাসনপ্রণালির অংশ। সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনশুমারি ও পূর্ববর্তী নির্বাচনসমূহের সম্প্রদায়গত ফলাফল বিবেচনা কার্যকর ছিল বলে দাবি করা হয়। 'সাম্প্রদায়িকতা'কে এখানে নেতিবাচক হিসেবে বিবেচনা করলেও সম্প্রদায়গত হিসাব-নিকাশও ঠিকভাবে কাজ করেনি। এ-কারণে দেখা যায় অনেক হিন্দু-অধ্যুষিত অঞ্চল যেমন পাকিস্তানভুক্ত হয়েছে, তেমনি অনেক মুসলমান-অধ্যুষিত অঞ্চলও ভারতভুক্ত হয়েছে। আর সীমান্তবর্তী অঞ্চলের এই জটিলতা ছাড়াও দুই দেশের অভ্যন্তরে হিন্দু ও মুসলমান জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ পাকিস্তান ও ভারতের রাষ্ট্রসীমায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ফলে এই ভাগের বিষয়টি যতটা না দেশচেতনার সঙ্গে জড়িত, তারচেয়ে বেশি রাষ্ট্রধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত। এর সঙ্গে ভারত-পাকিস্তানের সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণির দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাধীনতা এবং উপনিবেশমুক্তির বিষয়টিও যুক্ত:

> In the Indian subcontinent, the word 'Partition' conjures up a particular landscape of knowledge and emotion. The break-up of colonial India in 1947 has been presented from vantage points that privilege certain vistas of the postcolonial landscape. (Willem van 2004 : 24)

কার্যকারণগত পরিস্থিতির সাপেক্ষে দেশভাগকে 'রাষ্ট্রের সীমানা চিহ্নিতকরণ' বা 'নতুন রাষ্ট্রসীমা' হিসেবে অভিহিত করা যায়। পার্টিশন-গবেষক জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে খোদ পার্টিশন শব্দটির অর্থনির্মাণে দৃষ্টিভঙ্গিগত তাৎপর্যকে নির্দেশ করেছেন:

> The `partition of India', which is how the division of the subcontinent in 1947 is universally referred to in Indian historiography, is also (for Pakistanis) the `independence of Pakistan'. Within India, the `partition' of the historians, and of the official pronouncements of the nation-state lives side by side with the `partition'/`uproar'/`migration' that survivors of 1947 speak of. (Gyanendra 2003 : 13)

পার্টিশন বিষয়ে জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে (2003 : 14) কৃষক-শ্রমিক তথা জনমানুষের ব্যবহৃত শব্দবন্ধেরও উল্লেখ করেন:

> In Bangladesh, many ordinary peasants and labourers, speaking in common Musalmani Bengali of the rural poor, refer to 1947 as `partitioner bacchar' (the year of Partition), as they

refer to 1971 as `suadhinatar [or mukti-juddher] bacchar' (the year of Independence, or `of the liberation war' — referring to massacres and widespread resistance and fighting that came with the Pakistani army's actions of that year).

জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডের পর্যবেক্ষণের সঙ্গে পার্টিশন-গবেষক সাঈদ ফেরদৌস আরও একটি অনুষঙ্গ যুক্ত করেছেন; তা হলো – পার্টিশন-স্বাধীনতার সঙ্গে 'দেশভাগ' শব্দবন্ধ ব্যবহারের সঙ্গে বাঙালি মধ্যবিত্তের 'ধর্মনিরপেক্ষ' অংশের সম্পৃক্তির প্রসঙ্গ। তিনি এই বিষয়কে প্রশ্ন-উত্থাপনের মধ্যে রেখেছেন:

Firstly, the Bangalee educated middle class (assuming this to be outside Pandey's category of common Musalmani Bengali'), in their secular Bangalee usage, use another vernacular term, *deshbhag*, meaning the division or partition (*bhag*) of the country or land (*desh*). It is a term that exists across the border of both territories of the Partitioned Bengal, which Pandey, surprisingly, seems to miss in his list. [...] In parallel to this, it is crucial to consider, for myself, why I, like many other educated *Bangalees* on both sides of Partitioned Bengal, often choose to use *deshbhag*. Does it derive from my assertion of a secularist *Bangalee*ness? Or could there be other reasons, beyond the conscious choices of an individual? (Sayeed 2022 : 181)

এই প্রশ্নের একটা উত্তর হতে পারে – ভারতসাপেক্ষতা। সত্তরের দশক থেকে সাতচল্লিশের পার্টিশনের বাস্তবতাকে ভারতসাপেক্ষ দৃষ্টিকোণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশেও বিপুলভাবে দেশভাগ হিসেবে বিবেচনার করার ফলে এর কার্যকারণগত তাৎপর্য অনেকখানি ম্লান হয়েছে। বর্তমান আলোচনায় দেশভাগ শব্দটিকেই গ্রহণ করা হবে; কিন্তু এই গ্রহণ নিঃসংশয় নয়। দেশভাগের চেতনাগত বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেই এই শব্দটিকে ব্যবহার করা হবে।

সাতচল্লিশে দেশভাগের অভিঘাত শুধু বাংলা নয়, পাঞ্জাব প্রদেশকেও দ্বিখণ্ডিত করেছিল। তবে পাঞ্জাব ও বাংলার দেশভাগের মধ্যে পার্থক্য আছে। পাঞ্জাবে দেশভাগ মানেই গণহত্যা, দাঙ্গা, নারীনিগ্রহ, নির্যাতন এবং সর্বোপরি দেশত্যাগ ও দেশহারানোর বেদনা। দেশভাগের সাহিত্য সেখানে একটি শক্তিশালী অবস্থান গ্রহণ করে। হিংসা-নৈরাজ্য সমগ্র সমাজের মতো সাহিত্যিকদের মনোজগতকেও প্রভাবিত করে। সেখানে দেশভাগের সাহিত্য হয়ে ওঠে হত্যা ও নির্মমতার শব্দরূপ। উর্দু ভাষায় ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ (১৯১১-১৯৮৪), সাদাত হাসান মান্টো (১৯১২-১৯৫৫), আতিয়া হোসেন (১৯১৩-১৯৯৮), হিন্দি ও উর্দুতে কৃষণ চন্দর (১৯১৪-১৯৭৭), হিন্দিতে খাজা আহমেদ আব্বাস (১৯১৪-১৯৮৭), ইংরেজি ভাষায় খুশবন্ত সিং (১৯১৫-২০১৪), রাওয়ালপিন্ডিতে জন্মগ্রহণকারী হিন্দি ভাষার লেখক ভীষ্ম সাহনী (১৯১৫-২০০৩), উর্দু ভাষায় ইনতিজার হুসাইন (১৯২৫-২০১৬), রিতু মেনন

(জ. ১৯৪৯), উর্বশী বুটালিয়া (জ. ১৯৫২), আয়েশা জালাল (জ. ১৯৫৬) স্ব স্ব জনপদের পরিপ্রেক্ষিতে দেশভাগের কবি, কথাকার ও গবেষক হিসেবে পরিচিতি পান; সেই পরিচিতি রাষ্ট্র ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিস্তৃত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বাংলা সাহিত্যে দেশভাগ-কেন্দ্রিক সাহিত্য রচিত হয়েছে অনেক। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) (*একটি কালো মেয়ের কথা* ১৯৭১), জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) (*জলপাইহাটি* ১৯৪৮), অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৯১৮-২০০১) (*গড় শ্রীখণ্ড* ১৯৫৭), গৌরকিশোর ঘোষ (১৯২৩-২০০০) (*প্রেম নেই* ১৯৮১), শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২-২০২১) (*সুপুরিবনের সারি* ১৯৯০), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২) (*অর্জুন* ১৯৮৭; *পূর্ব-পশ্চিম* ১৯৮৯), অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১৯) (*নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে* ১৯৭১), প্রফুল্ল রায় (জ. ১৯৩৪) (*কেয়াপাতার নৌকো* ১৩৭৬), শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (জ. ১৯৩৫) (*পারাপার* ১৯৭৯) প্রমুখের উপন্যাসে দেশভাগ, দেশভাগের স্মৃতি ও বেদনা, উদ্বাস্তু জীবনবোধের প্রসঙ্গ রূপায়িত হয়েছে। প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্য সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের দেশভাগ বিষয়ক অধিকাংশ কথাসাহিত্যে প্রাধান্য পায় মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দু জনগোষ্ঠীর পূর্ববঙ্গ থেকে উৎখাত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের ছিন্নমূল জীবনযাপনের যন্ত্রণাবোধ, স্মৃতিকাতরতা। কিন্তু ওই কালখণ্ডে পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গে চলে যাওয়া বা পশ্চিমবঙ্গে থেকে যাওয়া বাঙালি মুসলমানদের জীবনসংকট বিশেষ মাত্রা পায় না সেইসব উপন্যাসে। অবশ্য ব্যতিক্রম – দেবেশ রায়ের (১৯৩৬-২০২০) *বরিশালের যোগেন মণ্ডল* (২০১০)।

ভূরাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণে দেশভাগের চর্চা ভারতভুক্ত পশ্চিমবঙ্গ ও তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে এবং বর্তমানের বাংলাদেশে অভিন্ন থাকে না। দুইটি দেশ দুই রাষ্ট্রীয় পরিচয়ে আবদ্ধ থাকার ফলে দুইয়ের আর্থরাজনৈতিক বাস্তবতার স্বরূপ স্বাভাবিকভাবেই স্বতন্ত্র হয়ে যায়। ভারতে দেশভাগ-চর্চা সম্পর্কে একজন সমকালীন ভারতীয় গবেষকের মূল্যায়নটি উদ্ধৃত করা যায়:

> ১৯৪৭ সালের দেশভাগ সাম্প্রতিক ইতিহাস চর্চায় একটি অত্যন্ত বিতর্কিত বিষয়। তবে এই বিতর্কের অভিমুখ অতি সম্প্রতি কিছুটা হলেও বদলে গেছে। আমাদের দেশের পেশাদার ঐতিহাসিক কিছুকাল আগেও দেশভাগ নিয়ে যে ধরনের চর্চা করতেন তার মূল লক্ষ্য ছিল দেশভাগের কারণ অনুসন্ধান এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত উপরতলার রাজনীতির বিশ্লেষণ। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, জিন্না ও মুসলিম লিগের ভূমিকা, কংগ্রেস ও কংগ্রেস নেতৃবর্গের ভূমিকা, উপরতলার ব্রিটিশ প্রশাসকদের ভূমিকা প্রভৃতি দেশভাগের ইতিহাস চর্চায় বেশি আলোচিত হত। ... [সমকালে] অনেকে মনে করতে থাকেন দেশভাগ কেবলমাত্র একটি ঘটনা নয়, বরং সেটি একধরনের চলমান প্রক্রিয়া, যার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতাকে অস্বীকার করা যায় না।' (ত্রিদিবসন্তপা ২০২০ : ১৬৬-১৬৭)

দীর্ঘদিন পর্যন্ত দেশভাগের ইতিহাসচর্চা ছিল 'হাই পলিটিক্সে'র বিষয়। দেশভাগের পূর্ববর্তী কেন্দ্রীয় রাজনীতি তথা ক্ষমতার রাজনীতির শুদ্ধ্যশুদ্ধির দিকেই ছিল প্রধান মনোযোগ। সেখানে দেশভাগের ফলে জনমানুষের ওপর, বিভিন্ন শ্রেণির ওপর অভিঘাতকে শনাক্ত করার প্রয়াস ছিল সামান্য:

> উপমহাদেশের ইতিহাস বিষয়ে ঐতিহাসিকদের বর্ণনা এবং সরকারি ভাষ্য প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে প্রশ্নাতীতভাবে নারী, প্রান্তিক জন এবং সাধারণ মানুষকে অবজ্ঞা করেছে। শুধু তা-ই নয়, এসব প্রচলিত ইতিহাস নির্মিত হয়েছে ব্যক্তি ও দলকে কেন্দ্র করে, তাঁদের ভূমিকা এবং সাফল্যের জয়গাথা বর্ণিত হয়েছে ইতিহাসে। (আলী ২০২২ : ৫৯)

মূলধারার এই ইতিহাসচর্চার বিপরীত দিক হচ্ছে জন-ইতিহাসচর্চা (People`s History)। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য:

> ইতিহাস চর্চা অনেকখানি আটকে পড়েছে জাতিরাষ্ট্রের স্রষ্টা শ্রেণীটির জীবনী রচনার মধ্যে। এই শ্রেণীটি উপনিবেশগুলার ভাগ্য নিয়ন্তাও বটে। এই ইতিহাসের রাজনীতি তো খুবই স্পষ্ট। জন-ইতিহাসকে এই দুই বেড়া ভেঙে বের হবার আশ্বাস দিতে হয়। কাজটি মূলত রাজনৈতিক। (আহমেদ ২০১৮ : ১১৭)

লোকসংগীত, মৌখিক গাথা, মুখের কথা, স্মৃতিচারণ প্রভৃতি জন-ইতিহাস চর্চার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হলেও দেশভাগের ফলে জনজীবনে এর প্রভাব ও প্রভাবের প্রলম্বনকে ধরার চেষ্টার সূত্রে সৃষ্টিশীল লিখিত সাহিত্যও অন্যতম আকর অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে দেশভাগের জন-ইতিহাসচর্চা শুরু হয় নব্বইয়ের দশকে। (সেমন্তী ২০১৮ : ১২-১৩) এর প্রথম সূচনা সাব-অলটার্ন স্টাডিজের মধ্য দিয়ে; বিশেষত জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডের 'The Prose of Otherness' (১৯৯৪) প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে। এরও আগে কান্তি বি পাকড়াশির *The Uprooted : A sociological Study of the Refugees of West Bengal* (১৯৭১) গ্রন্থে দেশভাগের ফলে পূর্ব থেকে পশ্চিমে যাওয়া মানুষের উদ্বাস্তু-জীবনের কথন স্ব স্ব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। 'প্রণতি চৌধুরী-র 'রিফিউজিস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল : আ স্টাডি অব দ্য গ্রোথ অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অব রিফিউজি সেটলমেন্টস উইদিন দ্য সি এম ডি', অশোক সেন ও অলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ডিস্ট্রিক্ট ইন দ্য আরবান কনটেক্সট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল (১৯৫১-৮১)', এবং 'মাইগ্রান্টস ইন দ্য ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ডিস্ট্রিক্ট (১৯৫১-৮১)" (সেমন্তী ২০১৮ : ১৩) প্রবন্ধগুলো সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে পশ্চিমবঙ্গে দেশভাগ ও উদ্বাস্তু-সংকট নিয়ে রচিত। পশ্চিবঙ্গে দেশভাগ-সংক্রান্ত আলোচনার একটি বড় অংশ জুড়ে থাকে দেশভাগের স্মৃতিকথা, অতীতচারণ ও রোমন্থনের অনুষঙ্গ।

বাংলাদেশে দেশভাগের প্রসঙ্গটি ভিন্ন তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত থাকে। পাকিস্তান-পর্বে দেশভাগকে যেমন নতুন রাষ্ট্রপ্রাপ্তি দেখা হয়, তেমনি এর অব্যবহিত পরবর্তী সংকটে দেশভাগের সংকটের চেয়ে গুরুত্ব পায় পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ববাংলার ওপর আগ্রাসন-শোষণ ও কর্তৃত্ব প্রদর্শনের বহুমাত্রিক ঘটনা; রাজনীতি পায় নতুন গতি। নতুন প্রতিপক্ষ, নতুন শোষকের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম ও জাতীয়তার অনুসন্ধানে দেশভাগের বেদনা ও চেতনা ক্রিয়াশীল থাকে। এখন পর্যন্ত দেশভাগকে প্রচলিত ধারণায় 'ভারত-ভাগে'র বিশাল ক্যানভাসে দেখা হয়। 'অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ নিজের প্রয়োজনে 'পার্টিশন' করে – তা অন্যতম চিহ্ন ধারণ করে আছে ভারতভাগের ইতিহাস।' (মুনিরা ২০২২ : ৬৯) দেশভাগের পেছনে বৃহত্তর অর্থে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতাকে চিহ্নিত করা হয়। তবে দেশভাগ-পরবর্তী দেশভাগের আলোচনায় আধিপত্য বজায় রাখে ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা। দেশভাগের আইনসম্মত দালিলিক উপাদানের চেয়েও নব্য-ইতিহাসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জন-ইতিহাসচর্চায় সাহিত্যিক উপাদানকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়:

> দেশবিভাজনের ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণের বহু স্তর আছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমাজ-বিশ্লেষণের সঙ্গে সেইসব ঘটনাপ্রবাহ বহুবিধ ব্যাখ্যার বয়ানে সংকলিত হয়েছে। মহাফেজখানার দলিল এবং গৌণ উৎসের পর্যাপ্ত তথ্যের পরেও একথা নিঃসংশয়ে বলা যাবে যে, দেশভাগের কোনও সামাজিক ইতিহাস নেই। স্মৃতি, সাহিত্য, বর্ণনীয় আখ্যান এসবেই রয়ে যাচ্ছে সেই সামাজিক ইতিহাসের কাড়া-আকাড়া বাস্তব। (মননকুমার ২০১৯ : ১৩)

যাঁরা সরাসরি দেশভাগকে সৃজনশীল আখ্যানের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করেন, তাঁরা দেশভাগকে ও এর কার্যকারণকে প্রজন্ম থেকে প্রজান্মান্তরে সম্প্রসারিত করার দায় অনুভব করেন:

> দেশভাগের গল্পকথা কখনও সাহিত্যকে ছাড়িয়ে সাহিত্যিকের জীবনও হয়। বিষয়টি সবসময়ই আনক্লোজড চ্যাপটার। যখন দেশভাগকে কেন্দ্র করে প্রবীণদের সময়টা শেষ হয়ে যাবে, তখনও নতুন প্রজন্মের হাতে ফিরে ফিরে আসবে ইতিহাসের নতুন নতুন উপাদান হয়ে। (সেলিনা ২০১৯ : ৮৯)

চল্লিশের দশকে অর্ধযুগ-ব্যাপী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তৎকালীন বাংলা জনাঞ্চলের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ইতিহাস-সমর্থিত। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের আকার, বৈশিষ্ট্য তখনও ছিল ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলমান জনগোষ্ঠী সুবিধাপ্রাপ্ত হবে – এটিই ছিল প্রধান ধারণা।

পাকিস্তান-আন্দোলনের উত্তুঙ্গ অবস্থায় ১৯৪৬ সালের নির্বাচন ও তার অব্যবহিত পরে ১৬ই আগস্টে কলকাতাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে সংঘটিত সহিংসতা-হত্যা জনমানুষের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান এই দুইয়ের সম্প্রদায়গত বিভাজনের রেখাটি তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। এর অব্যবহিত পরে বঙ্গ প্রদেশ ভাগ করা কিংবা অখণ্ড বঙ্গ প্রদেশ রাখা – এসব নানামুখী তৎপরতা ও দরকষাকষি সত্ত্বেও ভারত-পাকিস্তান দুই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলা প্রদেশও দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এই বাস্তবতা পাঞ্জাব প্রদেশের জন্যও প্রযোজ্য। বর্তমান দেশভাগ-সংক্রান্ত আলোচনায় বাংলা-ভাগের বাস্তবতাকে চিহ্নিত করা হবে। বাংলাদেশের উপন্যাসে দেশভাগ বলতে মূলত বাংলা-ভাগের বাস্তবতাকেই রূপায়িত করা হয়েছে। দেশভাগের ফলে পুরো প্রদেশব্যাপী একটি বড় ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়। দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে উদ্বাস্তু-সমস্যা, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও রক্তপাত ঘটতে থাকে। যদিও দুই বাংলার দেশভাগ ও উদ্বাস্তু-সংকটের মধ্যে মাত্রাগত পার্থক্য আছে। শব্দগতভাবেও আজাদি-স্বাধীনতা, পার্টিশন-দেশভাগ, উদ্বাস্তু-রিফিউজি-মোহাজের প্রভৃতির পরিস্থিতিগত পার্থক্য ছিল তৎকালে। যেমন উল্লেখ্য:

> পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু সমস্যা যতটা প্রকট ছিল বাংলাদেশে ততটা ছিল না। ভারত থেকে আগত বাঙালি মুসলমানগণ এদেশে এসে উদ্বাস্তু হিসেবে পরিচিত হননি। এদেশের জনগণও তাঁদের উদ্বাস্তু মনে করেনি। এদেশে রিফিউজি হিসেবে অভিহিত হয়েছেন ভারত থেকে, বিশেষ করে বিহার থেকে, (কিছু সংখ্যক উত্তর ভারত, গুজরাট) আসা উর্দুভাষী। (গোলাম মুস্তাফা ২০১৯ : ৪৭)

পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে দেশত্যাগী তথা উদ্বাস্তুদের আধিক্য সেখানকার প্রশাসনিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় তৈরি করেছিল। জনঘনত্বময় কলকাতা এতসংখ্যক উদ্বাস্তুকে ধারণ করে প্রস্তুত ছিল না। দেশভাগ-পরবর্তী সময়ে ভারতে উদ্বাস্তু-সমস্যা মোকাবিলার জন্য কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রক ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন বিভিন্ন ধরনের কর্মতৎপরতা গ্রহণ করে। দরিদ্র-উদ্বাস্তুদের একটা অংশকে পাঠানো হয় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে। 'উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাল দণ্ডকারণ্য অঞ্চলটিকে ১৯৫৭-৫৮ সালে বাঙালি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য নির্বাচিত করা হয়।' (রণজিৎ ২০১৮ : ৫৫) সেই দিক থেকে পূর্ববাংলায় উদ্বাস্তুর ধারণাটি আলাদা। 'পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ মুসলমানের কাছেই ১৯৪৭ মানে শুধুই দেশভাগ নয়, তার কিছু বেশি। স্বাধীনতা। ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি, এবং হিন্দু প্রভুদের দাসত্ব থেকে স্বাধীনতা।' (দীপেশ ২০১৮ : ১৫৬) পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত মুসলমান বাঙালিদের পূর্ববাংলার মুসলমান কর্তৃক অভ্যর্থনা না পেলেও সমভাষী ও সমধর্মী হবার কারণে এক ধরনের সহমর্মিতা লাভ করেছিল; যদিও এতে অর্থনৈতিক ও শ্রেণিগত বৈভিন্ন্য ছিল। 'দেশভাগের ক্ষতির চেয়ে তাৎক্ষণিক শ্রেণীগত লাভটাই বড় হয়ে উঠেছিল তাঁদের চোখে।' (অশ্রুকুমার ২০১৮ :

১৯২) – এই শ্রেণিটি মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমান। পঞ্চাশের দশকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ঢাকায় আসা হায়াৎ মামুদ 'দেশটাকে কখনও বিদেশ মনে হয়নি' নিবন্ধে জানাচ্ছেন:

> এখানকার ভাষা, আচার অনুষ্ঠান নিয়ে তার [মা] কোনও বিরূপতা ছিল না। সে সময় পশ্চিমবাংলা থেকে আসা লোকজনদের এখানকার বাসিন্দারা খুব উঁচু মনে করত, তবে বিহারিদের রিফিউজি মনে করত। আমাদের প্রতি কোনও নাক সিঁটকানো ভাব ছিল না। এখানে আসার পর বাবার কোনও সামাজিক সমস্যা হয়েছে বলে শুনিনি। ... বাবা হয়তো বন্ধুবান্ধব 'মিস' করতেন, কিন্তু এখানে এসে ভুল করেছেন এরকম কখনও মনে হত না তাঁর। (২০১৬ : ১০১-১০৩)

এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির কাছে নতুন রাষ্ট্রটি নিজের হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে 'নবসৃষ্ট পাকিস্তান সুযোগসন্ধানী ও উচ্চাভিলাষী মুসলমানদের জন্য আকস্মিকভাবে বিত্তবৈভব ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ানোর সুযোগ নিয়ে এসেছিল।' (আবুল মোমেন ২০২০ : ৩১) '১৯৫১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯.৫ ভাগই ছিল মোহাজের বা উদ্বাস্তু। সে-তুলনায় পূর্ব-বাংলায় উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কম; সমগ্র জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ১.৭ ভাগ [৬.৯৯ লক্ষ]।' (আতিউর, লেনিন ২০০০ : ৯৯) আবার পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত সবাই উদ্বাস্তুও ছিল না। কারণ সাতচল্লিশের আগে শিক্ষাগ্রহণ ও কর্মসূত্রে পূর্ববঙ্গের পৈতৃকনিবাসী শিক্ষিত মুসলমানদের একটা অংশ কলকাতাতেই অবস্থান করছিল। নতুন রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতিতে তাদেরকে বলা যায় 'পশ্চিমবঙ্গ-ফেরত'। পূর্ববঙ্গ-পৈতৃকনিবাসী কলকাতাবাসী অনেক বাঙালির কাছেও কলকাতাহীন পাকিস্তানভুক্ত পূর্ববাংলাপ্রাপ্তি নিখাদ প্রাপ্তির আনন্দের যোগান দেয়নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় হারানোর বেদনা ও ছেড়ে আসার যাতনা। ঢাকায় আসাটা ফিরে আসা নয়; সম্পূর্ণ নতুন করে আসা; কলকাতাকে 'ছেড়ে দিয়ে' আসা। মুসলিম লীগের বঙ্গীয় অংশ পাকিস্তান চেয়েছিল ঠিক; কিন্তু প্রত্যাশা ছিল – পুরো বঙ্গ প্রদেশই পাকিস্তানভুক্ত হবে; আর বঙ্গ প্রদেশ যদি বিভক্ত হয়েও যায়, তা অন্তত কলকাতাহীন পাক-বাংলা হবে না। ওই সময়ের তরুণ মুসলিম লীগ কর্মী শেখ মুজিবুর রহমান যেমন বলছেন (২০১৪ : ৭৯): 'যে কলকাতা পূর্ব বাংলার টাকায় গড়ে উঠেছিল সেই কলকাতা আমরা স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলাম।' তাঁর এই উচ্চারণের মধ্যে আছে অতৃপ্তির বেদনা। ঐতিহাসিকভাবে এক অঞ্চলের ওপর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শোষণের পরম্পরাও এতে নির্দেশিত হয়। এভাবেই পাকিস্তান-আন্দোলনের কর্মীদের সমাপ্তি ঘটে 'পাকিস্তান-আন্দোলন' অধ্যায়ের; শুরু হয় আরেক নতুন অধ্যায় – পাকিস্তান অধ্যায়। এমনই বিচিত্র ভাবপুঞ্জ, চিন্তনক্রিয়া, দৃষ্টিভঙ্গির বিচিত্রতা পরিলক্ষিত হয় ওই কালের বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে।

বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকগণ চল্লিশের দশকের জটিল ও বিপুল ঘটনাপুঞ্জের জীবনসংকটকে তাঁদের উপন্যাসে রূপদান করতে চেয়েছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের ভাবনির্যাস অনুষঙ্গী হলেও বাংলাদেশের উপন্যাসে বাংলাদেশের বাস্তবতাই বেশি প্রাধান্য লাভ করেছে। যদিও ঔপন্যাসিকদের একটি অংশ পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত, সাতচল্লিশ-পূর্বকালের পশ্চিমবঙ্গের বাস্তবতা তাঁদের সৃজনসত্তাকে নির্মাণ করেছে। এই রূপদানের মধ্যে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের সমান্তরালে মূলত জনজীবনে এর অভিঘাত বড় জায়গা করে নিয়েছে। মূলধারার ইতিহাস যেখানে 'রাজায় রাজায়' লড়াইকে প্রাধান্য দেয়, জন-ইতিহাসে অলিখিত কিন্তু নিত্যবিরাজমান 'রাজায়-প্রজায়' লড়াইয়ের কার্যকারণ অনুসন্ধানে রত। এক্ষেত্রে সাহিত্য বিশেষত উপন্যাসের বয়ানের মধ্য দিয়ে কথিত ও অকথিত জন-ইতিহাসের অনেকগুলো প্রান্তকে উন্মোচন করা সম্ভব।

২.৩. ১. পূর্ববাংলার গ্রামীণ জীবনে দেশভাগের অভিঘাত

২.৩.১.১

পূর্ববঙ্গের প্রান্তিক পর্যায়ে সাতচল্লিশ-পরবর্তী দেশত্যাগের বাস্তবতাটি পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেকটা ভিন্ন। গ্রামীণ পরিসরে পরস্পর প্রতিবেশী হয়ে বসবাসরত হিন্দু-মুসলমান ছিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কে আবদ্ধ; অনেকটা প্রাকৃতিক সম্পর্কের মতো। তাই দেশভাগ তাদের জীবনে প্রথমত বড় প্রভাবও ফেলেনি। কিন্তু ক্রমেই ধনাঢ্য হিন্দুদের দেশত্যাগের প্রভাব পড়ে প্রান্তিক পর্যায়ে, বিশেষত প্রান্তিক পেশাজীবীদের মধ্যে:

> প্রথম পর্বে (১৯৪৮-৪৯) পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুদের চলে আসার প্রধান কারণটি ছিল তাদের মনস্তাত্ত্বিক সংকট। হিন্দুরা, বিশেষত অবস্থাপন্ন হিন্দুরা, কিছুতেই 'পাকিস্তান'কে মন থেকে মেনে নিতে পারছিলেন না। বংশ-পরম্পরায় পূর্ববঙ্গে তাঁরা জমি ভোগ করেছেন, সামাজিক মর্যাদা পেয়েছেন; এখন তাঁরা অনুভব করছিলেন, দেশটার অধিকার আর তাঁদের হাতে রইল না, দেশটা অন্যের হয়ে গেল; নিজভূমে তাঁরা পরবাসী হয়ে গেলেন। (সন্দীপ ২০২০ : ৭৪)

যেমন আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩) রচিত *সূর্য-দীঘল বাড়ী* (১৯৫৫) উপন্যাসে রমেশ ডাক্তার পুরোটা জীবন মহম্মদ, আলাউদ্দিন, নিত্যানন্দ, নকড়ির মতো গ্রামীণ নিরক্ষর-অজ্ঞ লোকদের চিকিৎসাসেবা দিয়ে এসেছে। চিকিৎসাসেবা-গ্রহীতাদের মধ্যেও কোনো সম্প্রদায়গত বিভাজন নেই। পূর্ববাংলার অপরাপর অঞ্চলের মতো লোকায়ত ও সমন্বিত জীবনে তারা অভ্যস্ত। জাতীয় রাজনীতি সম্পর্কে তারা কমই ওয়াকিবহাল। ওই জনপদের অন্যান্যদের মতো রমেশ ডাক্তারও নিজের জীবনমানের খুব বেশি

পরিবর্তন করতে পারেনি। টাকার অভাবে যখন জগদীশ ডাক্তারকে পাওয়া যায় না, জয়গুন-পুত্র কাসু অসুস্থ হলে এই রমেশ ডাক্তারই ভরসা। কিন্তু রমেশ ডাক্তারের দিনগুলোও হোঁচট খেতে থাকে। দেখা যায় – 'স্বাধীনতা অর্জনের পরে বাস্তুত্যাগের হিড়িক পড়েছে দেশে। ভারত ও পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের চোখে লেগেছে আলোর ধাঁধা।' (আবু ইসহাক ২০০৪ : ৮৮) কিন্তু রমেশ ডাক্তার ধাঁধায় আক্রান্ত নয়। সে হুজুগে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চায় না। স্ত্রীর পুনঃপুন তাগিদ সত্ত্বেও রমেশ এই দেশ ছেড়ে যাবে না বলে সংকল্পবদ্ধ। জগদীশ ডাক্তার, হারান ডাক্তার এরা পাততাড়ি গুটিয়ে চলে গেলেও রমেশ দেশছাড়ার কোনো যুক্তি খুঁজে পায় না। বরং তাঁর উচ্চারণে প্রকাশিত হয় বাস্তবতার কার্যকারণ:

> কতগুলো পশুর প্ররোচনায় যা হয়েছিল, তা আর হবে না দেখে নিও। ভাইয়ের বুকে ছুরি বসিয়ে আনন্দ পাওয়া যায় না – সবাই বুঝতে পেরেছে। ভাইয়ের বুকের রক্তে যে করুণ অভিজ্ঞতা হল, হিন্দু-মুসলমানের মন থেকে তা সহজে মুছে যাবে না। আর যদি একান্ত মুছেই যায়, তবে বুঝব তার পেছনে কাজ করেছে স্বার্থান্ধ হিংস্রতা। সব জায়গায় এ হিংস্রতা দেখা দিতে পারে। যেমন আসামে 'বঙ্গাল খেদা' মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ধুতিবালাদের বিরুদ্ধে গুর্খারা কুক্‌রি শান দিচ্ছে। বিহারে কোণঠাসা করে রাখা হচ্ছে বাঙালীকে। এখন এক গণ্ডগোলের ভয়ে পালিয়ে আর এক গণ্ডগোলের মুখে গিয়ে পড়তে হবে। এখানে আমাদের কিসের অভাব? কোন দুঃখে যাব আমরা ঘর-বাড়ী ছেড়ে? জানো না, এখানে আমার মা-র কোলে আছি। (আবু ইসহাক ২০০৪ : ৮৮-৮৯)

একই ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও জগদীশ ও হারান ডাক্তারের দেশত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে যাওয়া এবং রমেশ ডাক্তারের থেকে যাওয়াকে কেবল হিন্দু-মুসলমান সংকট-সম্পর্ক দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। এর সঙ্গে আসে শ্রেণির প্রশ্ন। যে জগদীশ ডাক্তাররা অনেক আগে থেকেই পুঁজির সঙ্গে তথা সুবিধাবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত, তারাই সুবিধার জায়গাটি দ্রুত শনাক্ত করতে পারে। তাদের শ্রেণিচেতনার কাছে দেশচেতনা মুখ্যতা লাভ করে না; গুরুত্ব পায় পুঁজি। আর রমেশের ভিন্ন যুক্তির পেছনে যে অমধ্যবিত্তসুলভ শ্রেণিচরিত্র আবিষ্কার করা যায়, তার সঙ্গে ধর্মের যোগ সামান্য; বরং লোকায়ত পূর্ববঙ্গীয় সহজতার উপস্থিতি অধিক। এরকম আরও দৃষ্টান্ত পূর্ববাংলার প্রান্তিক সমাজে দেশভাগকে একমাত্রিকভাবে দেখার সুযোগ দেয় না। "*সূর্য-দীঘল বাড়ি*' উপন্যাসে আবু ইসহাক গড়ে তোলেন দেশ-বিভাগের সমকালীন পূর্ববঙ্গের গ্রামের বাস্তব প্রতিরূপ।' (মহীবুল ২০০২ : ১৫৬) দেশবিভাগকালীন গ্রামীণ দরিদ্র জনজীবনে 'স্বাধীনতা', 'পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠা' বা 'দেশভাগ' বড় কোনো আদর্শ নিয়ে উপস্থিত হয় না। দূর থেকে আগত রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের খবর নিরন্ন মানুষের কাছে ধরা দেয় কেবল অনাহার থেকে মুক্তির স্বপ্ন নিয়ে। তাদের কাছে এই মুক্তি রাজনৈতিক মুক্তি নয়; তাদের কাছে এই স্বাধীনতা মানে কেবল 'রাজার পরিবর্তন'। কিন্তু কী রাজনৈতিক, কী অর্থনৈতিক কোনো মুক্তিই তাদের

মেলে না। তাই জয়গুন দেশভাগের আগেও যে সামাজিক শোষকশক্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ছিল সংগ্রামশীল, দেশভাগের পরেও তার সংগ্রাম থাকে চলমান। কিন্তু হিন্দু জনগোষ্ঠী যে মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিকভাবে বিরুদ্ধ বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছিল, তা উপন্যাসে অপ্রকাশিত থাকেনি।

২.৩.১.২

দেশভাগের ফলে পূর্ববাংলার হিন্দু-অধ্যুষিত গ্রামীণ জনপদে দৃশ্যমান পরিবর্তন ঘটে গভীরতর অর্থে। দেশভাগের ফলে কেবল ভৌগোলিক বিভাজনই ঘটে না; ধর্মের ভিত্তিতে এই বিভাজনের ফলে জনগোষ্ঠীর মধ্যেও দৃষ্টিভঙ্গিগত বিভাজন ঘটে। সত্যেন সেনের (১৯০৭-১৯৮১) *পদচিহ্ন* (১৯৬৮) উপন্যাসে এমনই একটি বাংলাদেশের গ্রাম দেখা যাবে, যেখানে দেশভাগের অভিঘাত সম্পূর্ণ মাত্রায় গ্রামটির পরিস্থিতিকে পরিবর্তিত করে দেয়। উপন্যাসে হিন্দু ধর্মাবলম্বী বন্ধু সুবিনয়ের বাড়িতে মুসলমান যুবক আনিসের আগমন, অবস্থান ও পরিপার্শ্বের পরিবর্তন পূর্ববাংলার একটি আদর্শ গ্রামে সাতচল্লিশের বাস্তবতা ও পরবর্তী বাস্তবতার অভিঘাত দৃশ্যমান। ঔপন্যাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনার কার্যকারণ বিবৃত করেছেন চরিত্রের আচরণ ও কর্মতৎপরতার অনুষঙ্গে। শুরুতেই একটি হিন্দু-বাড়িতে মুসলমান যুবকের আগমন ও সেই আগমনকে সহজভাবে গ্রহণ করার মধ্যে অসাম্প্রদায়িক পরিচর্যা আছে। কিন্তু সাতচল্লিশের কয়েক বছরের মধ্যে মুসলমান-প্রধান পাকিস্তানে বসবাস করে মুসলমান যুবককে এই স্বাগত জানানোকে এক গভীরতর মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন বা পাকিস্তানায়নের পরোক্ষ চাপ হিসেবে বিবেচনা যেতে পারে। যদিও উপন্যাসে সুবিনয়ের বাবা যামিনী, মা প্রমীলা, বোন আরতি কিংবা ছোটভাই ঝন্টুর মধ্যে মুসলমান যুবক আনিসকে স্বাগত জানাতে প্রত্যক্ষত কোনো চাপ লক্ষ করা যায় না। কিন্তু উপন্যাসের অপরাপর বাস্তবতা অবচেতনে এই পরিবর্তনকে সমর্থন করে:

> মনভাঙা মানুষের মনের গহীনে প্রবেশ করে সত্যেন সেন তুলে এনেছেন সেই ভগ্ন-হৃদয়ের হাহাকার। ... ১৯৪৭-এর দেশবিভাগের ফলে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের বিশেষ করে গ্রামের মানুষের অন্তর্জ্বালা, সামাজিক আর্থিক বিপর্যয়ের এক দুর্দান্ত রেখাচিত্র এই 'পদচিহ্ন'। (সত্যেন [বদিউর] ২০১৪ : ভূমিকা [ষোলো])

পদচিহ্ন উপন্যাসে গ্রামের নামকরণে আছে প্রতীকী তাৎপর্য – শ্রীপুর। শ্রীপুরের হতশ্রী হওয়ার মধ্য দিয়ে পরিবর্তন তীব্রতা পেয়েছে। এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ আছে আর্থরাজনৈতিক কাঠামোর। ঔপন্যাসিকের সতর্ক অসাম্প্রদায়িক ও বস্তুবাদী অবস্থান সত্ত্বেও পরিবর্তিত বাস্তবতায় জনজীবনের সম্প্রদায়গত পরিচয় স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত হয়েছে; যার প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে দেশভাগ:

> কোথায় গেল সেই গ্রাম? শ্রীপুর হিন্দু প্রধান গ্রাম। গ্রামের পূর্বপ্রান্তে ও উত্তরপ্রান্তে মাত্র দুটি মুসলিম পল্লী। হিন্দুদের অধিকাংশ চাকুরিজীবীদের পরিবার, পোষ্য। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হবার পর এই অংশটাই প্রথম দেশত্যাগ করতে লাগল। তারপর তাদের অনুসরণ করে চলল ধোপা, নাপিত, কামার, কুমারের দল। এইভাবে কখনও ধীরে কখনও জোরে গ্রামের লোকসংখ্যা ক্রমেই কমতে লাগল। অবশেষে শেষ ধাক্কা এল পঞ্চাশ সালে। সমস্ত গ্রামটা যেন ধুয়েমুছে পরিষ্কার হয়ে গেল। এখন সারা গ্রামে ৫/৭ ঘর হিন্দু বাকী আছে। (সত্যেন ২০১৪ : ১১)

সাতচল্লিশ-পরবর্তী দেশত্যাগের ফলে হিন্দুপ্রধান গ্রামগুলোর একটি অনুবিশ্ব হয়ে ওঠে শ্রীপুর গ্রাম। হিন্দু ধর্মাবলম্বী অনেক মানুষ যেমন স্বভূমি-স্বদেশ ত্যাগ করেছে, তেমনি অনেক দরিদ্র মুসলমানেরও আগমন ঘটে। এর ফলে গ্রামের ভূগোলটিই বদলে যায়। তাই আনিসের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে ঔপন্যাসিক জানান : 'এতো শুধু শ্রীপুর বা ঘাসির পুকুরপারের কথা নয়, এ তো সারা দেশের কথা। হাজারে হাজারে নয় লাখে লাখে গিয়েছে আর এসেছে। শ্রীপুরের মধ্য দিয়ে সারা দেশের ছবিটাই আমি দেখতে পাচ্ছি।' (সত্যেন ২০১৪ : ৮৫) এই পরিবর্তন দুই সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক কাঠামো ও শ্রেণিবিন্যাসকেও নির্দেশ করে। ফলে আকস্মিক দেশত্যাগ বা দেশ হারানোর বেদনার সঙ্গে এই অর্থনৈতিক ও তৎসঞ্জাত সাংস্কৃতিক পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে *পদচিহ্ন* উপন্যাসে; আনিসের শ্রীপুর গ্রামবীক্ষণের মধ্য দিয়ে। পরিবর্তনগুলোও হয়েছে দৃশ্যমান – পোস্ট অফিসে চিঠির খোঁজ নেওয়া, হাটবারে গল্প-আড্ডা, পাঠাগারে দৈনিক পত্রিকা পড়া এগুলো বন্ধ হয়ে যায়। কারণ পড়াবার লোক নেই। অন্যদিকে সুবিনয়ের বাবা যামিনী স্কুলে গিয়ে দেখে নতুন নতুন 'ছোকরা'রা মাস্টার হয়ে এসেছে। অর্থাৎ হিন্দু পণ্ডিতদের জায়গা দখল করে নিয়েছে যুবক মুসলমান মাস্টাররা। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের পার্থক্যের উদাহরণ মিলবে ধর্মীয় আচার-প্রথার ক্ষেত্রেও। তাই স্মৃতি হাতড়িয়ে যামিনী জানায় : 'এখানে দশ মাইল জায়গা ঘুরে দেখ, এক ঘর ব্রাহ্মণ খুঁজে পাবে না। আমাদের এই গ্রামে এক দিন কুড়িটা পুজো হ'ত।' (সত্যেন ২০১৪ : ১৩) এক ধরনের শূন্য ভবিষ্যতই যেন তাদের জন্য অপেক্ষা করে। এজন্যই যামিনীকে বলতে শোনা যায় : 'আমাদের শিকড় ছিঁড়ে গেছে। এবার আমরা শুকিয়ে ঝরে পড়ব।' (সত্যেন ২০১৪ : ১৩) এই উচ্চারণে ওই জনগোষ্ঠীর সত্তামূলের সঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কৃতিগত যোগ অনুধাবন করা যায়। অর্থনীতি-রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম-সংস্কৃতির যোগ গভীর ও ঘনিষ্ঠ।

আরও কিছু পরিবর্তনচিত্র পাঠককে আর্থরাজনৈতিক বাস্তবতা সম্পর্কে নতুন ভাবনার খোরাক যোগায়। দেখা যায় – আগে যেটা ছিল রান্নাঘর, সেটা পরিণত হয় গরু রাখার গোয়ালঘরে। পূর্বে যেখানে বিকাল বেলা কানু সেনের পরিবার ঘাসের উপর বসে চা খেতো, এখন সেই জায়গা রূপান্তরিত হয় অজস্র লাউ-

কুমড়ার প্রকাণ্ড বড় একটা মাচায়। একদিকে রুচিসম্পন্ন সংস্কৃতি, অন্যদিকে রিফিউজি মুসলমানদের অনান্দনিক সংস্কৃতি – এ-দুয়ের পার্থক্য পূর্ববর্তীকালের এই দুই সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক বৈষম্যকেও নির্দেশ করে। অর্থনৈতিক কারণেই এক পক্ষ হয়ে উঠতে পেরেছিল নান্দনিক ও মার্জিত; অপর পক্ষকে অমার্জিত জীবনযাপন করতে হয়েছে, কেবল বাঁচার জন্য লড়াই করতে হয়েছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ও দেশভাগের মতো বড় ঘটনা এই পার্থক্যকে স্পষ্ট করে তোলে। এই পার্থক্যের উত্তর পরবর্তী পর্যায়ে কুদ্দুস মিয়ার বক্তব্যে পাওয়া যায়। কুদ্দুসের দীর্ঘ আলাপ থেকে জানা যায়, হিন্দু জমিদারদের দ্বারা দরিদ্র মুসলমানদের নির্যাতিত ও উৎখাত হওয়ার ইতিবৃত্ত। অর্থ ও প্রশাসনযন্ত্রকে ব্যবহার করে হিন্দু জমিদাররা পূর্বতন শেখপাড়া থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করে গোড়াপত্তন করে শ্রীপুরের। ইতিহাসের চঙ্ক্রমণে পাকিস্তান হবার পর হিন্দুরা আবার হয় কোণঠাসা। জমিদাররা জমিদারি হারালেও কোনো না কোনোভাবে অর্থের জোরে, বাড়িবদল করে পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে ভালোই থাকে। কিন্তু অন্য সাধারণ হিন্দু যেমন সুবিনয়ের বাবা যামিনীদের যাপন করতে হয় এক নিরাপত্তাহীন জীবন – স্বদেশে থেকেও পরবাসীময় জীবন। পাকিস্তান-আন্দোলনে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের অবস্থানগত ও চিন্তাগত পার্থক্য ছিল যেমন স্পষ্ট, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তার অভিঘাতের ধরনেও ছিল শ্রেণিসাপেক্ষতা।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় পূর্ববঙ্গের মুসলমান খুশি হয়েছে আর হিন্দুরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে – এই প্রচলিত কথার ভেতরেও আছে কথা। যেমন, উপন্যাসে কথোপকথনসূত্রে দেখা মিলবে সাত্তারের পিতামহ আরবালী হাওলাদারের। পাকিস্তান হবার আগে যে জমিদারি ব্যবস্থা ছিল এবং জমিদার ছিল শ্রীপুরের চৌধুরী বাবু, তার প্রতি সে সপ্রশংস সমর্থন জানিয়েছে। এর কারণ – সে ছিল সেই জমিদারির তহশিলদার। অর্থনৈতিকভাবে সে জমিদারিপ্রথা ও হিন্দু জমিদারদের দ্বারা সুবিধাপ্রাপ্ত, তাই মুসলমান হয়েও সে পাকিস্তানপূর্ব কালেরই সমর্থক। অর্থনৈতিক সম্পর্কের কাছে ধর্মীয় বোধ এখানে গৌণ। দেশভাগ দীর্ঘ দিনের ব্রিটিশবিরোধী তথা ঔপনিবেশিকতা বিরোধী চেতনার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনে। ঔপন্যাসিক বিষয়টিকে প্রথমত প্রতীকী ব্যঞ্জনায় এবং পরে অতীত ঘটনার অনুষঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। একটি বিশেষ বকুল গাছকে দেখিয়ে সুবিনয় আনিসকে বলে : 'পাকিস্তান হবার বছরখানেক আগে গাছটা ঝড়ে ভেঙ্গে পড়েছিল। গোড়াটা এখনও রয়ে গেছে।' (সত্যেন ২০১৪ : ২৪) এটি নিছক সাধারণ কোনো বকুল গাছ নয়। এর সঙ্গে রাজনীতিসচেতন সত্যেন সেন যুক্ত করে দেন বিপ্লবী আনন্দের কথা; কথিত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন তথা বিশের দশকে বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে জেলবাস শেষে যে আনন্দ ছিল ঘরবন্দি। স্বাধীনতা আন্দোলনে সফল না হতে পারার দুঃখবোধ নিয়ে আনন্দ এই বকুল গাছের ডালে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। মৃত্যুর মধ্য দিয়েও আনন্দ গ্রামে বিপ্লবী শক্তি হয়ে

বেঁচে ছিল। কিন্তু পাকিস্তান হবার আগে এর ভেঙে পড়া যেন সেই বিপ্লবের পরাজয় নির্দেশ করে। অসহযোগ আন্দোলনের কর্মী আনন্দের নামে প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরিটাও বন্ধ হয়ে যায়। শেষপর্যন্ত লাইব্রেরির দরজা জানালাও যে যেভাবে পারে খুলে নিয়ে যায়। তবে তা নিঃশেষ হয়ে যায় না; বকুল গাছের গোড়াটি থেকে যায়। এই গোড়া থেকে যাওয়ার মধ্যে বিপ্লবের আশাবাদ সম্ভাবনা জিইয়ে রাখেন শতভাগ বামপন্থি ঔপন্যাসিক সত্যেন সেন:

> সত্যেন সেনের নির্মোহ সমাজ-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলনে হিন্দু-মুসলিম সংকট এ উপন্যাসে বস্তুনিষ্ঠ স্বরূপে অভিব্যক্ত হয়েছে। জীবনের বহির্বাস্তবতার রূপ-রূপান্তরের সঙ্গে মানুষের অন্তর্জীবনে যে পরিবর্তন ও সংকট হয়ে ওঠে অনিবার্য, তার রূপায়ণেও সত্যেন সেনের সার্থকতা সন্দেহাতীত। (রফিকউল্লাহ ২০০৯ : ১২২)

বহির্বাস্তবের পরিবর্তনশীলতার সঙ্গেই অন্তর্বাস্তবতার বিচিত্র ধরনের সংকট যুক্ত থাকে। বলা যায় একটি আরেকটির সাপেক্ষ। ওই কালপর্বে বহিরাঙ্গণের দৃশ্যমান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যালঘুত্বের পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকা মানুষের মধ্যে আতঙ্কের উপস্থিতি একটি বাস্তবতা। ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অনিশ্চয়তার মনস্তত্ত্ব বিরাজ করতে থাকে। যেমন উপন্যাসে দরিদ্র মরণ কৈবর্তদাসও সুবিনয়কে প্রশ্ন করে : 'সত্যি করে বলুন বাবু, এ দেশে কি থাকা যাবে?' (সত্যেন ২০১৪ : ২৫) যদিও মরণের দেশত্যাগ করার কোনো কারণ নেই। এখানেও তার সম্পদ নেই, কোথাও নেই। ফলে নতুন করে হারাবারও কিছু নেই। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিকভাবে সে অপরাপর হিন্দু গ্রামবাসীর মতোই হয়ে ওঠে প্রশ্নসংশয়াকুল। কারণ এমন প্রশ্ন শুধু তার একার না, এমন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে অনেক, সুবিনয়কেও তা শুনতে হয়েছে, পত্রিকায় পড়তে হয়েছে। শিক্ষিত সুবিনয় বরাবরই বলতে চেয়েছে : 'আমাদের নিজেদের মাতৃভূমি ছেড়ে আমরা কোথায় যাব? কেনই-বা যাব?' (সত্যেন ২০১৪ : ২৬) শিক্ষিত সুবিনয়ের কাছে রাষ্ট্রের পরিবর্তন হলেও আদর্শায়িত মাতৃভূমির চেতনা বিদ্যমান। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে অনেক মানুষকে দেশত্যাগ করতে হয়েছে। তাই ধীরে ধীরে সুবিনয়েরও আত্মবিশ্বাস কমতে থাকে। ঔপন্যাসিক অর্থনৈতিক বিন্যাসের কার্যকারণ সম্পর্ক উন্মোচন করে সংকটের স্বরূপ উদ্ধার করতে সচেষ্ট। আনিস বারবার প্রশ্ন করে জেনে নিতে চায় এই অঞ্চলের মুসলমানরা কেমন আছে। জানা যায়, মুসলমানরাও দরিদ্র, কারও জমি আছে, কারও তাও নেই। মরণ দাসের চেয়েও দরিদ্র লোক আছে। তখন আনিস প্রশ্ন করে : 'আপনি তো অভাবের জ্বালায় হিন্দুস্থান চলে যাবার জন্য ছটফট করে মরছেন। সে দেশে গেলে আপনার কি গতি হবে, আপনিও জানেন না, আমিও জানি না। কিন্তু এই যে-সব গরীব মুসলমানদের কথা বললেন, এরা কি করবে, এরা যাবে কোথায়? হিন্দুস্থানে তো আর এদের জায়গা মিলবে না।' (সত্যেন ২০১৪ : ৩১) এই প্রশ্নের উত্তর মরণ প্রকাশ্যে দিতে পারে না ঠিক, তবে

তার মনের ভেতর যে উত্তরটি প্রস্তুত হয়ে থাকে, তার মধ্য দিয়ে বিজিত শ্রেণির মনস্তত্ত্বটি পরিষ্কার হয়ে যায় : 'এরা যা চেয়েছিল তা তো পেয়েইছে, এ নিয়ে এদের বলবার কি আছে! কিন্তু আমি তো তা চাই নি, আমি তো ছটফট করবই।' (সত্যেন ২০১৪ : ৩১) এভাবেই ঘটনার ভেতরের ঘটনার দিকে দৃষ্টি রাখেন ঔপন্যাসিক। তাঁর কাছে কেবল গ্রামের প্রকৃতি নয়, গ্রাম মানে গ্রামের মানুষ। আর গ্রামের মানুষের পরিবর্তনগুলো দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে এর বহিরঙ্গের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। এর সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে বসবাসরত গ্রামের মানুষের বসবাসের সঙ্গে ধর্মীয় পরিচয় যুক্ত হতে থাকে সাতচল্লিশ-পরবর্তী নবপ্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের বাস্তবতায়। একদিকে শ্রীপুর যেমন শ্রীহীন হয়ে উঠতে থাকে, অন্যদিকে মুসলমান-প্রধান ঘাসির পুকুরপাড়ে মুসলমান যুবকদের তৎপরতাও বাড়তে থাকে। বোঝা যায়, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা বা দেশভাগ কোনো সুস্থির অর্থনৈতিক মীমাংসা তৈরি করতে পারেনি। বরং বেড়েছে মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক সংকট।

দেশভাগের ফলে কেবল যাওয়ার চিত্র নয়, আসার চিত্রও আছে। যেমন খুরশেদ সাহেবকে দেখা যায়, যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত। ঢাকা শহরে থাকতে চেয়েও আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় ঘাসির পুকুরপাড়ে এসে বসত করতে হয়েছে। কলকাতায় একসময় একই অফিসে কাজ করার সুবাদে ও বন্ধুত্বের সূত্রে বঙ্কিম রায় নিজে এসে তার বাড়িতে খুরশেদ সাহেবকে থাকার ব্যবস্থা করেছিল। বলেছিল : 'তোমার যত দিন প্রয়োজন হয়, তুমি সেখানে গিয়েই থাক। তোমরা যত দিন থাকবে আমার বাড়ীটাও ভালো থাকবে, নইলে তো দশ ভূতে লুটেপুটে নিয়ে যাচ্ছে।' (সত্যেন ২০১৪ : ১১৩) অর্থাৎ দেশভাগ তৈরি করেছিল এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি; যে যতটুকু পেরেছে সম্পদ রক্ষা করতে চেয়েছে; নয়তো তা অতীত স্মৃতি, আনন্দ আর শেকড়চেতনার মতোই ছিনতাই হয়ে গেছে। ঘাসির পুকুরপাড় যদিও খুরশেদ সাহেবের কাছে পূর্ববঙ্গের অচেনা অজানা গ্রাম, কিন্তু বাস্তবতার প্রয়োজনেই তাকে থাকতে হয় সেখানে। এভাবেই দেশভাগের ফলে বহু মানুষ বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে সঙ্গে নিয়ে তাদের জীবনকে যাপন করে চলে। দেশ হারানোর বেদনা হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই আক্রান্ত করে। যেমন বঙ্কিম বাবুর বাড়িতে গন্ধরাজ ফুল দেখে কেঁদে ওঠে খুরশেদ সাহেবের স্ত্রী। জানতে চাইলে বলে : 'আমাদের গন্ধরাজ গাছটায়ও তো এমনি ফুল ফুটতো – এরচেয়েও বড়।' (সত্যেন ২০১৪ : ১১৯) এইসব অনুভূতির কোনো বৈষয়িক পরিমাপক নেই। কিন্তু সহৃদয় মানুষের জীবনে এইসব স্মৃতির বেদনা অশেষ, এবং এই বেদনাকে নিয়েই দেশভাগের বাস্তবতা তাদের জীবনে বিরাজ করে।

বাংলাদেশের জনসমাজে ব্রিটিশ শাসনকালে ধর্মীয় অপরায়ণ ঘটেছিল। এই বাস্তবতাকে স্বীকার না করে কেবল মিলনের চেষ্টা বৃথা-চেষ্টা হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে – সংকট কাটেনি। অপর হওয়া ও অপর করার আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যকারণ ইতিহাসে আছে। অপরায়ণের ক্ষতগুলো আগে শনাক্ত করা জরুরি – তারপর সম্মিলনের প্রসঙ্গ। বাংলাদেশের উপন্যাস এই ক্ষত শনাক্তে সফলতা দেখাতে পারেনি। অন্তত জাতীয়তাবাদী ঘরানার উপন্যাসগুলো সম্পর্কে এ কথা বলা যায়। আমৃত্যু মার্কসবাদী রাজনৈতিক কর্মী সত্যেন সেন এই ক্ষতগুলো চিহ্নিত করতে চেয়েছেন তাঁর উপন্যাসে। তাঁর সাহিত্যসৃজনে রাজনীতির প্রত্যক্ষতা সম্পর্কে সমালোচকের অভিমত : 'সৃষ্টিশীল সত্যেন সেনের সমগ্র সত্তার উপর ছিল মার্কসবাদী রাজনীতির একক অধিকার। ফলে তাঁর সমগ্র সাহিত্যভাণ্ডার হয়ে উঠেছিল মার্কসবাদী রাজনৈতিক দর্শনের শব্দভাষ্য।' (কুদরত ২০১৩ : ১৬৩) তাই সত্যেন সেনের জীবনবীক্ষণ অপরাপর ঔপন্যাসিকদের থেকে স্বভাবত স্বতন্ত্র পরিচয়ে শনাক্তযোগ্য। তিনি ব্যক্তিকে নির্মাণ করার ক্ষেত্রে তার সামগ্রিক হয়ে ওঠার পরম্পরাগুলোকে বিবেচনায় এনেছেন। তিনি রাজনীতির পক্ষ-বিপক্ষ অবস্থানের চেয়েও বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণিগত সংকটকে উন্মোচন করেন। তাঁর *পদচিহ্ন* উপন্যাসে 'সমাজদ্বন্দ্ব ও শ্রেণীদ্বন্দ্বপীড়িত জনজীবনের মধ্য থেকে যারা নতুন সম্ভাবনার লক্ষ্যে উজ্জীবিত, আনিস, সুবিনয়, সাত্তার সেই বিকাশমান মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর প্রতিনিধি। তারা হিন্দু কিংবা মুসলমান নয়, বাঙালি।' (রফিকউল্লাহ ২০০৯ : ১২৪) ইতিহাস-রাজনীতির সঙ্গে ঔপন্যাসিক সত্যেন সেনের সম্পর্ককে সমালোচক দেখেছেন এভাবে:

> *পদচিহ্ন* (১৯৬৮) ও *উত্তরণ* (১৯৭০) উপন্যাসে সত্যেন সেন চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের সমাজ ও রাজনৈতিক বাস্তবতার যে বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন তাতে ঔপন্যাসিকের সততার প্রমাণ বিদ্যমান। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি যেমন অসাম্প্রদায়িক, তেমনি নিম্নবর্গের মহিমা আবিষ্কারে অগ্রসর। তিনি সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করেই উদ্ঘাটন করেন দুই প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যকার ব্যবধান-বিদ্বেষের মূল কারণ ও প্রকৃত সত্য। (সৈয়দ আজিজুল ২০২২ : ৫৮)

তৃতীয় পক্ষের চোখ দিয়ে তিনি সমাজ-সংকটকে দেখেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বিরোধ, মৃত্যু-হত্যার বিরুদ্ধে তাঁর শৈল্পিক অবস্থান স্পষ্ট হলেও ব্যক্তির ধর্মীয় বিশ্বাস, ধর্মীয় সংস্কৃতিগত বোধকে অনুষঙ্গ করেই তা নির্মাণ করেছেন। ফলে কোনো চরিত্র যখন বিভিন্ন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়, তখন তার অবস্থান তথা তার সমাজ-ধর্ম-সংস্কৃতিকে নিয়েই অবস্থান করে। ফলে তার অবস্থানের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছে। এভাবেই সত্যেন সেনের ঔপন্যাসিক সত্তা ইতিহাস ও রাজনীতির বস্তুবাদী পাঠের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে। সাতচল্লিশ-পরবর্তী হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে শীতল সম্পর্কের কালে দুই সম্প্রদায়ের দুই যুক্তিশীল যুবককে নির্বাচন করেছেন সত্যেন সেন। তারা জানতে চেয়েছে পরস্পরকে,

দূর করতে চেয়েছে পারস্পরিক অপরতাবোধ। তাদের এই জানতে চাওয়ার মধ্যে কোনো জাতীয়তাবাদী আতিশয্য নেই। সংকটের স্বরূপ বুঝতে চাওয়ার জন্য তারা সংকটের কার্যকারণ ও ঐতিহাসিক পরম্পরা বুঝতে আগ্রহী। এ-জন্য আনিসকে নিয়ে সুবিনয় গ্রামের পর গ্রাম ঘুরেছে। হিন্দু-মুসলমান – কেবল এই দুই বর্গের মধ্যে ফেলে তারা মানুষকে বিচার করতে চায়নি, বরং এর ভেতরেও যে বহুস্তরিত অর্থনৈতিক শ্রেণিবিভাজন আছে তার স্বরূপও উন্মোচন করতে চেয়েছে। সময় ও রাজনীতির পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের জীবনের রূপান্তর – উন্নতি বা অবনতির চিত্র অনেকখানি নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রূপায়ণ করেছেন সত্যেন সেন তাঁর *পদচিহ্ন* উপন্যাসে।

২.৩.১.৩

পদচিহ্নের মতো শহীদুল্লা কায়সারের (১৯২৭-১৯৭১) *সংশপ্তক* (১৯৬৫) উপন্যাসে রূপায়িত হয় পাকিস্তানের জন্ম-পরবর্তী পূর্ববাংলার গ্রামীণ বাস্তবতার ক্রমভঙ্গুর চিত্র। ক্ষমতাকেন্দ্রের ঘটে পরিবর্তন – যুদ্ধ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সুবিধাপ্রাপ্ত হয় সুযোগসন্ধানীরা। একসময়ের ফেলুমিয়ার লাঠিয়াল রেঙ্গুন-ফেরত লুম্পেন শ্রেণিভুক্ত রমজান বনে যায় কাজি মোহাম্মদ রমজানে; পেয়াদা কালু হয় কালু শেখ। যুদ্ধের কালোবাজারিতে ফুলে ফেঁপে ওঠা রমজান তালতলির দত্তবাড়িকে পরিণত করে কাজিবাড়িতে। সাতচল্লিশের নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার রাজনীতি প্রান্তবর্তী জনপদেও সংঘটিত করে শ্রেণির রূপান্তর। এই রূপান্তর স্বাভাবিক নয়; পূর্ববর্তীকালে বিশ্বযুদ্ধ-মন্বন্তর পরিস্থিতিতে কালোবাজারি ও নারীপাচার এবং দেশভাগের বাস্তবতায় প্রতিবেশী সম্প্রদায়কে উৎখাত করার মধ্য দিয়ে রমজানের এই রূপান্তরের সুযোগ ঘটে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বাস্তবতায় হিন্দু ধর্মালম্বীরা যে নিজ গ্রাম-ভূমি এবং আজন্ম স্মৃতি থেকে উৎখাত হয়, তারই চিত্র দেখা যায় তালতলি গ্রামের দৃশ্যমান পরিবর্তনে:

> জন নেই, মানুষ নেই, কোথাও এতটুকু কোলাহল নেই। বড় বড় দালানগুলো দাঁড়িয়ে আছে বসতিহীন শ্রীহীন শোভাহীন। যেন প্রাগৈতিহাসিক কঙ্কালের সারি। সভ্যতার কোনো লুপ্ত যুগের স্মারক। কি এক শূন্যতায় খাঁ খাঁ করছে তালতলি। শ্মশানের দীর্ঘশ্বাসের মতো কি এক হাহাকার তালতলির মাটির বুকে। (শহীদুল্লা ২০১০ : ৩৬৫)

আরও কিছু পরিবর্তন যা সামগ্রিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনকে নির্দেশ করে:

> চুম্বকের আকর্ষণের মতো মালুর চোখজোড়া গেঁথে থাকে কাজিবাড়ির ফটকে। পুরনো দত্তবাড়ির শক্তি আর দম্ভকে ম্লান করে দিয়ে সেই সাবেক গাঁথুনির ওপর মাথা উঁচিয়েছে শক্তি আর বিলাসের নতুন ইমারত। আসমান বিস্তৃত তার অভিলাষ। আসমান উঁচু তার ঔদ্ধত্য। (শহীদুল্লা ২০১০ : ৩৭০)

হঠাৎ প্রাপ্তির উচ্ছ্বাস সমাজে একটি ভারসাম্যহীন অবস্থার সৃষ্টি করে। শহীদুল্লা কায়সার নির্মোহভাবে একই সঙ্গে দেশভাগের অনিবার্যতা যেমন রূপায়িত করেন, তেমনি এর ফলে উদ্বাস্তু ও দেশবদল ছাড়াও-যে পূর্ববাংলার জনজীবনে কিছু নেতিবাচক পরিস্থিতির তৈরি হয়, তার ভাষারূপ নির্মাণ করেন। *সংশপ্তক* উপন্যাসে দেশভাগের ফলে প্রত্যক্ষ সংকট বা উদ্বাস্তু-সমস্যার রূপায়ণ নেই; বরং এর ফলে মুসলমান অংশের অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবনপ্রাপ্তির চিত্র আছে। নতুন রাষ্ট্রের দ্বিতীয় রাজধানী ঢাকা নতুন নতুন সংস্কৃতি ও জীবিকার সন্ধান দেয় দীর্ঘ কাল ধরে পিছিয়ে পড়া মুসলমান জনগোষ্ঠীকে। তাই দেখা যায়, কলকাতায় ভাগ্যের অন্বেষণে নানা জায়গা থেকে ঘা-খাওয়া মালু অর্থাৎ আবদুল মালেক ঢাকায় রেডিও স্টেশনে চাকরি পায়। নানা জায়গা থেকে গান গাওয়ার আমন্ত্রণ আসে। কিন্তু নতুন রাষ্ট্রের রুচির দীনতা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে মালুর চোখে। সেই নিয়ে আক্ষেপ করলে উত্তরে জাহেদ জানায় : 'মধ্যযুগীয় পঙ্ককুণ্ড থেকে উঠে আসছি আমরা। পিছিয়ে পড়া জাত, স্বাধীনতার সনদটা পেয়ে গেলাম বলেই রাতারাতি বদলে যাবে দৃষ্টি-ভঙ্গিটা, ভাবছিস কেন?' (শহীদুল্লা ২০১০ : ২৭৮) এখানে দেশভাগের প্রতি ঔপন্যাসিকের নীতিগত অসমর্থন আছে; ইতিহাস ও রাজনীতির সঙ্গে মেশে শিল্পীর দায়বদ্ধতা।

২.৩.১.৪

কাৎলাহার বিল-কেন্দ্রিক আঞ্চলিক জীবনে চল্লিশের দশকের পাকিস্তান-আন্দোলনের রাজনীতি যে বেশ কার্যকরভাবে ও সেই জনজীবন-উপযোগী হয়েই প্রভাব বিস্তার করেছে, তা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *খোয়াবনামা* (১৯৯৬) উপন্যাস-সংক্রান্ত পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। ১৭৫৭ থেকে মিথ-বিশ্বাস-স্বপ্ন ও বাস্তবতার নানা অনুষঙ্গে এই উপন্যাসের ঘটনাক্রম সাতচল্লিশে এসে পৌঁছায়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর এতদঞ্চলেও গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন দেখা দেয়। অধিবাস্তবতার বদলে এ-পর্যায়ে বাস্তবতাই মুখ্য হয়ে ওঠে। বৈকুণ্ঠের রাত-বিরাতে অবাধ চলাচলের বিষয়ে হুশিয়ার করে মুকুন্দ সাহা : 'আসমান আর মোসলমান – এই দুয়ে বিশ্বাস নাই। এই মেঘ এই ফর্সা। এই রোদ এই আন্ধার। কাদের মিয়া কয়া গেলো, ইনডিয়ার রিফিউজি দিয়া টাউন বলে ভর্‍্যা গেছে। ইগলান কথা হামাক শোনায় কিসক?' (আখতারুজ্জামান ২০০৮ : ৫৯৬) এক ধরনের মানসিক চাপ-টানাপোড়েন হতে থাকে নিত্যসঙ্গী। বৃহত্তর রাজনীতির অভিঘাত প্রান্তিক পর্যায়েও কার্যকর হতে থাকে। পত্রিকার বিভিন্ন খবরও প্রান্তজনের মাঝে ভীতির সঞ্চার করে। যেমন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র বরাত দিয়ে বিষণ্ণ মুকুন্দ সাহা জানায় : 'হিন্দুর লাশভরা বগি নিয়ে পাকিস্তান থেকে রোজ ট্রেন যাচ্ছে শেয়ালদা স্টেশনে।' (আখতারুজ্জামান ২০০৮ : ৫৯৭) সত্যতা বা বাস্তবতার চেয়েও এই ধরনের খবর প্রান্তজনকে আরও আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে।

একদিকে যেমন শহরের হিন্দু নায়েববাবু গোপনে ওপার থেকে আগত বিত্তবান মুসলমানের সঙ্গে গোপনে বাড়ি বদল করে; জগদীশ সাহার এক দাগে বারো বিঘা জমি শরাফত মণ্ডল পানির দামে কিনে ফেলতে পারে; তেমনি গ্রামে একদল মুসলমান কামার যুধিষ্ঠিরকে দাম না দিয়ে কোদাল নিয়ে যায়। অর্থাৎ সকল স্তরে ও পর্যায়ে আধিপত্য, নৈরাজ্য ও আতঙ্ক বিরাজমান থাকে। আরও কিছু গুণগত পরিবর্তন ঘটে। যেমন, বিভাগ-পূর্বকালের কন্সটেবল হিসেবে কর্মরত তহসেন বিভাগ-পরবর্তীকালে পাকিস্তানে তহসেন দারোগায় উন্নীত হয়, কাৎলাহার বিলের পত্তন জোতদার শরাফত মণ্ডলের পরিবর্তে কালাম মাঝি প্রাপ্ত হয়। শ্রেণির বিচারে এটি আপাত শ্রেণির উত্থান বটে; কিন্তু শোষণের স্তর পরিবর্তন ঘটলেও শোষণের অবসান ঘটে না। জমিদারি উচ্ছেদ বা তেভাগা বাস্তবায়নের বক্তব্যের মধ্যেই কেবল সীমাবদ্ধ থাকে। 'বিষয়ের দিক থেকে শ্রেণিদ্বন্দ্বই ইলিয়াসের রচনায় মুখ্য। শ্রেণিদ্বন্দ্বের সেই বিশদ কাঠামোয় নিপুণ রাজমিস্ত্রির মতো তিনি জুড়তে থাকেন পূর্বোক্ত দ্বন্দ্বগুলো।' (মোহাম্মদ আজম ২০১৭ : ৪০) তাই দেখা যায় – ইসমাইলের মতো আপাত প্রগতিশীল মুসলিম লীগারও ওসব বিস্মৃত হয়। বরং এসব প্রশ্ন উত্থাপিত হলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের নব্য সুবিধাপ্রাপ্ত কাদের হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলে : 'উগলান কথা এখন রাখ। আমাদের নতুন রাষ্ট্র, ইনডিয়ার দালালরা মানুষকে খেপাতে চায়, মানুষ গোলমাল করলে ইনডিয়া সুযোগ নিয়া নয়া দেশটাকে খপ কর্যা খায়া ফালাবি।' (আখতারুজ্জামান ২০০৮ : ৬০২) আরও কিছু দৃশ্যমান পরিবর্তন উপন্যাসের ঘটনাক্রমে উঠে আসে। শহরের কালিতলায় শরাফতের জ্যেষ্ঠপুত্র সরকারি অফিসের ছোটসাহেব আবদুল আজিজ নতুন বাড়ি কেনে। সেখানে মাধবীলতা শোভিত বাড়ির ছাদে 'ওঁ' কিংবা এর নিচে লেখা 'শ্রীশঙ্করালয়' নতুন চুনকামেও মুছে ফেলা যায় না। এগুলো ঔপন্যাসিকের প্রতীকী পরিচর্যা। নতুন বাস্তবতায় সাতচল্লিশের দেশবদলের ক্ষতর মতোই হিন্দু সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব-স্মৃতি-শোককে মুছে ফেলা সম্ভব নয়। ঔপন্যাসিক এই সংকটের কোনো সমাধান আঁকেন না ঠিক; তবে সংকটের বাস্তবতাকে গভীর স্তর থেকে স্বীকার করেন। এটি ইলিয়াসের ঔপন্যাসিক সত্তার একটি মৌল প্রবণতা। সাতচল্লিশের সময়পর্বে তমিজের বাপেরও মৃত্যু ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে যেন অধিবাস্তব জগতেরও অবসান ঘটে। দেশভাগের বাস্তবতা কেন্দ্র থেকে প্রান্ত সর্বত্র বিরাজমান। এর ধরনগত বৈচিত্র্য থাকলেও কোনো ইতিবাচক বোধ তৈরি করতে পারে না কোনো জনসমাজে। *খোয়াবনামা* দেশভাগের নেতিবাচক পরিস্থিতিরই রূপায়ণ; তবে তা কোনো প্রতিষ্ঠিত বয়ানের বশ্যতা স্বীকার করে নয়।

২.৩.২. পূর্ব পাকিস্তানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা

২.৩.২.১

দেশভাগ কারো কারো জীবনে চরম দুর্বিপাক বয়ে আনলেও পূর্ববঙ্গের মুসলমান-দৃষ্টিকোণ থেকে পাকিস্তান আকাঙ্ক্ষীদের কাছে, স্বল্প সময়ের জন্য হলেও, ছিল প্রাপ্তির আনন্দ। 'পাকিস্তান যে-আদর্শ নিয়েই জন্মলাভ করুক বাস্তব পাকিস্তান হবে সর্বজনের সমষ্টিমঙ্গলের ভূমি, এমন এক আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ পূর্ববঙ্গে নানাভাবে ঘটেছিল।' (মফিদুল ২০১৮ : ৪২) আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯) সেই পাকিস্তান-আকাঙ্ক্ষী বিকাশশীল মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমানের প্রতিনিধি। তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান ও রূপান্তরও অনেকটা মীমাংসিত। একসময়ের কংগ্রেস-মুসলিম লীগ কর্মী বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে হয়ে উঠেছিলেন কৃষক-প্রজা পার্টির নেতা। অতঃপর চল্লিশের দশকে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপনের পর্বে তিনি হয়ে ওঠেন বাঙালি মুসলমানের 'স্বাতন্ত্র্যবাদী সাংস্কৃতিক' তৎপরতার অন্যতম তাত্ত্বিক; যার প্রমাণ তাঁর সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে যেমন প্রমাণিত, তেমনি সাহিত্যসৃজনেও সেই তৎপরতা রূপায়িত। তাঁর *জীবন-ক্ষুধা* (১৯৫৫) উপন্যাসে তাই দেখা যাবে সাতচল্লিশের দেশভাগের ফলে মানুষের দেশত্যাগের ঘটনা রূপায়িত হয় 'অপর চোখে'। দেশভাগের ফলে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মনে হয় – একে ঔপন্যাসিক অনিবার্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। উপন্যাসের শেষ পালার নাম 'সুবেহ্ সাদেক'। পরিচ্ছেদের নামকরণ এবং আপাত নির্মোহ বর্ণনার মধ্যেও ঔপন্যাসিকের পক্ষপাতিত্ব গোপন থাকে না:

> ১৯৪৭ সাল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারত উপমহাদেশ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। তার একটি পাকিস্তান, অপরটি হিন্দুস্তান। ভারতের দশকোটি মুসলমান আত্ম-নিয়ন্ত্রণ-অধিকারের দাবিতে তাদের নিজস্ব আবাস-ভূমি চাহিয়াছিল। সে আবাস-ভূমি তারা পাইয়াছে। যারা ছিল একদিন সম্প্রদায়মাত্র, তারাই হইয়াছে আজ একটা জাতি। যারা এতদিন নিজেদের ধর্ম-কৃষ্টির চাকুরি-ব্যবসার এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অধিকারের অসংখ্য রক্ষা-কবচের মধ্যেও দিনরাত আতঙ্কে দিন যাপন করিত, তারাই আজ স্বাধীন ও নিশ্চিতভাবে নিজেদের ইচ্ছামত জীবন গড়িয়া তুলিবার সুযোগ পাইয়াছে। তাই মুসলমানদের আনন্দ উল্লাস আর ধরে না। আজ তাদের বুকে-বুকে গর্ব, মুখে-মুখে হাসি, ঘরে-ঘরে আনন্দ, শহরে-বাজারে আলোক-সজ্জা।
>
> বাংলাও ভাগ হইয়াছে। কিন্তু তার বেশিরভাগ পড়িয়াছে পাকিস্তানে। রাজধানী কলিকাতা হইতে ঢাকায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। নতুন জাতির নতুন রাষ্ট্রের রাজধানী রূপে গড়িয়া উঠিবার জন্য বুড়ীগঙ্গার তীরে বুড়া ঢাকার শিরা-উপশিরায় যেন যৌবনের তাজা লহু ফাটিয়া পড়িতেছে। তার সর্বাঙ্গে নয়া জীবনের নতুন চাঞ্চল্য স্পন্দিত হইতেছে। (আবুল মনসুর ১৯৯৮ : ৪৬৬)

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হালিম; নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টির ফলে তার জীবনের উন্নতি ঘটে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করার দায়ে কারারুদ্ধ হালিম কারামুক্ত হয়। তার পূর্বতন কোম্পানি হ্যালি ব্রাদার্স হালিমের বিরুদ্ধে দায়ের করা সকল মামলা প্রত্যাহার করে। হালিম ব্যক্তিগত জীবনেও লুৎফুনকে নিয়ে শান্তির জীবনের দিকে এগিয়ে যায়। এমন সুখ-শান্তিময় জীবনে হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশবদল যেন তার কাছে অচেনা-অজানা বিষয়। যদিও ছেচল্লিশের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালনে সে ছিল অগ্রণী; ময়মনসিংহ (উপন্যাসে উল্লেখ – মোমেনশাহী) মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট হালিমের কাছে হিন্দুদের দেশ ছাড়ার কারণ অজানা থাকার কথা নয়। মোটর গাড়িতে স্ত্রীকে নিয়ে বৈকালিক ভ্রমণে যখন দেখতে পায়:

> হাজার হাজার পুরুষ-মেয়েলোক বালক-বৃদ্ধ কাতার করিয়া শহরের দিকে আসিতেছে। ভিড়ের মাঝে-মাঝে গরু মহিষের গাড়িতে বিছানা-পত্র হাড়ি-পাতিল। তাছাড়া লোকজনের মাথায় ও ঘাড়ে নানা রকম ও নানা আকারের পুটলি-পোটলা। এই বিপুল জনতার মিছিলের যেন আর শেষ নাই। (আবুল মনসুর ১৯৯৮ : ৪৬৭)

এটি সাতচল্লিশের দেশভাগ-পরবর্তী বাংলার এক টিপিক্যাল চিত্র – এবং এই চিত্র জীবন্ত। কিন্তু এই বাস্তুহারাদের প্রতি স্ত্রীর নারীসুলভ দরদ ও প্রশ্নের উত্তরে হালিম যা জানায়, তাতে ঔপন্যাসিক আবুল মনসুরের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। লুৎফুন যখন জিজ্ঞাসা করে : 'কেন বাপ-দাদা চৌদ্দ পুরুষের ভিটামাটি ছাইড়া অজানা-অচিনা দেশের দিকে রওনা হইছে?' অনেক কথার পরে হালিমের মন্তব্য ও স্বগত প্রশ্ন ছিল এরকম:

> নিরাপদ মনে না করাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যেসব জায়গায় কোনও মারামারি হয় নাই, সেখান থাইকাও হিন্দুরা চৈলা যাইতেছে। এই ধর না আমরার এ জিলার কোথাও কোনো মারামারি হৈছে এ খবর আমরা আজও পাই নাই। তবু হিন্দুরা কেন এমন দলে-দলে দেশত্যাগ করতেছে? (আবুল মনসুর ১৯৯৮ : ৪৬৮)

এমন প্রশ্নের উত্তর নির্মাণেও ঔপন্যাসিক দেরি করেন না। গমনোদ্যত একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বীকে প্রশ্ন করে হালিম জেনে নিতে চায় দেশত্যাগের কারণ। কোনো সদুত্তর পাওয়া যায় না। কিন্তু আবুল মনসুর আহমদের রাজনৈতিক স্মৃতিগ্রন্থ *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছরে* এর একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তিনি (২০১৬ : ২৩৯) হিন্দু জনগোষ্ঠীর দেশত্যাগের কারণ সম্পর্কে বলেন:

> পূর্ব-বাংলার হিন্দুদের মধ্যে বাস্তু-ত্যাগের হিড়িক পড়িয়াছিল। সাম্প্রদায়িক দাংগার ভয়ে নয়। অন্য কারণে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়ক ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের অন্তঃসারশূন্য 'ইসলামী রাষ্ট্র' ও শরিয়তী শাসনের শ্লোগানে হিন্দুরা সত্যই ঘাবড়াইয়াছিল। জানের ভয়ে নয় মানের ভয়ে। ধর্ম ও কালচার হারাইবার ভয়ে।

কিন্তু উপন্যাসে হিন্দু জনগোষ্ঠীর বয়ানে কোনো কার্যকারণ উপস্থিত থাকে না। হালিম পশ্চিমবঙ্গ থেকে সব ছেড়েছুড়ে আসা একজন মুসলমানকেও একই প্রশ্ন করে। সে যখন বলে : 'আপনেরা বাড়ি-ঘর ছাইড়া চৈলা আসলেন কেন?' প্রশ্নের উত্তরে উত্থাপিত হয় প্রশ্ন : 'চৈলা আসমু না? ও-দেশে কি মুসলমান

থাকতে পারে? ... পাকিস্তান আমার নিজের দেশ না ত কি হিন্দুস্তান আমার নিজের দেশ?' (আবুল মনসুর ১৯৯৮ : ৪৭১)। অর্থাৎ একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত মুহূর্তেই একটি জনগোষ্ঠীর স্বদেশের ধারণাকেই যেন পাল্টে দেয়; যদিও এই ধারণা যৌক্তিক মনে হয় না হালিমের। প্রকৃত অর্থে হালিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের প্রতিনিধি। তাকে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে বা পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গে স্থানান্তরিত হতে হয়নি। সে অনেকটা দর্শকের ভূমিকায় এই যাতায়াত দেখেছে। আর ঔপন্যাসিক হালিমের চোখ দিয়ে এই দেশত্যাগের মতো মর্মন্তুদ বিষয়টিকে একটা উপরিতলের বাস্তবতা হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। অভ্যন্তরীণ বিষয়টি প্রশ্ন হিসেবেই থেকে যায় : 'রাত না পোহাইতেই ঐ যে হাজার-হাজার লোক স্টেশন থাইকা আসতেছে, কি এরার জীবন-ক্ষুধা? কিসে হৈব তারার সে ক্ষুধার নিবৃত্তি? কে দেখব সে নিবৃত্তির পথ?' (আবুল মনসুর ১৯৯৮ : ৪৭৫)

পাকিস্তান-পর্বে রচিত (১৯৫৫) এই উপন্যাসে চল্লিশের দশকে পাকিস্তান-আন্দোলনের প্রতি সমর্থন স্পষ্ট। কিন্তু পাকিস্তান হয়ে যাবার পরে বিশেষত বায়ান্নো দেখার পরেও এই উপন্যাসে পাকিস্তানের প্রতি আস্থাশীল থাকতে দেখা যায় ঔপন্যাসিককে। এর কারণ কী হতে পারে? এর একটি দিক সম্পর্কে বলেছেন নাজমা জেসমিন চৌধুরী (১৯৯১ : ২৯১):

> উনিশশো পঞ্চান্ন উপন্যাসের প্রকাশকাল। ঐ সময়ে তৎকালীন 'পূর্ব পাকিস্তান' হতাশাচ্ছন্ন ছিল। আবুল মনসুর আহমদ তেমন হতাশাজনক পরিবেশ থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের অতীত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন।

কিন্তু তাতেও ঔপন্যাসিকের মনোলোক স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে না। অপর সমালোচকের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে ঔপন্যাসিকের রক্ষণশীলতা:

> *জীবনক্ষুধার* নায়ক হালিম ও লেখক আবুল মনসুর আহমদ অভিন্ন ব্যক্তি : ওই উপন্যাসের নায়ক সাম্প্রদায়িক ও সামন্ত মানসিকতায় আবদ্ধ, ঠিক যেমনভাবে সাম্প্রদায়িকতায় ও সামন্ত ভাবনায় আচ্ছন্ন আবুল মনসুর আহমদ। বায়ান্নোর কয়েক বছর পরে পাকিস্তান সম্পর্কে যখন অবিশ্বাস জন্মে গেছে সাধারণ মানুষেরও মনে, তখনও *জীবনক্ষুধার* লেখক পাকিস্তানপন্থী। (হুমায়ুন ২০০৭ : ২৭৪)

সমালোচকের এই মতটি নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা না গেলেও পাকিস্তানপর্বে রচিত এই উপন্যাসে পাকিস্তানায়নের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। হালিমের জীবনায়ন ও চরিত্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক সেই মাত্রাটিকে উপস্থিত করেছেন। পূর্বেই বলা হয়েছে, দেশভাগের স্বরূপ বাংলার সকল প্রান্তে অভিন্ন নয়। এর শ্রেণিগত ও সম্প্রদায়গত ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা রয়েছে। দেশভাগের প্রতিষ্ঠিত বয়ানের সমান্তরালে এটিও একটি বয়ান।

২.৩.২.২

ঔপন্যাসিকের অবস্থানগত পার্থক্যের কারণে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা-পরবর্তী দেশবদল ও উদ্বাস্তু-সমস্যার স্বরূপও বিচিত্র মাত্রা নিয়ে একেক উপন্যাসে একেকভাবে উপস্থিত হয়েছে। কখনো কখনো বাস্তবতার কার্যকারণ পরম্পরার চেয়েও উপন্যাসে আদর্শিক বিষয়-আশয় বেশি জায়গা করে নিয়েছে। যেমন *রাঙ্গা প্রভাত* (১৩৬৪) উপন্যাসে চট্টগ্রাম অঞ্চলের বাস্তবতা রূপায়ণে আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩) মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এই সংকটকে দেখতে চেয়েছেন। উপন্যাসের উদারবাদী চরিত্র চারুবাবু নিজ দেশের গ্রামপ্রকৃতি দেখে মুগ্ধ হয়ে যখন বলে 'দেশ ভাগ হয়েছে বলে যারা দলে দলে পশ্চিম বাংলার দিকে ছুটেছে সেই হতভাগারা চিরকালের জন্য দেশের ষড়ৈশ্চর্য্যময়ী রূপ থেকে বঞ্চিত হল।' (আবুল ফজল ১৩৬৪ : ১৪৭) এর মধ্য দিয়ে সমস্যার মূলকে চিহ্নিত করার পরিবর্তে আবেগ ও ঔপন্যাসিকের অবস্থানগত দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পায়। আবুল ফজল যেন এখানে দেশভাগের বিরোধিতা করছেন না, বিরোধিতা করছেন দেশত্যাগের। কিন্তু সাতচল্লিশের বাস্তবতায় দেশভাগেরই অব্যবহিত ফলাফল ছিল দেশত্যাগ, দেশবদল, দেশ-হারানোসহ আরও নানাবিধ দুর্বিপাক। এবং উপন্যাসসূত্রেই জানা যায় এই যাওয়া-আসার প্রক্রিয়া সহজে শেষ হয়ে যায়নি; কয়েক বছরব্যাপী চলেছে। তার মানে, বিভাগ-পরবর্তী পাকিস্তান অমুসলমান তথা হিন্দুদের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেনি। তাই দেখা যায়:

> চৌদ্দপুরুষের বাস্তুভিটা ছেড়ে অগণ্য মানুষ পাড়ি দিয়েছে পশ্চিমমুখো, তেমনি পশ্চিম থেকে পড়ি কি মরি হয়ে ছুটে এসেছে অনেকেই পূর্ব দিকে। ষ্টেশনে ষ্টেশনে তিল ধারণের যায়গা নেই। কারণে অকারণে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় লক্ষ লক্ষ মানুষ হয়েছে বাস্তুহারা। বেশির ভাগই অবস্থার হেরফেরে। একটা অজানা ও কাল্পনিক আতঙ্ক যে পেয়ে বসেছে দেশকে। (আবুল ফজল ১৩৬৪ : ১৫৮)

শেষোক্ত বাক্যত্রয়কে ঔপন্যাসিকের আরোপিত মন্তব্য বলে মনে হয়। এই মন্তব্যে উপন্যাস রচনার কাল তথা পাকিস্তানকালকে অস্বীকার করা যায় না। ঔপন্যাসিক দেশবদলের আতঙ্ককে 'অজানা' ও 'কাল্পনিক' বলে চিহ্নিত করতে চাইলেও প্রকৃত বাস্তবতা সে কথা বলে না। ঔপন্যাসিক তাঁর বক্তব্যকে যুক্তগ্রাহ্য করার জন্য এই আরোপিত ধারণাকে চারুবাবুর মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত করতে চান। আবার কামালের মধ্যেও বাস্তুহারাদের সহানুভূতি নির্মাণ করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজের ইঙ্গিত দেন। কামালকে 'সবচেয়ে বেশী পীড়া দেয় এ বাস্তুত্যাগের দৃশ্য। বিদেশী শাসনের যুগে আমরা পাশাপাশি বাস করতে পেরেছি এখন স্বাধীনতার যুগে, নিজেদের শাসনকালে পাশাপাশি শান্তিতে বাস করতে পারব না এ কেমন কথা?' (আবুল ফজল ১৩৬৪ : ১৫৯) আবুল ফজল কামালের মধ্য দিয়ে সাতচল্লিশের পাকিস্তান

প্রতিষ্ঠাকে দেশভাগের পরিবর্তে 'স্বাধীনতা' প্রাপ্তি হিসেবে দেখাতে চান। পরবর্তী সময়ে চারুবাবুর পুত্র মুকুলের সঙ্গে কথোপকথনেও দেশের প্রতি মাটির প্রতি হিন্দু-মুসলমান উভয়ের সমান অধিকারের কথা উচ্চারণ করে কামাল : 'সাধারণ ঝড় তুফান হলেও তা থেমে আকাশ পরিষ্কার হতে বেশ কিছু সময় লাগে। ... তোমরা এদেশেরই সন্তান, এ দেশেরই অধিবাসী, এ দেশেরই নাগরিক, অন্যের যে অধিকার তোমাদেরও সেই অধিকার, এক তিল বেশীও না এক তিল কমও না।' (আবুল ফজল ১৩৬৪ : ১৬৪) তারপরেও দেশছাড়া ঠেকানো যায় না। কামাল এবং মুকুলদের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে ঔপন্যাসিক একে দেখিয়েছেন 'হিরিক' হিসেবে। দেখা যায় বাস্তুত্যাগের ফলে সমাজে নানা মাত্রিক ভারসাম্যহীনতা। অমুসলমানদের কাছে দেশ হয়ে যায় বিদেশ; এককালের বিদেশ হয়ে যায় স্বদেশ – তৈরি হয় এক বেদনাক্রান্ত যুগ্মবৈপরীত্য:

> মুকুল চিঠিতে ঠাট্টা করেই তার বাবাকে জানায় : এখন থেকে পদ্মা-যমুনা-কর্ণফুলির উপর আমার আর অধিকার নেই। যে শঙ্খের তীরে মানুষ হয়েছি, বাল্য-কৈশোর সাঁতার কেটে কাটিয়েছি যার জলে, তার উপর আমার আর কোন দাবী-দাওয়া নেই। লাহোর, পেশোয়ার, সিন্ধু, হারাপ্পা-মহেঞ্জোদরো শুধু নয় ঢাকা, চট্টগ্রাম-রাজশাহীও আমার পক্ষে এখন বিদেশ। (আবুল ফজল ১৩৬৪ : ১৮০)

হিন্দু শিক্ষকদের দেশ ছাড়ার কারণে, ছাত্র-উপস্থিতি পর্যাপ্ত না থাকার কারণে স্কুল-কলেজ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। কিন্তু দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর মধ্যে থাকার কারণে মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার আলোও সেভাবে ছড়ায়নি। ফলে অপরাপর স্কুলের মতো চারুবাবু প্রতিষ্ঠিত স্কুলেও যথেষ্ট সংখ্যক মুসলমান শিক্ষক পাওয়া যায় না। সাতচল্লিশ-পরবর্তীকালে যে শূন্যতার দৃশ্য তৈরি হয় জনজীবনে, তারই চিত্র উপন্যাসে অঙ্কিত হয়েছে।

রাঙ্গা প্রভাত ঔপন্যাসিকের আদর্শায়িত সৃষ্টি। 'মানবতন্ত্রী' হিসেবে পরিচিত এক সময়ের মুসলিম সাহিত্য সমাজের অন্যতম অংশীজন আবুল ফজলের ঔপন্যাসিক সত্তায় যে রাজনৈতিক বোধ ও ইতিহাসচেতনা ক্রিয়াশীল থাকে, তাকে অভিহিত করা যায় সমন্বয়বাদী চেতনা হিসেবে। চট্টগ্রামের রক্ষণশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও পঠন-পাঠনসূত্রে তিনি একটি অসাম্প্রদায়িক জীবনচেতনার অধিকারী ছিলেন। তিনি কখনও প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেননি। কিন্তু তাঁর যৌবনকালে অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ *রেখাচিত্রে* (১৯৬৬) উল্লেখ পাওয়া যায়। একজন অ্যাকাডেমিক ব্যক্তি হিসেবে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন চল্লিশের দশকের পাকিস্তান-আন্দোলন, বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর (কলকাতা) ও সাতচল্লিশ-পরবর্তী পূর্ববাংলা বিশেষত চট্টগ্রামের বাস্তবতা। তবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিষয়ে অপরাপর শিক্ষিত মুসলমানের মতো তিনিও যে ছিলেন উৎসাহী, তার

একটি দৃষ্টান্ত মুহম্মদ আলি জিন্নাহকে নিয়ে *কায়েদে আজম* (১৯৪৬) নাটক। তবে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের নিবেদিত কর্মী আবুল ফজলের চেতনায় স্বীয় ধর্মীয় বোধ, স্বসম্প্রদায়প্রীতি উপস্থিত থাকলেও বৃহত্তর মানবকল্যাণই তাঁর আরাধ্য; যার অন্যতম দৃষ্টান্ত প্রবন্ধগ্রন্থ *মানবতন্ত্র* (১৯৭২)। তাই তাঁর মানববীক্ষণ অনেকখানি আদর্শায়িত মানবদর্শন। এরই প্রকাশ ঘটেছে *রাঙ্গা প্রভাত* উপন্যাসের জীবনায়নে।

এমন কালপর্বে *রাঙ্গা প্রভাত* রচিত ও প্রকাশিত যখন ধর্মের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্র বিদ্যমান। পাকিস্তান রাষ্ট্রকে স্বীকার করলেও ঔপন্যাসিককের আদর্শায়িত দৃষ্টিকোণ নির্মাণ করতে চায় একটি সমন্বয়ধর্মী সমাজ। এ-জন্য হাসান আজিজুল হক বলেন : 'পাকিস্তানি আমলের প্রথম দিকে যে অসাম্প্রদায়িক মানবিক মূল্যবোধ তিনি প্রচার করতে সাহসী হয়েছিলেন, সেজন্য তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাতেই হবে। (২০১৩ : ১৪) এটি ঔপন্যাসিকের সামাজিক ও মানবিক দায়বদ্ধতার বিষয়। কিন্তু উপন্যাসের অন্যতম শর্ত সমগ্রতা অনুসন্ধানী জীবনদর্শন, সেখানে আবুল ফজলের সীমাবদ্ধতাই চিহ্নিত হয় : 'সমগ্র সমাজকে বৈজ্ঞানিকভাবে দেখা এবং তার গলিত চেহারাটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এই উপন্যাসের মধ্যে নেই।' (হাসান ২০১৩ : ১৪) এই সংকট উক্ত কালপর্বের প্রায় সকল ঔপন্যাসিকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ বহির্বাস্তবের সংকটই ছিল প্রধান। এর মোকাবিলা করতে গিয়ে ব্যক্তিচরিত্রের যথাযথ উন্মোচন ঘটেনি। বাস্তবতার সংকটকে আদর্শ দিয়ে সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। এই ঔপন্যাসিককেও যেহেতু দেশ বদল করতে হয়নি, তাই দেশবদলের বাস্তবতার উপন্যাসে 'অপর দৃষ্টি'তে উপস্থাপিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও উপন্যাসে দেশভাগের ফলে যে অস্থিরতা, ভারসাম্যহীনতা ও কষ্টকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তার রূপায়ণ আছে।

উপর্যুক্ত দুই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হালিম ও কামালের রাজনৈতিক চেতনা ভিন্ন হলেও দুই উপন্যাসেই ঔপন্যাসিকদের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার রাজনীতির প্রতি সমর্থন মেলে। তাই দেশভাগের ফলে দেশত্যাগ বা উদ্বাস্তু-সংকটের চেয়েও পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সংকট বেশি গুরুত্ব পায়। এটি আরও একটি সূত্র ধরিয়ে দেয়, তা হলো পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় পূর্ববাংলায় উদ্বাস্তু-সমস্যার প্রকটতা ততটো ছিল না বলেই উপন্যাসের বয়ানে তা প্রবলভাবে রূপায়িত হয়নি।

২.৩.৩. পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গে

২.৩.৩.১

সাতচল্লিশের দেশভাগের বাস্তবতায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গে যারা এসেছিল, শ্রেণিগত বিবেচনায় তাদের একটা অংশ ছিল শিক্ষিত উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণি। দেশত্যাগ তাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ কোনো উদ্বাস্তু-বোধের জন্ম দেয়নি। আবু রুশ্‌দ্ (১৯১৯-২০১০) ও রশীদ করীম (১৯২৫-২০১১) ঔপন্যাসিক ভ্রাতৃদ্বয় এবং তাঁদের রচিত উপন্যাস *নোঙরের* (১৯৬৩) কামাল ও *উত্তম পুরুষের* (১৯৬১) উত্তম পুরুষ তথা শাকের পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত সেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত অংশের প্রতিনিধি। রশীদ করীমের মতো শাকেরকেও কলকাতা ছাড়তে হয়, সাতচল্লিশ-পরবর্তী বাস্তবতায়। তারা সপরিবারে চলে আসে পূর্ববাংলার মাদারীপুর মহকুমা শহরে; এরপর পিতার বদলিসূত্রে ঢাকায়। আশৈশব কলকাতায় বড় হওয়া শাকেরের কাছে এ-এক নতুন জগৎ, নতুন অভিজ্ঞতা। তাই শাকের জানায় – 'কলকাতার ছেলে মহাকুমা টাউনে এসে অল্প দিনেই হাঁফিয়ে পড়লাম।' (রশীদ ২০১৩ : ১৪৩) এই অভিযোজনের ভারসাম্যহীনতা যেন স্বয়ং ঔপন্যাসিকেরও। রশীদ করীমকেও কৈশোর-তারুণ্যের কলকাতা ছেড়ে নতুনভাবে শেকড় প্রোথিত করতে হয়েছে পূর্ববঙ্গে, ঢাকায়। '১৯৫০ সালে তিনি কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকায় চলে আসেন।' (পিয়াস ২০১৩ : ২২৭) শাকেরের অভিজ্ঞতা ঔপন্যাসিকের বিশ্বাসগত ফসল। রশীদ করীম সরাসরি দেশভাগের ফলে কোনো উদ্বাস্তু-জীবনের কথা বলেন না ঠিক, কিন্তু আভ্যন্তর অর্থে দেশহারানোর এক কারুণ্য তার চরিত্রসমূহকে আচ্ছন্ন করে। বাস্তবতাকে যেহেতু অস্বীকার করার সুযোগ নেই, তাই বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে শাকের নতুন জীবনের প্রতি অগ্রসর হয়; কিন্তু মর্মমূলে থাকে নিজের অস্তিত্বের প্রতি অনিঃশেষ আকর্ষণ। তাই কেবল দেশভাগ-পরবর্তী ঘটনাক্রম বিচার করে রশীদ করীমের উপন্যাসে দেশভাগের ফলাফল বোঝা সম্ভব হয় না; বরং পুরো উপন্যাসে নানাভাবে ছড়িয়ে থাকা একই সঙ্গে স্বজাত্যবোধ এবং অস্তিত্বে গেঁথে থাকা শৈশব-কৈশোরের কলকাতা উপন্যাসের স্থানিক পটভূমি হয়ে ওঠা দেশভাগের সামূহিকতাকে স্পষ্ট করে তোলে।

২.৩.৩.২

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কালে কলকাতার বাঙালি মুসলমান বিশেষত উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির মুসলমানদের অবস্থান ও প্রতিক্রিয়া কেমন হয়েছিল, তার রূপায়ণ আছে আবু রুশ্‌দের *নোঙর* উপন্যাসে। ঔপন্যাসিকের *আত্মজীবনী* (১৯৯৮) থেকেও জানা যায় – আবু রুশ্‌দ্‌দের পৈতৃক নিবাস পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত আলফাডাঙায় হলেও কয়েক প্রজন্ম ধরে তাঁরা কলকাতার অধিবাসী ছিলেন। শিক্ষাজীবন ও কর্মজীবনসূত্রে তাঁর পূর্বসূরিরা ছিল অভিজাত নাগরিক। আবু রুশ্‌দ্ আত্মজীবনীতে

(১৯৯৮ : ১০) লিখেছেন : 'আমাদের চিন্তা-ভাবনা ও ব্যবহারে সর্বতোভাবে শহুরেপনা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। গ্রাম্য-জীবন থেকে আমরা বরাবরই বিচ্ছিন্ন ছিলাম।' *নোঙর* উপন্যাসেও কেন্দ্র-চরিত্র কামাল কলকাতায় তিন পুরুষ ধরে বসবাসকারী বাঙালি মুসলমান যুবক, পেশায় ইনকামট্যাক্স অফিসার। পাকিস্তান হবার অব্যবহিতকালে মাউন্টব্যাটেন, র‍্যাডক্লিফ এদের হিন্দুপক্ষপাতিত্ব নিয়ে সে ভাবিত। চাকরির ক্ষেত্রে 'অপশন' থাকায় কামাল বেছে নেয় পাকিস্তান। যদিও তার পৈতৃক ভিটা পাবনায়, কিন্তু তিন পুরুষ ধরে কলকাতায় বসবাস সত্ত্বেও নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে তার এই সিদ্ধান্ত। যদিও পরিবারের অন্য সদস্যরা মা-বাবা-ছোটভাই-ভাইয়ের স্ত্রী কারো কাছেই পাকিস্তান কোনো আদর্শ গন্তব্য হয় না। কলকাতার নাগরিক মননে পূর্ব পাকিস্তান তখনও জঙ্গলাকীর্ণ গ্রাম। কিন্তু কামালের কাছে পাকিস্তান নতুনত্বের প্রতীক হয়ে আবির্ভূত হয়:

> নতুনদের স্বাদ তাকে পেয়ে বসেছে; প্রাচীনের ক্লীবতা থেকে আত্মা মুক্তি চায়। মহৎ অস্তিত্বের সম্ভাবনা প্রাচীন পরিবেশ থেকে একেবারে তিরোহিত নয়, তবে অভিজ্ঞতার ধরন এখানে অনেকটা নির্ধারিত আর উদ্যমের পরিধি সীমিত। (আবু রুশ্‌দ্ ২০০০ : ৩৬৫)

কামালের এই মনোভাবনা যেন স্বয়ং ঔপন্যাসিকেরও। আবু রুশ্‌দ্‌ও ১৯৪৭ সালের ১৬ই আগস্টে পরিবার-পরিজন ছেড়ে পাকিস্তানের ঢাকার উদ্দেশে কলকাতা ত্যাগ করেন। পাকিস্তান হবার অব্যবহিত আগে (১৯৪৬) কামালের মতো আবু রুশ্‌দ্‌ও আসন্ন পাকিস্তান সম্পর্কে একই ধরনের চেতনায় উচ্ছ্বসিত থাকেন। তিনি লিখেছেন (১৯৯৮ : ১৪৫-১৪৬):

> আমার মনটা তখনও বড় রোমান্টিক ছিল। পাকিস্তান হলে বিরাট এক সামাজিক পরিবর্তনের ঢেউ আসবে এবং তার সবল স্পর্শে আমাদের মনমানসিকতা অনেক বিস্তৃতি ও প্রসার লাভ করবে আমার মনে সে-স্বপ্ন তখন অটুট ছিল। পরে যে বাস্তবতার আঘাত পেয়েছিলাম তাতে আমার প্রত্যাশা বেশীদিন তার সজীবতা রাখতে পারেনি।

উপন্যাসেও দেখা যায় – পাকিস্তান সৃষ্টির মুহূর্তে কলকাতার চিত্রও ধীরে ধীরে এবং কোথাও কোথাও আকস্মিকভাবে বদলাতে থাকে। যেমন রহিমের স্ত্রী তাদের পির সাহেবকে বলে : 'এখন বাইরে বেরুলে গা'টা কেমন যেন ছমছম করে, পার্ক সার্কাসে মুছলমান ঘর সব খালি হয়ে গেছে।' (আবু রুশ্‌দ্ ২০০০ : ৩৭৫) ঔপন্যাসিক বিভিন্ন অনুষঙ্গে আরও কিছু পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেন। যেমন আগে হেয়ার কাটিং সেলুনের দেয়ালে ঝুলত মদিনার পাহাড় বা কাবা শরিফ, দুলদুল ঘোড়ার ছবি। আর 'এখন ক্যালেন্ডারে দেখা যায় জাপানী ললনার ব্যগ্র কামের বিলোল বাচন অথবা ইউরোপীয় সুন্দরীর বিদ্যুৎ-তীক্ষ্ণ কটাক্ষ।' (আবু রুশ্‌দ্ ২০০০ : ৩৭৭) সেলুনের মাস্টার আর তার সহযোগীর কথোপকথনেও প্রকাশ পায় সেই কালের বাস্তবতা ও সাধারণ মানুষের সংকটের চিত্র। সাধারণ মানুষের মনোলোকে

বিরাজ করে নানা গুঞ্জন। পাকিস্তান হবার আগেই কে কোন অংশে পড়বে তা নিয়ে চলে নানা জল্পনা-কল্পনা। উর্দু জবানে মাস্টার বলে : 'শুনা কংগ্রেসওয়ালা লোক রেডক্লিফ কা লিয়ে দো কোটি রুপেয়া উঠায়া, যেয়সা দার্জিলিঙ আর জলপাইগুড়ি ও লোককো মিল যায়।' উত্তরে সহকারী মকবুল বলে : 'জলপাইগুড়ি আর দার্জ্জিলিঙ যানে দো মাষ্টার, কলকাতা আগার পাকিস্তানকো মিল যায় তো পুরা এ্যাক মাহয়না হ্যাম মুফতমে বাল কাটেঙ্গে।' এরপর মাস্টার উচ্চারণ করে তার শ্রেণিগত সংকটের গূঢ় কথা : 'গরীব লোককা লিয়ে পাকিস্তান যো শালা হিন্দুস্তান ভি ওই, কাঁহি ফায়েদা নাহি।' (আবু রুশ্‌দ্ ২০০০ : ৩৭৭) এটাই নিম্নবিত্তের প্রধান বাস্তবতা। কিন্তু উচ্চবিত্তদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বার্থ, সুবিধা, ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা – এসব হিসাবনিকাশের সমীকরণ কার্যকর থাকে। তাই কামাল তাদের পারিবারিক পির সাহেবের কলকাতায় থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্তের সঙ্গে তাঁর মুরিদদের থেকে প্রাপ্ত উপঢৌকনের সম্পর্ক উপলব্ধি করে। কলকাতা ছেড়ে পাকিস্তানে যাবার আরও কিছু মনস্তত্ত্ব আছে। কামালের বন্ধু খলিল পাকিস্তানের সঙ্গে কোনোরূপ সংযোগ না থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তান অপশন বাছাই করে। সেই সিদ্ধান্ত অনেকটা বাধ্য হয়ে। সে জানায় :

> অপশান দিবার আগে আমার বস্ মিষ্টার সেনের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। আমি এখানে থেকে যেতে চাই শুনে তিনি প্রথমে আমার পিঠ চাপড়ালেন, তবে আমাকে যেন কলকাতা থেকে সরানো না হয় এ অনুরোধ করলে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে তিনি বললেন – "ওসব আবদার আর স্বাধীন ভারতে চলবে না।" ... কলকাতাই যদি ছাড়তে হয়, তবে মিষ্টার সেনদের মত লোকদের খপ্পরে পড়ে আর কি লাভ? (আবু রুশ্‌দ্ ২০০০ : ৩৭৬)

এখানে শ্রেণিমনস্তত্ত্বের সঙ্গে সম্প্রদায়গত সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও সংখ্যালঘিষ্ঠতার বিবেচনা ক্রিয়াশীল। বিভিন্ন ধরনের উদ্বেগ ও আশঙ্কার পরেও ব্রিটিশদের থেকে 'স্বাধীন' হওয়া ছিল সাধারণের কাছে প্রাথমিক আনন্দের বিষয়। এই আনন্দ হয়তো সাময়িক; কিন্তু ১৪ই আগস্ট মুসলমানদের জন্য একটি আনন্দের উপলক্ষ তৈরি করেছিল। 'স্বাধীনতার আনন্দের চেয়েও বড়ো ছিল এই স্বস্তি যে, এবার হয়ত হানাহানির শেষ হবে। দেশভাগও মেনে নেওয়া হয়েছিল কতকটা এই বোধ থেকেই।' (সন্দীপ ২০২০ : ১৫) সমসাময়িক পত্রিকাগুলোর (*দি স্টেট্‌সম্যান*, *অমৃতবাজার পত্রিকা*) প্রতিবেদনে ১৫ই আগস্টের কলকাতাতে সম্মিলন ও স্বস্তির ছবি পাওয়া যায়:

> এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য দেখা গেল কলকাতায়, ১৫ অগাস্ট সকালে। হিন্দু-মুসলমান-শিখ একে অপরকে জড়িয়ে ধরছেন রাস্তায়। ফুলে-পতাকায় সাজানো হয়েছে দোকান। গোলাপজল ছিটানো হচ্ছে পথচারীদের গায়ে। হিন্দুরা মসজিদে ঢুকছে, মুসলমানরা মন্দিরে। আর ট্রাকে করে লোক বেরিয়ে পড়েছে। তারা ধ্বনি দিচ্ছে : হিন্দু-মুসলিম এক হো! বন্দে মাতরম! ইনকিলাব জিন্দাবাদ। এক হিন্দু বিধবা চলেছেন নাখোদা মসজিদ

> দেখতে। লরির ওপর একটি ছেলে নাচছে আর বলছে, হাম আজাদ হো গিয়া। (উদ্ধৃত, অমলেন্দু ১৯৮৯ : ২৩৮)

কামালের পর্যবেক্ষণেও তা ধরা দেয় একই ধরনের উচ্ছ্বাসময় আবেগের অনুষঙ্গে:

> বাঘের মত আত্মবিশ্বাসে লাফ দিয়ে ১৪ই আগস্ট আসে। জন্ম হয় নতুন রাষ্ট্রের। পাকিস্তান, পাকিস্তান, পাকিস্তান! এখন আর শুধু নাম নয়। স্বাধীন স্পর্শ্যযোগ্য এক সত্তা। খাইবার পাশের অভিযান – প্রকম্পিত ঊষর ভূমির প্রতি বালুকণা। কারাকোরাম পাহাড়ের প্রস্তরদৃঢ় তুষার-কোমল শৃঙ্গের প্রতিটা ভাঁজ। সিন্ধু মরুভূমির প্রখর প্রদাহ। লাহোর ও পেশোয়ারের ঐতিহাসিক গরিমা। পদ্মা ও মেঘনার সামুদ্রিক বিস্তার; দীঘি ও বিলের ঢল। বকুল ও শেফালীর জ্বালা-জুড়ানো সৌরভ। ঢাকার বাদশাহী অতীত। কুমিল্লা ও বগুড়ার বৌদ্ধ মঠ পীঠগড়। আরব বণিকের স্মৃতি বিজরিত উৎফুল্ল চট্টগ্রাম বন্দর এখন থেকে সবই আমার।
>
> কলকাতা আজ থেকে কামালের পর। (আবু রুশ্‌দ্ ২০০০ : ৩৮১)

উচ্চবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্তের চোখে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতাকে পর ভাবা আর পাকিস্তানকে আপন করে নেওয়ার এই অনুভূতি আকস্মিক বলেই মনে হয়। কারণ এইসব স্থান ঐতিহ্য সৌন্দর্য পাকিস্তান হবার আগেও ছিল, আগেও এগুলোর উত্তরাধিকার দাবি করতে কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু এত উচ্ছ্বাস কেন? মূলত পাকিস্তান যে মধ্যবিত্তের কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র, তাই এই অনুভূতির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। কলকাতায় অবস্থান করলেও পাকিস্তানের প্রতি মুগ্ধ কামাল বিমনা হয়ে ভাবে : 'স্বাধীনতার টগবগানো খুশিতে ঢাকার প্রতিটা অলি-গলি আজকে নিশ্চয় চোখ জুড়ানো নূতন এক লেবাশ পরেছে। যদি আজকে ঢাকায় থাকা যেত।' (আবু রুশ্‌দ্ ২০০০ : ৩৮) এখানে পাকিস্তান নিয়ে নিম্নবর্গ আর উচ্চবর্গের, বিশেষত উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির চিন্তার পার্থক্যটি স্পষ্ট হয়ে যায়। পাকিস্তান মুসলমান মধ্যবিত্তের জন্য ক্ষণিক আনন্দ এনে দিলেও তা স্থায়িত্ব লাভ করেনি। মধ্যবিত্তের সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তহীনতার দ্বৈরথ তাকে আরও গভীর নিরস্তিত্বের মধ্যে পতিত করে। কালের যাত্রায় একসময় কামাল পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। নতুন শহরে সে মুখোমুখি হয় নতুন নতুন বাস্তবতার।

২.৩.৩.৩

পশ্চিম থেকে আসা মুসলমানদের মধ্যে যেমন উচ্চমধ্যবিত্ত ছিল, অন্যদিকে আরেকটি বড় অংশ ছিল দরিদ্র মধ্যবিত্ত। শিক্ষিত এই শ্রেণি চিন্তা ও মননে মধ্যবিত্ত-সত্তাকে ধারণ করলেও অর্থনৈতিক বিবেচনায় দরিদ্র। দেশভাগের বাস্তবতায় কোন ধরনের সংকটের মুখোমুখি হয়ে তাদের পশ্চিমবঙ্গ বিশেষত কলকাতা ছাড়তে হয়েছিল, তারও শিল্পভাষ্য নির্মিত হয়েছে বাংলাদেশের উপন্যাসে। সরদার জয়েনউদ্‌দীনের (১৯১৮-১৯৮৬) *বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ* (১৯৭৫) উপন্যাসের প্রথমপর্বে উক্ত

সংকটপর্বের রূপায়ণ আছে। উপন্যাসটি একই ঔপন্যাসিকের *অনেক সূর্যের আশা* (১৯৬৬) উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব হিসেবে বিবেচ্য। *অনেক সূর্যের আশার* যেখানে শেষ, *বিধ্বস্ত রোদের ঢেউয়ের* শুরু সেখান থেকে। উপন্যাসের শুরুতে কয়েক বাক্যে ঔপন্যাসিক তা জানিয়ে দিয়েই উপন্যাস শুরু করেছেন। তবে লক্ষণীয় বিষয় – *অনেক সূর্যের আশার* প্রকাশকাল পাকিস্তানপর্বে, উপন্যাসের ঘটনাক্রম সাতচল্লিশ-পূর্ববর্তী সময়; বিষয়ের অনেকখানি জুড়ে থাকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রতি বাঙালি মুসলমান যুবকদের সমর্থন ও সম্পৃক্তির কার্যকারণগত পরম্পরা। আর *বিধ্বস্ত রোদের ঢেউয়ের* প্রকাশকাল বাংলাদেশ-পর্বে, ঘটনাক্রম সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্নো; বিষয়ের বড় অংশ জুড়ে থাকে বাঙালি মুসলমানের ঢাকা কেন্দ্রিক নতুন চিন্তা, নতুন জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত কর্মক্রিয়া।

অনেক সূর্যের আশার রহমতরা *বিধ্বস্ত রোদের ঢেউয়ে* পাকিস্তান জন্মের মুহূর্ত থেকেই মোহভঙ্গের বেদনায় আক্রান্ত এবং নিজেদের পূর্ববর্তী তৎপরতায় ও পাকিস্তান-আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়দের কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ। কারণ পাকিস্তান সৃষ্টির পর কলকাতা ভারতের অংশে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে তাদের অস্তিত্ব হয় সংশয়পূর্ণ। রহমত-কলিম-হাতেমদের ৫/২-এর পাটোয়ার বাগানের মেসবাড়িটি ধীরে ধীরে শূন্য হতে থাকে। কারণ অধিকাংশ মুসলমানের গন্তব্য তখন ঢাকা – পূর্ব পাকিস্তানের নতুন রাজধানী। ফলে এই তিনজন অনুভব করে এক নিরাশ্রয় চেতনা। কয়েকদিনের মধ্যেই পাল্টে যায় কলকাতার চিত্রও – 'মুসলমানদের মনটা ক'দিনেই খুব সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। যে মনোবল নিয়ে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতো, অকস্মাৎ উবে গেছে যেন।' (সরদার ১৯৭৫ : ১১) রহমত-কলিমদের মতো সচেতন শিক্ষিত মুসলমানরা চেয়েছিল পাকিস্তান – মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রব্যবস্থা; কিন্তু তারা দেশভাগ তথা বাংলাভাগ চায়নি। এই দেশভাগ তাদের জন্য ছিল আকস্মিক। কলিমের আক্ষেপ ও ক্ষোভ হওয়া তাই স্বাভাবিক:

> আসাম গেল, পাঞ্জাবের অর্ধেক গেল, বাঙলার গেল জানটাই। এ পাকিস্তান নিয়ে আমরা ধুয়ে খাব নাকি? লোকে অনুকম্পা করে যে পুরস্কার দেয়, ঐ যাকে বলে কনসোলেশান প্রাইজ, এও যে তাই। (সরদার ১৯৭৫ : ১২)

মেট্রোপলিটন কলকাতা ছাড়া তারা যেন কিছু ভাবতেই পারে না। হাতেম-কলিম দুইজনেরই পৈতৃক বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানে; গ্রামে হাতেমের স্বজন আছে, কলিমের কেউ নেই। ফলে হঠাৎ করে কলকাতা ত্যাগ করা তাদের জন্য এক অপ্রস্তুত ব্যাপার। কিন্তু পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি তাদের স্থির হতে দেয় না। কলকাতা-ত্যাগ যেমন মুসলমানদের বাস্তবতায় পরিণত হয়, পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতায় হিন্দু জনগোষ্ঠীর উদ্বাস্তু-স্রোতও তৈরি করে বিপর্যয়ের চালচিত্র:

> কলকাতার আবহাওয়া ক্রমাগত অসহ্য রকম বিষিয়ে উঠছে। দোকান পাটে, বাজারে প্রায়ই ছোট খাটো কথাবার্তা নিয়ে হুড়হাঙ্গামা হচ্ছে। আর একটা নিশ্চিত মীমাংসা আছে এসব ঘটনার। অপরাধী বা আসামী সবক্ষেত্রেই মুসলমান।
>
> পূর্ব বাংলা থেকে স্রোতের মত মানুষ এসে পৌঁছাচ্ছে কলকাতায়। তাদের না আছে খাবার না আছে মাথা গুঁজবার ঠাঁই। নিরূপায় হয়ে শিয়ালদহ রেল স্টেশনের আশেপাশে খোলা জায়গায়ই বিছানা বিছাচ্ছে তারা। এইসব লোকই হুড়হাঙ্গামা বেশী করছে। জোরজবরদস্তি চালাচ্ছে মুসলমান দোকানদার ব্যবসায়ী এদের উপর। ইচ্ছে, ভয় দেখিয়ে কোন মতে তাদের ভাগিয়ে জায়গাটা দখল করতে পারলেই হয়। (সরদার ১৯৭৫ : ৫৫)

ছেচল্লিশের দাঙ্গার ভয়াবহতা তখনও ম্লান হয়ে যায়নি। যেমন হাতেম কলকাতার বাসে উঠে শুনতে পায় – 'ক'দিন আগেও শালা নেড়েদের জন্য এখানে দিয়ে যাওয়া যেত না।' (সরদার ১৯৭৫ : ১৬)। ধুতি পরিহিত থাকার কারণে হাতেমের ধর্মপরিচয় সেবার চট করে চিহ্নিত করা যায়নি। সংস্কৃতির সঙ্গে যে ধর্মের এক গভীর যোগ আছে, তা এই ঘটনা থেকে উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু এটি একটি মানসিক পীড়ন, যা ক্রমান্বয়ে পুরো চেতনাকে আক্রান্ত করতে থাকে। একগুঁয়ে কলিমও তখন আর আনন্দের ছবি আঁকতে পারে না; দাঙ্গার মর্মপীড়াকে ধারণ করেই সে আঁকে দাঙ্গাবিরোধী স্কেচ। রহমতও দেখে : 'আজ এ মুসলমানের দোকানটা লুট হয়ে গেল, কাল অমুক মুসলমানের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। তাই মন প্রায়ই ভয়ে ভয়ে তড়পায়, কখন কি ঘটে তার ঠিক কি?' (সরদার ১৯৭৫ : ১৬) তিনজনের এই প্রেক্ষণবিন্দু বা চিন্তাস্রোত মুসলমানের প্রেক্ষণবিন্দু। কিন্তু সাতচল্লিশের অব্যবহিত পরে কলকাতায় বসবাসরত মুসলমানরা বাস্তবিক ও মানসিকভাবে যে অনিরাপদ বোধ করছিল, উপন্যাসধৃত কর্মতৎপরতা থেকে তা অস্বীকার করা যায় না। ফলে অনিকেত মানুষগুলোর জন্য অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায় কলকাতা-ত্যাগ ও ঢাকা-গমন। কিন্তু ঢাকাও কি তাদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত? কলকাতায় থাকা অবস্থাতেই তারা জানতে পারে মাথা গুজবার ঠাঁই নেই ঢাকায়। আর ঢাকা যে তাদের কাছে একেবারেই অচেনা, অজানা। কোথায় তাদের ঠাঁই হবে – এক অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ তাদের সামনে অবস্থান করে। নিম্নমধ্যবিত্ত এই মুসলমানদের অবস্থান দেশভাগ কোনো ইতিবাচক ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দিতে পারেনি। তাই রহমত উচ্চারণ করে : 'কলকাতায় ছিলাম লাখো হিন্দুর চাপে আধমরা, আর এখন ঢাকায় তেলোটাক শহরে যাব লাখ লাখ মুসলমানের চাপে সেই আধমরা অবস্থা থেকে শেষ নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচার জন্য।' (সরদার ১৯৭৫ : ১৩) কিন্তু ভাগ্যই তাদের নিয়ে যায় ঢাকায়। দীর্ঘ কষ্টকর রেলযাত্রা – শিয়ালদহ থেকে গোয়ালন্দ পর্যন্ত; সেখান থেকে স্টিমারে মানবেতর ভীড় সহ্য করে নারায়ণগঞ্জ; এরপর নারায়ণগঞ্জ থেকে ঘোড়ার গাড়িতে ওমর মিয়ার বাড়িতে পদার্পণ। দ্বিধাদ্বন্দ্ব, অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও এভাবেই তাদের নতুন জীবনের সূচনা। এখানেও এসে তারা পেয়ে যায় কলকাতারই সঙ্গীসাথি ও পরিচিত জনদের। কলকাতার

মতোই এ যেন আরেক নতুন উপনিবেশ। রহমত-হাতেম-কলিমদের জীবন হয়ে ওঠে উদ্বাস্তুসম। তাদের আশ্রয়ের কোনো স্থায়ী সমাধান মেলে না। র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিটের ঘুপচি ঘরেই দিন গুজরান করতে হয় তাদের। নতুন রাজধানী ঢাকায় এর মধ্যেই শুরু হয় বিচিত্রমুখী রাজনৈতিক তৎপরতা।

২.৩.৪. স্মৃতিসত্তায় দেশভাগ

২.৩.৪.১

দেশভাগ-পরবর্তী উদ্বাস্তু-সংকট কেবল তৎকালীন সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্মৃতিকাতরতা ও দীর্ঘমেয়াদী মনোজাগতিক সংকট তৈরি করেছে। অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক অবস্থা থেকে দেশবদল বা দেশত্যাগের ফলে অসুবিধাজনক অবস্থায় উপনীত হওয়ার সঙ্গে দেশজনিত 'স্মৃতি'র সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে যাওয়া হিন্দু মধ্যবিত্ত বাঙালিদের মধ্যে দেশভাগ অনেকাংশে স্মৃতিসত্তার আখ্যান হিসেবে ক্রিয়াশীল শাকে। সাতচল্লিশ-পরবর্তী ভারতীয় বাংলা উপন্যাসে তার রূপায়ণ আছে। সেদিক থেকে বাংলাদেশের উপন্যাসে এই প্রবণতা কম। পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত মুসলমান মধ্যবিত্ত বাঙালির একটা বড় অংশ বৈষয়িকভাবে অপেক্ষাকৃত সুবিধাপ্রাপ্ত হয়েছিল বলে তারা ফেলে-আসা কষ্টকর সময়ের স্মৃতিকে গৌণ বিবেচনা করে লব্ধ নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে সম্মুখমুখী হয়েছে। কিন্তু দেশবদলের পরও যে শ্রেণির কাঙ্ক্ষিত প্রাপ্তিযোগ ঘটেনি, বরং একটা মূলহীন অনুভূতি নিয়ে জীবনযাপন করতে হয়েছে সেই শ্রেণি হয়েছে স্মৃতি-আক্রান্ত। অধুনা সাহিত্যতত্ত্বে এই ধারণাকে চিহ্নিত করা হয় 'ডায়াসপোরা' হিসেবে। ডায়াসপোরা সাহিত্যতত্ত্বে যে বিষয়গুলো গুরুত্ব পায় সেগুলো হলো : 'গৃহত্যাগ করা, নিজ বাসভূমের জন্য স্মৃতিকাতর হয়ে পড়া, নতুন ভূমিতে একাকিত্ব বোধ করা, সমঝোতা করা, নতুনভাবে নিজের আত্মপরিচয় নির্মাণ করা, দুই দেশের সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ভেতর আটকে পড়া; প্রভৃতি।' (মোজাফ্‌ফর ২০১৯ : ২৫) এর সঙ্গে প্রবল হয়ে উঠতে পারে সাংস্কৃতিক ও রুচিগত বৈভিন্ন্যের সংকট। সেই সংকট অনেক ক্ষেত্রে আত্মপরিচয়ের সংকটের দিকে মানুষকে ধাবিত করে।

রাজিয়া খানের (১৯৩৬-২০১১) *হে মহাজীবন* (১৯৮৩) উপন্যাসের আমিনা এমনই সংকটাবর্তে বৃত্তাবদ্ধ একটি চরিত্র। দেশভাগ কেবল মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্নবিত্তকেই আক্রান্ত করেনি, উচ্চবিত্ত মুসলমান-পরিমণ্ডলে দেশভাগের অভিঘাতের স্বরূপ কেমন, আমিনা ও তার পরিপার্শ্ব থেকে তা উপলব্ধি করা যায়। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র আশৈশব মহানগর কলকাতায় অভ্যস্ত আমিনা মল্লিকের সংকট

পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী শহর ঢাকায় মিলতে না পারার সংকট। যদিও ঢাকায় তার আগমন ষাটের দশকে। দেশভাগের প্রত্যক্ষ স্মৃতি তার মধ্যে নেই। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে ঢাকায় আসতে হয়েছিল। এরপর ঢাকার নব্য ধনিক আনিসের সঙ্গে বিবাহ-সূত্রে এক বিবমিষাময় জীবন তাকে যাপন করতে হয়েছে। এমএ পড়া পর্যন্ত কলকাতায় নির্মিত হওয়া তার নাগরিক মন কোনোভাবেই উঠতি নগর ঢাকাকে মেনে নিতে পারেনি। এই আশঙ্কা ঢাকায় আসার আগেই তার মধ্যে দেখা দিয়েছিল:

> যে মুক্ত আবহাওয়ায় সে মানুষ হয়েছে ঢাকায় তা পাবে তো? বৈদগ্ধ্য, ধর্মনিরপেক্ষতা, উদার দৃষ্টিভঙ্গি এগুলো কেবল মুক্ত আকাশের নিচেই প্রস্ফুটিত হয়। সংকীর্ণচিত্ত গ্রাম্যতায় এসব মূল্যহীন। ঐ গুণগুলো সংকীর্ণলোকের কাছে ঘৃণ্য মনে হওয়া স্বাভাবিক। (রাজিয়া ২০০৪ : ৫১৬)

সংস্কৃতি ও রুচিগত পার্থক্য আমিনাকে প্রকটভাবে ভুগিয়েছে। আমিনার বাস্তবিক ও মানসিক পরিভ্রমণ কলকাতা-করাচি-লন্ডন-জার্মানি। স্বামী আনিস ও তার আত্মীয়স্বজনদের কর্মকাণ্ড সবসময়ই আমিনার কাছে নীতিবর্জিত ও রুচিহীন বলে মনে হয়েছে। 'তার দৃষ্টিতে স্বামী-সংসার সারা বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছে।' (মৌমিতা ২০২১ : ১৬২) আনিসের সঙ্গে বিয়েটাও যেন দেশভাগের মতো এক আকস্মিক ব্যাপার। কোনো মানসিক বা রুচিগত মিল না থাকা সত্ত্বেও আনিসের ক্ষণিক আবেগের মূল্য দিতে হয় বিয়েতে আমিনার সম্মতির মধ্য দিয়ে; ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিকোণ থেকে দেশভাগও যেন অনেকটা ক্ষণিক আবেগের ফলাফল। কিন্তু অচিরেই ব্যবধান উন্মোচিত হয়:

> সেদিনের অজ্ঞাত এক ছোকরা বাপের নতুন পয়সায় তাদের পারিবারিক জীবনে একটু জৌলুস এসেছে। গ্রীন রোডের ওদের পচা, নোংরা বাড়ি যতই লতায় ঢেকে রাখুক না কেন ওর ভেতরে অন্তঃসারশূন্য জীবনযাত্রা তাকে আরও বীতশ্রদ্ধ করেছে আনিসের প্রতি। ভাই-বোনরা মিশনারি স্কুলে পড়ে চটপট ইংরেজি আওড়ায়। পোশাক-আশাকেও স্মার্ট। কিন্তু গ্রাম্যতার ছাপ চাল-চলনে। (রাজিয়া ২০০৪ : ৪৯৯)

বিশ বছরের বিবমিষাময় দাম্পত্যজীবনকে ছুড়ে ফেলে অবশেষে প্রাক্তন প্রেমিক গৌতমের সান্নিধ্যেই আমিনা শুশ্রূষা অনুভব করে। কলকাতার বাতাসকেই নির্মল মনে হয়; আর ঢাকার বাতাস হয়ে ওঠে বিষাক্ত ও তেতো। সাতচল্লিশের সময়কার ঘটনা না হলেও দেশভাগের দীর্ঘস্থায়ী অভিঘাতকে আমিনা চরিত্র ধারণ করেছে। ষাটের দশকে হলেও মুসলমান হবার কারণেই আমিনাকে যে কলকাতা ও ঢাকার মধ্যে ঢাকাকে নির্বাচন করতে হয়, তা দেশভাগেরই প্রলম্বিত ফলাফল। এবং শেষ পর্যন্ত ঢাকাকে, ঢাকার রুচিকে ও ঢাকার অধিবাসীদের মেনে না নিতে পারার যাতনাও দেশভাগজনিত উন্মূলীত জীবনবোধেরই পরিচায়ক। আমিনার এই ধরনের বৈশিষ্ট্য থেকে তাকে 'ডায়াসপোরা' বলে অভিহিত করা যায়। ডায়াসপোরা সাহিত্যের পরিচিতি উল্লেখ করেছেন সমালোচক মোজাফ্ফর হোসেন (২০১৯ : ২৪):

> ডায়াসপোরা পরিস্থিতিতে বাস করছেন অর্থাৎ কোনো কারণে নির্বাসনে থেকে বা জীবিকার অন্বেষণে নিজ দেশ ছেড়ে ভিনদেশে বাস করছেন এমন পরিস্থিতিতে কোনো লেখক যে সৃজনশীল সাহিত্য রচনা করেন সেটি ডায়াসপোরা সাহিত্য। ... প্রত্যক্ষ ডায়াসপোরা সাহিত্য হলো সেইসব সাহিত্যসৃষ্টি যেখানে ডায়াসপোরা জীবনে থেকে স্বদেশ (হোমল্যান্ড) এবং আশ্রিত দেশের (হোস্টল্যান্ড) মধ্যকার টানাপোড়েন উঠে আসবে।

হে মহাজীবন উপন্যাসে ডায়াসপোরা সাহিত্যের কিছু বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি পাওয়া যায়। দেশভাগ আমিনার মতো এমন অনেক মানুষের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটিয়েছে। মূলধারার ইতিহাসে সবসময় এই রক্তক্ষরণ লিখিত হয় না। কিন্তু জন-ইতিহাস চর্চার অংশ হিসেবে সৃষ্টিশীল সাহিত্যপাঠ থেকে এইসব নির্মম বাস্তবতার পাঠ অনুভব করা যায়।

২.৩.৪.২

মাহমুদুল হকের (১৯৪০-২০০৮) *কালো বরফ* (রচনা : ১৯৭৭; গ্রন্থাকারে প্রকাশ : ১৯৯২) উপন্যাসের কেন্দ্র-চরিত্র মফস্বলবাসী কলেজ-শিক্ষক আবদুল খালেকও দীর্ঘমেয়াদী উদ্বাস্তু-সমস্যাক্রান্ত চরিত্র। এই সংকটের সূচনাও দেশভাগজনিত বাস্তবতা। উপন্যাসবিধৃত দেশচ্যুত বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পারার নিষ্ক্রমণ হিসেবে আবদুল খালেকের সঙ্গী হয় তার শৈশবস্মৃতি। সেই শৈশবস্মৃতির পোকা ও বর্তমানের খালেকের স্পাইরাল উপস্থিতি ডায়াসপোরো মানসিকতার পরিচয় বহন করে।

মাহমুদুল হক নিজেও একজন পশ্চিম থেকে পূর্বে আসা মানুষ। পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাতে জন্ম এই লেখককে পরিবারের সঙ্গে হতে হয়েছিল দেশছাড়া। ১৯৪৭ সালে 'ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন ও নিষ্ঠুর আততায়ীর মতো দেশভাগের যন্ত্রণা বুকে নিয়ে শত শত পরিবারের সঙ্গে সিরাজুল হক [মাহমুদুল হকের পিতা] চলে এসেছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। একা। স্ত্রী-সন্তান এসেছিলেন কয়েক বছর পর।' (আবু হেনা ২০১০ : ২৫৮) ১৯৫২ সালে মাহমুদুল হক ঢাকায় এসে লালবাগের ওয়েস্টএন্ড স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন। অর্থাৎ এক খণ্ডিত শৈশব নিয়ে তাঁর পাকিস্তান-অধ্যায়ের শুরু। এক ফেলে আসা শৈশবের স্মৃতি-অনুস্মৃতি নানাভাবেই তাঁর কথাসাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে। 'লেখক স্মৃতির সমুদ্রে ডুবে যেতে যেতে নিজের অজান্তেই একটা বিরল উপন্যাস তৈরি করে ফেলেছেন।' (গৌতম ২০১৪ : ২২৮) একই সঙ্গে উপন্যাস হিসেবে আখ্যানের বয়ানের এক ব্যতিক্রমী নিরীক্ষাও তাঁর উপন্যাসে লক্ষ করা যায়। আর যাপিত জীবনের মাহমুদুল হকও এই প্রসঙ্গে বিবেচনাযোগ্য হয়ে ওঠে। যেমন তাঁর সম্পর্কে বলা হয়:

> কথাশিল্পী মাহমুদুল হক জীবৎকালেই হয়ে উঠেছিলেন আলো-আঁধারির মানুষ. ধরা-ছোঁয়ার বাইরে যেন তাঁর অবস্থান। ... তিনি যেন এ-জীবনে থেকেও নেই, অস্তিত্বের ভিন্নতর অর্থের সন্ধানে খুঁজছেন পথ, বুঝি-বা পেয়েছেন পথের হদিশ, তবে সেই একলা পথে চলবার আর কোনো সাথি বা সঙ্গী পাওয়া যায় না, নিঃসঙ্গ সেই সাধনায় চলে নিজের সঙ্গে নিজেরই বোঝাপড়া। এমন পথের অভিযাত্রী হওয়ার রসে নিমজ্জিত সাধক-মনের অধিকারী মানুষও তো তেমন মেলে না, মাহমুদুল হক ছিলেন সেইসব বিরলতমদের একজন। (আবুল হাসনাত ২০১০ : মুখবন্ধ)

ফলে মাহমুদুল হকের *কালো বরফ*-পাঠ এক অর্থে মাহমুদুল হক-পাঠ। 'দেশভাঙার বুকভাঙা বেদনায় জারিত শৈশব তাঁর শরৎ-বিভূতি দাগকাটা মনে লেখক হওয়ার স্বপ্নবীজ বুনে দিয়েছিল। জীবন থেকে খুব অল্প বয়সেই পেয়েছিলেন জীবনের গূঢ়পাঠ : একদিন সবকিছু গল্প হয়ে যায় (*কালো বরফ*)।' (ফেরদৌসী ২০১০ : ৮১) স্ত্রী রেখা ও পুত্র টুকু সমেত জীবিকার প্রয়োজনে নিস্তরঙ্গ জনপদে (মুন্সিগঞ্জ) আবদুল খালেক সময়ের সঙ্গে অনভিযোজিত মানুষ। তাই তার বর্তমানের চেয়ে সে নিবারণ কাকুর দেওয়া 'পোকা' নামের মধ্যেই জীবনের অর্থ খুঁজতে চায়। সে ফিরে যায় শৈশবের পুকুর ঘাটে, বারান্দায়, সিঁড়িতে, জানালায়; যা ছিল নিজ দেশ, এখন সেটা আর তার দেশ নয়। মণি ভাইজান, ছবিদি, মাধুরী, টিপু, রানি, পুঁটি, পাচু, ঝুমিদের নিয়েই তার জগৎ। ইরানি জিপসিদের তাবু, গোরা সৈনিকদের ছাউনি, গিরিবালা, শনপাপড়ি, কুলপি মালাইওয়ালা, চিনেবাদামওয়ালা – সবকিছুর মধ্যে এক হৃতশৈশবের বেদনা। এর ব্যাখ্যা হিসেবে যতীন সরকার (২০১৩ : ১২৪) জানান:

> এই আবদুল খালেক ওরফে পোকাকে বিমুগ্ধ শৈশবেই বিরূপ বাস্তবের পোকার কামড়ে ক্ষতবিক্ষত হতে হয়েছিল। সেই পোকার কামড়ে তার সত্তার একেবারে গভীরে যে দগদগে ঘা-এর সৃষ্টি হয়, সেটি কোনোদিনই শুকোয়নি। বাস্তবের রাক্ষুসে পোকাটির নাম পার্টিশান বা দেশভাগ, দেশভাগ থেকেই পাকিস্তান।

দেশভাগ কেবল যে উপরিতলের রাজনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তা মানুষের সামূহিক চেতনাকে নাড়া দেয় তা পোকা তথা খালেকের চিন্তাস্রোতে ধরা দেয়। উপন্যাসবিধৃত বর্তমান বাস্তবতায় খালেকের অস্তিত্ব রূপায়িত হয় ঔপন্যাসিকের প্রতীকী ব্যঞ্জনায়:

> একটা বিশাল অশথ গাছ আড়াআড়িভাবে পড়ে আছে। কোনোরকমে সে ডিঙিয়ে গেল। প্রথমে অবাক হলো। বিনা বিষ্টিবাদলাতেই এমনভাবে গাছ-গাছড়ার হুমড়ি খেয়ে পড়া সে আর কখনও দ্যাখেনি। খেয়াল করে দেখলো, গাছের গোড়াটা একেবারে ভোঁতা, শেকড়-বাকড় নেই। ক্ষয়া, পোকা খাওয়া। এই ভেবে কিছুটা অবাকও হলো, এতোদিন তাহলে গাছটা খাড়া দাঁড়িয়ে ছিল কিভাবে! নিছক অভ্যাসবশত? না কি কোনো কিছুর অপেক্ষায়? (মাহমুদুল ২০১০ : ৬৪-৬৫)

পোকা ভর্তি হয়েছিল কালীকৃষ্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। মাহমুদুল হকের স্কুলের নামও কালীকৃষ্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়। পোকা আর বটুকে (মাহমুদুল হকের ডাক নাম) আলাদা করা যায় না। মাহমুদুল হকের হৃতশৈশবই পোকার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। পোকার মতো বালকদের বোঝার কথা নয় ভোটাভুটি, দেশভাগ, পাকিস্তান, কাটাকুটির কথা। কিন্তু তারা জেনে যায় : 'দ্রুত একটা পরিবর্তন ঘটছিল চারদিকে। সেসব আমরা কিছু বুঝতাম না। হিন্দু-মুসলমানদের দলাদলির কোনো ব্যাপার থেকে বালক সংঘ ভেঙে দু টুকরো হয়েছিল।' (মাহমুদুল ২০১০ : ৮০) দেশভাগ এমন এক আকস্মিক বাস্তবতায় পরিণত হয়, যা একজন 'মানুষ বালককে' এক মুহূর্তে 'মুসলমান বালকে' রূপান্তরিত করে দেয়, তাকে বুঝতে দেওয়ার আগেই। প্রতিবেশী হরিপদের প্রশ্ন ছিল 'তোমার বাবা পাকিস্তান চায় নাকি?' এর উত্তর পোকার জানা ছিল না। কারণ 'পাকিস্তান কি জানা ছিল না।' (মাহমুদুল ২০১০ : ৮১) একসময় কানে আসতে থাকে – 'কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, জিন্না, জহরলাল, প্যাটেল'দের নাম। কিন্তু 'হুট করে একদিন পাকিস্তান হয়ে গেল।' পোকাদের বাড়ি, বাসস্থান পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হলো না। এক পর্যায়ে সাম্প্রদায়িক আক্রমণের কারণে তাদের হতে হয় দেশত্যাগী। হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতার কারণে যে পোকাদের নিজ ভূমি ছেড়ে পাড়ি জমাতে হয়েছিল পাকিস্তানে, পরিণত বয়সে খালেক এ-পাশেও দেখে মুদ্রার উল্টো রূপ – মুসলিম-সাম্প্রদায়িকতা। এখানে সে দেখতে পায় জোর করে হিন্দুর সম্পত্তি দখল করে বড়ফট্টাই করা আফজালদের। তাই এখানেও সে বেমানান। আফজাল সম্পর্কে স্ত্রী রেখাকে খালেক বলে : 'জোর করে হিন্দুর সম্পত্তি দখল নিয়েছে লোকটা, তাই দুটো করে খেতে পারছে, তা না হলে কে পুঁছতো এদের।' (মাহমুদুল ২০১০ : ৮৯) এই মানসিক প্রতিকূলতার মধ্যেও সে খানিকটা স্বস্তি পায় নরহরি ডাক্তারকে পেয়ে। হিন্দু হয়েও সে দেশ ত্যাগ করেনি। আর তার খেসারত দিতে হয় পরবাসীসম জীবনযাপনের মাধ্যমে। অর্থাৎ ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ কোনো পক্ষকেই উপকৃত করেনি, সুবিধা দিয়েছে কেবল সুযোগসন্ধানী লুটেরাদের, যাদের আদতে নেই কোনো ধর্মীয় সংবেদনশীলতা। খালেকের এই মানসিক বিত্রস্ত রূপকে সমালোচক দেখেছেন উত্তর-ঔপনিবেশিক বাস্তবতার কার্যকারণ সম্পর্কের ভেতর দিয়ে:

> মাহমুদুল হক তাঁর উপন্যাসে ঔপনিবেশিক কাঠামোর বিপরীতে অবস্থান নিয়ে শৈশব-স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে উপনিবেশিত মানুষগুলির যথার্থ পরিচয় উদঘাটন করায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। উপন্যাসে চরিত্রগুলি বুর্জোয়া নাগরিক সমাজের পরাশ্রয়ী মধ্যবিত্ত, কখনো বা নিম্নবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি; বর্তমান যাদেরকে করেছে উদ্বাস্তু, উন্মূল; সত্তার মূল ঠিকানা তারা খুঁজে ফেরে শৈশবস্মৃতিতে। (কানিজ ২০১৫ : ২১৫)

দেশভাগ একটি স্থায়ী ও ধারাবাহিক বেদনা হিসেবে ক্রিয়াশীল ছিল মাহমুদুল হকের জীবনে ও তাঁর উপন্যাসে। ঔপন্যাসিকের ইতিহাস ও রাজনীতিজ্ঞানের সচেতনতা প্রকাশ পায় *কালো বরফ* গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় রচনাকাল উল্লেখে লেখকের সচেতন আগ্রহে। এই গ্রন্থের প্রকাশক জানান : 'তাঁর

অভিপ্রায় ছিল রচনাকাল ছাপা হোক দৃষ্টি-কাড়ানিয়াভাবে, উৎসর্গ-পত্রের মতো স্পষ্টভাবে। সেভাবেই ছাপা হয়েছিল, 'রচনাকাল : ২০-৩০ আগস্ট, ১৯৭৭।" (মফিদুল ২০২১ : ২১) এটি নিছক কোনো তথ্যমূলক সচেতনতা নয়; এর সঙ্গে জড়িত সময়ের পরম্পরা ও রাজনীতির চঙ্ক্রমণকে ধারণ করার বাস্তবতা। সাতচল্লিশের রাজনীতির প্রত্যক্ষ শিকার মাহমুদুল হক সাতচল্লিশ-পরবর্তী বাংলাদেশের সেই নাগরিক অংশের প্রতিনিধি যাঁরা রাজনীতি, শাসনব্যবস্থার বিচিত্র পরিবর্তন সত্ত্বেও বাংলাদেশে সদর্থক, উদার ও ধর্মনিরপেক্ষ স্রোতটিকে বহমান রেখেছিলেন। পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে কোন পরিস্থিতিতে মাহমুদুল হক সপরিবারে হয়েছিলেন নিজদেশচ্যুত হয়েছিলেন এবং থিতু হয়েছিলেন ঢাকায়। এবং তাঁর শিল্পসত্তায় নানাভাবে রূপায়ণ ঘটে সেই হৃতশৈশবের বেদনা ও দেশহারানোর ক্ষত। ঔপন্যাসিক এক সাক্ষাৎকারে জানান : 'আমার শৈশব খুব দ্বন্দ্বসংকুল, দেশভাগের যন্ত্রণায় ভরা, বাধ্য হয়ে দেশ ছাড়ার বেদনায় ভরা।' (আহমদ মোস্তফা ২০১৩ : ৩৩) কিন্তু তিনি নতুন রাষ্ট্রে এসেও নিজের সদর্থক ভূমিকা রেখেছিলেন। তাই সেই বেদনা ও ক্ষত ওই কালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; এর পরবর্তী বিভিন্ন বাস্তবতায় ও রাজনৈতিক অভিঘাতে তা আরও কীভাবে জটিল হয়ে ওঠে, তার রূপদানের মধ্য দিয়েই মাহমুদুল হক তাঁর রাজনৈতিক সজ্ঞানতার পরিচয় দেন। পরিণত জীবনে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরবর্তী থাকলেও তারও আগে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রগতিশীল রাজনীতির সঙ্গে সংযোগ মাহমুদুল হকের রাজনীতিচেতনার ধারাবাহিকতাকে নির্দেশ করে। ঔপন্যাসিকের জীবনপঞ্জিকার জানাচ্ছেন:

> ১৯৫৪ সালে [মাহমুদুল হক] ভুখা মিছিলে গিয়ে পুলিশে আটক হন। বাবাকে বন্ড দিয়ে ছাড়িয়ে আনতে হয়েছিল, এ মামলাও চলেছিল বেশ কিছুদিন। অষ্টম শ্রেণির ছাত্র যখন, হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারী' সংকলনের প্রকাশক ওয়েস্টএন্ড স্কুলের বাংলার শিক্ষক মোহাম্মদ সুলতানের সাহচর্য ও প্রেরণায় ছাত্র ইউনিয়নের স্কুল শাখা গঠন করেন। ... ১৯৫৭-'৫৮ সালে মাহমুদুল হক পূর্বপাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের [ইপসু] কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। '৫৮-র পরে রাজনীতিতে আর সক্রিয় ছিলেন না।। (আবু হেনা ২০১০ : ২৫৮-২৫৯)

এই ধারাবাহিকতায় ও পূর্ববর্তী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির শিকার মাহমুদুল হক ১৯৯২ সালে প্রকাশিত বইয়ে যখন রচনাকাল ১৯৭৭-কে গুরুত্ব দিতে চান, তখন সেই উপন্যাসের আবদুল খালেকের নিরস্তিত্বময় জীবন ও তার শৈশব তথা পোকার হৃতশৈশব, নিজবাসভূম থেকে উৎখাত হওয়ার সমান্তরাল যন্ত্রণাবোধের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিকের রাজনৈতিক বোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত ধর্মনিরপেক্ষ চেতনাঋদ্ধ বাংলাদেশ সত্তরের দশকের মধ্যভাগে আবারও পতিত হয় ধর্মীয় রাজনীতি ও সেনাতন্ত্রের কবলে। সাতচল্লিশ থেকে চব্বিশ বছর অতিক্রান্ত করে একাত্তরে এসে মাহমুদুল হকের মতো মানুষদের দেশহারানোর বেদনার ক্ষণিক উপশম হলেও মধ্যসত্তরে তা আরও

গভীর গহ্বরে নিপতিত হয়। তাই খালেকের ক্ষত কেবল সাতচল্লিশের অভিঘাতের ক্ষত নয়, মধ্যসত্তরের রাজনৈতিক অভিঘাতে সেই ক্ষত গভীরতর। *কালো বরফ* তারই রূপায়ণ। *কালো বরফ* নিরুপায় ও নিরবলম্ব মানুষের শোকগাথা। "কালো বরফ' হলো সেই শোকগাথা যা ক্রমাগত পাঠই হয়ে যাবে।' (অমর ২০১৪ : ২২৫) পোকা নামের মধ্যেও ঔপন্যাসিক নির্মাণ করেন দেশহারা মানুষের পোকার মতো বেঁচে থাকার ব্যঞ্জনা। রাজনীতি থেকে যোজন যোজন দূরে থাকা মানুষ কীভাবে রাজনৈতিক ঘটনার শিকার হয়, তারও আলেখ্য এই উপন্যাস।

২.৩.৪.৩

*কালো বরফে*র আবদুল খালেকের মতো আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের (১৯৪৩-১৯৯৭) *চিলেকোঠার সেপাই*র (১৯৮৭) ওসমান গণিও ডায়াসপোরা মানুষ। উপন্যাসের শুরুতেই যে স্বপ্ন দৃশ্য – রঞ্জু তথা ওসমানের পিতার মৃত্যুদৃশ্য – দূর দেশে অবস্থান – শিমুল গাছ থেকে টুপটাপ শিশির পতন – সব একাকার হয়ে পূর্ণবয়স্ক ওসমানের অবচেতনে যে পীড়ন তৈরি করে, তা ক্ষণিকের সৃষ্টি নয় – দীর্ঘ ও ধারাবাহিক বিচ্ছিন্নতার স্বপ্নরূপ। দেশভাগের পর ওসমানের বাবার পূর্ব পাকিস্তানে আগমন, সন্তানকে পাকিস্তানে রেখে আবারও নিজভূমে প্রত্যাগমন, ফিরে না আসা – এসবের মধ্যে পিতার কারণে ওসমানের মধ্যে বঞ্চিত হবার ক্ষোভ যেমন বিরাজ করে, তেমনি দূরে বসবাসরত পিতার জন্য মঙ্গল প্রার্থনাও উপস্থিত থাকে। ১৯৬৯-এর বাংলাদেশের রাজনীতির মধ্যে ওসমানের সিজোফ্রেনিক রোগগ্রস্ত হওয়া, মিলতে না পারার উৎস-সন্ধানে দেশভাগ ও ডায়াসপোরো জীবনবোধকে চিহ্নিত করা যায়।

বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক ঘটনাক্রমে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের তাৎপর্য সামূহিক। এই আন্দোলনে শ্রেণিগত অবস্থান বহুমাত্রিক। উপন্যাসের কেন্দ্র-চরিত্র ওসমানকে যে শ্রেণিভুক্ত বলে শনাক্ত করা যায় – মধ্যবিত্ত – অপরাপর মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকেও তার অবস্থানটি স্বতন্ত্র। দেশভাগের সূত্র ধরে পিতার হাত ধরে পূর্ব পাকিস্তানে আসা, নিজের দেশ হিসেবে এই দেশের সঙ্গে মিলতে না পারার সংকট তাকে মধ্যবিত্তসুলভ এড়িয়ে যাওয়া মানসিকতার ভিত্তিকে সদৃঢ় করে। রাজনৈতিক ইতিহাসের দুই প্রান্তের সংযোগ ব্যক্তির অনুষঙ্গে একটি বৃহত্তর জাতীয় পাটাতনে উপস্থিত এই উপন্যাসে। 'গণআন্দোলনের মধ্যে পুরানা রাজনীতির সীমানা পাঠ, আর নতুন রাজনীতির খোঁজ – এ-ই *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসের নিরক্ষরেখা।' (মোহাম্মদ আজম ২০১৭ : ৩৯) তাই ওসমানের বিকার ও রাজনৈতিক সক্রিয়তার দোদুল্যমানতার কার্যকারণ অনুসন্ধানে তার আত্মআবিষ্কারের নিত্যপ্রণোদনা একটি প্রভাবক অনুষঙ্গ। প্রতিবেশী বালক রঞ্জু নাম উচ্চারণে বারবার সে ফিরে যায় দেশভাগ-পূর্ব

স্মৃতিতে, পিতামাতার দেয়া ডাকনাম রঞ্জুর শৈশবে, গোয়ালঘূর্ণি গ্রামের দিনগুলোতে। তবে, দেশভাগ যে কেবল স্বপ্নভঙ্গের ইতিকথা নয় বরং কোনো কোনো শ্রেণির জন্য নতুনতর প্রাপ্তিযোগ, তার দৃষ্টান্ত মেলে ওসমানের বন্ধু উপন্যাসের আরেক চরিত্র আনোয়ারের পিতা আকবরের কলকাতা ছেড়ে ঢাকার ওয়ারীতে বাড়ি কেনা ও স্বচ্ছল জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে। এর ফলে পরবর্তী প্রজন্মের আনোয়ার হতে পেরেছিল পুরোদস্তুর নাগরিক। ব্যক্তির বিচারে দেশভাগের মাত্রাগত বৈচিত্র্য বহুধা। আনোয়ারের বাবা সুবিধাভোগী হতে পেরেছিল, কিন্তু ওসমানের বাবা ইব্রাহিম শেখ সুবিধা করতে পারেনি। ফলে শ্রেণিগত বৈভিন্ন্য তখনই ঘটে যায়। ভারতে অবস্থানকালে 'দেশভাগের পরেও ২ বছর ১৪ই অগাস্ট এলে পাকিস্তানের নিশান ওড়াবার জন্য ইব্রাহিম শেখের হাত নিসপিস করতো।' (আখতারুজ্জামান ২০০৮ : ৯৬) ব্যবসায় সুবিধা হবে – এই ভেবেই তার পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় আসা। কিন্তু সুবিধা করতে পারেনি বলেই সে দুই বছরের মাথায় ফিরে যায় নিজভূমি গোয়ালঘূর্ণিতে; আর পিতার সঙ্গে যেতে না পারায় ওসমান হয়ে পড়ে চিলেকোঠার বাসিন্দা – হৃতবল সেপাই। সুবিধাজনক অবস্থানে নেই বলেই উনসত্তরের উত্তাল-পর্বেও সে আত্মরতিতে মগ্ন, স্বপ্নদৃশ্যে প্রয়াত মাতার উচ্চারণে পূর্ব পাকিস্তান 'বিদেশ বিভুঁই'। উপন্যাসের শুরুটাই এমন – 'তোমার রঞ্জু পড়ি রইলো কোন বিদেশ বিভুঁইয়ে, একবার চোখের দেখাটাও দেখতি পাল্লে না গো!' (আখতারুজ্জামান ২০০৮ : ১৩) লক্ষণীয়, এখানে বাস্তবের ওসমান পাকিস্তানকে বিদেশ মনে করছে না; স্বপ্নদৃশ্যেও ওসমানের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে পাকিস্তান বিদেশ নয়। ভারতে অবস্থানকারী (স্বপ্নদৃশ্যে) মায়ের উচ্চারণে ওসমানের অবস্থান বিদেশে। ওপারের সাপেক্ষে এপার বিদেশ। ওসমান বহির্বাস্তবে পাকিস্তানকে বিদেশ মনে করে না। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে প্রত্যাশিত প্রাপ্তিযোগের অভাবই মনোজাগতিকভাবে তাকে মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। তাই খিজির-চেংটু যত সহজে গণ-আন্দোলনে যুক্ত হতে পারে, ওসমানের সেভাবে যুক্ত না হবার পেছনে, কেবল পর্যবেক্ষকের অবস্থানের পেছনে শ্রেণিগত অবস্থানের পাশাপাশি দেশভাগজনিত অস্তিত্ব-অন্বেষা ক্রিয়াশীল থাকে। দেশভাগের সঙ্গে যে উদ্বাস্তু জীবনবোধ অব্যবহিত স্থান করে নেয়, তার প্রতীকী পরিচর্যা আছে চিলেকোঠায় ওসমানের বসবাসের মধ্যে। বাস্তবে নয়, তার দেশভাগ থাকে স্মৃতিসত্তায়, স্বপ্নদৃশ্যে, আত্মরোমন্থনে – যার প্রকাশ ঘটে আত্মরতিতে। অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতাহীনতারই একটি প্রকাশ তার আত্মরতিক্রিয়া। '১৯৪৭ চিহ্নটি অবচেতনা কেবল নয়, সামূহিক নির্জ্ঞানের মতো বহন করা হয়েছে ইলিয়াসের সাহিত্যে।' (সিরাজ ২০১৭ : ৩১) দেশভাগ এই উপন্যাসের বহিরঙ্গের বিষয় নয়, কেন্দ্রীয় বিষয়ও নয়; বিবিক্ত ব্যক্তির চারিত্র্য-উন্মোচনে ও বড় ইতিহাসে ব্যক্তির অবস্থান চিহ্নিতকরণে দেশভাগের উপস্থিতি এখানে অন্তঃসলিলার মতো।

২.৩.৪.৪

মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠীর মনস্তত্ত্বে দেশভাগের ক্ষতকে রাজনৈতিক পরম্পরার ভেতর দিয়ে চিহ্নিত করা গেলেও আরও একটি জনগোষ্ঠীকে দেশভাগ এক চিরস্থায়ী রাষ্ট্রহীন ও দেশহীন বাস্তবতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত করে; সেই জনগোষ্ঠী হচ্ছে বিহারি জনগোষ্ঠী। বিহার প্রদেশসহ উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট থেকে আগত দরিদ্রতম এই মুসলমান শ্রেণির বাস্তবতা অপরাপর সকল গোষ্ঠী থেকে আলাদা। ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ কোনো পক্ষের কাছেই সুবিচার পায়নি বলে স্থায়ীভাবে মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হতে হয় এই মানবগোষ্ঠীকে। ‘ষাটের দশকের শেষাংশে পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, পূর্ব পাকিস্তানে ২০ লক্ষ উর্দুভাষী আসেন।’ (মোজাফ্ফর ২০১৯ : ৩৯) এই জনগোষ্ঠীর জীবনের কথকতা রূপায়িত হয়েছে হরিপদ দত্তের (জ. ১৯৪৭) *মোহাজের* (২০০৬) উপন্যাসে। ‘রিফিউজি’, ‘উদ্বাস্তু’, ‘বাস্তুচ্যুত’, ‘মোহাজের’ এই শব্দগুলো প্রতিশব্দসূচক হলেও অখণ্ড অর্থ বহন করে না। তাৎপর্যগত ও কার্যকারণ বিবেচনায় এই বিহারি জনগোষ্ঠীই পূর্ববাংলা অংশে প্রকৃত উদ্বাস্তু। এমনই একটি পরিবার আবু-আল-সাঈদের পরিবার। তার পুত্র আবু-আল-মোতালেব, মোতালেবের পুত্র একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে রাজাকার হওয়ার দরুন মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত আবিদ এবং আফগান যুদ্ধে মুজাহিদ হিসেবে নিহত অথবা নিখোঁজ আরেক পুত্র জাহিদের আখ্যান। এই আখ্যানের শুরু আছে, শেষ নেই। প্রকৃত অর্থে দেশহীন, ভূমিহীন, শেকড়হীন, সভ্যতাবিচ্ছিন্ন এই জনগোষ্ঠী। বিহারের কৃষিনির্ভর গ্রাম ইমামপুরা থেকে সাম্প্রদায়িকতার শিকার আবু-আল-সাঈদদের কণ্ঠে ভারতের সদ্য ‘স্বাধীনতাকে’ প্রথমত মনে হয় মিথ্যা। কারণ এই ‘স্বাধীনতার’ প্রথম পদক্ষেপই হয় তাদের বাস্তুচ্যুতিকরণ। তাই বজ্রনিনাদের মতো উচ্চারিত হয় : ‘ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়, লাখো ইন্সান্ ভুখা হ্যায়, হিন্দুস্থান-পাকিস্তান বেজন্মা হ্যায়!’ (হরিপদ ২০১২ : ৯) বিহার অঞ্চলের উচ্চবিত্ত মুসলমানরা যখন পাকিস্তানের পশ্চিমাংশে চলে যাওয়ার সামর্থ্য রাখে, তখন দরিদ্র শ্রেণির একমাত্র গন্তব্য পাকিস্তানের পূর্বাংশ। তাদের মনস্তত্ত্বে পূর্ববাংলা অনুপস্থিত – তারা চেনে কেবল পাকিস্তান; পূর্ববাংলা পাকিস্তানভুক্ত বলেই এটিই হয় তাদের একান্ত গন্তব্য। পাকিস্তান তখন তাদের মনোলোকের এক ও অদ্বিতীয় স্বর্গসম কল্পরাজ্য:

> দূরে নিরাপদ সুস্বাদু শস্যপূর্ণ আর বেহেশতি দরিয়ার মতো শীতল পানির নয়া দেশ পাকিস্তান। বরকত-রহমতে পূর্ণ নবী মুসার হাতে কুদরতি লাঠি। বনি-ইসরাইলিদের আশা-হিক্মত-হিফাজত আর বরকতের খেজুর গাছ। (হরিপদ ২০১২ : ১০)

কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। লুটেরাদের দ্বারা উদ্বাস্তু কাফেলার আক্রান্তি, আবু সাঈদের স্ত্রীবিয়োগ, পূর্বপাকিস্তানের সীমান্তবর্তী গ্রামের মুসলিম লীগ নেতা ইসলাম খোনকারের আশ্রয়লাভ, পরিত্যাক্ত হিন্দুবাড়িতে ক্ষণস্থায়ী বসতি, ইসলাম খোনকার কর্তৃক উৎখাত, পার্বতীপুর রেলওয়ে কলোনিতে বসবাস, আবু সাঈদের মৃত্যু, পুত্র আবু মোতালেবের পার্বতীপুর থেকে নারায়ণগঞ্জের আদমজী পাটকলে চাকরি, জুটমিলের বিহারি কলোনিতে বসবাস, বাঙালি-বিহারি দাঙ্গায় অংশগ্রহণ, বাঙালি জনগোষ্ঠীকে নিত্য-অবিশ্বাস, বাঙালি জাতীয়তাবাদে নিরন্তর অবিশ্বাস, মুসলিম লীগের বাঙালি নেতৃত্ব-কর্তৃক ব্যবহৃত হওয়ার গ্লানি, মুসলিম লীগার-আওয়ামী লীগার-ভাসানী তথা সর্বমতবাদের বাঙালিদের প্রতি ঘৃণা, মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন, পুত্র আবিদের রাজাকারে যোগদান – অতঃপর নিহত হওয়া, বাঙালি যুবক কর্তৃক বিহারি-নারীনিগ্রহ, মুক্তিযুদ্ধের পর ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক ঢাকার মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে আগমন, বাঙালি যুবকের সঙ্গে মোতালেবের কন্যা শাহজাদীর বিবাহ ও প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে আসা, পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বিহারিদের গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি ও প্রতিশ্রুতির বরখেলাপ, শেখ মুজিবের স্বজাতি-কর্তৃক নিহত হওয়া, জুলফিকার আলি ভুট্টোর ফাঁসি, আশির দশকে রুশ-আফগানিস্তান যুদ্ধে দ্বিতীয় পুত্রের মুজাহিদ হিসেবে আফগানিস্তান গমন ও ফিরে না আসা, বিধবা পুত্রবধূ শাকেরার প্রণয় ও অমীমাংসিত ভবিষ্যৎ, আদমজী পাটকল বন্ধ হওয়া (২০০২) এবং পঞ্চান্ন বছর পর (১৯৪৭-২০০২) আবারও নিজভূমি ইমামপুরায় অবৈধ উপায়ে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা, অতঃপর বিএসএফ কর্তৃক গ্রেফতার হওয়া – এই দীর্ঘ যাত্রায় যে ক্ষতচিহ্নটি সবসময় দগদগে ঘায়ের মতো বিরাজমান থাকে এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে, তা হলো – দেশভাগ। কেবল ধর্ম এক; আর সবকিছু – ধর্মীয় আচার-ভাষা-সংস্কৃতি-খাদ্যাভ্যাস-উৎপাদনব্যবস্থার যোজন যোজন দূরত্ব – মানসিক দূরত্ব ও জাত্যভিমান এই জনগোষ্ঠীকে পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশকে কখনো নিজের হতে দেয়নি।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেক বাঙালি মুসলমান সময়ের সুশ্রূষায় এই দেশকে নিজের করে নিতে পেরেছিল। কিন্তু বিহারি জনগোষ্ঠী দেশভাগকে একটি অনিঃশেষ বেদনা হিসেবে বহন করে চলেছে। এক মুহূর্তের জন্যও স্মৃতিসত্তা, জীবনসত্তা থেকে এর অভিঘাত মোচন করা সম্ভব হয়নি। সাংস্কৃতিক ও জাতিগত বৈভিন্ন্যের সাপেক্ষে বাঙালিকে তাই তাদের সবসময় মনে হয়েছে 'বেইমান বাঙাল'; বাংলাদেশকে মনে হয়েছে নিছক 'বাঙাল মুলুক' – বাংলাদেশ মনে হয়নি। একাত্তর-পূর্ববর্তী ও একাত্তর-পরবর্তী এই দুই পর্বে তাদের জীবনায়নকে ভাগ করলেও কোনো পর্বে তাদের জীবনমানের গুণগত কোনো পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু একাত্তরের পরে তাদের জীবনে মানসিক শক্তিটুকুও নিঃশেষ হয়ে যায়। পঞ্চান্ন বছর বসবাস করার পরেও জীবনের অন্তিম পর্বে তাই আবু-আল-মোতালেব হয় 'স্বদেশ'-অভিমুখী। সংখ্যাগত

আকারে খুব বড় না হলেও সভ্যতাবিচ্ছিন্ন করে রাখা এই জনগোষ্ঠীর কোনো স্থান হয় না বাংলার ইতিহাসে, বাঙালির বয়ানে। ঔপন্যাসিক তাই ভূমিকায় জানিয়ে দেন : 'কোনো লেখকই যখন লিখল না একাত্তরের ছিন্নমূল বিহারী উদ্বাস্তুদের নিয়ে, আমিই তার দায় গ্রহণ করলাম। ... রাজনৈতিক বিপর্যয়ের এই মানব-ট্র্যাজেডি নির্মাণের মধ্য দিয়ে লেখক হিসেবে আমি আমার শিল্প-দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি বলে মনে করি।' (২০১২ : ভূমিকা) মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করেও রাজনৈতিক ঘটনা ও দুর্ঘটনার শিকার একটি মানবেতর জনগোষ্ঠীর ইতিকথা *মোহাজের* উপন্যাস। দেশভাগ এই ইতিকথার সূচনাবিন্দু; কিন্তু এর অভিঘাত ক্রমায়ত ও সুদীর্ঘ – প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বিস্তৃত। এটি প্রকৃত অর্থে মানবলাঞ্ছনার আখ্যান – অনিঃশেষ ট্র্যাজেডি।

২.৩.৫. পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ জীবন-বাস্তবতায় দেশভাগের ক্ষত

২.৩.৫.১

শওকত আলীর (১৯৩৬-২০১৮) *ওয়ারিশ* (১৯৮৯) উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে দেশভাগের কারণে তিন প্রজন্মের জীবনদর্শন ও আত্মআবিষ্কারের ইতিবৃত্ত। উপন্যাসে ঘটনাক্রমে রায়হানের পিতা মুর্শেদ আলী প্রধানের বাল্যকাল থেকে পূর্ব পাকিস্তানে আসা; অতঃপর বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে শহিদ হওয়ার মধ্য দিয়ে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরের দীর্ঘ যাত্রার রূপায়ণ দেখা যায়। আশৈশব রাজনীতিসচেতন, অসাম্প্রদায়িক ও অবিভক্ত ভারতে কংগ্রেসি রাজনীতিতে আস্থাশীল মুর্শেদ আলীর কর্মস্রোত, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, স্বদেশ ও স্বভূমির প্রতি দায়বদ্ধতা; অতঃপর দেশভাগের পরিবর্তিত বাস্তবতায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির শিকার হয়ে স্বদেশ থেকে উন্মূলীত হওয়ার বেদনা এ উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও দুই প্রজন্ম মুর্শেদপুত্র রায়হান ও তার পুত্র রঞ্জু। মূলত পশ্চিমবঙ্গের বালিগাঁওয়ে ফুফাতো ভাই শাহাবুদ্দিনের পত্র পেয়ে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারসূত্রে রায়হান তার তরুণ পুত্র রঞ্জুকে নিয়ে পিতৃভূমিতে যায়, আশির দশকে। কিন্তু বাস্তবতা কোনো সরলরৈখিক বিষয় থাকে না। নিকট আত্মীয়ের আচরণের পরিবর্তন, মূল্যবোধগত পরিবর্তন রায়হানকে নিয়ে যায় আত্মরোমন্থনের জগতে, স্মৃতির স্রোতে। স্মৃতি ও বাস্তবতার সম্মিলনে উন্মোচিত হতে থাকে সাতচল্লিশ-পূর্ববর্তী জীবনবাস্তবতা, রাজনৈতিক তৎপরতা ও সাতচল্লিশ-পরবর্তী সমাজ-রাজনৈতিক পরিবর্তনের আখ্যান:

> অতীতের স্বপ্ন, কল্পনা, প্রত্যাশা এবং বর্তমানের বিচূর্ণিত স্মৃতিবিধুরতা মধ্যবিত্তের আত্মসন্ধান ও সত্তাসন্ধানের আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণে উপন্যাসটি শতাব্দীকালের ব্যাপ্তীকে ধারণ করেছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাসের যে রূপান্তর এবং তার অভিঘাত প্রজন্মান্তরের চেতনার যে ব্যবধান তারই

বিশাল সময়ের আয়তন এই উপন্যাসে কখনও ফ্ল্যাশব্যাকে, আবার কখনও বর্তমান সময়-স্বভাবের চারিত্র্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। (মিল্টন ১৯৯৬ ৮০)

উপন্যাসের শুরু মুর্শেদ প্রধানের জন্ম থেকে শুরু হলেও বর্তমান আলোচনা সাতচল্লিশ-পরবর্তী বাস্তবতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। সাতচল্লিশের দেশভাগের পর মুর্শেদ প্রথমত দেশবদল করেনি, করতে চায়ওনি। কাজের প্রয়োজনে অথবা অধিকতর উন্নত জীবনের আশায় পরিচিত অনেক মুসলমান যখন পূর্ব পাকিস্তানে স্থায়ী হয়েছে, তখনও মুর্শেদ তার সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী আদর্শকে ধারণ করে নিজ জন্মভিটায় থেকেছে। কাজ করতে চেয়েছে স্বভূমির মানুষদের জন্য। তাই ১৯৪৮ সালে তার এলাকায় একজন মুসলমান এমএলএ-র মৃত্যুজনিত কারণে আসন শূন্য হলে মুর্শেদ সেখানে উপনির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নেয়। কংগ্রেসের কাছ থেকে সমর্থন না পেয়ে স্বতন্ত্র নির্বাচন করে; এবং পরাজিত হয়। পরাজয়টিই বড় কথা নয়। এর সঙ্গে রাজনীতির অভ্যন্তরীণ সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িক চেহারা দর্শনের ফলে মুর্শেদের সামূহিক বিশ্বাস আঘাতপ্রাপ্ত হয়। মুর্শেদের লড়াই ছিল দুই দিকে – ঘরে এবং বাইরে। ঘরে মুসলিম লীগ সমর্থক স্ত্রী সালমার সঙ্গে যেমন তার বোঝাপড়া করতে হয়েছে, তেমনি বাইরে অসংখ্য স্বার্থান্ধ মানুষকে মোকাবিলা করতে হয়েছে। সালমার মুসলিম লীগের প্রতি সমর্থন ছিল আদর্শগত। কিন্তু দেশভাগের পর সেই নীতির প্রতিও প্রশ্নশীল হয় সালমা। কারণ সালমা দেশভাগের জন্য মুসলিম লীগের রাজনীতি করেনি, করেছিল মুসলমানদের সার্বিক অবস্থার উন্নতির জন্য। আর সেই রাজনীতির ফলাফল যে দেশভাগ, তাকে সে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি। তাঁর চিন্তনে একটা বিষয়ই ক্রিয়াশীল থাকে – 'মানুষকে তার নিজের মাটি থেকে উচ্ছেদ করা অন্যায়।' কেন সে পার্টিশনের বিরুদ্ধে, তার ব্যাখ্যায় সে জানায়:

পার্টিশন মানে তো সীমানা দিয়ে একটা এলাকা চিহ্নিত করে দেওয়া যে, এই পর্যন্ত পাকিস্তান আর এই পর্যন্ত হিন্দুস্থান – হলো না হয় পার্টিশন। আমি একজন মানুষের পরিচয়ের কথা বলছি – তার নানান সম্পর্কের কথা বলছি। বহুদিন ধরে এসব জিনিস হয়ে ওঠে, এগুলোই কি মানুষের জীবনের মূল নয়? অথচ রাজনীতিতে এসব জিনিসের কথা বলা হয়নি – হলেও কখনো শুনিনি। (শওকত ২০১২ : ১৯৬)

সালমার চিন্তার মধ্য দিয়ে এই চরিত্রের প্রগতিশীল প্রান্ত উন্মোচিত হয়। সঙ্গে মুর্শেদও অনুভব করে এমন ধরনের চিন্তাই কংগ্রেসের রাজনীতির মধ্যে সে দেখেছিল। কিন্তু দেশভাগের পর কংগ্রেসও আর সেই নীতিতে থাকে না। নির্বাচনে অংশ নেওয়ার বিষয়ে বন্ধু বিভূরঞ্জনের মন্তব্যে পাওয়া যায় ওইকালের প্রকৃত বাস্তবতা:

> আসলে পুঁজি যাদের হাতে আছে, কংগ্রেস তাদেরই বড় হওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে। আপাতত, শুধু আপাতত বলবো না, পরেও দেখবে, এদেশে ক্যাপিটালিজমই প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে – মানুষের মুক্তির যে কথা বলা হয়ে থাকে, ওটা শুধু বলবার জন্যেই – কাজ করার জন্যে নয়। (শওকত ২০১২ : ১৮৩)

আর সে কারণেই মুর্শেদকে নিজ দলের কাছ থেকে সাম্প্রদায়িক বিবেচনায় বঞ্চনার শিকার হতে দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত সে উপলব্ধি করতে পারে যে, আদর্শের চেয়ে পুঁজিই সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। একই বিবেচনায় দেখা যায় হুট করে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা হিন্দু-রিফিউজিরা কীভাবে স্থানীয় কংগ্রেসিদের মদদে মুর্শেদের বাড়ি দখল করে। স্থানীয় কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের কাছে প্রশ্ন করলে উত্তর আসে – 'আপনাদেরই জাতভাইয়ের হাতে সর্বস্ব দিয়ে এসেছে – কোথাও ওদের মাথা গুঁজতে হবে তো।' (শওকত ২০১২ : ৭৮) অর্থাৎ দেশভাগ কেবল সীমানার ভাগ নয়; অন্যায়, জবরদস্তি ও জবরদখলেরও আলেখ্য। সারাজীবন কংগ্রেসের রাজনীতি করে আসা মুর্শেদকে, তার কন্যাকে সহ্য করতে হয় অশ্লীল ইঙ্গিত, সন্ধ্যা হলে বাড়িতে পড়তে শুরু করে ইট। তবুও মুর্শেদ সহিংস হয় না। কংগ্রেসের রাজনীতি আদর্শচ্যুত হলেও সে নিজেকে মহাত্মা গান্ধীর শিষ্যই মনে করে। অশুভ শক্তির উদ্দেশে সে বলে : 'আমি সত্যাগ্রহী – সত্যের সৈনিক। অহিংসা দিয়ে আমি তোমাদের পরাস্ত করবো – ভূত পিশাচের দল। তোমাদের ভয় পাই না। তোমাদের ভয় পাই না – সাহস থাকে তো আলোতে এসো, এসে সামনে দাঁড়াও।' (শওকত ২০১২ : ৭৯) কিন্তু যখন দুই বছরের মাতৃহীন পুত্রের গায়ে ইট পড়ে, এরপর মুর্শেদ সিদ্ধান্ত নিতে আর দেরি করেনি। সহাবস্থানের প্রাণান্তকর চেষ্টা বিফলে যায়। বাড়িতে আগুন দেওয়ারও চেষ্টা করা হয়। অতঃপর ছেলেমেয়েদের ট্রেনে চাপিয়ে গন্তব্য হয় পূর্ব পাকিস্তান; এ-যেন অনির্দেশ্য, কিন্তু অনিবার্য গন্তব্য।

এই উপন্যাস তিন প্রজন্মকে ধারণ করেছে। মুর্শেদের সহাবস্থানচেষ্টা ও দেশভাগবিরোধী অসাম্প্রদায়িক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে এসেও সে সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হতে পারেনি। শেষপর্যন্ত ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দেবার মধ্য দিয়ে দেশভাগের চূড়ান্ত ফলাফল সে লাভ করেছে। আশির দশকে (১৯৮৪) যখন তার পুত্র বাংলাদেশের সাংবাদিক পেশায় নিয়োজিত রায়হানকে সম্পত্তির ওয়ারিশসূত্রে পশ্চিমবঙ্গে যেতে হয়, তখনও তাকে শরিকদের দ্বারা আক্রান্ত হতে হয়। আর নিজ দেশেও তখন স্বৈরশাসনের কালো থাবা। রায়হান-রঞ্জু সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করতে পারেনি ঠিক, কিন্তু দেশভাগের ফলে যে অশান্তি, বৈষম্য শুরু হয়েছিল অন্তত তার ওয়ারিশ হতে পারে। সমালোচকের ব্যাখ্যাটি এখানে স্মর্তব্য:

ওয়ারিশ একদিকে শওকত আলীর জীবনাভিজ্ঞতার বিনির্মাণ আরেকদিকে নির্মোহ দৃষ্টিতে জীবনের উত্তরাধিকার চিহ্নিত করার আলেখ্য। একে বলা যেতে পারে প্রজন্মের পরম্পরায় দেশকাল ও বাস্তবসত্যের মুখদর্শন, একটি জাতির আত্ম-আবিষ্করণ। (বেগম আকতার ২০১২ : ২১৪)

ওয়ারিশ উপন্যাসসূত্রে দেশভাগের আরও একটি বয়ান উন্মোচিত হয় – তা হলো পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ জনপদের অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদে আস্থাশীল রাজনীতিসচেতন মুসলমানের বাস্তবতা। এটি সম্ভব হয়েছিল ঔপন্যাসিকের জীবন-অভিজ্ঞতাসূত্রে। দেশভাগ কেবল এক বা দুই পক্ষের রক্তাক্ত হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি করে না; অসংখ্য পক্ষের বিচিত্র মাত্রার স্মৃতি-ক্ষত ও অভিজ্ঞতাকে ধারণ করেই দেশভাগের বয়ান পায় সামূহিকতা।

২.৩.৫.২

হাসান আজিজুল হকের (১৯৩৯-২০২১) *আগুনপাখি*কে (২০০৬) অনেকে (সন্‌জীদা ২০১০ ॥ সনৎকুমার ২০১৫) বলেন আত্মজৈবনিক। হাসান আজিজুল হক দেশহারানো মানুষ। পশ্চিমবঙ্গের রাঢ়ভূমি থেকে উন্মূলীত হয়ে একেবারে ভিন্ন পরিবেশে, প্রতিবেশে, নতুন ভৌগোলিক আবহে হাসানের সাহিত্যিক উন্মেষ ও বিকাশ। *আগুনপাখি*কে আত্মজৈবনিক বলা হলেও মূল জায়গাতে রয়েছে কিছু তফাৎ। হাসান আজিজুল হকের মা জোহরা খাতুন শেষ পর্যন্ত স্বামী-সন্তানসহ পূর্ববঙ্গে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন (হাসান ২০১৯)। কিন্তু *আগুনপাখি*র সেই নামহীন-গোত্রহীন 'মেতর বউ' শত অনুরোধ সত্ত্বেও পাকিস্তানে আসেনি। তার বয়ান থেকেই পাওয়া যায় দেশবদলের করুণ চিত্র:

ই দ্যাশ থেকে কজনা যেছে জানি না, উ দ্যাশ থেকে লিকিন বেসুমার মানুষ সর্ব্বস্ব হারিয়ে ইখানে এসে হাজির হচে। কলকেতায় ইস্টিশানে ইস্টিশানে লিকিন মানুষের ভিড়ে পা ফেলার জায়গা নাই। আকালের সোমায় যতো লোক গেয়েছিল কলকাতায়, এ্যাকন তার চেয়ে অ্যানেক বেশি মানুষ সিখানে গিজ গিজ করছে। (হাসান ২০০৬ : ১৪৯)

এমন বাস্তবতার কোনো কার্যকারণ তার যাপিত জীবনে সে খুঁজে পায় না। সে শুধু একটি প্রশ্নের উত্তর জানতে উন্মুখ হয়। সেই প্রশ্নের সদুত্তর মিললে হয়তো সে অনুরোধ মেনেও নিত। কিন্তু উত্তর সে পায়নি। যখন পুত্র-কন্যারা জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে পূর্ব পাকিস্তানে স্থায়ী নিবাস গড়ে, স্বামীও চলে যাবার উদ্যোগ গ্রহণ করে, তখনও সেই নারী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বিশ্বযুদ্ধ-মন্বন্তর, কংগ্রেস-মুসলিম লীগের রাজনীতি, দাঙ্গা-হত্যা শেষে আসে দেশভাগ; তারপর চলতে থাকে দেশবদল – এমনই পরিস্থিতিতে উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদের নামকরণ করা হয় 'আর কেউ নাই, এইবার আমি একা'। প্রশ্নটি হলো : 'কোথা যাব, আমি কোথা যাব? ... ক্যানে যাব কেউ আমাকে বুঝিয়ে দিক। বুঝিয়ে দিলেই আমি যাব,

যেখানে যেতে বলবে সেখানে যাব।' (হাসান ২০০৬ : ১৫২-১৫৩) বিদায় বেলায় 'মেজখোঁকা'র আন্তরিক প্রশ্নের জবাবে আবারও তার সেই একই অবস্থান:

> আমি ক্যানে তোমাদের সাথে দেশান্তরী হব এই কথাটি কেউ আমাকে বুঝুইতে পারে নাই। পেথম কথা হচে, তোমাদের যি একটো আলেদা দ্যাশ হয়েছে তা আমি মানতে পারি না। একই দ্যাশ, একইরকম মানুষ, একইরকম কথা, শুদু ধম্মো আলেদা সেই লেগে একটি দ্যাশ একটানা যেতে যেতে একটো জায়গা থেকে আলেদা আর এটো দ্যাশ হয়ে গেল, ই কি কুনোদিন হয়? (হাসান ২০০৬ : ১৫৬)

কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারে না। কারণ এই প্রশ্নের উত্তর নেই। যারা দেশভাগের রাজনীতি করেছে তাদের কাছে যেমন নেই, যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদের কাছেও নেই। উপন্যাসের শেষেও তার অভিন্ন চিন্তনের স্বগতোক্তি:

> আমি আমাকে পাবার লেগেই এত কিছু ছেড়েছি। আমি জেদ করি নাই, কারুর কথার অবাধ্য হই নাই। আমি শুদু নিজে বুঝে নিতে চেয়েছি। আমাকে কেউ বোঝাইতে পারলে না ক্যানে আলেদা একটো দ্যাশ হয়েছে গোঁজামিল দিয়ে যিখানে শুদু মোসলমানরা থাকবে কিন্তুক হিঁদু কেরেস্তানও আবার থাকতে পারবে। তাইলে আলেদা কিসের? (হাসান ২০০৬ : ১৫৮)

*আগুনপাখি*র অনন্যতাকে সমালোচক দেখেছেন এভাবে:

> হাসানের *আগুনপাখি* আরো এক কারণে উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকবে, এটিই আমাদের কথাসাহিত্যের একমাত্র উপন্যাস, যেখানে ভারতবিভক্তিকে দেখা হয়েছে নারীর আত্মা দিয়ে, নারীর শরীর দিয়ে, নারীর বুকজোড়া তৃষ্ণা দিয়ে। (ইমতিয়ার ২০১৫ : ৩১৮)

দেশভাগ কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক সিদ্ধান্তজাত বিষয় হলেও প্রান্তের মানুষের কাছে ভিন্ন মাত্রা নিয়ে উপস্থিত হয়। বিশেষত প্রান্তের প্রায় নিরক্ষর একজন নারীর প্রশ্নের উত্তর যখন থাকে না মূলধারার ইতিহাসের পাতায়, দেশভাগ তখন যেন তার আবেদন হারিয়ে ফেলে। এক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও উপন্যাসের দৃষ্টিকোণ নির্মাণে সক্রিয় থাকে। হাসান আজিজুল হক দেশভাগের শিকার একজন মানুষ হিসেবে সহৃদয়তা দিয়ে দেশভাগের অসারতার বয়ান নির্মাণ করেছেন।

২.৩.৬. বাঙালি জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেশভাগ

২.৩.৬.১

বাংলাদেশের উপন্যাসে সাতচল্লিশ-পরবর্তী রাজনীতির স্বরূপসন্ধানের ধারাবাহিক আলোচনায় সেলিনা হোসেনকে (জ. ১৯৪৭) স্বতন্ত্রভাবে পাঠ করতে হয়। সেলিনা হোসেন মূলত প্রচলিত ইতিহাসকে রূপদান করতেই উপন্যাসকে একটি শিল্প-আশ্রয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তাঁর ইতিহাসবোধ

অনেকখানি রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। রাজনৈতিক ইতিহাসকে উপন্যাসে ধারণ যে তিনি করেছেন সচেতনভাবে, তা উপন্যাস পাঠ থেকে যেমন অনুধাবন করা যায়, তেমনি তাঁর অন্যান্য গদ্য, সাক্ষাৎকার ও আলোচনা এই বিবেচনাকে সমর্থন করে। আলোচ্য কালের রাজনীতি তথা পাকিস্তানভুক্ত বাঙালি জনমানসের সংকট, জীবনজিজ্ঞাসা ও আর্থরাজনৈতিক বোধ সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের ধারণায় রচনাকালের রাজনৈতিক অভিজ্ঞানের ক্রিয়াশীলতাও অনুভব করা যায়। এই পর্যায়ে তাঁর *যাপিত জীবন* (১৯৮১), *গায়ত্রী সন্ধ্যা* (প্রথম খণ্ড ১৯৯৪), *সোনালি ডুমুর* (২০১৫) উপন্যাসত্রয় আলোচিত হবে।

দেশভাগের ফলে কেবল একটি ভূখণ্ডের রাজনৈতিক বিভাজনই ঘটে না; মানুষের জীবন, জীবনায়ন, জীবনচর্যা, জীবিকার সংস্থান বদলে যায়। বলা যায়, দেশভাগ একটি জাতির মূল্যবোধগত বিখণ্ডনের ইতিহাস। সেলিনা হোসেনের *যাপিত জীবন* উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ কাল পরিসরে এক উদ্বাস্তু পরিবারের জীবনায়ন, অন্তর্যাতনা ও সংকটের চিত্র। যুক্ত হয়েছে নতুন ভূখণ্ডে এসে নতুন সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে অস্তিত্ব-সংকটের মুখোমুখি হয়ে সেগুলো মোকাবিলা করার লড়াই। সাতচল্লিশের আগস্টে দেশভাগ-পরবর্তী বাস্তবতায় পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুর থেকে পূর্ববাংলার রাজধানী ঢাকায় নতুন জীবনের আশায় আগমন ঘটে সোহরাব আলি পরিবারের। 'এ-উপন্যাসে দেশ-বিভাগের নেতিবাচক ফল, উন্মূলিত অস্তিত্বের আর্তনাদ এবং পারিবারিক পরিমণ্ডলে সংঘটিত ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের অন্তর্ময় সম্পর্কসূত্র নিরূপিত হয়েছে।' (রফিকউল্লাহ ২০০৯ : ৩০৪) উপন্যাসের শুরুতে দেখা যায় দেশভাগের ফলে একটি ছিন্নমূল পরিবারের সন্ধ্যার প্রাক্কালে পূর্ব পাকিস্তানের একটি বাড়িতে পৌঁছানোর বর্ণনা। সোহরাব আলি, আফসানা খাতুন (নীরু), তাদের তিন পুত্র মারুফ, জাফর ও দীপু। নিজ বাসভূম থেকে অনেকটা একবস্ত্রেই তারা নতুন আরেক ভূখণ্ডে যেতে বাধ্য হয় : 'সঙ্গে তেমন কিছু ছিলো না, সামান্য কাপড়-চোপড় ছাড়া। গত মঙ্গলবার বাড়ি থেকে বেরুনোর পর পথে পুরো পাঁচ দিন কেটেছে। মহানন্দা পেরিয়ে গরুর গাড়িতে আমনুরা। সেখান থেকে ট্রেনে ফুলবাড়িয়া এসে নেমেছে ঘণ্টাখানেক আগে।' (সেলিনা ২০০৯ : ৯)

ধর্মকেন্দ্রিক ভাগবাটোয়ারার ফলাফল দেশভাগ; সেজন্য এক অঞ্চলের মানুষকে আরেক অঞ্চলে উদ্বাস্তুর মতো জীবনযাপন করতে হয়। তবে সব মানুষও যে ধর্মের কারণে বর্বর, তা-ও নয়। তাই শুরুতেই ঔপন্যাসিক জানিয়ে দেন ঢাকার বাড়িটি সোহরাবের বন্ধু দীপেনের সঙ্গে বাড়ি-বদলের সূত্রেই পেয়েছে। মানুষ হিসেবেও দীপেনের মানবিকতার কথা স্মরণ করে সোহরাব। আবার নিম্নবর্গের হিন্দু ধর্মাবলম্বী

হরেণ-মালতী দম্পতি অনোন্যপায় হয়ে নিজ দেশেই থেকে যায়। তারাই হয়ে ওঠে সোহরাব পরিবারের সুখ-দুঃখের নিত্যসঙ্গী। সোহরাব-নীরুদের দুঃখ উদ্বাস্তু-জীবনের দুঃখ হরেণ-মালতীর নিজ দেশে পরবাসী হওয়ার দুঃখের সমরূপ হয়ে ওঠে। সোহরাবের পরিবার হয়তো উদ্বাস্তুর সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না, তারা একটি বাড়ি পেয়েছে, বড় সন্তান চাকরি পেয়েছে, মেজো সন্তান বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ছোট সন্তান স্কুলে পড়তে পারছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজ ভূমি থেকে ছিন্নমূল হবার যাতনা জীবনবোধকে আক্রান্ত করে। প্রাণ যেখানে ধর্মের কাছে তুচ্ছ, সেখানে মূল থেকে ছিন্ন না হয়ে কোনো উপায় ছিল না:

> এখন মনে হচ্ছে পথের ক্লান্তি নয়, পালিয়ে আসার ধাক্কাতেই সকলের স্নায়ু বিকল। যতক্ষণ এসেছে সামনের কথা মনে ছিল না, কোথায় যাচ্ছি, কেমন হবে এমন কোনো ভাবনাও হয় নি। প্রাণের ভয়ে দিশেহারা ছিল সবাই। এখন ভয়। এই অচেনা পরিবেশে আত্মস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন ভয় করতে লাগলো। নতুন জায়গা, বন্ধু না শত্রু? বুক টিপ্‌টিপ্ করে সোহরাব আলির। (সেলিনা ২০০৯ : ৯)

দেশভাগের মাস খানেকের মধ্যেই তাদেরকে দেশ ছাড়তে হয়। বহরমপুরের ছিমছাম লতাগুল্ম-বাগানশোভিত শান্তির বাড়ি থেকে বংশালের নোনাধরা বাড়িতে তারা মাথা গোঁজার ঠাঁই পায়। তারপরেও তারা নতুন জায়গাকে আপন করে নিতে চায় – 'বাগান নামের এলোমেলো, অগোছালো, ফাটাফুটো এখণ্ড ভূমিতে' সোহরাব আলির পরিবার যেমন মানসিক আশ্রয় পেতে চায়, নতুন পাকিস্তান যেমন – অনেকটা তেমনই। বহরমপুরের স্থানীয় হাইস্কুলের বোটানির শিক্ষক সোহরাবের পূর্ব পাকিস্তানে এসে যথোচিত কাজ না পাওয়া বা না করে ভেষজ উদ্ভিদ দিয়ে ওষুধ তৈরি করার মধ্যে যে আত্মকুণ্ডলায়নের প্রবণতা, তা যে উদ্বাস্তু-জীবনবোধের ফলাফল। স্ত্রী আফসানা ওরফে নীরুর সঙ্গে একান্ত কথোপকথনে সেই মর্মযন্ত্রণা ধরা দেয়:

> এখন ছিমছাম কোনো কিছু আমার আর ভালো লাগে না। এই এলোমেলো ভাবটাই ভালো। আমার মনে হয় যে ভদ্রলোকের বাড়ি ছিলো, বাগান সাজানোয় তাঁর মন ছিলো না। তাঁর মন ছিল কেবল গাছের বিস্তারে। সেই বেড়ে ওঠায় তিনি বোধ হয় আনন্দ পেতেন নীরু। (সেলিনা ২০০৯ : ১৫)

এর মধ্য দিয়ে আপাত স্বাভাবিক জীবনের ভেতরেও এক প্রবল মানসিক অস্বাভাবিকতা প্রকাশিত হয়। এই অস্বাভাবিকতা উন্মূলীত জীবনচেতনা থেকে উৎসারিত। এরপর পূর্ব পাকিস্তানে একে একে নানা রাজনৈতিক ঘটনা গতিপ্রাপ্ত হয়েছে। সোহরাবের সন্তান জাফর-দীপু সেইসব ঘটনায় অধিকার আদায়ের পক্ষে কাজ করে। কিন্তু সোহরাব কেবল দর্শক হয়ে থাকে; হারানোর বেদনা আরও ঘনীভূত হয়।

২.৩.৬.২

যাপিত জীবনের মতো *গায়ত্রী সন্ধ্যা* (প্রথম খণ্ড ১৯৯৪, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৯৫, তৃতীয় খণ্ড ১৯৯৬) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেনের বাঙালি জাতীয়তাবাদী মানসাকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ ঘটেছে। এই জাতীয়তাবাদী ধারণা একাত্তর-পরবর্তী। একাত্তর-পরবর্তী বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনকোণ থেকে সাতচল্লিশ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত বিস্তৃত সময়পরিসরে বাংলাদেশ-অঞ্চলে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের একটি ধারাবাহিক মূলধারার বয়ান এই উপন্যাসত্রয়ে বিবৃত হয়েছে। বর্তমান গবেষণার সময়পরিসর ১৯৫২ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ বলে মূলত এই উপন্যাসের প্রথম খণ্ড (প্রথমার্ধ) আলোচনাভুক্ত হয়েছে।

সাতচল্লিশের দেশভাগের ফলে পশ্চিম থেকে আগত পূর্বের দিকে ধাবিত এক মুসলমান পরিবারের আতঙ্ক, উৎকণ্ঠা, দেশহারানোর কষ্ট, নতুন আশ্রয় সন্ধানের উদ্বেগ মিশ্রিত একটি পরিস্থিতি দিয়ে উপন্যাসের শুরু। পরিবারটি সাতচল্লিশের দেশহারা মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে। ঔপন্যাসিক শুরু থেকেই দুই বাংলার একক জাতিসত্তার প্রতি তাঁর অনড় অবস্থান ব্যক্ত করেছেন। এই পরিবারের মধ্যে ঔপন্যাসিক রূপদান করতে চেয়েছেন বাঙালি জাতির উন্মূলীত অংশের প্রতিচ্ছবি। 'জাতির সমাজ-রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সমস্যা এবং সেই সমস্যার আবর্তে ঘূর্ণিত ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনের অন্তরঙ্গ বিন্যাসে এ উপন্যাস বিশিষ্ট।' (মিল্টন ১৯৯৬ : ১৯) এই পরিবারের প্রধান সদস্য আলী আহমদ। পেশায় বাংলার শিক্ষক আলী আহমদ মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙামাটি গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে আসে, সঙ্গে তার গর্ভবতী স্ত্রী পুষ্পিতা, তাদের ছয় বছরের শিশুপুত্র প্রদীপ্ত। তারা মহানন্দা নদী পাড়ি দিয়ে রাজশাহী শহরের দিকে আশ্রয়ের খোঁজে ধাবমান। এই পরিবারের সঙ্গে আরও থাকে কালো খালা ও তার ছেলে ফজলে গাজী, রাঙামাটি গাঁয়ের হেডমাস্টার নসরুল্লাহ, তার স্ত্রী হাসনা বেগম ও তার দুই ছেলে। প্রতিকূল পরিবেশে রেলগাড়িতেই জন্ম নেয় আলী আহমদ-পুষ্পিতার কনিষ্ঠ পুত্র, যার নামকরণ করা হয় – প্রতীক। উপন্যাসের শুরুতে পুষ্পিতা-প্রদীপ্ত-প্রতীক প্রভৃতি নামকরণ থেকে বোঝা যায় ঔপন্যাসিকের মানসপ্রবণতা। সদ্য জন্ম নেওয়া ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তানে ভারত থেকে উদ্বাস্তুর জীবন বরণ করে নেওয়া একটি মুসলমান পরিবারের বাস্তবিক যাতনার মধ্যে এই চেতনাগত আরোপণে লেখকের আদর্শগত অবস্থানটি অনায়াসে উপলব্ধি করা যায়। শিশুর ভূমিষ্ট হওয়া যাকে বলে, তা থেকেও বঞ্চিত হয় প্রতীক, কারণ তার কোনো নিজের ভূমি নেই, তার জন্ম হয় চলমান ট্রেনে – এই পরিচর্যা লেখকের সচেতন আদর্শায়িত ধারণার প্রকাশ। তাই আলী আহমদের মনে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নবসৃষ্ট পাকিস্তান সম্পর্কে, তা যেন অনেকটা ঔপন্যাসিকের মীমাংসিত প্রশ্ন:

> এই দেশ কি ওর জন্য গৌরবের হবে? পাবে কি মাতৃভূমির সত্যিকার মর্যাদা? একত্রিশ বছর আগে ও নিজে যে দেশে জন্মেছিলো আজ সেখান থেকে উৎখাত হয়ে গেলো। এই শিশুর একই নিয়তি হবে না তো? (সেলিনা ২০১৩ : ১১)

আলী আহমদের পরিবারের গন্তব্য রাজশাহী। কিন্তু আজন্ম মুর্শিদাবাদের স্মৃতি তো আলী-পুষ্পিতাদের ছাড়তে চায় না। পুষ্পিতার চব্বিশ বছর কাটানো চিরচেনা রাঙামাটি থেকে উৎখাত হওয়ার বেদনাও সেই স্মৃতিকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। তৈরি হয় স্বপ্ন ও বাস্তবতার দ্বৈরথ। তাদের মনে চেপে বসে উদ্বাস্তুর বোধ। বিশ্বাসহীনতা হয় তাদের নিত্যসঙ্গী : 'মানুষকে কী বিশ্বাস আছে? যারা এতদিন ভাইয়ের মতো ছিলো, তাদের হাতে এখন ছুরি, রক্ত দেখে, মৃত্যু দেখে একটুও বিচলিত বোধ করে না।' (সেলিনা ২০১৩ : ১৪) উদ্বাস্তু-জীবনে প্রধান তাড়না থাকে ঘর খোঁজার তাড়না। আলী আহমদ নিজে উদ্বাস্তু হওয়া সত্ত্বেও এই তাড়নার অর্থ জানতে হয়ে ওঠে প্রশ্নশীল : 'প্রত্যেকে উদ্বাস্তু এবং ব্যস্ত। আলী আহমদ বুঝতে পারে না যে ওদের এতো কীসের তাড়া? ওরা কোথায় যাবে? কোথায় ওদের আশ্রয়? ঘর হারানো মানুষেরা কি ঘর খোঁজার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে?' (সেলিনা ২০১৩ : ১৭) এর সঙ্গে যুক্ত হয় অস্তিত্বহীনতার অনুভূতি; এবং তা ঔপন্যাসিক প্রতীকী পরিচর্যায় উপস্থাপন করেন :

> নিমেষে তাড়া খাওয়া কুকুরের মতো মনে হচ্ছে নিজেকে, যেন পায়ে ত্রস্ত গতি, ভীত চাউনি এবং রুদ্ধশ্বাসে ভরা ফুসফুস। হ্যাঁ, কুকুরই তো, একদল লোক লাঠিসোটা নিয়ে ওকে তাড়া করেছে, ও লেজ তুলে দৌড় দিয়েছে, দৌড়ে এসে রোহনপুর স্টেশনে পড়েছে। (সেলিনা ২০১৩ : ১৮)

শুধু মুসলমান হওয়ার কারণেই তাদের হতে হয়েছে দেশছাড়া, ঘরছাড়া। তাই তাদের মধ্যে তৈরি হয় প্রশ্ন ও আত্মজিজ্ঞাসা : 'শুধু একটি ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণেই ওকে পালাতে হচ্ছে। তবে স্বাধীনতাটা কীসের? শুধুই কি ধর্মের?' (সেলিনা ২০১৩ : ২০) এমন প্রশ্নশীল আলী আহমদদের ভবিষ্যৎ ছিন্নমূল মানুষের অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ। তারপরেও তারা ঘন তমসার মধ্যেও নতুন আশার ক্ষীণ সম্ভাবনার আলো জ্বালিয়ে রাখতে চায়। সেই ক্ষীণ আলোটি হচ্ছে – বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা – ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্যমূলকতার অন্যতম অনুষঙ্গ। রাষ্ট্রের নতুন রাজনৈতিক নামকরণ হলেও চরিত্রের চিন্তাস্রোতে আবহমান কালের মাটি-পানি-বাতাসের অখণ্ড ভাবনার উপস্থিতি ঔপন্যাসিকের একাত্তর-পরবর্তী প্রতিষ্ঠিত বাঙালি জাতীয়তাবাদের ফসল। বৃহদায়তনিক উপন্যাসটির সমাপ্তিও ঘটবে এই চেতনাস্রোতের অনুষঙ্গে। তাই স্ত্রী পুষ্পিতার গর্ভের ফুল পাকিস্তানের মাটিতে পুঁতে ফেলার মুহূর্তে আলী মনে করে তার সন্তান 'এখন থেকে এই মাটির সন্তান, হাজার বছরের শেকড়ের সঙ্গেই ওর জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক – যে নাড়ি কেটে ও মানবশিশুর অধিকার পেলো সেই নাড়ির বাকিটুকু প্রোথিত হয়ে যাবে এই মাটির বুকে।' (সেলিনা ২০১৩ : ২৩) অর্থাৎ 'উদ্বাস্তু পিতার সন্তান হতে চলেছে স্বাধীন

পাকিস্তানের অধিবাসী, এ স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষার নয়, আরোপিত। দেশের ভূমিপুত্রদের নিজের মাটির প্রতি অধিকারবোধ রক্ত-মাংস-মজ্জায় নিরন্তর প্রবাহিত।' (সুস্মিতা শেঠ ২০২১ : ৩৪৯) উদ্বাস্তুর বোধ একটি ক্ষণিক বোধমাত্র নয়। একবার উদ্বাস্তু জীবনে প্রবেশ করলে সেই বোধকে বহন করতে হয় আমৃত্যু ; কখনো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে।

*গায়ত্রী সন্ধ্যা*য় কেবল আলী আহমদ নয়, তার সঙ্গে এমন আরও অনেক দেশ হারানো মানুষের দেখা মেলে। তারা নতুন রাষ্ট্রকে আপন করেই পেতে চায়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের কারণে এই উদ্বাস্তু-জীবনবোধ থেকে তারা মুক্ত হতে পারেনি। তাই আলী আহমদকে রবীন্দ্র-অনুরাগী হওয়ার জন্য শুনতে হয় 'মালাউন' গালি। একসময় তাদের অর্থনৈতিক পরিবর্তন, রাজশাহী থেকে ঢাকায় আগমন, ঢাকা কলেজের শিক্ষকতা; অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে শিক্ষকতাকে অবস্থার উন্নতিই বলা যায়। কিন্তু তৎকালীন পাকিস্তানের নানা ধরনের রাজনৈতিক ঘটনার বিভিন্ন পর্যায়ে শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে পা মেলাতে ব্যর্থ হয় সে। তাই শেষ পরিণতি মুক্তিযুদ্ধকালে বিজয়ের পূর্বমুহূর্তে নিখোঁজ হওয়া, আর ফিরে না আসা, মৃত্যুর পর একটুকরো ভূমিতে শায়িত হবার অধিকার না পাওয়ার মধ্য দিয়ে। এই ভূমিবঞ্চিত মৃত্যু উদ্বাস্তু-জীবনবোধেরই প্রতীকায়ন।

২.৩.৬.৩

সাতচল্লিশের দেশভাগের প্রক্রিয়াকে অধুনা গবেষক চিহ্নিত করেছেন 'প্রলম্বিত দেশভাগ' বলে (সাঈদ ২০১৮)। অর্থাৎ দেশভাগ কেবল সাতচল্লিশে শেষ হয়ে যায় না। দেশভাগের অন্যতম অনুষঙ্গ দাঙ্গার বাস্তবতা ও উদ্বাস্তু জীবনবোধও সেই প্রলম্বনকে ধারণ করে। ছেচল্লিশে কলকাতা ও নোয়াখালীর দাঙ্গার পর যদিও বাংলা অঞ্চল পাঞ্জাবের মতো রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার মুখোমুখি হয়নি, তথাপি দাঙ্গা একটি ধারাবাহিক বাস্তবতা হিসেবে বিরাজ করে। সেলিনা হোসেনের *সোনালি ডুমুর* উপন্যাসটি সর্বতোভাবেই সেই প্রলম্বিত দেশভাগ ও দাঙ্গার ঘটনাবহুল উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত। দেশভাগের ফলে উদ্বাস্তু-জীবনবোধ, দাঙ্গার আতঙ্ক, প্রতিমুহূর্তে সংখ্যালঘু হয়ে জীবনযাপন করার মনোযাতনা এই উপন্যাসে মুখ্যতা পেয়েছে। উপন্যাসের কাহিনিসজ্জায় কেন্দ্রীয় অবস্থানে পাওয়া যায় স্বর্ণকারিগর অমিয়নাথের পরিবারকে, যারা সাতচল্লিশের দেশভাগের ফলে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে বাস্তুভিটাসহ সকল সম্পত্তি ওয়াহেদ মিয়ার কাছে বিক্রি করে পাড়ি জমায় নদিয়া জেলায়। সম্পদ বিক্রির সমুদয় অর্থ দিয়ে ভাইপো প্রফুল্লর নামে ক্রয় করে একটি বাড়ি। কিন্তু নিজ ভাইপোর কাছে প্রতারিত হয়ে তারা আবারও ফেরে নিজগ্রামে। নিজগ্রামে এলেও তখন তারা নিঃস্ব, বাস্তুহীন। বাস্তুহীন হয়েও হয়তো তারা এখানে নিজ কর্মযোগে

থেকে যেত; কিন্তু মুসলিম লীগের উঠতি গ্রাম্য মাতবর ওয়াহেদ মিয়া নিজ স্বার্থ চরিতার্থতার জন্য সেই পরিবারকে গ্রাম ছাড়া হতে বাধ্য করে। তারা পাড়ি জমায় চাঁদপুরে। চাঁদপুরে দেশভাগের কারণে ধনাঢ্য হিন্দুদের ছেড়ে যাওয়া এক পুরোনো বাড়িতে তাদের আশ্রয় হয়। অমিয়নাথের পুত্র অনিমেষ এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। তার বালকের চোখ দিয়ে উপন্যাসের শুরু। দেশভাগ কী, দাঙ্গা কী, সংখ্যালঘু কী, দাঙ্গা কেন হয় – এমন নানা প্রশ্নের উত্তর জানতে চায় সে। আর এসব প্রশ্নের যৌক্তিক উত্তর খুঁজে পায় না অমিয়নাথ বা তার স্ত্রী সরোজিনী।

দেশভাগ-পরবর্তী পূর্ববাংলা যে প্রতিমুহূর্তে তাদের নিরাপত্তা দিতে, সম্মান দিতে, নাগরিক অধিকার রক্ষায় ব্যর্থ হচ্ছে, তা-ই এই কিশোর-মননে নানা প্রশ্নের অনুষঙ্গে উত্থাপনের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক ভাষারূপ নির্মাণ করতে চেয়েছেন। চাঁদপুরে এসে দেখা মেলে ছেচল্লিশের নোয়াখালীর দাঙ্গার কারণে বাবা-মা-ভাই-বোনসহ এগারো সদস্য হারানো মাধুরীলতার; সে তার স্কুলশিক্ষক নানা ভূদেব দত্তের কাছে প্রতিপালিত। চাঁদপুরে এসেও দেশভাগ-পরবর্তী বাস্তবতা পিছু ছাড়ে না। তাই দেখা যায় ছাত্রদের শিক্ষাদানে তৎপর স্কুলের হেডমাস্টারের আপাত শিক্ষাবিস্তারের নামে হিন্দুনিপীড়ন। মেয়েদের জন্য স্কুল তৈরির জন্য হিন্দুদেরই ফেলে যাওয়া অন্য অনেক জমি থাকলেও সে দখল করে কালীমন্দিরের জমির একাংশ; রাস্তা সোজা করার প্রয়োজনে একই স্কুলের নিবিষ্ট শিক্ষক ভূদেব দত্তের বাগানের জমি দখল করে। এই দখলের পেছনে কার্যকর থাকে মুসলিম লীগের ক্ষমতার অপব্যবহার। দখলের মর্মান্তিকতায় মৃত্যুবরণ করে ভূদেবের স্ত্রী অনিতারানি। মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছানোর সময় যখন অনিমেষের কাছে জানতে চাওয়া হয় – কী অসুখে অনিতারানি মারা গেছে, তখন অনিমেষ একটাই শব্দ উচ্চারণ করে – ‘দাঙ্গা’। অনিরারানি হয়তো হার্টফেল করেই মারা গেছে, কিন্তু কিশোর অনিমেষের বুঝতে অসুবিধা হয় না – এই মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, এ মৃত্যু প্রলম্বিত দাঙ্গারই ফলাফল। বাগান দখল ও তৎপরবর্তী স্ত্রীর মৃত্যু ভূদেব দত্তকে করে উন্মূলিত। সে বুঝে যায়, এই সমাজ এই ভূমি তার জন্য নিরাপদ নয়। তাই নাতনি মাধুরীলতাকে নিয়ে সে চলে যায় অন্যত্র – জয়াগ নামক স্থানে; সেখানেই মহাত্মা গান্ধী-প্রতিষ্ঠিত এক স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করে। এর ফলে অনিমেষ ও মাধুরীলতার মধ্যে যে এক স্বতঃস্ফূর্ত বন্ধুত্ব তৈরি হয়েছিল, যাকে যৌবন বয়সে চিহ্নিত করা যায় প্রেম বলে, তার একটি স্থানিক দূরত্ব তৈরি হয়। অনিমেষ স্কুল পেরিয়ে কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি হয়। সেখানেও সে দেখা পায় দাঙ্গার কারণে নিঃস্ব বন্ধু সুহাসকে, যে সুহাস সব হারিয়ে জীবন নির্বাহের জন্য দিনে পড়াশোনা করে আর রাতে রেলস্টেশনে কুলির কাজ করে। সুহাসের কাছেই জানতে পায় দেশভাগের এতকাল পরেও তখনও হিন্দু জনগোষ্ঠীর দেশত্যাগের ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে। দেখা হয়

ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে। এরপর কলেজ ছাড়িয়ে সে আসে ঢাকায়, ভর্তি হয় মেডিক্যাল কলেজে। সেখানেও সে পায় দেশভাগের ফলে মুসলমান রিকশাচালক আবদুল জলিল মালেককে, যে ছিল মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা, এখন ঢাকায় উদ্বাস্তু – দেশভাগের আরেক পিঠ। দেখে দেশভাগের ফলে ভারত থেকে আগত বিহারিদের বৈরী আচরণ। একই ধর্মের অনুসারী হয়েও বাঙালিদের সঙ্গে তাদের বিরোধ ধর্মের চেয়েও শ্রেণিস্বার্থের বিষয়কে এবং জাতিত্বের ধারণাকে স্পষ্ট করে তোলে। আরও দেখা মেলে ডাক্তার মন্মথনাথ নন্দীর, কেবল হিন্দু হবার কারণে র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিটের যার বাড়িটি বিহারিদের দ্বারা লুট হয়। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময়পরিসর পর্যন্ত উপন্যাসের ব্যাপ্তি।

ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন *সোনালি ডুমুর* উপন্যাসের সর্বত্র দেশভাগ ও দাঙ্গার বাস্তবতাকেই মুখ্য করে তুলেছেন। এক্ষেত্রে একটি হিন্দু পরিবারের মনোগহনে সংকট-আতঙ্কই ছিল উপন্যাসের সার্বক্ষণিক অনুষঙ্গ। তবে দাঙ্গার বাস্তবতা নির্মাণে এখানে কেবল উপরিতলের বর্ণনা আছে – কার্যকারণ অনুসন্ধান নেই। কারণ এখানে কেবল হিন্দু পরিবারের মনস্তত্ত্বটিই প্রাধান্য পেয়েছে। উপন্যাস পাঠে জানার সুযোগ হয় না ওয়াহেদ মিয়া কিংবা হেড মাস্টারের মনস্তত্ত্ব। অমিয়নাথের পরিবারের বেশ কিছু মুসলমান সুহৃদ যেমন কালামের মা, মিনুর মা কিংবা অনিমেষের বন্ধু সেলিম, আশরাফ, হারিস, চাঁদপুরের মৌলবী হাসানুদ্দীন চরিত্রগুলোর উপস্থিতি উপন্যাসে উদারপন্থি মুসলমান অংশের প্রতিনিধিত্ব করলেও তাদের এই উদারতার ভিত্তিভূমির প্রসঙ্গ নেই। এখানে ঔপন্যাসিকের হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয়ের প্রচেষ্টা প্রতিষ্ঠিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী বয়ানের অনুগামী; কিন্তু সংকট চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের চিহ্ন নেই। আর উপন্যাসের প্রথম পর্যায়ে অনিমেষের উচ্চারণে দেশভাগ ও দাঙ্গা নিয়ে যে কিশোরসুলভ প্রশ্ন উচ্চারিত হয়, তা যেন পুরো উপন্যাসকে কিশোরসুলভ আবেগে প্রকৃত সংকটকে লঘু করে তোলে। অনিমেষ ছোট বয়স থেকে বড়দের মতো করে বুঝতে চায়; কিন্তু বড় হলেও তার মধ্যে ছোটদের আবেগ থেকে যায়। এই আবেগ ঔপন্যাসিকের আবেগের অনুগামী। এই পর্যায়ে অনিমেষের উচ্চারণে কিছু প্রশ্নসূচক সংলাপ উল্লেখ করা হলো যেখানে ঔপন্যাসিকের উত্তরও গ্রথিত থাকে; যেমন – 'দেশভাগ মানে কি মায়ের কান্নাকাটি?' কিংবা 'দেশভাগ হলে নতুন পতাকা ওড়াতে হয়?' (সেলিনা ২০১৫ : ১৩), 'ধর্ম দিয়ে বন্ধুত্ব হয় নাকি! বন্ধুত্ব মনের টান রে!' (সেলিনা ২০১৫ : ৮৩), 'ইন্ডিয়ায় গেলে তো লোকে ওদেরকে রিফিউজি বলে। ওরা কি তাহলে দেশহীন মানুষ?' (সেলিনা ২০১৫ : ১০৭) ঔপন্যাসিক দেশভাগের কথা বলতে গিয়ে দেশ ধারণাকে সুস্পষ্টতা দেননি। তিনি নতুন রাষ্ট্রধারণার পরিধির মধ্যেই দেশধারণাকে চিহ্নিত করেছেন। এর ফলে দেশভাগ বিষয়টিই দুর্বল হয়ে যায়। যেমন

নিজগ্রাম দেওভোগ থেকে ওয়াহেদ মিয়ার হুমকি ও অত্যাচারে যখন চাঁদপুরে যেতে হয়, তখন অনিমেষের মা সরোজিনি নিজেকে বলে : 'গাঁ ছেড়ে গেলে শেকড় উপড়ানো হবে কেন? দেশ তো ছাড়ছে না। দেশের ভেতরেই এক গাঁ থেকে অন্য গাঁয়ে থাকা মাত্র। মেয়েদের তো শৈশবের গাঁ ছেড়ে বিয়ের পরে পরের গাঁয়ে যেতে হয়।' (সেলিনা ২০১৫ : ৫৩) প্রতিমুহূর্তের দাঙ্গার আতঙ্ক এমনভাবে আক্রান্ত চরিত্রদের আক্রান্ত করেছে, মনে হয় ওই কালে এটাই একমাত্র সংকট, আর কোনো সংকট নেই। ঔপন্যাসিক দাঙ্গার বারবার ফিরে আসা বা আসার আতঙ্ক থেকে একটি শ্রেণির সামূহিক বিপর্যয়কে নির্মাণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অপরাপর শ্রেণির সম্পর্ক নির্ণয়ের কোনো উদ্যোগ না থাকায় তা একমাত্রিক দৃষ্টিকোণে পরিণত হয়েছে। এইসব সরলীকৃত বয়ান সত্ত্বেও ইতিহাসের পাঠের মতো উপন্যাসে দাঙ্গার ক্ষত ও রক্তাক্ত হওয়ার মর্মযাতনা রূপায়িত হয়েছে। যেমন চাঁদপুরে এসে তারা দেশভাগ ও দাঙ্গার কারণে অনেক হিন্দুবাড়ি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে। যারা নোয়াখালীর দাঙ্গার প্রত্যক্ষদর্শী ও শিকার, তাদের প্রেক্ষণবিন্দু ব্যবহার করে এবং ক্রমাগত ব্যবহার করে দাঙ্গার ভয়াবহতাকে গভীর করে তুলতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক। জোর করে ধর্মান্তরিতকরণ, হিন্দু নারীদের ওপর যৌন নির্যাতন, হত্যা, সহিংসতা, হুমকি, দেশত্যাগ – এসবের ফলে আক্রান্ত মনস্তত্ত্ব উপন্যাসের পুরোভাগ জুড়ে থাকে। যে সতীশ মজুমদার রক্তে ডুবে থাকা মাধুরীলতাকে উদ্ধার করেছিল, তার জীবনের সঙ্গে দাঙ্গা যেন সেঁটে থাকে। অনিবার্যভাবে আসে মহাত্মা গান্ধীর প্রসঙ্গ। ঔপন্যাসিকের আদর্শও যে গান্ধীবাদ তা আর অপ্রকাশ্য থাকে না। ঔপন্যাসিক শেষ পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ববঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটি সমন্বয়বাদী সহাবস্থান কামনা করেছেন। প্রতিটি চরিত্রের মধ্যে নিজ দেশে পরবাসী জীবনযাপন সত্ত্বেও বাঙালি জাতীয়তাবাদসৃষ্ট দেশচেতনাকে জাগিয়ে রাখতে চেয়েছেন। তাই ঢাকায় আসার মুহূর্তে পিতা অমিয়নাথের এক প্রশ্নের জবাবে অনিমেষ বলে : 'এই দেশ আমার। আমি এই দেশের মানুষ। আমার বাস করার অধিকার আছে বাবা। আমি ধর্মীয়ভাবে সংখ্যালঘু হই আর যা হই, এ দেশের বাতাস বুকে টেনে আমি মাথা তুলে বাঁচতে চাই।' (সেলিনা ২০১৫ : ২৭৬) এটি ঔপন্যাসিকেরও চাওয়া। উপস্থাপনার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও *সোনালি ডুমুর* অসহায়ত্ব, কান্না ও আতঙ্কের ভাষারূপ। ইতিহাসের প্রতিষ্ঠিত বয়ানই এখানে স্থান পায়।

ঔপন্যাসিক হিসেবে সেলিনা হোসেনের আবির্ভাব ১৯৭১ সালে, *উত্তর সারথি* প্রকাশের মধ্য দিয়ে। সে-হিসেবে তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তা স্বাধীন বাংলাদেশের সমান বয়সী। আবার তাঁর জন্ম-বছর ১৯৪৭। সাতচল্লিশ-পরবর্তী রাজনীতি বিশেষত রাষ্ট্রভাষা-কেন্দ্রিক ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারকেও তিনি নিজের

ভেতর দায়িত্বের সঙ্গে লালন করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতটুকু বিভিন্ন সময় ঔপন্যাসিক নিজেই গুরুত্ব সহযোগে বলতে চেয়েছেন:

> জন্মগ্রহণ করেছিলাম সাতচল্লিশ সালে। বড়ো হয়ে জেনেছি দেশভাগ হয়েছে। পাকিস্তান নামের একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। এই অর্থে আমি দেশভাগ দেখেছি। ভাষা আন্দোলন বুঝিনি। বাহান্নোর সেই সময়ে নিজের ভাষায় কথা বলেছি। কিন্তু মাতৃভাষার মর্যাদা বোঝার বয়স ছিল না। (সেলিনা ২০১৭ : ২)

তথাপি রাজনীতিঘনিষ্ঠ অধিকাংশ উপন্যাস তিনি রচনা করেছেন বাঙালি জাতীয়তাবাদের উজ্জীবনের কালে। দেশীয় বিভিন্ন পক্ষ-বিপক্ষ বিরাজমান থাকলেও বাঙালি জাতীয়তাবাদ তাঁর কাছে সময়ের একটি প্রার্থিত ও প্রগতিমুখী ধারণা। 'জরুরি কিছু কথা বলার দায় সাহিত্য অনুভব করে, অনেকের মতো কর্মী হিসেবে সেলিনা হোসেনও করেছেন এবং উৎস থেকেই করেছেন।' (সিরাজ ২০২০ : ৪০৫) তিনি দ্বন্দ্বনিরপেক্ষভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বয়ান নির্মাণে ব্রতী হতে পেরেছিলেন। ইতিহাসকে তাঁর উপন্যাসের উপাদান করার বিষয়ে অধিকাংশ সমালোচনা সপ্রশংস। যেমন : 'ইতিহাসের গভীরে সন্ধানী আলো ফেলে ঔপন্যাসিক প্রতিবেদন সৃষ্টিতে তাঁর সিদ্ধি কিংবদন্তিতুল্য। বস্তুত, ইতিহাসের আধারেই তিনি সন্ধান করেন বর্তমানকে শিল্পিত করার শিল্প-প্রকরণ।' (বিশ্বজিৎ ২০২০ : ৪২) আরও উল্লেখ্য:

> ইতিহাসের পুনঃপাঠ বা বিনির্মাণের ক্ষেত্রে সেলিনা হোসেন এক স্বতন্ত্র পথযাত্রী। এক স্বকীয় ধারায় তিনি ইতিহাসকে অনুধাবন করতে চেয়েছেন এবং উপন্যাসের ক্যানভাসে ইতিহাসের উপাদানকে উপস্থাপন করেছেন। তিনি ইতিহাসের সত্যের সঙ্গে ঔপন্যাসিকের কল্পনার এক ধরনের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন তাঁর আপন রীতিতে। (সৈয়দ আজিজুল ২০১৭ : ২২৪)

সেলিনা হোসেনের উপন্যাসের চরিত্ররা বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিষয়ে মীমাংসিত। তারা সাতচল্লিশের আগে কী ধরনের রাজনৈতিক চিন্তায় বিশ্বাসী ছিল, তার রূপায়ণ দেখা যায় না। কেবল দেখা যায় সাতচল্লিশের দেশভাগের ফলাফল হিসেবে তাদের দুর্ভোগ এবং দুর্বিপাকে পতিত হওয়ার চিত্র। মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তারা পাকিস্তান চায়নি। যদিও দেশভাগ আর পাকিস্তান চাওয়া এক বিষয় ছিল না। এক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর অনুসারী সমন্বয়বাদী মুসলমান হিসেবে তাদের চিহ্নিত করা যায়। তাঁর চরিত্ররা দেশভাগের বিপর্যয়কে অতিক্রম করেই নতুন প্রতিবেশে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে ধারণ করে সামনে এগোতে চায়। প্রতিমুহূর্তে দেশভাগের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন করে; দেশভাগের ফলে দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িকতা, উন্মূলিত হওয়ার বেদনাকে অনুভব করে, স্মৃতিরোমন্থনে অনেকটা সময় পার করে দেয়। এ-থেকে মনে হতে পারে ঔপন্যাসিকের অবস্থানও দেশভাগের বিরুদ্ধে। কিন্তু দেশভাগের ফলেই যে এই মুসলমান বাঙালির শিক্ষিত অংশ নিজেদের স্বতন্ত্র ভাষানির্ভর জাতি ভাবতে শুরু করলো, তাঁর

উপন্যাসে এটাও একটি বাস্তবতা। ঔপন্যাসিকের দেশভাগ বিষয়ক অবস্থান তাঁর এক সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

> **প্রশ্ন :** দেশভাগ হওয়া কি জরুরি ছিল? আপনি দেশভাগের পক্ষে না বিপক্ষে অবস্থান নিবেন? নিলে কেন?
>
> **সেলিনা হোসেন :** হ্যাঁ, জরুরি ছিল। আমি দেশভাগের পক্ষে অবস্থান নেব। নিলাম এই জন্য যে, দেশভাগ না হলে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ হতো না। বাঙালি জাতির জন্য এমন একটি রাষ্ট্র বাঙালি জাতিকে মর্যাদার আসনে তুলে ধরেছে। বাঙালি মুক্তিযুদ্ধ করে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশের শহিদ দিবস ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় ভাষণ দেন। এভাবে আমাদের পরিচিতি বিশ্বে ছড়িয়ে যায়। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও বাংলা ভাষায় ভাষণ দেন জাতিসংঘে। এভাবে বাংলাদেশ বাংলা ভাষা বিশ্বের দরবারে পৌঁছে গেছে। দেশভাগ না হলে আমাদের এই অর্জন সম্ভব হতো না। একারণেই দেশভাগের পক্ষে অবস্থান নিয়েছি। (হারুন ২০২৩ : ৫৪০-৫৪১)

স্পষ্টত এই উচ্চারণে দেশভাগের পক্ষে অবস্থানের পেছনে বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারণাই ক্রিয়াশীল। যেমন, তাঁর চরিত্ররাও দেশভাগের নেতিবাদী অংশগুলোর কথা প্রকাশ করেও দেশভাগ-পরবর্তী সময়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশে তৎপর। সাতচল্লিশপূর্ব পাকিস্তান-আন্দোলনের দাবি বিষয়ে সেলিনা হোসেনের স্পষ্ট উচ্চারণ পাওয়া যায় না, তেমনি চরিত্রদেরও ওইকালের রাজনৈতিক অবস্থান অস্পষ্ট থেকে যায়। ওই কালপর্বে এই জনগোষ্ঠীর তথা বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক অবস্থান হয়তো ঔপন্যাসিকের কাছে ঠিক বলে মনে হয়নি। তাই ঔপন্যাসিক সামনে চলতে চেয়েছেন। সময়চিত্রণ ও সময়কে ধারণ সেলিনা হোসেনের প্রধান প্রবণতা।

দেশভাগ একটি রাজনৈতিক ঘটনা। যদিও এর পেছনে গভীরভাবে ক্রিয়াশীল অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত। কিন্তু বহিরাবরণে প্রধান কারণ হিসেবে যে বিষয়টি চিহ্নিত হয়েছে, তা হলো সাম্প্রদায়িকতা। ওই বাস্তবতার কিছু শক্তিশালী বয়ানও দীর্ঘদিন ধরে দুই রাষ্ট্রে জারি আছে। দেশভাগের ফলে পূর্ববাংলা থেকে অনেক হিন্দু-ধর্মাবলম্বীকে দেশচ্যুত হতে হয়েছে, উদ্বাস্তু-জীবনবরণে বাধ্য হতে হয়েছে, দলে দলে দেশত্যাগ করতে হয়েছে – এটি একটি বয়ান। কিন্তু এটিই একমাত্র বয়ান নয়। উপন্যাসের পাঠও একমাত্রিক হয় না। উপন্যাস পাঠের মধ্য দিয়ে আরও অসংখ্য বয়ান হাজির হয় পাঠকের সামনে। মুখোমুখি করে অসংখ্য প্রশ্নের। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের ভূমিগত, শ্রেণিগত এবং কখনো কখনো সম্প্রদায়গত অবস্থানও এসব বয়ান নির্মাণে ভূমিকা পালন করে। প্রতিষ্ঠিত বয়ানের সঙ্গে পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশের উপন্যাসের বয়ান যদি তাতে যোগ না হয়, সেই বয়ানের বলয় পূর্ণতা পায়

না। এখানে পশ্চিমবঙ্গের দৃষ্টিকোণের বিরোধিতা বা বিপরীত-নন্দন প্রতিষ্ঠার প্রয়াস প্রধান লক্ষ্য নয়। বরং দীর্ঘদিন যে বয়ান ছিল আলোচনার বাইরে, তাকে যুক্ত করে একটি বহুস্বরিক বয়ান নির্মাণ প্রচেষ্টা এই গবেষণার একটি দৃষ্টিকোণ। বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য ইতিহাসের সত্যাসত্য বিচার নয়। বরং একটি কালখণ্ডে সংঘটিত রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহকে উপন্যাসের কাঠামোতে স্থান দিতে গিয়ে কী কী ধরনের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হয়েছে, তার অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ। আলোচনার আওতা যেহেতু বাংলাদেশের উপন্যাস, স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের প্রেক্ষণবিন্দু গুরুত্ব পেয়েছে। দেশভাগের ফলে যে উদ্বাস্তু-পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক কারণে পূর্ববঙ্গেও সেই পরিস্থিতির স্বাতন্ত্র্য আছে। এসব পরিস্থিতিকে চরিত্র ও পরিপার্শ্ব উভয়ের সমবায়ে নির্মাণ করেছেন বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকরা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সাতচল্লিশ-পরবর্তী আর্থরাজনৈতিক জিজ্ঞাসা, জাতীয়তা ও ভাষা আন্দোলন

২.৪.১. পরিপ্রেক্ষিত

ইতিহাসের ধারায় বিচিত্র ঘটনা-পরম্পরার মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ সালে যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়, তার সঙ্গে জড়িত ছিল বাংলা জনাঞ্চলের জনমানুষের নির্ধারিত ও অনির্ধারিত কিছু স্বপ্ন, প্রত্যাশা ও মুগ্ধতা। এই প্রত্যাশার অনেকাংশ সংশ্লিষ্ট ছিল অর্থনৈতিক মুক্তির সঙ্গে। কিন্তু পাকিস্তান নামক নতুন রাষ্ট্রকাঠামো বাঙালি মধ্যবিত্তকে মুখোমুখি করে বহুমাত্রিক আর্থরাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জিজ্ঞাসার। এর অব্যবহিত ধারাক্রম হিসেবে উপস্থিত থাকে বাঙালি জনগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্যবোধ ও নতুনতর জাতীয়তার প্রসঙ্গ। এই আলোচনার শুরুতে তৎকালীন অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতটি জেনে নেওয়া প্রয়োজন। বদরুদ্দীন উমর তাঁর তিনখণ্ডে প্রকাশিত *পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* (প্রথম-প্রকাশ: ১৯৭০) গবেষণাগ্রন্থে সাতচল্লিশ-পরবর্তী পরিস্থিতির দালিলিক তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করেছেন। কামরুদ্দীন আহ্মদ তাঁর *পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি* (প্রথম-প্রকাশ: ১৯৭০) বইয়ের বড় অংশ জুড়ে বাঙালি মধ্যবিত্তের নতুন সংগ্রামের অভিযাত্রাকে বিশ্লেষণ করেছেন আর্থরাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে। সাঈদ-উর রহমান তাঁর গবেষণাগ্রন্থ *পূর্ব বাংলার রাজনীতি সংস্কৃতি ও কবিতায়* (প্রথম-প্রকাশ: ১৯৮৩) তৎকালীন আর্থরাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গের বিশ্লেষণ করেছেন। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) থেকে প্রকাশিত আতিউর রহমান সম্পাদিত *ভাষা আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক পটভূমি* (প্রথম-প্রকাশ: ১৯৯০) শীর্ষক গবেষণাগ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে ওই কালের অর্থনীতি, শ্রেণি-অবস্থান, শ্রেণি-রাজনীতি ও সাহিত্যিক পরিপ্রেক্ষিত। বর্তমান আলোচনায় সাতচল্লিশ-পরবর্তী পূর্ববাংলার আর্থরাজনৈতিক জিজ্ঞাসা, জাতীয়তা ও ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত অনুধাবনের প্রয়োজনে আরও অনেক উৎসগ্রন্থের সঙ্গে উপর্যুক্ত গ্রন্থগুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে।

বাংলা অঞ্চলে পাকিস্তান মূলত মধ্যবিত্ত মুসলমান বাঙালির রাজনৈতিক প্রত্যাশার ফলাফল। পূর্ববাংলার কেন্দ্রীয় শহর ঢাকা পরিণত হয় পাকিস্তানের একটি প্রাদেশিক রাজধানীতে। প্রাদেশিক রাজধানী হওয়ার জন্য একটি শহরে যেসব উপাদান থাকা জরুরি, ঢাকায় সেগুলোর অনেক কিছুরই অনুপস্থিতি ছিল।

(Ahmed 2016 : 19) মধ্যবিত্তের আত্মউন্নয়নের জন্য একটি ভূখণ্ডে যে ন্যূনতম অবকাঠামোগত উপাদান থাকা প্রয়োজন, তারও অনেক কিছু পাকিস্তানের এই নতুন প্রদেশে ছিল না। পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায়, সর্বভারতের ৪০০টি বস্ত্রকারখানার মধ্যে পূর্ববাংলায় ছিল মাত্র দশটি, অখণ্ড বাংলার ১০৬টি পাটকলের মধ্যে পূর্ববাংলায় কেবল ১টি; ছিল না কোনো স্টিলপ্ল্যান্ট, পেপারমিল, রাসায়নিক কারখানা, কয়লা উৎপাদন প্রকল্প। ছিল কেবল ৪৯টি মৌসুমী (সিজনাল) পাট প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, ৫৮টি ছোট চালকল, তিনটি চিনিকল এবং একটি সিমেন্ট কারখানা – যা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল। (Nafis 1958) অর্থনৈতিক বিন্যাসের দিক থেকেও পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ছিল বিস্তর ব্যবধান। এই ব্যবধান কেবল অবকাঠামোগত নয়; বরং গুণগত ও চেতনাগতও:

> স্বাধীনতাপ্রাপ্তিকালে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের কোনো অর্থনৈতিক সাদৃশ্য ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক কাঠামো পুরোপুরি মধ্যযুগীয় আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর দাঁড়িয়ে ছিল। অথচ, পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী গোড়া থেকেই ঔপনিবেশিক শক্তি কর্তৃক ১৭৯৩ সালের ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে তাদের উপর আধা-সামন্ততন্ত্র ব্যবস্থা আরোপের বিরোধিতা করে আসছিল। এর দরুন পূর্ব পাকিস্তানের ভূমিব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় সবসময়েই অগ্রবর্তী থেকেছে। (কামরুদ্দীন ২০১৪ : ৮৮)

পূর্ববাংলার জনগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে কামরুদ্দীন আহ্‌মদ (২০১৪ : ৮৯) আরও জানান:

> পূর্ব পাকিস্তানের একটি ক্ষুদ্র অথচ শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী আছে, যারা সেখানে তথাকথিত মোল্লা ও পীর, দুর্নীতিপরায়ণ, ষড়যন্ত্রকারী, বক্তৃতাবাগীশ রাজনীতিক আর দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানাবিধ শোষণকারীদের চিরাচরিত প্রভাব নষ্ট করে দিয়ে গড়তে চায় এক আধুনিক সমাজ। সমাজের এই সম্ভ্রান্ত অংশটি উর্দুভাষী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মধ্যে নিজসত্তা বিলীন না করে, বাংলা ভাষার রক্ষণ ও আধুনিকীকরণের জন্যও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। নিজস্ব ইতিহাস, সাহিত্য ও কলা সম্পর্কে পূর্ববাংলাবাসী গর্বিত।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে তৎকালে স্বাধীনতা অর্জন হিসেবে বিবেচনা করলেও অব্যবহিত পরিস্থিতি এই ধারণা দেয় যে, এটি জনমানুষের মুক্তি বা স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেনি। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করার পর মুসলিম লীগ এই অঞ্চলের মুসলমানদের অধিকার সংরক্ষণের প্রধান দল হিসেবে দাবি করে। ১৯৪৭-এর পর মুসলিম লীগ পাকিস্তানের এবং পূর্ববাংলার একমাত্র নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দলে আসীন হয়। কিন্তু দেখা যায় – জনমানুষ যে স্বপ্ন আর প্রত্যাশা নিয়ে মুসলিম লীগকে সমর্থন জানিয়েছিল, তা কম সময়ের মধ্যেই ম্লান হতে থাকে। 'সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী ঠিক যে জায়গায় তার ভূমিকা সমাপ্ত করে, মুসলিম লীগ সেই জায়গা থেকেই ক্ষমতা গ্রহণ করে।' (Ahmed 2016 : 1) এই বিবেচনায় সাতচল্লিশের নতুন রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠাকে স্বাধীনতা হিসেবে না

দেখে শাসকশক্তির ক্ষমতার হস্তান্তর হিসেবে চিহ্নিত হয়। এ-প্রসঙ্গে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (২০১৬ : ১৪) প্রশ্ন রেখেছেন: 'রাষ্ট্রীয় তৎপরতায় দেশ ভাগ হয়েছে দু'বার, রদ ঘটেছে একবার, উত্থান ঘটেছে নতুন রাষ্ট্রের, তার পতনও হয়েছে, কিন্তু যাদেরকে নিয়ে রাষ্ট্র সেই মানুষেরা কি সুখ, শান্তি, ও স্বস্তি পেয়েছে? সন্ধান পেয়েছে মুক্তির?' এমনতর প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছিল তৎকালীন পূর্ববাংলার বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তকে; যাদের একটা বড় অংশ চল্লিশের দশকে পাকিস্তান-আন্দোলনে ছিল অগ্রণী। বাঙালি মধ্যবিত্ত মুসলমানের মতো প্রান্তিক পর্যায়েও পাকিস্তান ধারণার প্রতি জনসাধারণের সমর্থন তৈরি হয়েছিল, এটি ঐতিহাসিকভাবেও সত্য:

> এই বিচিত্র রাষ্ট্রটি জনগণের ইচ্ছা ও আগ্রহের ফলেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কেহ জোর করিয়া চাপাইয়া দেয় নাই। ... এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ চাকুরি-বাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, জমিদারি-মহাজনি ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, সেই আধিপত্য হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা এবং ভারতে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকে লইয়া একটা নিজস্ব শাসন ও সমাজব্যবস্থা কায়েম করা। (তফাজ্জল ১৯৮১ : ২৫)

এর প্রমাণ ১৯৪৬-এর নির্বাচনে মুসলিম লীগের জয়লাভ। মুসলিম লীগ ওই নির্বাচনে পূর্ববাংলায় ১২১টি মুসলিম আসনের মধ্যে ১১৩টি আসনে জয়লাভ করে। (Mauri & Taya Zinkin 1970 : 584) এর মধ্যে গ্রামীণ পর্যায়ে ১১১টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ ১০৩টিতে জয় পায়। (Shila 1976 : 197) যদিও ওই নির্বাচনে সকল প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার ছিল না। মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৫ শতাংশ ভোটাধিকারপ্রাপ্ত হয়। (Sumit 1983 : 34) ভাষাসৈনিক ও সংস্কৃতিগবেষক আহমদ রফিক (২০১৫ : ১৭) তাঁর *দেশবিভাগ : ফিরে দেখা* গ্রন্থের 'আমজনতারও স্বপ্ন ছিল পাকিস্তান' পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন:

> বঙ্গদেশে চল্লিশের দশকে রাজনীতির খেলা, লীগ-কংগ্রেসের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব আর মোহাম্মদ আলী জিন্নার তথাকথিত দ্বিজাতিতত্ত্বের বাহারি পাকিস্তানি বেলুন যা দেখে মুগ্ধ বাঙালি মুসলমান। এ মুগ্ধতার পেছনে ছিল বিরাজমান আর্থ-সামাজিক বৈষম্য থেকে মুক্তির স্বপ্ন। মুক্তি অর্থনৈতিক সচ্ছলতার জন্য, সচ্ছলতা না হোক অন্ততপক্ষে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের।

অর্থাৎ এই স্বপ্ন ছিল শোষণমুক্তির স্বপ্ন। ব্রিটিশ সরকারের বিদায়, বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, ধনী-গরিবের বৈষম্য হ্রাস, ন্যায়ভিত্তিক শোষণহীন সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যেই এদেশের মানুষ 'পাকিস্তান-আন্দোলন'কে সমর্থন জানিয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৭-পরবর্তী বাস্তবতা মূলত শোষণমুক্তির বদলে শোষণের পরম্পরার বাস্তবতাতে পরিণত হয়। উন্মোচিত হতে থাকে সামন্ততান্ত্রিক ও ধর্মতান্ত্রিক পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর প্রতারক চারিত্র্য। প্রতারিত হয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার

অন্যতম অংশীজন বাঙালি মুসলমান। এ-প্রসঙ্গে রাষ্ট্রচিন্তক আবুল কাসেম ফজলুল হক (১৯৯৮ : ১৯) বলেন:

> এক শোষকের বদলে নতুন আর এক শোষককে – এক অত্যাচারীর বদলে নতুন আর এক অত্যাচারীকে তারা ক্ষমতায় বসাচ্ছে – একথা তখন তারা ভাবতেও পারেনি। অন্যায়মুক্ত, অভাবমুক্ত, প্রেম-প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যপূর্ণ নতুন জীবনের স্বপ্নই তাদেরকে একদা পাকিস্তান আন্দোলনে আকৃষ্ট করেছিল।

রাজনীতির ক্ষেত্রেও দৃশ্যমান পরিবর্তন ঘটতে থাকে। মুসলিম লীগ নেতৃত্ব আজন্ম সামন্তশ্রেণিনিয়ন্ত্রিত। পাকিস্তান সৃষ্টিতে নেতৃত্বদানকালে চল্লিশের দশকে দৃশ্যমান হতে থাকে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের প্রধান দুই অংশ। এক পক্ষে দেখা যায় সামন্ত ও ধর্মীয় মূল্যবোধতাড়িত শ্রেণি, যাদের নেতৃত্বে ছিল ঢাকার আহসানমঞ্জিল কেন্দ্রিক নবাব পরিবার। ওই সময়ের তরুণ মুসলিম লীগ কর্মী শেখ মুজিবুর রহমান (২০১৪ : ১৭) জানাচ্ছেন : 'মুসলিম লীগ তখন পর্যন্ত জনগণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় নাই। জমিদার, জোতদার ও খান বাহাদুর নবাবদের প্রতিষ্ঠান ছিল।' অন্য পক্ষে দেখা যায় উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণি, যাদের মধ্যে উদারনৈতিক বুর্জোয়া মানসিকতা লক্ষ করা যায়। '১৯৪৩ সনে আবুল হাসিম সাহেব মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হবার পর মুসলিম লীগ বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীতে ভাগ হলো। মওলানা আকরম খাঁ, হাসান ইস্পাহানী ও খাজা নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভিযান আরম্ভ হয় – এ অভিযান প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে।' (কামরুদ্দীন ২০০৯ : ১০৭) সাতচল্লিশের নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ঢাকা প্রাদেশিক রাজধানী হলে নবাব পরিবার অগণতান্ত্রিক আচরণের মাধ্যমে অপর অংশকে কোণঠাসা করে রাখতে চায়। ভাষা ও জাতিগতভাবেও তারা নিজেদের বাঙালি মনে করত না, যতটা মুসলমান মনে করত। ফলে নিজ জনাঞ্চলের স্বার্থ, সুযোগ-সুবিধা দেখার চেয়ে ব্যক্তিস্বার্থে তারা পাকিস্তানের শাসকদের স্বার্থেই নিজেদের নিয়োজিত রাখে। আর স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম লীগের অপর অংশ যারা জন্মগত, ভাষাগত ও সংস্কৃতিগতভাবে বাঙালি; তাদের সঙ্গে রক্ষণশীল অংশের বিরোধ শুরু হয়। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী এই পরিস্থিতির মোকাবিলার দিকে নজর না দিয়ে, বিভিন্ন শ্রেণির বিচিত্র প্রত্যাশার দিকে নজর না দিয়ে কেবল ধর্মকে প্রধান করে তোলে। ফলে অর্থনৈতিক প্রশ্নে মানুষের মধ্যে তৈরি হয় আশাভঙ্গ ও হতাশার বাস্তবতা।

বদরুদ্দীন উমর তাঁর *পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে দেখিয়েছেন ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই পূর্ববাংলায় কীরূপ খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল। বিভাগপূর্ব কালেও এই পরিস্থিতি মোকাবিলার পবিবর্তে এক রাজনৈতিক দল অন্য রাজনৈতিক দলকে দোষারোপের সম্পর্কে জড়িত ছিল। (বদরুদ্দীন [২] ২০১২ : ১৪) এর

সঙ্গে যুক্ত হয় সরকারের কর্ডন নীতি, লেভি ব্যবস্থা। '১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে পূর্ব বাঙলায় কর্ডন প্রথা চালু করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ। যেসব জেলায় তখন কর্ডন ছিল সেগুলোর বাইরে কোনো ধান চাল বেসরকারিভাবে জেলার বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল।' (বদরুদ্দীন [২] ২০১২ : ২৫) 'পূর্ব বাঙলায় খাদ্য সংকট প্রকৃতপক্ষে একটা গুরুতর আকার ধারণ করতে থাকে ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের দিকে।' (বদরুদ্দীন [২] ২০১২ : ৩১) দুর্ভিক্ষ সামাল দিতে কর্ডন প্রথার সঙ্গে যুক্ত হয় লেভি ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী সরকার খাদ্যে উদ্বৃত্ত এলাকার জমির মালিকদের নির্ধারিত মূল্যে সরকারের কাছে ধান-চাল বিক্রয়ে বাধ্য করা হয়। এতে বিভিন্ন এলাকার কৃষকরা সরকারি আমলাদের অবিবেচনার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। (বদরুদ্দীন [২] ২০১২ : ৬৪) '১৯৪৮-৪৯ সালে পূর্ব বাঙলায় যে ব্যাপক খাদ্য সংকট ও দুর্ভিক্ষাবস্থা দেখা গেল সেই অবস্থাকে প্রতিরোধ করার কোন সুসংগঠিত ব্যবস্থা হয়নি।' (বদরুদ্দীন [২], ২০১২ : ৬২)

উক্ত কালপর্বে ভূমিব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়গুলোও পূর্ববাংলার জনমনস্তত্ত্বে প্রভাব বিস্তার করে। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদের যে স্বপ্ন সাধারণ কৃষকদের দেখানো হয়েছিল চল্লিশের দশকে পাকিস্তান-আন্দোলনের কালে, তার বাস্তবায়ন ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি। কিন্তু ১৯৫০ সালে "পূর্ব বাঙলা জমিদারী ক্রয় ও প্রজাসত্ব আইন' যেভাবে প্রণীত হয়েছিলো তাতে প্রকৃতপক্ষে জমিদারী সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ হয় নি। কারণ এই আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রই জমিদারে পরিণত হয়, পূর্ব বাঙলা সরকারই হয় কৃষকদের থেকে খাজনা আদায়ের অধিকারী। এই ব্যবস্থায় জমিদারের গোমস্তা ও কর্মচারীদের স্থান দখল করে সার্কেল অফিসার, তহশীলদার, চৌকিদার প্রভৃতি সরকারী কর্মচারীরা এবং তাদের মাধ্যমে কৃষকদের থেকে নির্যাতনমূলকভাবে খাজনা আদায় এবং তাদের ওপর অন্যান্য নানা প্রকার অত্যাচার রীতিমতো অব্যাহত থাকে।' (বদরুদ্দীন [২] ২০১২ : ১৫৫-১৫৬) ফলে সাধারণ কৃষকদের সঙ্গেও প্রতারণা করে তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকার। তাই দেখা যায় জমিদার চলে গেলেও তার পরিবর্তে হাজির হয় জোতদার এবং স্বয়ং সরকার। এই বাস্তবতায় পূর্বতন জমিদার, জোতদার, মহাজন, সভূমি কৃষক, ভূমিহীন কৃষক, কৃষক না হয়েও কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন স্তরের মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থগত দ্বন্দ্বের মীমাংসা হয় না। পাকিস্তানে সাম্যের পরিবর্তে মুসলিম লীগের সামন্ত মানসিকতার কারণে বৈষম্যের বাস্তবতা বিরাজমান থাকে। পূর্ববাংলার কেন্দ্রীয় পর্যায়ে যখন ভাষা আন্দোলন, শাসনতন্ত্র প্রণয়ন, নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণি, যার মধ্যে খোঁজা হয় জাতীয়তাবাদের উপাদান, সেই সময়পর্বে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সংঘটিত হতে থাকে নানা মাত্রিক কৃষক আন্দোলন। কৃষিপ্রধান পূর্ববাংলায় ভূমি ও কৃষিব্যবস্থার সংকট ওই কালের প্রধান সংকট হিসেবে বিবেচিত হয়।

যদিও জাতীয়তাবাদের তাত্ত্বিক ধারণা তাদের ছিল না, কিন্তু অব্যবহিত বাস্তবতাই তাদেরকে জীবনজিজ্ঞসার মুখোমুখি করে এবং এরই ফলাফল বিভিন্ন কৃষক আন্দোলন। 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরই কৃষক জনগণ অতি দ্রুত মুসলিম লীগ সরকারের গণবিরোধী চরিত্র সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করেন এবং তাঁদের মধ্যে আন্দোলনের একটা সম্ভাবনা দেখা দেয়।' (বদরুদ্দীন [২] ২০১২ : ১৬৫) এরই ধারাবাহিকতায় তেভাগা আন্দোলন, টঙ্ক প্রথা-বিরোধী আন্দোলন, নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ, নানকার বিদ্রোহ প্রভৃতি কৃষক আন্দোলন জোরদার হয়। এর সঙ্গে বিচ্ছিন্নভাবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সংঘটিত বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সাতচল্লিশ-পরবর্তী পূর্ববাংলার আর্থরাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ধারাবাহিকভাবে অশান্ত করে রাখে। সাতচল্লিশ-পরবর্তী পূর্ববাংলার আর্থসামাজিক রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনারও রয়েছে মাত্রাগত বৈচিত্র্য। দেশভাগজনিত মাত্রায় ওই কালের বাঙালি জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় পরিচয় ও অবস্থানগত পরিস্থিতিকে চারটি বর্গে অন্তর্ভুক্ত করে বিবেচনা করা যায় : এক. পূর্ববঙ্গে বসবাসকারী স্থানীয় বাঙালি মুসলমান; দুই. পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত বাঙালি মুসলমান; তিন. পশ্চিমবঙ্গ-ফেরত বাঙালি মুসলমান এবং চার. পূর্ববঙ্গে বসবাসকারী স্থানীয় হিন্দু জনগোষ্ঠী। শহর ও গ্রামের বিচারে : নাগরিক ও গ্রামীণ বাস্তবতা। শ্রেণির বিচারে স্বাভাবিকভাবে উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন। তবে এই কোনো ভাগই সরলরৈখিক নয়। জৈবিক প্রক্রিয়ার মতো এক বর্গের বৈশিষ্ট্য কখনো কখনো অন্য বর্গের বৈশিষ্ট্যে বিদ্যমান থাকে।

বিভিন্ন ইতিহাসতাত্ত্বিকদের বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসবিদ আহমেদ কামাল সাতচল্লিশ-পরবর্তী পূর্ববাংলার রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রধান তিনটি সংকটকে চিহ্নিত করেছেন : এক. ভাষা আন্দোলন; দুই. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং তিন. পাটের দরপতন। (Ahmed 2016 : 5) কিন্তু সকল কারণের প্রধান পটভূমি অর্থনৈতিক বাস্তবতা। 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বাঙালি মুসলমানরা আশা করেছিল এমন এক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, যে পরিকল্পনার আওতায় ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সবাই তার ন্যায্য অর্থনৈতিক সুবিধাটুকু পাবে। অর্থনৈতিক বঞ্চনার বোধ থেকেই পাকিস্তানের মানুষেরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেছিল।' (কুদরত ২০২২ : ৫৬) সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর (২০১১ : ৪) পর্যবেক্ষণও অভিন্ন : 'বাঙালী মুসলমান পাকিস্তান চেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেটা ইসলামের জন্য নয়, উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য তো নয়ই, চেয়েছিল নিজেদের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যই।' কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। বরং শোষণের নতুন রূপের মুখোমুখি হয় পূর্ববাংলার জনগণ। পাকিস্তানি কেন্দ্রীয় সরকার অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ কলিন ক্লার্ককে দায়িত্ব দিলে 'কলিন ক্লার্ক পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় পূর্ব বাংলায় শিল্পায়ন আর পশ্চিম পাকিস্তানে কৃষি বিস্তার করার কথা বলেছিলেন।' (কুদরত ২০২২ : ৫৬) কিন্তু

তাঁর সুপারিশও বাস্তবায়িত হয়নি। শাসকগোষ্ঠী কেবল পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে সকল মনোযোগ নিবদ্ধ করে। এর ফলাফল হিসেবে শুরু থেকেই পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বৈষম্যের বাস্তবতা বিরাজমান থাকে। আবুল মনসুর আহমদ (১৯৯৯ : ১২৭) জানাচ্ছেন:

> কৃষায়ণে অবহেলা করার দরুনই পূর্ব পাকিস্তান অবহেলিত হউক, আর পূর্ব পাকিস্তানকে অবহেলা করার দরুনই হউক, ফল দাঁড়াইল এই যে, ১৯৪৯-৫০ সালে যেখানে জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান ছিল শতকরা ষাট টাকা, ১৯৬৫-৬৬ সালে সেখানে দাঁড়াইল শতকরা ছেচল্লিশ টাকা।

বিআইডিএস-এর গবেষণা থেকে জানা যায়:

> পূর্ব-বাংলা ১৯৪৭-৫২ কালপর্বে কারো কাছ থেকেই কোন রকম সহযোগিতা পায় নি, বরং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে সে পায় বিমাতাসুলভ আচরণ। কেন্দ্রীয় সরকার সে সময় পূর্ব বাংলাকে কোনো রকম সাহায্য তো করেই নি বরং পূর্ব-বাংলার অর্জিত টাকা পয়সা পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গিয়ে সেখানকার উন্নয়ন-কর্মকাণ্ডকে তরান্বিত করেছে। (আতিউর ও লেনিন ২০০০ : ১২০)

প্রশাসনযন্ত্রেও বাঙালিদের অংশগ্রহণ ছিল নগণ্য। রওনক জাহান তাঁর গবেষণায় উল্লেখ করেন (Rounaq 2023 : 26): ১৯৪৭-১৯৫৫ কালপর্বে পাকিস্তানের ১৯ জন সচিবের মধ্যে একজনও বাঙালি ছিল না; ৪১ জন যুগ্মসচিবের মধ্যে পূর্ববাংলার ৩ জন; ১৩৩ জন উপসচিবের মধ্যে ১০ জন এবং ৫৪৮ জন আন্ডারসেক্রেটারির মধ্যে পূর্ববাংলার ছিল মাত্র ৩৮ জন। উচ্চস্তরের এই বৈষম্য নিম্নস্তরেও বিদ্যমান ছিল। প্রশাসন, অর্থনীতি ও ব্যবসা সবক্ষেত্রেই পূর্ববাংলার বাঙালিদের ওপর অবাঙালিদের আধিপত্য বাড়তে থাকে। পাকিস্তান-আন্দোলনের অন্যতম অংশীজন বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে তাই বাড়তে থাকে বঞ্চনার প্রলম্বিত বোধ। 'দেশবিভাগের পূর্বে শুধু পাকিস্তান অর্জনের ওপর গুরুত্ব দেওয়ায় অন্যান্য প্রশ্ন চাপা পড়ে গিয়েছিল। পাকিস্তান কায়েম হলে সেসব প্রশ্ন মাথা চাড়া দেয়।' (সাঈদ-উর ২০০১ : ১৩) অর্থনৈতিক ও জীবনমান সংক্রান্ত এমন প্রশ্নের মুখোমুখি বাঙালি মধ্যবিত্ত তাই নতুন রাজনৈতিক অভিযাত্রার দিকে ধাবিত হয়।

অপেক্ষাকৃত উদার ও বুর্জোয়া মনোভাবাপন্ন অংশকে অবদমিত করে পূর্ববাংলার মুসলিম লীগকে সামন্ত ও রক্ষণশীলদের দলে পরিণত করা হয়। তার দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা যায় অখণ্ড বাংলা প্রদেশের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীকে বাদ দিয়ে পূর্ববাংলার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে খাজা নাজিমুদ্দিনকে মনোনীত করা, সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের সঙ্গে বৈরী আচরণ এবং পূর্ববাংলার তরুণ কর্মীদের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার পথ রোধ করা। মুসলিম লীগের জনবিচ্ছিন্নতা ও বিবিধ অগণতান্ত্রিক আচরণের ফলাফল হিসেবেই ১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' যার

সভাপতি মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮৫-১৯৭৬), সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) ও খন্দকার মোশতাক আহমদ (১৯২০-১৯৯৬)। সমালোচকের ভাষায় : '২৩ জুন ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে বাঙালি পুঁজিপতি ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম।' (রফিকউল্লাহ ২০০৯ : ৪৬) এই রাজনৈতিক দল পরবর্তীকালে বাংলাদেশের বড় রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়, যার বর্তমান নাম 'বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ'। লক্ষ করবার বিষয় – প্রাথমিক পর্বে আওয়ামী মুসলিম লীগও পাকিস্তানি আদর্শকে ধারণ করেই তার যাত্রা শুরু করেছিল। প্রতিষ্ঠার পরদিন (২৪শে জুন) আরমানিটোলায় অনুষ্ঠিত জনসভায় দলের লক্ষ্য সম্পর্কে যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল তাতে 'প্রস্তাবনায় পৃথিবীর এই অঞ্চলে কমুনিজমের প্রসার রোধ করার জন্য পাকিস্তানকে দারুল ইসলাম বা সত্যিকার মুসলিম রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলার অঙ্গীকার করা হয়।' (সাঈদ-উর, ২০০১ : ১৭) এ-প্রসঙ্গে আহমদ ছফার (২০০৯ : ১৭) একটি অভিমত স্মরণযোগ্য:

> একথা বলা একটুও অযৌক্তিক হবে না যে, মূলত আওয়ামী লীগ মুসলিম লীগেরই একটা অংশ। পাকিস্তানের সঙ্গে বাস করে তাদের ন্যায্য হিস্যা আদায় করতে পারছিল না বলে আওয়ামী লীগকে শেষ পর্যন্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সূচনা করতে হয়েছিল।

বোঝা যায়, পাকিস্তান রাষ্ট্রকে স্বীকার করেই উক্ত সময়পর্বে এই রাজনৈতিক দলের জন্ম। পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদের যে ধারণা এই জনাঞ্চলে বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণিসাপেক্ষ।

আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার আগে আরও কিছু রাজনৈতিক সংগঠন কাজ শুরু করে। ১৯৪৭ সালের ৬ এবং ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে গঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ'। এই সংগঠনের পেছনে যাঁরা সক্রিয় ছিলেন, তাঁরা ছিলেন সাম্যবাদী চিন্তায় অনুপ্রাণিত। একসময়ের মুসলিম লীগ কর্মীরাই এই দল গঠন করেন। শামসুল হক (১৯১৮-১৯৬৫) (সভাপতি), কামরুদ্দীন আহ্‌মদ (১৯১২-১৯৮২), মোঃ তোয়াহা (১৯২২-১৯৮৭), তাজউদ্দীন আহমদ (১৯২৫-১৯৭৫), অলি আহাদ (১৯২৮-২০১২) প্রমুখ ছিলেন গণতান্ত্রিক যুবলীগের নেতৃস্থানীয় কর্মী। (বদরুদ্দীন, ২০১২ [১ম] : ২২) ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ব বাংলা শাখা গঠিত হয়। পশ্চিম বাংলা থেকে মুজাফফর আহমদ (১৮৮৯-১৯৭৩), মনসুর হাবিব-সহ (১৯১৭-১৯৯৬) কিছু কমিউনিস্ট নেতা ঢাকায় আসেন এবং পার্টি অফিস খোলেন। (বদরুদ্দীন [১] ২০১২ : ২৮৫-২৮৬) একসময় বামপন্থিরা জাতিসত্তার অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে পাকিস্তান-আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছিল; কিন্তু পাকিস্তানি শাসকদের

বিরোধিতা করায় তারাই রাজনৈতিকভাবে পাকিস্তানে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। 'ফলে কমিউনিস্ট পার্টির বিশেষত মুসলিম অংশ অল্পকাল পরেই নবগঠিত আওয়ামী লীগে যোগদান করে, অনেকে বিভিন্ন কৃষক-শ্রমিক সংগঠনে যোগ দেয়।' (কুদরত ২০২২ : ৬৬) ১৯৫১ সালে বামপন্থিদের আরেকটি অংশ 'গণতন্ত্রী দল' প্রতিষ্ঠা করে; কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এর জন্য ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রগঠনের একটা প্রভাব ছিল। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য:

> কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টির বেশির ভাগ কর্মী ও নেতাই ছিলেন হিন্দু। দলে দলে হিন্দুরা ভারতে চলে যাওয়ায় কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট কর্মীরা ভয়ানক অসুবিধায় পড়েন। এই দুইটি দলের যে গণভিত্তি ছিল তা ধসে যায়। অনেক কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট কর্মী ও নেতা ভারতে চলে যান। এই অবস্থায় পূর্ববঙ্গে কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে বক্তব্য বিষয় নিয়ে জনসাধারণের সামনে হাজির হওয়া কষ্টকর ছিল। (অমলেন্দু ২০২১ : ১৬৩)

আওয়ামী লীগই বৃহত্তর বাঙালি মুসলমানের স্পন্দনকে অনুভব করতে পেরেছিল বলেই এটি পাকিস্তানপর্বে পূর্ববাংলার জনমানুষের প্রধান রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়।

বাঙালি মনস্তত্ত্বে তখনও পাকিস্তানের প্রতি ছিল গভীর দুর্বলতা। ধর্মের ভিত্তিতে প্রত্যাশিত পাকিস্তানে ধর্মীয় প্রভাবও জনমনস্তত্ত্বে দৃঢ়ভাবে বিরাজমান ছিল। এবং পাকিস্তানের 'জাতির পিতা' বলে খ্যাত 'কায়েদে আজম'-ভূষিত মুহম্মদ আলি জিন্নাহ বাঙালি জনগণের কাছে তখন পর্যন্ত জীবন্ত কিংবদন্তি, এক অলঙ্ঘনীয় ব্যক্তিত্ব। এমনকি তাঁর মৃত্যুর (১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮) অব্যবহিত পরে পূর্ববাংলার অধিকাংশ মুসলমান বাঙালি লেখক যেভাবে শোক ও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তাঁদের সৃষ্টিশীল ও মননশীল রচনার মধ্য দিয়ে, তাতে জিন্নাহর বিষয়ে তাঁদের মুগ্ধতা গোপন থাকেনি। যেমন বাঙালি জাতীয়তাবাদী পাঠে যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র (১৯২২-১৯৭১) অবস্থানকে ধর্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে বলে চিহ্নিত করা হয়, যে ধর্মতন্ত্রকে আবার পাকিস্তানবাদের সমার্থক হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তিনিও এক চিঠিতে তাঁর বন্ধু হৃষীকেশ লাহিড়ীকে জানাচ্ছেন:

> কায়েদে আজমের মৃত্যু অপূরণীয়। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন এযাবৎ পৃথিবীর মহত্তম ব্যক্তিত্বদের একজন। কিন্তু তাঁর মহত্ত্ব ছিল প্রধানত এই যে তিনি অধঃপতিত, প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া মুসলমানদের অনিশ্চিত অবস্থা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তিনি ভারতবর্ষে তাঁর স্বধর্মের কোটি কোটি মানুষের স্বার্থের পক্ষে যে বিশেষ অবদান রেখেছেন, সেখানে তাঁর বড়ো মহত্ত্ব। (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ২০১৩ : ১০৭)

এই মুগ্ধতা বা অনুরাগ যে আকস্মিক নয়; বরং এর সঙ্গে রয়েছে এই জনগোষ্ঠীর সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক পরম্পরা, তা-ও ওয়ালীউল্লাহ্র কথায় স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। কিন্তু একদিকে বাস্তবের শোষণমূলক অবস্থা

এবং অন্যদিকে পাকিস্তানপ্রীত মনস্তত্ত্ব বাঙালি মুসলমানকে এক দ্বৈরথ অবস্থার মধ্যে পতিত করে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নয়, ইসলামের বিরুদ্ধে নয়, জিন্নার বিরুদ্ধে নয়; বরং এগুলোকে স্বীকার করে নিয়েই শোষণমুক্তির নতুন অভিযাত্রায় অভিযাত্রী হয় ১৯৪৭-এর 'পাকিস্তানি বাঙালি' জনগোষ্ঠী। (মো. রাফাত ২০২৩ : ১৪২) এ-প্রসঙ্গে রফিকউল্লাহ খানের (২০০৯ : ৪৫) মন্তব্যটি উল্লেখ্য:

> বাংলাদেশের বিকাশমান মধ্যবিত্তশ্রেণী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সূচনা থেকেই কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ষড়যন্ত্রমূলক চারিত্র্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। কিন্তু বৃহত্তর জনজীবনে ধর্মাদর্শনির্ভর 'আজাদি'র মোহ কিছুকাল স্থায়িত্ব লাভ করে। ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে পাকিস্তানি প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি ঐ মোহ দূরীভূত করতে অনেকটা সক্ষম হয়।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সাতচল্লিশ-পরবর্তী পূর্ববাংলার সবচেয়ে বড় ঘটনা। এই আন্দোলন ১৯৫২ সালে সামূহিক রূপ পেলেও এর সূচনা পাকিস্তান সৃষ্টিরও অব্যবহিত আগে থেকে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে দুই পর্বে ভাগ করা যায় – এক. ১৯৪৭-১৯৪৮ পর্ব; দুই ১৯৫১-১৯৫২ পর্ব। ১৯৪৭ সালের ১৭ই মে মুসলিম লীগ নেতা চৌধুরী খলিকুজ্জামান (১৮৮৯-১৯৭৩) উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র জাতীয় ভাষা করার প্রস্তাব করলে বাঙালি বুদ্ধিজীবীমহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। লেখক-প্রাবন্ধিক আবদুল হক (১৯১৮-১৯৯৭) দুই দফায় লেখেন 'বাংলা ভাষাবিষয়ক প্রস্তাব' শীর্ষক প্রবন্ধ (*ইত্তেহাদ* ২২ ও ২৯শে জুন ১৯৪৭) এবং পরবর্তীকালে 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধ (*দৈনিক আজাদ* ৩০শে জুন ১৯৪৭)। একই বছর জুলাই মাসে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জিয়াউদ্দিন আহমদ (১৮৭৩-১৯৪৭) উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মত দেন। তখন প্রতিষ্ঠানিকভাবে এই বক্তব্যের কোনো প্রতিবাদ হয়নি। কিন্তু মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯) লিখিতভাবে জিয়াউদ্দিনের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের ১২ই শ্রাবণ তারিখে 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে এই প্রবন্ধ 'আমাদের ভাষা সমস্যা' নামে পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৪৭ সালে সিলেটের মুসলিম সাহিত্য সংসদ আয়োজিত আলোচনাসভায় 'পূর্বপাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক একটি বক্তৃতা দেন সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪); যেখানে সুস্পষ্টভাবে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে অভিমত উচ্চারিত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই সদ্য প্রকাশিত সরকারি এনভেলাপ, পোস্টকার্ড, মনি অর্ডার, ডাকটিকিট রেলটিকিট ইত্যাদিতে উর্দু এবং ইংরেজি থাকলেও বাংলা ছিল অনুপস্থিত। (আহমদ ২০১৫ [ভাষা] : ২০১৬) বাঙালি শিক্ষিত শ্রেণির কাছে এটি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর একদেশদর্শী নীতির বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বিবেচিত হয়। যদিও ভাষা-প্রসঙ্গ দিয়েই বৈষম্যের দৃশ্যমান সূত্রপাত, কিন্তু এই বৈষম্যমূলক আচরণ কেবল ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ১৯৪৭-এর নভেম্বর মাসে বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে ঢাকার নীলক্ষেত ব্যারাকে বসবাসরত

সরকারি কর্মচারীদের একটি বিশাল অংশ ব্যারাক প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে মিছিল সমাবেশ করে। এক হিসেবে এটিই ছিল ভাষা-প্রসঙ্গে প্রথম কোনো প্রতিবাদ-সমাবেশ। সরকারি কর্মচারীরা সাধারণত আবেগচালিত হয় না; আসন্ন অস্তিত্ব-সংকট মোকাবিলার একটি দৃশ্যমান রূপ হিসেবে ওই মিছিল-সমাবেশকে বিবেচনা করা যায়। ২৭শে নভেম্বর ১৯৪৭ তারিখে করাচির শিক্ষা-সম্মেলনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর পক্ষে সুপারিশ গৃহীত হলে ঢাকায় তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়। সেখানে কেবল ছাত্ররাই নয়, নীলক্ষেত ও পলাশি ব্যারাকের সরকারি কর্মচারীরাও অংশগ্রহণ করে এবং তৎকালীন প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের (১৮৯৪-১৯৬৪) সরকারি বাসভবন বর্ধমান হাউসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। (আহমদ ২০১৫ [ভাষা] : ১৬) সরকারি কর্মচারীদের বঞ্চনার ক্ষোভই এখানে প্রধান। এর কয়েকমাস আগে অর্থাৎ পহেলা সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ তারিখে গঠিত হয় তমদ্দুন মজলিস; এর প্রধান সংগঠক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক মোহাম্মদ আবুল কাসেম (১৯২০-১৯৯১)। সেই সংগঠন থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর *পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষা বাংলা – না উর্দু* নামক পুস্তিকা প্রকাশ করে। ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের গণপরিষদের অধিবেশনে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮৬-১৯৭১) ইংরেজি ও উর্দুর সঙ্গে বাংলাকে গণপরিষদের ব্যবহারিক ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু বাঙালি-অবাঙালি উভয় শ্রেণির মুসলিম লীগ সদস্যদের বিরোধিতায় ওই প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। এর ফলে ঢাকায় আন্দোলন আরও বেগবান হয়। ২৬শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। ২৮শে ফেব্রুয়ারি এক সভা থেকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় – ১১ই মার্চ দেশব্যাপী প্রতিবাদ সমাবেশ পালন করা হবে। ১১ই মার্চ সচিবালয়, নীলক্ষেত ও পলাশি ব্যারাক, রেলওয়ে ওয়ার্কশপ ইত্যাদি জায়গায় পিকেটিং হয় এবং পুলিশ ও সরকার সমর্থক গোষ্ঠীর আক্রমণে অনেক আন্দোলনকারী আহত হয়; অনেক নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। (আহমদ ২০১৫ : ২০) পরিস্থিতি সামলে নিতে নাজিমুদ্দিন সরকার আন্দোলনকারীদের কিছু দাবি মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শান্তিচুক্তির আহ্বান জানায়। ১৫ই মার্চ আটদফার শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তার মধ্যে অন্যতম ছিল পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠা।

ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বে ১৯৫১ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন নতুন রূপে অধিক শক্তি নিয়ে ফিরে আসে। 'যদিও বৃহত্তর জনসমাজ ১৯৪৮ সালের ভাষা-আন্দোলনে তেমন করে সাড়া দেয়নি, তবু পরের বছর থেকে ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা-দিবসরূপে পালিত হতে থাকে।' (আনিসুজ্জামান ২০১৫ : ১৭০) ১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারি পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ঢাকার নবাব খাজা নাজিমুদ্দিন পল্টন ময়দানে এক জনসভায় ঘোষণা করেন : 'পাকিস্তানকে আমরা এছলামী রাষ্ট্ররূপে গঠন করিতে যাইতেছি। ...

প্রাদেশিক ভাষা কি হইবে তাহা প্রদেশবাসীই ঠিক করিবেন, কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবে উর্দু।' (আহমদ ২০১৫ [ভাষা] : ৩৫) এই বক্তব্য ১৯৪৮ সালের জিন্নার বক্তৃতারই প্রতিধ্বনি। এর প্রতিবাদে '৩১শে জানুয়ারি ঢাকা বার লাইব্রেরি হলে মাওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মী সম্মেলনে সরকারবিরোধী সব দল ও সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। মূল উদ্দেশ্য পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করা। ৪০ সদস্যের ওই পরিষদের আহ্বায়ক মনোনীত হন কাজী গোলাম মাহবুব।' (আহমদ ২০১৫ [ভাষা] : ৩৬) ৪ঠা ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ছাত্রসভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ২১শে ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী প্রতিবাদ কর্মসূচি পালনের। কিন্তু ২০শে ফেব্রুয়ারি বিকালে ও রাতে পরবর্তী দিনের জন্য সরকার কর্তৃক জারিকৃত ১৪৪ ধারার খবরের পরিপ্রেক্ষিতে সংগ্রাম পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটির যে সভা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে নেতৃবৃন্দের আপসকামী মনোভাব পরিষ্কার হয়ে যায়। ১৫ জন সদস্যের মধ্যে ১১ জনই ২১শে ফেব্রুয়ারির কর্মসূচি প্রত্যাহারের পক্ষে মত দেয়। বাকি চারজন ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে মত দেয়। (আনিসুজ্জামান ২০১৫ : ১৭৩) বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত নেতৃবৃন্দের সামনে ছিল আসন্ন প্রাদেশিক নির্বাচনের সমীকরণ। শেষ পর্যন্ত ২১শে ফেব্রুয়ারির দিনে সকালে সাধারণ ছাত্ররা পুরাতন কলাভবনের আমতলায় অনুষ্ঠিত সভায় ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষেই স্বতঃস্ফূর্ত রায় দেয়; এবং তা তারা কার্যকর করে প্রাণবিসর্জনের মধ্য দিয়ে। এই ঘটনা জনতার স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের কাছে নেতৃত্বের দোদুল্যমানতাকে নির্দেশ করে।

সাতচল্লিশ-পরবর্তী নতুন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় পূর্ববাংলার জনমানুষের কাছে ভাষার প্রসঙ্গটি যেমন বৃহৎ অর্থে আর্থরাজনৈতিক প্রশ্ন হিসেবে দেখা দেয়, তেমনি এর একটি সাংস্কৃতিক তাৎপর্যও ছিল। পাকিস্তানভুক্ত হবার ফলে এক দিকে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি থেকে স্বতন্ত্র হবার প্রবণতা যেমন ছিল, তেমনি সমগ্র পাকিস্তানের সাপেক্ষে একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক বোধ নির্মাণও এই জনাঞ্চলের শিক্ষিতজনের কাছে জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে দেশভাগের বাস্তবতায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত বাঙালি তথা মুসলমান বাঙালিদের সাংস্কৃতিক বোধও নতুন নির্মীয়মাণ সাংস্কৃতিক বোধে মিথস্ক্রিয়া ঘটায়। উক্ত কালপর্বে পর্বে গড়ে উঠতে দেখা যায় বেশ কিছু সাংস্কৃতিক সংগঠন। সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো মধ্যবিত্ত শ্রেণির সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখে। পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস (১৯৪৭), সংস্কৃতি সংসদ (১৯৫১), পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ (১৯৫২) এসবের যে ভূমিকা, তাতে পাকিস্তানের সমুন্নতি রক্ষা, ইসলামি মূল্যবোধের জাগরণ এবং অখণ্ড বাঙালি চেতনার পরিবর্তে মুসলিম বাঙালির ধারণা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার করার চেষ্টা দেখা যায়। এমনকি সাংগঠনিকভাবে যে তমদ্দুন মজলিস রাষ্ট্রভাষাপ্রশ্নে প্রথম সক্রিয় অবস্থান গ্রহণ করে, তারও আদর্শগত প্রত্যাশা ছিল 'ইসলামী নিয়ম-কানুনের ভিত্তিতে

পরিচালিত পাকিস্তান।' (সাঈদ-উর ২০০১ : ২৬) ফলে বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে অধিকারচেতনা, সংগ্রামী বোধ জাগ্রত করতে এই ধরনের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের বিশেষ ভূমিকা থাকলেও বাঙালি জাতীয়তাবাদ তখন পর্যন্ত অবয়ব ধারণ করতে পারেনি। এর প্রকাশ দেখা যাবে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকেন্দ্রিক বিভিন্ন তৎপরতায়। যে ভাষা আন্দোলনকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উৎসবিন্দু হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তার শুরুটি বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত ও সংজ্ঞায়িত 'বাঙালি জাতীয়তাবাদের' সমরূপ নয়। লক্ষণীয় – যাঁরা সাহিত্যিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ছিলেন পাকিস্তানি আদর্শের অনুসারী, তাঁদের অনেকেই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্বে সক্রিয়ভাবে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। 'পাকিস্তানসৃষ্টি-পরবর্তী বাস্তবতায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন থেকে রাষ্ট্রভাষা বাংলাকে পাকিস্তানি আদর্শের পরিসরেই তাঁরা অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচনা করেছিলেন। চিরায়ত বাংলা, বা অখণ্ড বাংলা বা 'হিন্দু-মুসলমানের সমন্বিত বাংলা'র কথা ভেবে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার বিষয়টি উত্থাপিত হয়নি। সেই 'হিন্দুয়ানি থেকে স্বতন্ত্র' বাংলাকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে তাঁরা দেখতে চেয়েছেন।' (মো. রাফাত ২০২৩ : ১৪৫) ১৯৪৭-১৯৪৮ সালে যাঁরা যুগপৎ পাকিস্তানি আদর্শ রক্ষা ও রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সক্রিয় অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন, তাদের মানসপ্রবণতা বোঝার জন্য আহমদ শরীফের (২০১১ : ১৬-১৭) একটি মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যায়:

> যাঁরা বাঙলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পেতে চেয়েছেন, বাঙলা ভাষার ভাবী রূপ-স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁদের মত ও মতলব অভিন্ন ছিল না। ব্রিটিশ আমলে কোলকাতায় চালু লিখিত সাধু কিংবা চলিত রীতির ভাষা অবিকৃতভাবে অনুসরণের পক্ষে যেন খুব কম পাকিস্তানীই ছিলেন। তখন পাকিস্তানী ও ইসলামী জোশ এত প্রবল যে, ভিন্নমতের স্থিতধী বুদ্ধিজীবীরা মুখ খুলতে শঙ্কা-সংকোচ বোধ করেছেন।

হুমায়ুন আজাদও (২০১৪ : ২৮) মনে করেন – পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পরে 'এ-সময়ের কবিদের অধিকাংশই রচনা করেছেন পাকিস্তান, কায়েদে আজম, কায়েদে মিল্লাত ও শায়েরে পাকিস্তান বা ইকবালের স্তোত্র, ঈদের ও আজাদীর মহিমা বর্ণনা করেছেন তাঁরা বছরের পর বছর; এবং প্রকাশ করেছেন শিল্পগুণহীন আবেগ-উচ্ছ্বাস-উল্লাস-ক্ষোভ।' আহমদ শরীফ ও হুমায়ুন আজাদের বক্তব্যের মধ্যে একাত্তর-পরবর্তী প্রতিষ্ঠিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ স্পষ্ট। তথাপি বিভিন্ন মাত্রিক সাংস্কৃতিক তৎপরতার ফলে পূর্ববাংলার বাঙালি সত্তার একটি স্বতন্ত্র রূপও উন্মোচিত হতে থাকে। এ-প্রসঙ্গে ১৯৪৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য-সম্মেলনে মূল সভাপতি হিসেবে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রদত্ত অভিভাষণের সেই বহুশ্রুত বাক্যগুলো স্মরণ করা যেতে পারে (২০১৫ : ৩০৯):

> আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙ্গালী। এটি কোনো আদর্শের কথা নয়। এটি একটা বাস্তব কথা। মা-প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙ্গালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছে যে, মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জো টি নেই।

এমনতর সাংস্কৃতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই জনগোষ্ঠীকে তার আত্ম-অধিকার প্রতিষ্ঠা ও আত্মপরিচয় আবিষ্কারে ব্যাপৃত থাকতে হয়েছে পরের আরও কয়েক দশক; এবং সেই অভিযাত্রা একটি চলমান প্রক্রিয়া।

ভাষা আন্দোলনের সঙ্গেই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে বাঙালি জনগোষ্ঠীর জাতীয়তাবাদের ধারণা। পাকিস্তান সৃষ্টির পর কাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ায় পূর্ববাংলার জনসমাজের মধ্যে অনেকগুলো অধিকারচেতনা কয়েক ধাপে জাগ্রত ও বিকশিত হয়। নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থায় তথা পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্বাংশে স্থানীয় ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত বা কলকাতা-ফেরত উভয়শ্রেণির মুসলমান ও বসবাসকারী হিন্দু জনগোষ্ঠী উভয়কেই বিভিন্ন ধরনের আর্থরাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয়েছিল। মোকাবিলার ধরনও ছিল বহুমাত্রিক, শ্রেণিভিত্তিক ও স্তরবহুল। ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে ২১শে ফেব্রুয়ারির রক্তক্ষরণ, আত্মদান তথা প্রাণবিসর্জনের মধ্য দিয়ে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে অধিকারচেতনার একটি সামষ্টিক রূপ। এই সমষ্টিরূপকে পরবর্তীকালে চিহ্নিত করা হয় বাঙালি জাতীয়তার ধারণা হিসেবে। কিন্তু ১৯৫২ সালের পূর্বাপর সময়খণ্ডে বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত ও তাত্ত্বিক রূপ পায়নি। এ-কারণে পরবর্তী দুই দশকেও বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক তৎপরতার সমান্তরালে নিরন্তর সাংস্কৃতিক ও তাত্ত্বিক সংগ্রাম জারি রাখতে হয়েছে। তাই দেখা যায় ১৯৬৩ সালে প্রাবন্ধিক আবদুল হককে (২০১৯ : ৪৫) বলতে হয় : 'নৃতত্ত্ব, ভাষা বা ইতিহাস যেদিক দিয়েই দেখা যাক, বাঙালি মুসলমান যে বাঙালি, এটা একটা বাস্তব ব্যাপার, একটা সরল সত্য। কিন্তু এই সরল সত্যটি অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গেই স্বীকৃত হয়েছে।' বদরুদ্দীন উমর বাঙালি মুসলমানের এই সংকটকে সাংস্কৃতিক সংকট হিসেবে দেখেছেন। ১৯৫২ (রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন), ১৯৫৬ (শাসনতন্ত্রে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতি) অতিক্রম করে ষাটের দশকেও উমরের মতো তাত্ত্বিকদের জাতীয়তাবাদের ধারণা প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামশীল থাকতে হয়। ১৯৬৭ সালে তিনি (১৯৬৭ : ৭-৮) লিখছেন : 'পূর্ব পাকিস্তানী মধ্যবিত্ত মুসলমানদের অনেকের ধারণা যে বাঙালী হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিলে ধর্মনাশ হবে, তাদের রাষ্ট্রের বুনিয়াদ শিথিল হবে। মুসলমানদের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে ভারসাম্যের এই অভাবই তাদের সৃষ্টিহীনতার জন্যে অনেকাংশে দায়ী।' অর্থাৎ একাত্তর-পরবর্তী বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপূর্ববর্তীকালে এক ধরনের ধারাবাহিক তাত্ত্বিক প্রচেষ্টা চলমান ছিল। কিন্তু, বায়ান্নোকে বাঙালি

জাতীয়তাবাদের একটি দৃশ্যমান রাজনৈতিক সূচনাবিন্দু ধরা যেতে পারে। বিভিন্ন শ্রেণির, ভিন্ন অবস্থানে বসবাসকারী মানুষের অধিকারচেতনা ভিন্ন হলেও একুশে ফেব্রুয়ারিতে রক্ত ঝরার পরে একটি বিন্দুতে এসে অধিকারচেতনাগুলো একটা সামষ্টিক রূপ লাভ করে। কিন্তু এই সমষ্টির ফলাফল কেবল ভাষাচেতনা নয়। এই গণ-আন্দোলন কেবল যে ভাষানির্ভর ছিল না, তা অব্যবহিত কালের ভাষ্য থেকেও স্পষ্ট হয়। যেমন ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যবাহী ভাষা আন্দোলন-কেন্দ্রিক প্রথম সাহিত্যসংকলন *একুশে ফেব্রুয়ারী*র ভূমিকায় সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমান (২০০১ : ১২) জানান:

> একুশে ফেব্রুয়ারীর পেছনে দেশ-জোড়া এই বিপুল জমায়েত সম্ভব হয়েছিল, কেননা এ-তো শুধু ভাষা আর সংস্কৃতির প্রশ্নই ছিল না, এর সাথে জড়িয়ে ছিল আমাদের সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্ন, বিভিন্ন ভাষাভাষী জনতার আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী, বাঙালীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের প্রশ্নও।

গণতান্ত্রিক অধিকারচেতনাই এখানে মুখ্য। লক্ষণীয়, এই অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য পূর্ববাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমানুষ চল্লিশের দশকে পাকিস্তান-আন্দোলনে নিজেদের যুক্ত করেছিল। লক্ষ্যও অভিন্ন, অংশীজনও অভিন্ন; কেবল শাসক গোষ্ঠীর পরিচয় ভিন্নতর। মূলত এই জনাঞ্চলের চিরায়ত অধিকারচেতনার ধারাবাহিক সংগ্রামী অভিযাত্রার একটা উল্লেখযোগ্য বিন্দু রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, যা ওই ঘটনার পরেও ধারাবাহিকভাবে অগ্রসরমান। তাই তার অনেক বছর পর (১৯৯২) স্বাধীন বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (২০১৭ : ১৮০-১৮১) এই চেতনার জায়গাটিকে শনাক্ত করেছেন এভাবে:

> ২১ ফেব্রুয়ারি শুধু বাংলা ভাষা আদায়ের দাবি জানাবার দিন নয়, মানুষের প্রতিবাদকে প্রকাশ করার, প্রতিরোধকে ভাষা দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে ২১ ফেব্রুয়ারি। ঢাকার হত্যাকাণ্ডের মুহূর্ত থেকে মাতৃভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ২১ ফেব্রুয়ারির একমাত্র লক্ষ্য নয়; দেশবাসীর আত্মপরিচয় অনুসন্ধানের সঙ্গে সামাজিক বিপ্লব ঘোষণা এবং তা সংঘটিত করা হয়ে দাঁড়ায় এর অঙ্গীকার।

বায়ান্নো-পরবর্তী দুই দশক এবং স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম কয়েক দশক এই বাঙালি জনগোষ্ঠীকে আরও নানাবিধ সংগ্রাম, বিশেষত সাংস্কৃতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বুঝে নিতে হয়েছে নিজের জাতীয়তার মৌল ধারণাকে। জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তাবোধের ধারণাকে ইতিহাসবিদ চিহ্নিত করেছেন সম্মিলিত ঐতিহ্যবোধ হিসেবে:

> জাতীয়তাবাদ মূলতঃ একটি ভূভিত্তিক চেতনা; একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত চেতনা বা অনুভূতি। ... জাতীয়তাবোধ উন্মেষের পেছনে যে উপাদানটি সর্বাধিক প্রয়োজনীয় সেটি হল এক সম্মিলিত ঐতিহ্যবোধ। এই ঐতিহ্যবোধ বা চেতনা যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে

> কেবলমাত্র এক বংশজাত বা এক ধর্মাবলম্বী অথবা এক ভাষাভাষী হলেই কিংবা এক অঞ্চলের বা একই রাষ্ট্রের অধীনে বসবাস করলেই জাতীয়তাবোধের পরিপূর্ণ স্ফুরণ ঘটে না। (সালাহউদ্দীন ১৯৯১ : ৬-৭)

সমসাময়িক গবেষক জাতীয়তার ধারণাকে বিশদ করেছেন:

> জাতীয় চেতনা একটি আইডিয়া। এটি হচ্ছে একরকমসূচক ভাবানুভূতি। আমরা এক – এই অনুভূতি হচ্ছে জাতীয় চেতনা। একটি জনগোষ্ঠী যখন নিজেদের মধ্যে কোনো ঐক্যকে, একত্বের ধারণাকে লালন, পালন এবং অনুভব করে, তখন ওই একত্বের চেতনাকে বলা যায় জাতীয় চেতনা। জাতীয় চেতনা সাধারণত দেখা যায় একই নৃতাত্ত্বিক, ভাষাভিত্তিক বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অধিকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে। ... জাতীয় চেতনা মূলত একটি স্বতঃস্ফূর্ত গোষ্ঠীগত ভাবানুভূতি।' (কুদরত ২০২২ : ১৫-১৬)

এই সূত্র ধরে বলা যায়, জাতীয় চেতনা যেহেতু অনেকটা আকৃতিহীন, তাই এর রূপান্তর ঘটাও স্বাভাবিক। নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাগত বৈভিন্ন্য সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক বাস্তবতায় শোষিত হবার ধারণা চল্লিশের দশকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় সংস্কৃতিগত ঐক্যচেতনার জন্ম দিয়েছিল। ফলে সেখানে ধর্মভিত্তিক জাতীয় চেতনা জন্ম নেয়। কিন্তু এটাও স্পষ্ট যে, এটি কেবল ধর্মের ঐক্য ছিল না। অর্থনৈতিক বৈষম্যবোধ ধর্মভিত্তিক জাতীয় চেতনাকে সজীব করে তুলতে পেরেছিল। এর উদাহরণ হিসেবে বলা যায় পশ্চিম এশীয় (আরব-ইরান-ইরাক-তুরস্ক) কিংবা দক্ষিণ-পূর্বএশীয় (ইন্দোনেশিয়া-মালোয়শিয়া) জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে কেবল অভিন্ন ধর্মীয় পরিচয় থাকলেও অভিন্ন জাতীয় চেতনার জন্ম হয়নি। ফলে চল্লিশের দশকের মুসলিম জাতীয় চেতনার একটি অঞ্চলগত ও অর্থনৈতিক শাসনকাঠামোগত ভিত্তি ছিল। 'জাতীয়তাবাদ সম্পূর্ণত একটি রাজনৈতিক ধারণা। জাতীয় উপলব্ধিকে শক্তিশালী করার একটি সাধারণ বোধ বা কখনো কখনো এই বোধ থেকে জন্ম নেওয়া আন্দোলনই হচ্ছে জাতীয়তাবাদ।' (কুদরত ২০২২ : ১৭) সে হিসেবে জাতির সংজ্ঞার্থের সঙ্গে খাপ না খেলেও চল্লিশের দশকে যেহেতু ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় চেতনার জন্ম হয়েছিল এবং তাকে প্রাতিষ্ঠানিক তথা রাষ্ট্রীয় রূপ দেওয়ার জন্য রাজনৈতিক আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল, ফলে সেখানে জাতীয়তাবাদের দাবিও উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু তখনও জাতির ধারণা স্পষ্ট হয়নি। পাকিস্তান-আন্দোলনের জাতির ধারণাটাই ছিল ওই আন্দোলনকারীদের কাছে ভিন্ন মানদণ্ডে পরিমাপ্য। তারা ধর্মকথিত জাতীয়তার ধারণাকে গ্রহণ করেছিল; এবং তা ফলবান হতে পেরেছিল অর্থনৈতিক পটভূমিতে। ফলে প্রচলিত জাতির ধারণা দিয়ে তাদের জাতিত্বের ধারণাকে মাপা যায় না।

এখন পর্যন্ত 'জাতীয়তাবাদ' বলতে যে বহুল আলোচিত প্রপঞ্চ নানাভাবে বিশ্লেষিত হয়ে আসছে, তা সম্পূর্ণত পশ্চিমী রাষ্ট্রব্যবস্থাসাপেক্ষ। কিন্তু সমাজ ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় রাজনীতি বা এক

কালের কৌম সমাজ-অধ্যুষিত বাংলা অঞ্চলের সাপেক্ষে জাতীয়তাবাদ শনাক্ত হয়নি। বিশ শতকে ভারতীয় ও বাংলা অঞ্চলে জাতি ও জাতীয়তাবাদের ধারণাকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছে জাতীয় চেতনার ধারণা হিসেবে। সেজন্য মনে করা হয় – 'এই উপমহাদেশে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ঘটেছে পাশ্চাত্যের প্রভাবে।' (সালাহউদ্দীন ১৯৯১ : ১২) চল্লিশের দশকে যে মুসলমান-ঐক্য ধারণার জন্ম হয়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন শিক্ষিত সমাজ জাতিত্ব ও অতঃপর জাতীয়তাবাদের সূত্র সন্ধান করেছিল। জাতীয় চেতনাকেই অভিহিত করা হয়েছিল জাতি ও জাতীয়তাবাদ হিসেবে। কিন্তু জনমানুষের মধ্যে জাতীয়তাবাদ নিয়ে দ্বন্দ্ব বা সংকটের চেয়ে যাপিত জীবনে উপস্থিত সংকটই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সেই সংকট নিরসনে শিক্ষিত সমাজ কর্তৃক ধারণাকেই তারা গ্রহণ করে। এরই ফলাফল চল্লিশের দশকে বিরাজমান প্রচণ্ড শক্তিশালী 'মুসলিম জাতীয়তাবাদ'; যার আরেক নাম 'পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ'। আরেক বিবেচনায় জাতীয়তাবাদের আলোচনায় ধর্মকেও বাদ দেওয়া যায় না। কারণ, জাতীয়তাবাদ একটি ইহজাগতিক ধারণা। ধর্মও এক অর্থে ইহজাগতিক ধারণা। কারণ পারলৌকিক নানা অনুষঙ্গ সত্ত্বেও বস্তুজগতে ধর্মের উপস্থিতি বস্তুসাপেক্ষ। কারণ ধর্ম চর্চিত হয় মানুষ দ্বারা। ধর্ম সম্পূর্ণত মানুষসাপেক্ষ ধারণা। আর মানুষ ইহলোকের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

বাঙালি জাতি যে একটি জাতি এই ধারণা পূর্ববাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে আত্মস্থ করতে দীর্ঘ সময় পাড়ি দিতে হয়েছে। আধুনিক জাতিত্বের ধারণা অনুযায়ী সকল উপাদান থাকা সত্ত্বেও বাঙালি বুঝতে পারেনি যে, সে বাঙালি। কারণ এর সঙ্গে যে রাজনৈতিক উপাদান জরুরি, তার সঙ্গে এই জনগোষ্ঠীর পরিচয় হয়েছে অনেক পরে। ফলে রাজনৈতিক পরিচয়ে বাঙালি – এটি স্বয়ং এই জনগোষ্ঠীর কাছেই একটি নতুন ধারণা। এ জনাঞ্চলের হাজার বছরের ইতিহাসে বহুমুখী সংকটের উপস্থিতি অর্থাৎ একক সংকট বা প্রতিপক্ষের অনুপস্থিতিই জাতীয়তাবাদের ধারণার সঙ্গে তার দূরত্বের কারণ হতে পারে। উপনিবেশ বা প্রাক্-উপনিবেশ পর্বে প্রতিপক্ষ যেমন ছিল বহুস্তরিক, তেমনি আক্রান্ত জনগোষ্ঠীও বহুস্তরিক। পাকিস্তান-পর্বে একটি একক প্রতিপক্ষ পাওয়া গেল – এবং একটি শোষিত গোষ্ঠী একক পরিচয়ে নিজেকে চিহ্নিত করতে পারল। এক পক্ষে পাকিস্তানি শাসনকাঠামো, অন্য পক্ষে শোষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত। ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রথমত মধ্যবিত্তের বাঙালি জাতীয়তাবাদ। শাসনকাঠামোর শোষকশক্তির বিরুদ্ধে যদিও কেবল মধ্যবিত্ত অংশগ্রহণ করেনি। জীবনের প্রয়োজনে, জীবিকার প্রয়োজনে ও পরিপার্শ্বগত কারণে নিম্নবর্গ, কৃষক শ্রেণি, শ্রমিক শ্রেণিও বিভিন্ন সময়পর্বে শোষণবিরোধী আন্দোলনে ধারাবাহিকভাবে অবস্থান করেছে, আন্দোলন করেছে; কিন্তু জাতীয়তাবাদকে চিহ্নিত করেছে মধ্যবিত্ত। এই একই বিষয় লক্ষ করা গেছে 'পাকিস্তান-আন্দোলনে'র কালেও। মধ্যবিত্তই

অপরাপর জনগোষ্ঠীকে জাতীয়তাবাদের বড় সামিয়ানার নিচে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছে; ফসল ঘরে তুলেছে মধ্যবিত্ত। ফলে জাতীয়তাবাদের সুফল ভোগ করেছে মধ্যবিত্ত; আর কুফল ভোগ করেছে সাধারণ জনগণ। জাতীয়তাবাদ যদি হয় জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, সে হিসেবে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত যে সকল কার্যকর আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে, তার কোনোটিতে এই প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় না। বরং অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ই সবগুলো আন্দোলনের নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। তবে অধিকার প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিক আন্দোলন স্বাধীনতার আন্দোলনের দিকে ধাবিত হয়। যখন সেখানে রাজনৈতিক বোধ সংযুক্ত হয়, তখনই স্বাধীন জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। এই জনগোষ্ঠীকে একটি একক প্রতিপক্ষ জাতি বা শক্তিকে চিহ্নিত করতে হয়। এর জন্য বাংলা জনাঞ্চলের মানুষকে পাড়ি দিতে হয় আরও দুই দশকের পথ। এর ফলাফল বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা। এটিকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের একটি এবং একমাত্র স্মারক বলা যেতে পারে।

প্রতিষ্ঠিত বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারণায় ধর্ম গুরুত্ব পায়নি। কারণ অর্থনীতির সংকটটিই প্রধান বলে বিবেচিত হয়েছে। অভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভিন্ন জাতিশক্তি দ্বারা শোষিত হবার অভিজ্ঞতায় ঐক্যচেতনায় ধর্মীয় উপাদান গৌণ হতে থাকে। ফলে কার্যকারণসূত্রেই বাঙালি জাতীয়তাবাদ ধর্মনিরপেক্ষ চারিত্র্য অর্জন করে। শাসকগোষ্ঠীর ধর্মতন্ত্রকে সে প্রত্যাখান করে; কিন্তু এর জন্য ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে তাকে সংঘাতে লিপ্ত হতে হয়নি। ফলে প্রক্রিয়াগত কারণেই বাঙালি জাতীয়তাবাদ ধর্মনিরপেক্ষ। এর সঙ্গে সূত্রবদ্ধ করা যায় এই জনগোষ্ঠীর আবহমান লোকায়ত মানসিকতা ও চঙ্ক্রমিত অধিকার আদায়ের ক্রমাগত সংগ্রাম। বাঙালি জাতীয়তাবাদ স্বয়ংভূত বা একক চিহ্নযুক্ত জাতীয়তাবাদ নয়; এটি এক অর্থে প্রতিরোধমূলক জাতীয়তাবাদ। উনিশ শতকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ হিন্দু জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হওয়ায় বিশ শতকে এই অঞ্চলে মুসলিম জাতীয়তাবাদ ফলবান হয়ে উঠতে পেরেছিল। কিন্তু পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে আন্দোলনের প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে উপস্থিত থাকে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ। মুসলিম জাতীয়তাবাদ সাতচল্লিশ-পরবর্তীকালে এককভাবে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হওয়ায় এবং সেই জাতীয়তাবাদের আগ্রাসী চারিত্র্য বাঙালি জাতীয়তাবাদকে ফলবান করে।

যে-কোনো রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে উৎপাদনপদ্ধতি ও সমাজকাঠামোও পরিবর্তিত হয়। তার প্রভাব অনুভূত হয় সমাজস্থিত ব্যক্তির জীবনযাপন, মনস্তত্ত্ব ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে। পাকিস্তান-আন্দোলন থেকে জন্ম নেওয়া সাতচল্লিশের পাকিস্তান সৃষ্টি বাংলাদেশ ভূখণ্ডকে নতুন রাজনৈতিক পরিচয়ে পরিচিত করে। তার অব্যবহিত পরেই নতুন আর্থরাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জিজ্ঞাসার মুখোমুখি

হয় এই জনাঞ্চলের তথা পূর্ববাংলার জনমানুষ। ফলে রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে ঘটে আরও একটি পর্বান্তর। '১৯৪৭এর রাষ্ট্রীয়-রাজনৈতিক পরিবর্তন নতুন যে বাস্তবতা সৃষ্টি করে তা চেতনালোকের নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে অন্য এক বাস্তবতার জন্ম দেয়। থিসিস, অ্যান্টিথিসিস ও সিনথেসিসের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ এক নতুন বাস্তবতা ও জাগরণের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়।' (সৈয়দ আজিজুল ২০২২ : ৪৫) এর সঙ্গে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন এই জনাঞ্চলের বাংলাভাষী জনমানুষকে অপরাপর রাষ্ট্রের বাঙালি ও একই রাষ্ট্রভুক্ত অপরাপর জাতিগোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র পরিচেয়ে পরিচিহ্নিত হবার অভিযাত্রাকে গতিপ্রাপ্ত করে। এ-প্রসঙ্গে স্মর্তব্য:

> ১৯৫২ সাল পর্যন্ত বাঙালি সংস্কৃতি বলতে এক অখণ্ড সাংস্কৃতিক ইউনিটকে বোঝাত। মনে করা হতো যে, ১৯৪৭-এর দেশ-বিভাগের ফলে সেই সংস্কৃতি দ্বিখণ্ডিত হলেও তার আত্মিক বৈশিষ্ট্য একই রকম রয়ে গেছে। ১৯৫২ থেকে যে সংস্কৃতি এ দেশে গড়ে উঠল, তা চরিত্রগতভাবে এ দেশের সংস্কৃতি। তাকে সর্ববঙ্গীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করার বিশেষ কোনো কারণ নেই। তার স্বাধিকার ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অবিসংবাদিত। এ দেশের সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্য এবং সামাজিক উৎসবের আধুনিকতম ধারাগুলিই এ কথার প্রমাণ দেবে। (মমতাজুর ১৯৯৪ : ১৭)

এই নতুন চেতনার শিল্পরূপকার হিসেবে বাংলাদেশের সাহিত্যে বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকদের অভিযাত্রা। চল্লিশের দশকের ইতিহাসে বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, পাকিস্তান-আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, দাঙ্গার রাজনীতি, দেশভাগ-উদ্বাস্তুর বাস্তবতা বড় জায়গা জুড়ে আছে। এরপর নতুন বাস্তবতায় বাংলাদেশের ইতিহাসে যুক্ত হয় পাকিস্তান রাষ্ট্রের অর্থনীতি ও রাজনীতির সঙ্গে পূর্ববাংলার জনমানুষের বোঝাপড়া, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও জাতীয়তার প্রশ্ন। উপর্যুক্ত আর্থরাজনৈতিক বাস্তবতাকে বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বশীল উপন্যাসসমূহে উক্ত কালপর্বের ঘটনাক্রমে জনমানুষের জীবনজিজ্ঞাসার ও রাজনৈতিক চিন্তার স্বরূপ সন্ধান বর্তমান পরিচ্ছেদের অন্বিষ্ট।

উপন্যাস-পাঠ

২.৪.২. নতুন অভিযাত্রা : শাহরিক বাস্তবতা

২.৪.২.১

আবু রুশ্‌দের (১৯১৯-২০১০) *নোঙর* (১৯৬৩) উপন্যাসের কামাল পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত বাঙালি মুসলমান বর্গভুক্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। তার চোখে সাতচল্লিশ-পরবর্তী পূর্ববাংলা বিশেষত ঢাকা অপরিচয়ের বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত হয়। 'ঢাকা এ পর্যন্ত কামাল দেখেনি। স্কুলে ভূগোলের বইয়ে শুধু বাঙলার দ্বিতীয় নগরী বলে ঢাকার উল্লেখ দেখেছিলো।' (আবু রুশ্‌দ্ ২০০০ : ৩৮১) পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার

খবরে কলকাতায় অবস্থানকালে কামালের কাছে ঢাকা অপরাপর যে-কোনো শহরের মতো এক অচেনা শহর। কিন্তু তার কাছে ঢাকা বিবেচিত হয় ভাগ্যোন্নয়নের শহর হিসেবে। তাই তার প্রাথমিক উচ্ছ্বাস সম্পূর্ণত পাকিস্তানি আদর্শ-পরিস্রুত। তার মনে হয় : 'স্বাধীনতার টগবগানো খুশীতে ঢাকার প্রতিটা অলি-গলি আজকে নিশ্চয় চোখ জুড়ানো নূতন এক লেবাশ পরেছে। যদি আজকে ঢাকায় থাকা যেত।' (আবু রুশ্‌দ্ ২০০০ : ৩৮১) এই একটি মাত্র ঘোষণা, একটি মাত্র রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত যে কামালের আজন্ম শহর কলকাতাকে পর এবং ঢাকাকে আপন করে তোলে – বিষয়টি বিস্ময়কর। যে শহরকে সে কখনই দেখেনি, তার প্রতি এই মুগ্ধতা এক অর্থে পাকিস্তানপ্রীত ঔপন্যাসিকের মুগ্ধতা। অপরাপর রাজনৈতিক কর্মীদের ভাবনায়ও এতটা উচ্ছ্বাস দেখা যায়নি। বরং কলকাতাহীন পাকিস্তান তাদের মধ্যে অনিশ্চয়তা ও হারানোর বেদনা তৈরি করেছিল।

কামালের বন্ধু আলমগীর যখন উচ্ছ্বসিতভাবে বলে – 'চলো বেরউই, স্বাধীনতার চেহারাটা চোখ ভরে দেখে নিই।' তখন কামালের বিমনা উত্তর – 'তাহলে ত ঢাকা যেতে হয়।' কামালের উচ্চারণে বাঙালি-সত্তার মধ্যে মুসলমানিত্ব যে কী প্রবলভাবে উপস্থিত এবং আজন্ম স্মৃতি-নৃতত্ত্ব-ঐতিহ্য সবকিছু যেন ভেঙে পড়ে যায় এই মুসলমানিত্বের কাছে, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কামাল এখানে এমন এক চরিত্র, যারা প্রাথমিকভাবে কোনো সংকট-আশঙ্কার মুখোমুখি না হয়েও হয় ঢাকামুখী। বাঙালি মুসলমানের এই অংশই ঢাকাকে দিয়েছিল নতুন রূপ। চারশ বছরের পুরোনো ঢাকা তাদের গড়াপেটার মধ্য দিয়ে নতুন রূপ পেতে শুরু করে সাতচল্লিশ-কেন্দ্রিক নতুন বাস্তবতায়। নতুন ভূখণ্ডে এদের আগমনের পেছনে পাকিস্তানি জাতীয়তাবোধই প্রাথমিকভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। শুধু তা-ই নয়, নতুন ভূখণ্ডে অভিযোজন সক্ষমতার মাত্রা, পূর্বতন জীবনবিন্যাসের অভিজ্ঞতা এবং নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের নিজস্ব সংকট নতুন নতুন আর্থসামাজিক জিজ্ঞাসার জন্ম দেয়।

কামালের এই পাকিস্তানপ্রীতি বা মুসলমানসাপেক্ষ মানসপ্রবণতা থেকে বোঝা যায়, ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারটি মূলত বহন করে আনে অপেক্ষাকৃত সুবিধাভোগী পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত বাঙালি শিক্ষিত মুসলমানরা। '*নোঙর* সদ্য পাকিস্তানের রাজনৈতিক সময়কে নির্মাণ করে।' (শহীদ ২০০৩ : ৭৮) ব্রিটিশ সরকারের ইনকামট্যাক্স অফিসার কামাল অপশন দিয়ে যখন এই বাংলায় আসে, তখনও সে একই পদে বৃত থাকে। সে শুধু নয়, আসে তার বড়সাহেব হোসেন সাহেব। আরও আসতে দেখা যায় কামালের সঙ্গে স্টিমারে দেখা হওয়া সেই শফি – যে একসময় সাবান-কারখানা চালাতো, বিশ হাজার টাকা সঙ্গে

নিয়ে এই বাংলায় আসে ভাগ্যের আরও উন্নতি করবার জন্য। একে একে আলমগীরও চলে আসে। পূর্ববাংলাকে যেভাবে দেখে কামাল এবং এই জনপদের প্রতি তার শ্রেণিদৃষ্টিকোণটিও প্রকাশিত হয়:

> গোয়ালন্দ থেকে মুন্সীগঞ্জ পর্যন্ত ভাগ্যকুলেরর পড়ন্ত দু'একটা কাচারী বাড়ী বাদ দিলে, সে অন্য কোন পাকা ঘর দেখেনি। এই সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা স্টীমার যাত্রার পর কোথাও একটা শিল্প প্রতিষ্ঠান বা বাড়ন্ত নগর বা এমন কি সমৃদ্ধ জনপদ চোখে পড়লো না। খালি বালি ও পলিমাটি আর সাদা ঢেউ ও সবুজ তৃণের মিশ্রিত বাহার। কলকাতার কর্মমুখরতার পর এই নিথর শান্তি প্রলেপের মত কাজ করে বটে, তবে গতি ও বেগের এই আকস্মিক বলয় কামালের মনে এক অস্বস্তিকর শূন্যতার সৃষ্টি করে। (আবু রুশ্‌দ্‌ ২০০০ : ৩৯৪)

প্রথমদর্শনে ঢাকা সম্পর্কে কামালের ভাবনা:

> ধূলি-কাদা আর কয়লা-ক্লিষ্ট ছাপরার সামনে গাঢ় কালচে ময়লার থপথপানি। উন্মুক্ত পায়খানার ক্ষমাহীন কদর্যতা। জীর্ণ বেঢপ বাড়ী। বৈশিষ্ট্যহীন স্টেশন। এই ছিল একদা জাহাঙ্গীরনগর। এই আমাদের পাকিস্তান। রহম করো খোদা। (আবু রুশ্‌দ্‌ ২০০০ : ৩৯৪)

ঢাকার হতশ্রী চেহারা কামালের চোখে নগ্নভাবে ধরা পড়ে। কামালরা ঢাকাকে নির্বাচন করেছিল তাদের ভাগ্য-উন্নয়নের উপায় হিসেবে, ঢাকার প্রতি বিশেষ ভালোবাসা থেকে নয়। যদি ভালোবাসার কথা বলতে হয়, তবে তা পাকিস্তানের জন্য। কিন্তু ঢাকা প্রস্তুত ছিল না তাদের জন্য। ঢাকার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য তাদেরকে মুখোমুখি করে অভিযোজিত হওয়ার চ্যালেঞ্জের। এই চ্যালেঞ্জের সঙ্গে যুক্ত হয় কলকাতাকে ছেড়ে আসার বেদনাও। এই বেদনা কখনো কখনো হতাশায়ও রূপ নেয়। একদিকে অধিকতর কম আয়াসে ব্যক্তিগত উন্নতির সম্ভাবনা এবং অন্যদিকে ঢাকায় মানিয়ে চলার প্রতিমুহূর্তের চ্যালেঞ্জ কলকাতা-ছাড়া শিক্ষিত মুসলমানদের মনস্তত্ত্বে দ্বৈরথ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এই দ্বৈরথের সঙ্গেই ওই কালের নব্য পাকিস্তানের পূর্বাংশের আর্থরাজনৈতিক জীবনজিজ্ঞাসার জন্ম দেয়।

ওই কালের পরিপ্রেক্ষিতে কারা এসেছিল ঢাকায়? এসেছিল ইনকামট্যাক্স অফিসের বড় কর্তা হোসেন সাহেব, যার সম্পর্কে শোনা যায় – 'ফিচকে ধরনের কোনো অনাচার করে হাত ময়লা করে না। বছর চার-পাঁচের ব্যবধানে সহসা পনের-কুড়ি হাজার টাকা মেরে বসেন।' (আবু রুশ্‌দ্‌ ২০০০ : ৩৯৬) সাবান ব্যবসায়ী শফি কলকাতায় থাকা কালে মুসলমান ব্যবসায়ী বলে যার বছরে সাত হাজারের বেশি লাভ হতো না, ঢাকায় এসে প্রথম বছরেই কুড়ি হাজার টাকা লাভ করে। ফলে পাকিস্তান তার কাছে বড় নিয়ামতই বটে। যদিও রাজনীতিতে কামালের তেমন আকর্ষণ নেই বলে সে জানায়, তবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কারণেই তার এই স্থানান্তর। ফলে রাজনীতিকে অস্বীকার করারও উপায় নেই। খুব সহজেই তার অভিযোজন-অক্ষমতা ও অপরতাবোধ প্রকাশিত হয়:

> এই শহরকে বলতে গেলে সে চেনেই না। এর লোকদের চালচলন, পোশাকের ঢিলেমি, কথাবার্তা সবই তার কাছে অজানার কিছুটা শঙ্কা নিয়ে এখন দেখা দিচ্ছে – নিজেকে নির্ভয়ে তাদের সঙ্গে মিলাতে পারছে না। কিন্তু এই কুণ্ঠা নিয়ে চলতে গেলে তার মনে বিচ্ছিন্নতার ভাব থেকে যাবে আর এখানকার মাটিকে কিছুটা বন্য ও অনাত্মীয় বলে মনে হবে। (আবু রুশ্‌দ্ ২০০০ : ৪০১)

ঢাকায় নাগরিকতা বলতে যতটুকু কামাল দেখতে পায়, তাও যেন অনেকখানি বিকৃত নাগরিকতা। 'ঢাকার শ্রেষ্ঠ বসত অঞ্চল' বলে খ্যাত ওয়ারী এলাকায় আলমগীরের বন্ধু রহমানের সঙ্গে তাস খেলা, রহমানের স্ত্রীর অসঙ্গত আহ্লাদী আচরণ, পরস্ত্রীকাতরতা নাগরিকতার প্রকট দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপিত হয়। নিজের স্ত্রীর জন্য একজন মিডওয়াইফার পেতেও কামালকে হতে হয় গলদঘর্ম। তবুও নতুন বাস্তবতা বা যাকে চিহ্নিত করা হচ্ছে পাকিস্তানি জাতীয়তাবোধ, তার ভিত্তিতে সে এই ভূমি ও জনাঞ্চলকেও নিজের করে নিতে চায় এবং বলে : 'এখানকার মাটিকেই যেন আমি আমার মা বলে বুঝতে শিখি।' (আবু রুশ্‌দ্ ২০০০ : ৪০১) যা অনেকখানি আরোপিত বলে মনে হয়। প্রায় সব ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক অনাচার দৃশ্যমান। যেমন ডাক্তার চিকিৎসার ফি বাবদ ইনকামট্যাক্সের পরিমাণ কমাতে অফিসারের সঙ্গে বাগাড়ম্বর করে, ইনকামট্যাক্স অফিসারও উপরি পাওনার আশা করে; আবার উপরমহলের চাপে হোসেন সাহেব বিধি আরোপে নমনীয় হওয়ারও পরামর্শ দেয়। কর্মক্ষেত্রে সৎ থাকতে গেলে কাউকে কাউকে শাস্তিও পেতে হয়। কর্মচারীরা পর্যন্ত টাকার জন্য বড় সাহেবদের সঙ্গে প্রতারণার আশ্রয় নেয়। সর্বত্র আপসের সংস্কৃতি। এমন নৈরাজ্যকর অবস্থায় পাকিস্তানের মহান আদর্শে উজ্জীবিত কামালদের মন বিমর্ষ হয়ে পড়ে। 'যে প্রসারিত ও বলিষ্ঠতর কর্মজীবনের উদ্দীপনায় সে পাকিস্তানে এসেছিলো আর মনে করেছিলো স্বাধীনতার টগবগানো আনন্দে বৃহত্তর এক অস্তিত্ব ডালপালায় এবং ফুল ও ফলে চারদিক ছড়িয়ে পড়বে তার কোন নিকট সম্ভাবনা কোনদিকে সে দেখতে পায় না।' (আবু রুশ্‌দ্ ২০০০ : ৪০৪) তার সঙ্গে আছে রুচিগত বৈভিন্ন্য। একই ধর্মবিশ্বাস থাকলেও কলকাতা-ঢাকা বা পশ্চিম-পূর্বের সংস্কৃতিগত পার্থক্যও প্রকাশিত হয় কামালের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে : 'রাস্তার পাশে সস্তা হোটেলের খোলা দেকচিতে হলুদ-বিকৃত গোস্তের ভাসমান পিণ্ড দেখে কামালের পেটের ভিতর থেকে 'ওয়াক' করে ওঠে।' (আবু রুশ্‌দ্ ২০০০ : ৪১৬) ধর্মের অনুষঙ্গ অনুহ্য রেখেও দুই বাংলার অভিন্ন সংস্কৃতির বিষয়টি এখানে মেলানো যায় না।

হোসেন সাহেবের কন্যা সালেহার সঙ্গে বিয়েকে ঢাকায় অভিযোজন-সংকটের খানিকটা সমাধান হিসেবে কামাল গ্রহণ করে। নতুন আর্থসামাজিক বাস্তবতা ব্যক্তিবিচ্ছিন্ন নয়। ফলে কামালের সামূহিক সংকটের সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনও যুক্ত। কলকাতায় রেখে আসা বাবা-মা-ছোট বোন-ভাই-ভাইয়ের স্ত্রী থেকে

একাকী ঢাকায় তারও দরকার আশ্রয়। বিয়ে উপলক্ষ্যে কলকাতা থেকে আসা অনুজ রহিমের ঢাকার প্রতি তাচ্ছিল্য অনেকটা ঘৃণায় পরিণত হয়। এই বয়ানের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে নির্মিত পাকিস্তানের ভিত্তির দুর্বলতাও প্রকাশিত হয়। দুই বাংলার দুই শহরের মানুষের জীবনায়নের যে বিস্তর ফারাক, তা-ই বারবার করে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিয়ের পর সস্ত্রীক কামালের কলকাতায় গমন, সেখানে পরিবার-পরিজনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সময়যাপন তাকে ক্ষণিক মুক্তির প্রশান্তি দেয়।

পাকিস্তান যে দুর্বল ভিতের উপর দাঁড়িয়ে ছিল, তা জিন্নার মৃত্যুর খবরে কামাল-সালেহার কাতরোক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। জিন্নাকে নিয়ে কলকাতায় বসবাসরত রহিম ব্যঙ্গোক্তি করতে গেলে কামাল ক্ষিপ্ত হয়। এই বাতচিতের মধ্যে রহিমের স্ত্রীর কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ – 'আমরা ত আর পাকিস্তানে নেই যে সেখানকার লোকদের সম্বন্ধে সমঝে বুঝে কথা বলতে হবে।' এর মধ্য দিয়ে 'স্বাধীনতা'র দুর্বল ও ক্রমভঙ্গুর স্বরূপটি বোঝা যায়। অন্যদিকে পাকিস্তানের তথা ঢাকার সংস্কৃতিও কলকাতাবাসীর কাছে তীব্রভাবে অপর থেকে যায় এবং তার ব্যবধান আরও বাড়তে থাকে। হাওড়া ব্রিজ দেখতে যাওয়ার সময় 'ভাবী' সম্বোধন শুনে পুরো ট্রামের লোক চাওয়াচাওয়ি ও কানাকানি পরিস্থিতি দেখে কামালের মনে হয় – পাকিস্তান আর মুসলমানদের সম্বন্ধে অসভ্য রকম মন্তব্য যেখানে করে, সেখানে অবস্থান নিরাপদ নয়।

কামাল-সালেহার সন্তান জন্মের পরেই যেন কামালের দৃষ্টিভঙ্গির অনেকটা পরিবর্তন ঘটে। 'পূর্ব বাঙলার মাটি আকাশ নদী কামালের মনকে গত আড়াই বছরে হরণ করে নিয়েছে, কিন্তু সমাজের পরিবেশে কোনো স্নিগ্ধতা বা মহত্বের সম্ভাবনা একেবারে বিলুপ্ত মনে হয়।' (আবু রুশ্‌দ্ ২০০০ : ৪৭৩) কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায় বৃহত্তর জাতীয় চেতনার চেয়ে ব্যক্তিগত বাস্তবতা কেন কামালকে পূর্ববাংলার মাটির প্রতি আকৃষ্ট করে? মনে হয় সন্তানই তার নোঙর; অন্য কিছু নয়। উপন্যাসের শেষে কামালের মনোভাবনার মধ্য দিয়ে মূলত ঔপন্যাসিকের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়:

> পাকিস্তান আমার দরকার ছিলো সারা দুনিয়া আমার সেটা বুঝবার জন্য। সেখানকার ধান ক্ষেতে এখন আমি আমার নিজস্ব ঘ্রাণের সন্ধান পাই। সেখানকার কালবৈশাখীর তাণ্ডবে আমি নিজের দুর্বার আকুতি প্রতিধ্বনিত হতে দেখি। সেখানকার পাখি ও ফুলে আমার আত্মা ধ্বনিত সৌরভিত হয়ে উঠে; সেখানকার হাওয়ায় আমার ছেলে ঘুম পাড়ানি গান শুনতে পাবে। সেখানে আমার অস্তিত্ব পৃথক, নিবিড়, অন্তরঙ্গ।

> কিন্তু তাই বলে সমগ্র অতীতের ও ইতিহাসের বৃহত্তর বাঁধন থেকে নিজকে বিচ্ছিন্ন করবার মূর্খ চেষ্টা আমি করবো কেন। অন্তরঙ্গ উষ্ণভাবে পৃথক হয়েও আমি অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। (আবু রুশ্‌দ্‌ ২০০০ : ৪৮৪)

মানুষ গতিশীল প্রাণী। তার স্থায়ী কোনো আবাস নেই। এই পৃথিবীই তার ঠিকানা। তাই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কারণে, বিভিন্ন প্রপঞ্চের কারণে সে হয়ে ওঠে কোনো একটি রাষ্ট্রের বাসিন্দা। এর মধ্য দিয়ে তার জীবনকে যাপন করতে হয়। আর যাপিত জীবনের নানা কার্যকারণের মধ্য দিয়ে সেই সময় ও সমাজকে পাঠ করা যায়। ব্যক্তি কামালের মধ্য দিয়ে অঙ্কিত হয় পূর্ব পাকিস্তানের নতুন শহরের নগর হয়ে ওঠা, তার হোঁচটখাওয়া ও বেড়ে ওঠা, হঠাৎ-পুঁজির আগমনে সরকারি চাকরিজীবী-ব্যবসায়ীদের স্খলন; একই সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানি তথা অবাঙালিদের দ্বারা বাঙালিদের শোষণচিত্র ও অবাঙালিদের সঙ্গে তাল মেলানোর নামে তাদের বশ্যতা স্বীকার করা। এ আরেক ঔপনিবেশিক বাস্তবতা। একে চিহ্নিত করা হয় আধা-ঔপনিবেশিক শাসন বা নব্য ঔপনিবেশিকতা হিসেবে। পাকিস্তান শুরু থেকে শোষণমূলক পুঁজিবাদকে যে সমর্থন দিয়েছে, তারই ফলাফল হিসেবে করিম, খলিল, আলমগীরদের ভোগবাদী জীবনচিত্র দেখা যায়। আর এভাবে শোষণপ্রক্রিয়া, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি অব্যাহত থাকে সর্বত্র। তাই স্বল্প সংখ্যক মানুষকে সুবিধার আওতায় এনে সাধারণ মানুষকে শোষণ করাটাও সহজ হয়ে যায় পশ্চিমের অবাঙালি পাকিস্তানিদের।

যে স্বপ্ন ও জীবনের প্রতি অসীম প্রত্যাশা নিয়ে কামাল পিতা-মাতা-ভাই-বোন এবং আজন্ম চেনা শহর নিজের শহর কলকাতাকে ত্যাগ করে ঢাকায় আসে উপন্যাসের শুরুর কাহিনিভাগে, পুরো উপন্যাসের ঘটনাক্রমে দেখা যাবে স্বপ্নভঙ্গের একেকটি পর্ব। শেষ পর্যায়ে কামালের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামো, প্রশাসনকাঠামো ও সমাজবিন্যাসের বিনষ্টির চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। পাকিস্তানি বোধের চেয়ে প্রবল হয়ে উঠতে থাকে বাঙালিত্বের বোধ। এই বোধ নিছক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন বা আবেগজাত নয়; অনেকগুলো স্তর, দ্বন্দ্ব-আঘাত মোকাবিলা করে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতাকে স্বীকার করে তার এই রূপান্তর।

পুরো উপন্যাসের পটভূমি সাতচল্লিশ-পরবর্তী পূর্ববাংলার ঢাকা ও খানিকটা কলকাতা। কিন্তু এই উপন্যাসে সাতচল্লিশ-পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্রিয়াশীলতার কোনো অভিঘাত নেই। 'আবু রুশ্‌দের উপন্যাসে ইতিহাস চেতনার আড়ালে যে ক্ষেদোক্তি থেকে তিনি কাহিনীর বয়ান শুরু করেন

সেখানে নিছক ইতিহাস বা রাজনীতি নয় চরিত্রই ব্যাখ্যায়ন করেন। গতিশীল কাহিনী বিন্যাসে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে শিল্পকে নির্মাণ করেন না লেখক।' (শহীদ ২০০৩ : ৭৯) আটচল্লিশ থেকে যে ভাষা আন্দোলন, দরিদ্র মোহাজেরদের আবাসন ও কর্মসংস্থানের সংকট, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, শ্রমিকবিক্ষোভ কোনো কিছুই এখানে উপস্থিত নেই। তাই পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে – অপেক্ষাকৃত সুবিধাভোগী এই শ্রেণি কি কেবল ঢাকার সঙ্গে অভিযোজন সক্ষমতার তৎপরতার মধ্যেই ব্যস্ত ছিল? তারা কি রাজনীতির সঙ্গে যোগ স্থাপনের কোনো প্রয়োজন অনুভব করেনি? শ্রেণি অবস্থানের কারণেই কি ওইসব সংকটের মুখোমুখি হতে হয়নি তাদের?

২.৪.২.২

শহীদুল্লা কায়সারের (১৯২৭-১৯৭১) *সংশপ্তক* (১৯৬৫) উপন্যাসে সাতচল্লিশ-পরবর্তী ঢাকার জনজীবনে ও মূল্যবোধের দৃশ্যমান কিছু পরিবর্তন আর্থসামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনকে নির্দেশ করে। উপন্যাসে গ্রামীণ গায়ক বালক মালুর জনপ্রিয় শিল্পী আবদুল মালেক হয়ে ওঠা, হুরমতি-লেকুদের আর্থিক দুরবস্থা, জাহেদের আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনীতির সঙ্গে সংযোগ নতুন পাকিস্তানের নতুন বাস্তবতার পরিচয় বহন করে। এর সঙ্গে পাকিস্তান সৃষ্টি হবার ফলে কোন শ্রেণিটি মূলত সুবিধাপ্রাপ্ত হয়েছে, তার শনাক্তিও এই উপন্যাসের শিল্পকাঠামোর মধ্যে আবিষ্কার করা যায়। এছাড়া ঢাকা শহরে নতুন নাগরিকতার স্বরূপ উন্মোচনে কখনো কখনো এর অকালপক্ব বিকৃতিচিত্র রূপায়ণের ক্ষেত্রেও ঔপন্যাসিকের সচেতন প্রয়াস লক্ষ করা যায়। নতুন রাষ্ট্রে একসময়ের মুসলিম লীগ কর্মী সচেতন মুসলমান যুবক সৈয়দপুত্র জাহেদের চিন্তাতেও আসে রূপান্তর। কারণ, যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে সে একসময় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তা অর্জিত হয়নি। বরং অবনমন ঘটেছে। তাই মালু যখন বলে – 'আজাদী তো হলো মেজো ভাই, এবার একটু বিশ্রাম নাও।' জাহেদ জানিয়ে দেয় নতুন সংগ্রামের কথা – 'বিশ্রাম কিরে? এখনই তো কাজের ধুম।' (শহীদুল্লা ২০১০ : ৩১৬) অর্থাৎ প্রকৃত আজাদি তথা মুক্তি আসেনি। 'জাহেদ চরিত্রের মাধ্যমে শহীদুল্লা কায়সার শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানের আত্মরূপান্তরের ইতিহাস বিবৃত করেছেন। বাস্তবের অভিঘাতে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবাদী জাহেদের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীতে রূপান্তর একটা দ্বন্দ্বময় অথচ বাস্তবসম্মত প্রক্রিয়ায় রূপায়িত হয়েছে।' (রফিকউল্লাহ ২০০৯ : ১৭০) অন্যত্র জাহেদকে খুঁজতে গিয়ে মালু জানতে পারে – জাহেদের পিতা সৈয়দ সাহেব 'পাকিস্তানের বদৌলতে ধাঁই ধাঁই করে উপরে উঠেছেন, আড়াই বছরে তিনটি পদোন্নতি পেয়েছেন।' (শহীদুল্লা ২০১০ : ৩১৪) কিন্তু পুত্রের সরকারবিরোধী রাজনীতি-সংশ্লিষ্টতার কারণে সে আরও ওপরে ওঠার সুযোগবঞ্চিত হচ্ছে। জাহেদকে সন্ধানের সূত্রেই জাহেদের বোন আরিফার বাসায় গিয়ে আরিফার পুত্রের কাছে জানতে পারে,

ইঞ্জিনিয়ার বাবা কীভাবে একের পর এক ঢাকা শহরে নিজের বাড়ি বানিয়ে চলছে। ছেলেটিও পিতার বাড়ি তৈরির প্রক্রিয়া সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। এভাবেই সদর্থক মূল্যবোধকে পিষে ফেলে গড়ে উঠতে থাকে নতুন রাজধানী, নতুন নগর ঢাকা।

হঠাৎ নাগরিক হয়ে ওঠার চেষ্টায় ঢাকার উঠতি মধ্যবিত্তদের মধ্যে শিল্প-সাহিত্যের প্রতি আকস্মিক আগ্রহও দেখা যায়। মালুর জনপ্রিয়তা ও বিভিন্ন আয়োজনে আমন্ত্রণ তার একটি দৃষ্টান্ত। কিন্তু আত্মসত্তা সম্পর্কে সচেতন না থাকার ফলে শিল্পের প্রতি এই আগ্রহের কোনো শক্ত ভিত তৈরি হয় না। ফলে অল্পকাল পরেই ফাঁপা নাগরিকতার মধ্যে তার পতন ঘটে। মালুর প্রতি রিহানার প্রণয় প্রকাশের আতিশয্য এবং হঠাৎই নিষ্প্রভ হয়ে যাওয়ার বিষয়টিকেও দুর্বল ভিতের নাগরিক সংস্কৃতিকে নির্দেশ করে। মালুর সঙ্গে পরিচয়ের আগে ব্যক্তি-রিহানার কোনো পরিচয়ও তেমনভাবে জানা যায় না। তবে 'রিহানা' এই নামকরণ থেকে তাকে পশ্চিমবঙ্গ-আগত মুসলমান বলে অনুমান করা যায়। কারণ পূর্ববঙ্গের হলে নামটি অনায়াসে 'রেহানা' হয়ে যেত। এভাবেই পূর্ববাংলার ভোগবাদী মধ্যবিত্তের একটি চিত্র পাওয়া যায় *সংশপ্তক* উপন্যাসে।

বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদ নির্মাণ প্রক্রিয়ার *সংশপ্তক* উপন্যাস একটি অর্গ্যানিক আলেখ্য। এখানে জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার স্তরগুলোর রূপায়ণে শিল্পসিদ্ধির পরিচয় আছে। ইতিহাস ও রাজনীতির সঙ্গে মিশেছে শিল্পীর দায়বদ্ধতা। এর গ্রহণযোগ্য পরিপ্রেক্ষিত নির্মাণে ঔপন্যাসিক গ্রামপ্রধান পূর্ববাংলার গ্রামীণ পটভূমিকে নির্বাচন করেছেন। 'বিভাগ-পূর্ব থেকে পরবর্তী পর্যন্ত বিস্তৃত কালপ্রবাহে পূর্ববঙ্গে বাঙালি মুসলমান অধ্যুষিত গ্রাম-সমাজ যে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে, শহীদুল্লা কায়সার তার একটা বিশ্বস্ত পরিচয় আমাদের দেয়ার চেষ্টা করেন।' (মহীবুল ২০০২ : ১২৬) এর সঙ্গে রাজনৈতিক গতিপ্রবাহ যুক্ত হয়েছে কালের অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে। জাহেদের পাকিস্তান-আন্দোলনের পশ্চাতে যেমন ছিল একটি সুদীর্ঘ পরিপ্রেক্ষিত, তেমনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রত্যাশাভঙ্গের বেদনা, শোষণহীন রাষ্ট্র অর্জন করতে না পারা তাকে আবারও নতুন সংগ্রামের দিকে ধাবিত করে। যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য এত সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ স্বীকার করেছে জাহেদরা, স্বাধীন পাকিস্তানে গণমানুষের জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে কারাবরণ করতে হচ্ছে তাদের। জাহেদের মতো শিক্ষিত ও প্রগতিমুখী সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক রূপান্তরের বয়ানও নির্মিত হয় সংশপ্তকের মধ্য দিয়ে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য:

> আজকের যে উচ্চশিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্তের প্রতিনিধিবর্গ পূর্বপাকিস্তানী জীবনের সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ অংশ অধিকার করে আছে, যাদের আকাঙ্ক্ষা বাসনা প্রত্যহ অন্তহীন সম্ভাবনার নব নব দিগন্ত উন্মোচনে ব্যস্ত, তাদের

চেতনা তলদেশ কোন্ অলক্ষ্য সূত্রে, স্থূলতা, কার্যত দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কারে জর্জরিত গ্রাম জীবনে বর্তমান ও অতীতের সঙ্গে সহস্র শিরা-উপশিরার নিকটতম আত্মীয়তার বন্ধনে সুদৃঢ়রূপে গ্রথিত সেই সত্যই যেন লেখক 'সংশপ্তকে' উদ্ঘাটিত করতে তৎপর হয়েছেন। (মুনীর ১৯৮৫ : ১৫৩)

এই উপন্যাস তার কালের ব্যাপ্তি ও জীবনায়নের গভীরতায় বাংলা জনাঞ্চলের জাতীয়তার ধারণাকে শিল্পরূপ দিতে পেরেছে। কেবল একক জাহেদের চিন্তা-দর্শন বা রূপান্তরই এর মূল অন্বিষ্ট নয়। উদার মানবতাবাদী সেকান্দর মাস্টার, স্বকৃত বিকাশশীল ও সাবলম্বী রাবু, নিম্নবর্গের লেকু-হুরমতি কিংবা লুম্পেন থেকে পুঁজিপতিতে পরিণত হওয়া রমজানের মাধ্যমে, বলা যায় বহুমুখী চিন্তার মিথস্ক্রিয়ায় ওইকালের ব্যক্তিরূপটি উন্মোচন করা গেছে। আবার, সৈয়দবাড়ি মিয়াবাড়ির সম্পর্ক ও দ্বন্দ্ব, তালতলি-বাকুলিয়ার জীবনযাপন ও জীবনমান, সামন্ত আধিপত্য ও ক্ষয়িষ্ণুতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে রাজনীতির অভিঘাতে গ্রামীণ জীবনে তার প্রতিক্রিয়া রূপায়ণের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক আবহমান বাংলার সমাজ জীবনে রাজনীতির ক্রিয়াশীলতা নির্মাণ করেছেন। ''৫২ সালের গণঅভ্যুদয়ের প্রস্তুতি হিসেবে শুধু '৪৭ থেকে '৫১ নয়, এর আগেও যে একটা অন্তঃশীল যুগ গড়ে উঠেছিল তারই ঘটনা পরিক্রমার ভিত্তিতে রচিত 'সংশপ্তক'।' (রণেশ ২০১২ : ১৩২) এমন সময়ে শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৭-১৯৭১) এই উপন্যাসটি রচনা করেছেন, যখন পাকিস্তানে আইয়ুবি কালো দশক বিরাজমান, বাকস্বাধীনতা, গণতন্ত্র, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সামরিক শৃঙ্খলে বন্দি। 'সামরিক শাসকপুষ্ট পাকিস্তানে আইয়ুবের কারাগারে বন্দি থেকে লেখক যে উপন্যাস রচনা করেন তা আসলে তথাকথিত দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত পাকিস্তানের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা অসাম্প্রদায়িক বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের পটভূমি।' (শহীদ ২০০৩ : ৭৪) অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির সঙ্গে শহীদুল্লা কায়সারের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। সাতচল্লিশপূর্ব কালে 'এশিয়া-আফ্রিকার অগণিত মানুষের উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন এক উল্লেখযোগ্য কণ্ঠস্বর। বঞ্চিতদের জন্য, গরীব-দুঃখী মানুষের জন্য তিনি আন্দোলনে অংশ নেন। কলকাতার কলেজ স্কোয়ার, ধর্মতলা স্ট্রীট, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ছাত্র-মিছিলের পুরোভাগে থেকে তিনি মিছিল পরিচালনা করতেন। ঢাকাতেও প্রতিটি জনসভায়, শোভাযাত্রায় ও গণসমাবেশে তাঁর উপস্থিতি প্রেরণা জোগাত।' (গোলাম সাকলায়েন ১৯৮১ : ৮-৯) সাতচল্লিশ-পরবর্তীকালে পিতার কর্মস্থল পরিবর্তনসূত্রে ঢাকায় এসেও তিনি বামপন্থি রাজনীতিতে সক্রিয় হন। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ায় তাঁকে আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনীতি করতে হয়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের শুরু থেকে তাঁর ছিল প্রত্যক্ষ ভূমিকা; এরজন্য কারবরণও করতে হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য:

শহীদুল্লা কায়সার '৪৮ থেকে '৭১ মধ্যে ৮ বছর জেলে কাটিয়েছেন এবং বাদবাকী সময়েও সদাসক্রিয় কমিউনিস্ট রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে বিভিন্ন ধরনের কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন। তাঁর ৪৫ বছরের

> জীবনে কৈশোরেই তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রগতিবাদী চিন্তা ও কাজের অনুসারী ছিলেন। (রণেশ ২০১২ : ৫৫৫)

এর সঙ্গে যুক্ত হয় ঔপন্যাসিকের মুসলিম পরিবারের আভিজাত্য এবং একই সঙ্গে আধুনিক শিক্ষাগ্রহণজনিত মূল্যবোধ। রাজনৈতিক প্রতীতির দিক থেকে তিনি বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজগতি ও রাজনৈতিক রূপান্তরকে দেখেন। *সংশপ্তকে*র ঘটনাক্রম ১৯৫২ সালের কিছু আগে থেমে গেলেও ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে, বাঙালি মুসলমানের ধারাবাহিক অভিযাত্রার কার্যকারণ হিসেবে ব্যক্তিমনন ও সমাজবিন্যাসের মধ্যে রাজনৈতিক অভিঘাতকে চিহ্নিত করেন ঔপন্যাসিক।

২.৪.২.৩

সাতচল্লিশ-পরবর্তী পূর্ববাংলার জনজীবনে যে অস্থৈর্য, প্রত্যাশাবঞ্চনা, নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার বৈষম্য বিরাজমান ছিল তারই শিল্পভাষ্য হয়ে উঠেছে সরদার জয়েনউদ্‌দীনের (১৯১৮-১৯৮৬) *বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ* (১৯৭৫) উপন্যাস। *অনেক সূর্যের আশা*র স্বাধীনতার স্বপ্ন ও মুক্তিকাঙ্ক্ষা মুখ থুবড়ে পড়ে *বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ*য়ের সময়পরিধির বিন্যাসে। দুই উপন্যাস দুই কাল ও কালের রাজনৈতিক গতিপথ ধারণ করে পূর্ববাংলার জনমানসের অখণ্ড সংগ্রামী চেতনার অন্তর্গত কালগত রূপান্তরকে নির্দেশ করে। সংগ্রামী চেতনা অখণ্ড হলেও শাসকশক্তির পরিবর্তনে সংগ্রামের গতিমুখ নতুনভাবে নির্ধারণ করে এই অঞ্চলের জনমানুষ। কোনো তত্ত্বের শেকল তাকে বাঁধতে পারে না। 'বহুমুখী বঞ্চনার মধ্য দিয়ে বাঙালিরা এ-সত্য অনুধাবনে সক্ষম হয় যে, দেশ-বিভাগই প্রকৃত মুক্তি নয়, মুক্তির বীজমন্ত্র নিহিত রয়েছে একটা শোষণহীন সমাজব্যবস্থায়। প্রতিরোধ আর সংগ্রামের মাধ্যমেই কেবল এ-রকম সমাজ অর্জিত হতে পারে, এবং সত্যিকারভাবে শিক্ষিত ও আদর্শবাদী তরুণদের পক্ষেই এ-সমাজের গোড়াপত্তন সম্ভব।' (গিয়াস ২০১৯ : ১১৪) কিন্তু ঔপন্যাসিকের মতো তার প্রধান চরিত্র রহমত মধ্যবিত্তভুক্ত হওয়ায় সে নির্দ্বন্দ্ব থাকতে পারেনি। তার সঙ্গে অপরাপর চরিত্রসমূহের কখনো সমধর্মী আবার কখনো বিপরীতধর্মী তৎপরতায় যে বুননটি তৈরি হয়, তার মধ্যে ওই কালের রাজনৈতিক চারিত্র্যের মাত্রাগত সামূহিকতা প্রকাশিত হয়। সমালোচকের মতে – 'উত্তর-আজাদ বাঙালির সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রামাণ্য দলিল হয়ে উঠেছে বর্তমান উপন্যাসটি।' (ফজলুল ২০০৮ : ১৭১) উপন্যাসে ব্যক্তির চেয়ে ওই কালের রাজনীতি হয়ে উঠেছে গতিনিয়ন্ত্রক। তাই উপন্যাসে তৎকালের প্রাধান্য প্রত্যক্ষভাবে দৃশ্যমান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য:

> আলোচ্য সময়কালে সামাজিক-রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতিতে বাঙালি জীবনে আত্মসন্ধান, সত্তাসন্ধান ও জাতিসত্তাসন্ধান প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। ... স্বাধীনতা-পূর্বকালে ঔপনিবেশিক শোষণ-নিপীড়ন ও সামরিক

শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও প্রতিবাদের মাধ্যম হিসেবে যে পুরাণ-ইতিহাস ও ঐতিহ্য-আশ্রয়ী উপন্যাসের উদ্ভব হয়েছিল, এ পর্যায়ের ঔপন্যাসিকরা নতুন তাৎপর্যে সে ধারায় পরিভ্রমণ করেন। সময় ও সমাজের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে শক্তিসঞ্চয়ের রূপায়ণ সরদার জয়েনউদ্‌দীনের *বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ*। (রফিকউল্লাহ ২০০৩ : ৫২-৫৩)

সময়ের সামূহিক অস্থিরতা ক্রিয়াশীল থাকে উপন্যাসের চরিত্রসমূহের মনস্তত্ত্বে ও জীবনায়নে। একসময়ের মুসলিম লীগ কর্মী পাকিস্তান-আন্দোলনে নিবেদিত সাংস্কৃতিক কর্মী কলিমের সাতচল্লিশ-পরবর্তী কালপর্বে অঙ্কিত ছবিও আর কোনো নিটোল সরল-স্নিগ্ধ ছবি থাকে না। হয়ে ওঠে সময়ের অস্থৈর্যের প্রতিরূপ। শিল্পী হওয়ার কারণেই বোধহয়, জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্বের ফাঁক অপরাপর চরিত্রদের মধ্যে সে-ই প্রথম শনাক্ত করতে পারে। তাই জিন্নাহর উদ্দেশেও ব্যঙ্গ-শ্লেষ করতে পিছপা হয় না। বাঙালি মুসলমান যে ছিন্নমূল বৃক্ষে রূপান্তরিত হতে চলেছে, তার জন্য সে দায়ী করে জিন্নাকেই। যদিও কলিম পূর্ববর্তী বছরগুলোতে পাকিস্তান-আন্দোলনের একজন নিবিষ্টপ্রাণ কর্মী হিসেবে কাজ করে গেছে। আশাভঙ্গের চিত্রও সে দ্রুত দেখতে পেয়েছে। এসব কার্যকারণ অনুধাবন সত্ত্বেও বাঙালি মুসলমানের মন তখন পর্যন্ত জিন্না-প্রীত। জিন্নার বদৌলতে তারা পেয়েছে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা। সেই ব্যবস্থা প্রত্যাশা মাফিক হয়নি ঠিক, জীবনকে ঠেলে দিয়েছে আশ্রয়হীনতার দিকে; কিন্তু তারপরেও জিন্নার বিরুদ্ধে কটূক্তি শুনতে শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান অপারগ। কলিমের কটূক্তির জবাবে রহমত উচ্চারণ করে:

জিন্না সাহেবের বিরুদ্ধে কটূক্তি শুনে রাগ সামলাতে পারিনে, বলি কলিম তোমার মুখে এ সব কথা শোভা পায় না, যা বলেছ–বলেছ, ভবিষ্যতে আর এ রকম কথা উচ্চারণ করো না। সাবধান, মুসলমান জাত তোমার এসব কথা সহ্য করবে না। (সরদার ১৯৭৫ : ২১)

রহমতের মতো শিক্ষিত মুসলমান বাঙালিদের এই আবেগ প্রবণতাকে যতীন সরকার অভিহিত করেছেন 'পাকিস্তানি মৌতাত' হিসেবে। (২০১৩ : ১০৪)

বিভাগ-পরবর্তী বাস্তবতায় ঢাকা প্রস্তুত ছিল না এত উদ্বাস্তু মানুষকে স্বাগত জানাতে। তাই কলিম-রহমতদের অনিবার্যভাবে মুখোমুখি হতে হয় আরেক সংগ্রামের। কলকাতার ৫/২ পাটোয়ার বাগান লেন থেকে ঢাকার ছত্রিশের পাঁচ র‍্যানকিং স্ট্রিট : বাঙালি মুসলমানের আরেক সংগ্রাম। এই সংগ্রাম অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামই তাদের জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের দিকে ধাবিত করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর আঘাত। এটি যে-কোনো ঔপনিবেশিক প্রকল্পেরও বৈশিষ্ট্য। বাংলা ভাষার ওপর আরবি-ফারসি-উর্দুর প্রাধ্যান্য আরোপের চেষ্টা। আরবি-ফারসির সঙ্গে বাংলা ভাষা ও বাঙালির সম্পর্ক ঐতিহাসিক। কিন্তু পাকিস্তান আমলে এই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা

আরোপণমূলক ও আধিপত্যবাদী। ফলে ভাষার প্রশ্নে জনগণের সচেতনতার সঙ্গে সার্বিক আর্থরাজনৈতিক অবস্থানের সম্পর্ক।

অনেকগুলো শ্রেণিচরিত্রের উপস্থিতি ঘটেছে *বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ* উপন্যাসে। তাদের প্রতিনিধিত্বশীল অবস্থান দিয়ে সময় ও পরিস্থিতিকে তারা বুঝতে চেয়েছে। এর ফলে ওই সময়ের একটি বড় চিত্র উপন্যাসে দেখা যায়। 'সরদার জয়েনউদ্‌দীন কিছু চরিত্রের আধারে একটি সময়ের চালচিত্রকেই উপন্যাসে তুলে আনেন, এক্ষেত্রে যতটা না কাজ করেছে তার শিল্পদৃষ্টি তার চেয়ে বেশী সক্রিয় তিনি কালচিহ্নিত ইতিহাসের ঘটনাকে বিধৃত করতে।' (শহীদ ২০০৩ : ৯৫) এই উপন্যাসে কেবল ভাষার প্রশ্নকে একক ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি। জনজীবনের সার্বিক আর্থরাজনৈতিক জিজ্ঞাসার অংশ হিসেবে ভাষার প্রশ্নটি এসেছে। তৎকালীন সময়ে বিভিন্ন শ্রেণির মনস্তত্ত্বও প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, রহমত নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। তার চরিত্রে ধরা পড়ে দোদুল্যমানতা। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হলেও তা বাস্তবায়নে যে ত্যাগ সইতে হবে, তাতে মন সায় দেয় না। এটিই তৎকালীন নাগরিক মধ্যবিত্তের মানসপ্রবণতা। এমনকি স্বাধীনভাবে সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রেও সরকারের দমনমূলক মানসিকতাকে আমলে নিয়ে নিজেকে নিরাপদে রাখতে চায় – সে কেবল ভাবে আর দেখে।

সুজিত বামপন্থি কর্মী। সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল পরিস্থিতিকে সে মার্কসবাদী শ্রেণিতত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা করে। জন্মগতভাবে হিন্দু ধর্মাবলম্বী হলেও কাজে ও চিন্তায় সে সকল ধর্মের শোষিত মানুষের পক্ষে কাজ করে, বক্তৃতা দেয়, কলাম লেখে, অন্যদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করে – এটি পূর্ববাংলার রাজনীতিরও একটি বৈশিষ্ট্য। ছমির লুম্পেন শ্রেণি থেকে পাকিস্তানপর্বে হয় নতুন রাজনৈতিক চেতনায় রূপান্তরিত। এই সেই ছমির মিয়া যে কলকাতার একবালপুর লেনের মেসে হেনার মার সঙ্গে অসদাচরণ করার জন্য মেস থেকে বিতাড়িত হয়েছিল, প্রতিশোধস্বরূপ হেনাকে প্ররোচিত করে ঘরছাড়া করেছিল, সম্ভোগ করেছিল এবং একসময় টাকার বিনিময়ে বিক্রিও করে দিয়েছিল। পাকিস্তান-আন্দোলনের কালে সে পরিণত হয়েছিল ওই আন্দোলনের অন্যতম 'সালারে'। দাঙ্গার বাস্তবতায় নির্মমতা ও রাজনৈতিক প্রহসনের যুগপৎ পরিচয় মেলে ছমিরের স্বীকারোক্তিতেই:

> কায়দা পেলেই দলে ভিড়ে ছোরা চালিয়েছি, আবার দিনের বেলা এতিম বাচ্চা এবং আহত মেয়েদের সেবা করার জন্য হাসপাতালে ডিউটিতে থেকেছি, খবরের কাগজে বিবৃতি দিয়েছি, দাঙ্গা বিরোধী বিবৃতি এবং কিভাবে গুণ্ডাদের হাত থেকে মা বোনদের জান প্রাণ সম্মান রক্ষা করেছি। (সরদার ১৯৭৫ : ২৮)

পাকিস্তান হবার পর আবার তাকে সক্রিয় দেখা যায় পূর্ববাংলার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে। সমাজের অপরাপর মানুষের মতো ছমিরও দোষেগুণে মেলানো মানুষ। কালের গতি ও রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ তাকে রূপান্তশীল করে তোলে। পূর্ব পাকিস্তানে এসে তার আবাস হয় ঢাকার কমলাপুর বাজারের নিকটবর্তী এলাকায়। সঙ্গী হয় মরিয়ম পাঠক নাম্নী এক হোমিও চিকিৎসক – কলকাতা থেকে আগত ভাগ্যলাঞ্ছিতা। সেখানেই দেখা মিলবে হেনার মার সঙ্গেও। হেনার মা নিম্নবর্গের একজন মানুষ। কিন্তু অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সদা জগ্রত। সাতচল্লিশের আগে হায়াত খাঁ সঙ্গী হয়ে সে প্রথমে বামপন্থি আন্দোলন ও পরে পাকিস্তান-আন্দোলনে যুক্ত হয়। পাকিস্তান হবার পরে ঢাকায় এসেও সে মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে। রাষ্ট্রভাষা-কেন্দ্রিক আন্দোলনেও অবলীলায় যুক্ত হয়ে যায়। মূলত অধিকার আদায়ের চেতনাই হেনার মায়ের শক্তির মূল উৎস। এই শক্তি ও সাহস পরিস্থিতির ভিন্নতাকে মেনে নিয়ে একেক আঙ্গিকে প্রকাশিত হয়েছে। হেনার মায়ের সংগ্রাম মূলত শোষিত শ্রেণির একটি ধারাবাহিক আন্দোলন।

হাতেম (জামরুল) একসময় সংবাদপত্রে কাজ করত কলকাতায়, ঢাকাতে এসেও পত্রিকায় কাজ নেয়। কবি আলিম পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদে স্থির আস্থাশীল। জীবনযাপনের অসঙ্গতি, আবাসন-খাদ্য সবকিছুতে অপ্রাপ্যতা থাকলেও জিন্না-পাকিস্তান প্রশ্নে তখনও ভক্তিপ্রাণ। এজন্য কলিম তাকে ভর্ৎসনা করতেও ছাড়ে না। আলিম ছিল সেই শ্রেণিভুক্ত যারা 'অম্লান বদনে মেনে নিয়েছে, বাংলার মুসলমান পুরোপুরি মুসলমান নয়, আধা হিন্দু। সে কারণেই জিন্না সাহেবের ইঙ্গিতে অনেক বাংলা শব্দ আজকাল উর্দু আরবী ফারসী শব্দের গুঁতোয় বাংলা ভাষা থেকে পালাই পালাই করছে। জিন্না সাহেবের অতিভক্তরা 'তমুদ্দন' বলেন, 'সংস্কৃতি' বলতে চান না।' (সরদার ১৯৭৫ : ১৩৬) উপন্যাসের বয়ানেও তমুদ্দন শব্দের ব্যবহারকারীদের মানসপ্রবণতা স্পষ্ট করা হয়েছে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রথমপর্বে একসময়ের পাকিস্তান-আন্দোলনের কর্মীরাই সক্রিয় ছিল এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সঙ্গে পাকিস্তান-বিরোধিতার বদলে ছিল পাকিস্তান-সাপেক্ষ তৎপরতা, তা ইতিহাস-সমর্থিত। কিন্তু ঔপন্যাসিক এই তৎপরতাকে সরল অর্থে গ্রহণ করেননি। তাই যেমন জানিয়ে দেন : 'তমুদ্দন মহফিল নামে একটা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানও এরই মধ্যে গঠন করা হয়েছে। তাদের কাজই হবে যত সংস্কৃত শব্দ ভাষা থেকে ঝেঁটিয়ে বের করে আরবী ফারসী উর্দুকে ঠাঁই করে দেয়া।' (সরদার ১৯৭৫ : ১৩৬) তেমনি তাদের পরবর্তী সময়ের অবস্থানকেও চিহ্নিত করেন : 'তমুদ্দন মহফিল অধিকতর উর্দু শব্দ বাংলা ভাষার মধ্যে ঢুকানোর প্রচেষ্টার শপথ নিয়েছিল, তারা আবার বাংলা ভাষার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সোচ্চার হয়ে উঠেছে। বলছে, অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে মর্যাদা দিতেই হবে।' (সরদার ১৯৭৫ :

১৬৩) ইতিহাসের এইরূপ ধারাবাহিকতায় আলিমেরও চিন্তার রূপান্তর ঘটে। তবে এর কারণ ভাষাচেতনাগত নয়; বৈষয়িক কারণই মুখ্য। কারণ এক বিহারি তাকে তাঁর থাকার জায়গা দখল করে তাকে আশ্রয়চ্যুত করে। পুলিশকে ঘুষ প্রদান করার মাধ্যমেই এটা সম্ভব হয়। অর্থাৎ পরিস্থিতি ও অস্তিত্বের প্রয়োজনে আদর্শিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে।

উপন্যাসপাঠসূত্রে জানা যায়, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় অবাঙালি পশ্চিমারা সরকারি চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, কলকারখানা, ঠিকাদারি সবক্ষেত্রে সুবিধাপ্রাপ্ত হয়। পাকিস্তান-আন্দোলনের একসময়ের সক্রিয় ছাত্রনেতা মোদাচ্ছেরও সুযোগ বুঝে কন্ট্রাক্টারির ম্যানেজার হয়ে উপরি উপার্জন করতে ব্যস্ত হয়। এর পেছনে সে যুক্তি খুঁজে পায় যখন দেখে মূল অবাঙালি কন্ট্রাক্টর আরও বেশি পরিমাণ দুর্নীতিপরায়ণ। তখন 'লুটপাটের সময়'। মূলত একদিকে অভাব আর অন্যদিকে প্রশাসনিক নৈরাজ্য মানুষকে দুর্নীতিপ্রবণ করে তোলে। কিছুদিন পর দেখা যায় সেই মোদাচ্ছের পাঞ্জাবি কন্ট্রাক্টর দ্বারা প্রতারিতও হয়। ফলে এই প্রতারণার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে যায় এক জাতির সঙ্গে আরেক জাতির প্রতারণা ও আধিপত্যবাদী প্রবণতা। প্রতারিত হয়ে প্রবঞ্চিত হয়ে সেও উচ্চারণ করে:

> মুসলিম লীগ মুভমেন্ট করে কি করলাম। কেবল হাতখানাই কিছুটা অকেজো করেছি, অধিকতর লাভের মধ্যে কিছুদিন জেলের লফসীও টেনে এসেছি। এমনি এক সরকার প্রতিষ্ঠায় প্রাণপণে লড়লাম, যে সরকার লোকজনের সুখসমৃদ্ধি দেখা দূরে থাক, পেটের ভাত জুটানোর মতো সামান্য একটা চাকরি, মানে খেটে খেতে চাই, সে সংস্থান দেবার মতো সামর্থও তার নেই। (সরদার ১৯৭৫ : ১৫৯)

এমন পরিস্থিতির মধ্যেই মোদাচ্ছেররা সামনে পেয়ে যায় রাষ্ট্রভাষা-কেন্দ্রিক আন্দোলন। ফলে তারা সামূহিক অচলাবস্থা থেকে মুক্তির একটি উপায় হিসেবে গ্রহণ করে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে। তাই মোদাচ্ছের এক পর্যায়ে রহমতকে বলে, 'মনস্থির করে ফেলেছি, আবার আন্দোলনে নামব। বসে বসে আর ভালো লাগে না।' (সরদার ১৯৭৫ : ১৬৫) এভাবেই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন তার সীমাকে বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়। জাতীয়তাবাদের ধারণা আবিষ্কৃত হয়েছে আরও পরে। পশ্চিমবঙ্গ-ফেরত নিম্নবিত্ত মুসলমান যুবকদের রাজনৈতিক নেতা মনোয়ার জাহান চৌধুরী এক সময় তার র‍্যানকিন স্ট্রিটের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিল। সে-ও একসময় শাসকশক্তির সঙ্গে আপসের পথ বেছে নেয়। শোষণের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান বিচার কার্যকর থাকে না; শোষক নিজেই একটি শক্তিশালী শ্রেণি। জনপ্রিয় পত্রিকাগুলোও হয়ে ওঠে পুঁজিপতি ও শাসকগোষ্ঠীর দোসর। যেমন তৎকালে 'ওয়াতন' পত্রিকা আর তার সম্পাদক হীরু মিয়া সম্পর্কে রহমত-সুজিত-কলিমদের আলাপে উঠে আসে আপাত জনবান্ধবতার আড়ালে শোষকশক্তির সঙ্গে পত্রিকাওয়ালার গোপন আঁতাতের কথা। *অনেক সূর্যের আশায়* ছিল 'মুক্তি' পত্রিকার

কথা, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতো পাকিস্তান-আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে। অনুমান করা দুষ্কর নয় এই মুক্তি মাওলানা আকরাম খাঁ পরিচালিত 'আজাদে'র রূপক রূপ। সাতচল্লিশ-পরবর্তীকালে (১৯৪৮) 'আজাদ' ঢাকা থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করে। *বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ*তে অনুরূপ 'মুক্‌তি'র ঢাকা থেকে প্রকাশিত হওয়ার তথ্যের উল্লেখ আছে।

কবি রহমত আর চিত্রশিল্পী কলিম পূর্ববাংলায় ছিল অনেকটাই বেকার। পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামো এই শিক্ষিত যুবকদের সংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেনি। অলস সময়ে নতুন সমাজ তথা শোষণমুক্ত দারিদ্র্যমুক্ত সমাজের ছবি তারা আঁকতে থাকে; কেউ কাগজে, কেউ চিন্তনে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তখনও রহমত শোষণহীন সমাজের রূপকল্পের সঙ্গে জিন্নার রাষ্ট্রভাবনার সাযুজ্য অনুভব করে, বলে : 'জান কলিম, জিন্না সাহেব কিন্তু এই সমাজের কথাই ওয়াদা দিয়ে বলেছিলেন। বলেছিলেন, পাকিস্তান হবে এমন এক দেশ, যে দেশে শোষণ থাকবে না, থাকবে না মানুষে মানুষে ছোট বড় ভেদাভেদ ধর্মে ধর্মে কোনো পার্থক্য।' (সরদার ১৯৭৫ : ১২৮) কিন্তু বরাবরের মতো কলিম তা গ্রহণ করতে পারে না। কলিমের মতো পূর্ববাংলার জনগণও অচিরেই দেখে জিন্নাহ ও তাঁর অনুগামীদের অগণতান্ত্রিক রূপ, কথার বরখেলাপ। তাই বাস্তব অবস্থার নিরিখে কলিম উচ্চারণ করতে পারে : 'পাকিস্তান তো হয়ে গেছে আজ কতদিন, জনসাধারণের অবস্থা দেখতে পাচ্ছ! গরীব থেকে আরও গরীব হচ্ছে। আর বড়রা বিশেষ করে পশ্চিমা পাইকার গোষ্ঠী কেমন ফেঁপে উঠছে দিনরাত।' (সরদার ১৯৭৫ : ১২৯) ঢাকা শহরেও রেললাইন ঘেঁষে দরিদ্র রিফিউজিরা ঝুপড়ি ঘরে অনাহারে, রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে দিন গুজরান করে। পুলিশ আবার তাদের উচ্ছেদ করেছে, লাঠিপেটাও করেছে। তাদের আহাজারি থেকেও পাকিস্তান ধারণার অকার্যকরতা প্রকাশিত হয়:

> এজন্যেই বুঝি আমরা পাকিস্তানের জন্যে লড়েছিলাম। কলকাতায়-বিহারে জান দিয়েছিলাম। হিন্দুস্তানে তারা বাড়ী ঘর পুড়িয়ে দিল, জানে মারলো, এখানেও পুলিশ লেলিয়ে মাথা গুঁজবার ঝুপড়ি ভাঙছো, পিটিয়ে মারছো। আমরা এখন কোথায় যাই। (সরদার ১৯৭৫ : ১২৯)

এক গৃহহারা সর্বস্বহারানো বৃদ্ধার কণ্ঠে উচ্চারিত হয় তীব্র ক্ষোভ : 'কোথায় সে গোলামের বেটা জেন্না, আমার নাত ছেলেটো ন্যাশনাল গাডে নাম লেখায়া মারলি, আর এখন আমায় মারবি?' (সরদার ১৯৭৫ : ১২৯) মধ্যবিত্তের মুখ দিয়ে সম্ভব না হলেও অন্তত উন্মুলিতের মুখ দিয়ে এই উচ্চারণের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিকের অভিপ্রায় বোঝা যায়। বরং মধ্যবিত্ত রহমত বৃদ্ধার এই উচ্চারণের কার্যকারণ তলিয়ে দেখতে আগ্রহী না হয়ে জিন্নার প্রতি বৃদ্ধার অনৌচিত্যবোধের সমালোচনা করে। ঔপন্যাসিক ওই কালের বাস্তবতা নির্মাণে প্রথমেই কোনো মীমাংসায় আসতে চাননি। শ্রেণির অবস্থানকে আগে বাস্তবতা

দিয়ে, কখনো কখনো আবেগের বাস্তবতা দিয়ে নির্মাণ করতে চেয়েছেন। এরপর শ্রেণির আক্রান্ত হবার ঘটনাক্রমে শ্রেণির প্রতিবাদী অবস্থানকে চিত্রিত করতে চেয়েছেন। যে মধ্যবিত্ত তার আওতাসীমার মধ্যে বসবাসকারী নিম্নবর্গের হাহাকার বুঝতে অক্ষম, জিন্নার প্রতি বিনয়াবনত, সে-ই ঘরে বসে স্বপ্ন দেখে দারিদ্র্যমুক্ত সমাজের। এর মধ্য দিয়ে তৎকালীন মুসলমান যুবকদের প্রতি একধরনের কূটাভাষও নির্মিত হয়েছে।

অন্যদিকে কলিম তার শিল্পসত্তায় অনুভব করে ধর্মতন্ত্রের ভিত্তিতে সৃষ্ট অদ্ভুত রাষ্ট্রকাঠামোকে। সে তার অঙ্কিত ছবির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে সময়ের সামূহিক সংকটকে:

> কলিম গত রাতের সেই দানবের ছবিটার গায়ে রঙ চাপাচ্ছে। এরই মধ্যে দানবটার পেছনে লিকলিকে যাদুকর চেহারার একটা লোক আঁকা হয়ে গেছে, যার হাতে উঁচিয়ে ধরা আছে যাদুর কাঠির মতো একখানা ছড়ি, একচোখে চশমা, তা থেকে কালো ফিতে ঝুলছে, স্মার্ট পোশাকে সাজানো লোকটার গলায় বো বাঁধা। (সরদার ১৯৭৫ : ১৪৫)

এই বর্ণনা থেকে স্পষ্টতই দানবরূপী ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্র ও তার কাণ্ডারি সেই লিকলিকে জিন্নাকে শনাক্ত করা যায়। কলিমদের মতো তরুণ শিল্পীসমাজ পাকিস্তান রাষ্ট্রের গলদকে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই চিহ্নিত করতে পেরেছিল। শুধু ছবি আঁকার মাধ্যমেই নয়, বৈষম্যমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সে দিনরাত সময় দিয়েছে, পোস্টার লিখেছে, সেগুলো সাঁটিয়েছে। পাকিস্তানপর্বের পরবর্তী সকল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে কলিমদের মতো শিল্পীদের ভূমিকাও ছিল অগ্রণী। কলিমরা পাকিস্তানবাদী আদর্শের ফাঁপাসত্তাকে আবিষ্কার করতে পেরেছিল তৎকালীন জীবনযাপনের অসংগতি ও বৈষম্যের বাস্তবতা থেকে, কোনো আরোপিত তত্ত্ব থেকে নয়। সে যখন পাকিস্তান-আন্দোলনে যুক্ত ছিল, সেটাও তার কালের বাস্তব পরিস্থিতির ভিত্তিতেই। ফলে কলিমদের রূপান্তর কালের সাক্ষ্য বহন করে। এই রূপান্তর প্রক্রিয়ার একটি পর্যায়ে এসে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সঙ্গে পরিচিত হয় এই অঞ্চলের মানুষ। এটি মূলত পরিণত রূপ লাভ করেছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, বৈষম্যের বিরুদ্ধে ক্রমাগ্রসর প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সমষ্টিরূপ হিসেবে।

ইতিহাসের অনেক চরিত্র হুবহু উপন্যাসেও স্থান করে নিয়েছে। যেমন এসেছে তমুদ্দন মজলিস ও ভাষা আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা আবুল কাসেম, শেখ মুজিবুর রহমান, তোয়াহা, অলি আহাদ, শওকত আলী, সরদার ফজলুল করিম, তাজউদ্দীন আহমদের নাম। কলিমের মাস্টার সাহেবের মধ্য দিয়ে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের মুখাবয়ব বোঝা যায়। কিছু পত্রিকা পরিবর্তিত নামে এলেও সেসবের

কর্মকাণ্ড ও আদর্শিক অবস্থান অনুসারে সেগুলোকে চিনে নেওয়া দুষ্কর নয়। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চে সংঘটিত ধর্মঘট পালন, জিন্নার ঢাকায় আগমন – এসব সবিস্তারে আছে। ভাষার প্রশ্নে ঢাকা শহর উত্তপ্ত হতে থাকে। সরকারি কর্মচারী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষও এই উত্তাপে সামিল হতে থাকে। পুরান ঢাকার কুট্টিদের সরকার ব্যবহার করে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও কুট্টিদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে প্রায়শ। ভাষা আন্দোলনের মতো রাজনৈতিক বিষয়কে তৎকালীন সরকার সাম্প্রদায়িকীকরণেরও চেষ্টা করে। ভাষা আন্দোলনের কর্মীদের 'পাকিস্তান ধ্বংসের এজেন্ট' বলার পাশাপাশি 'হিন্দুদের চর' অপবাদ দেওয়ার চেষ্টাও হয়েছে। ছাত্রদের ওপর পুলিশি দমন-পীড়ন, উত্তেজনা, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান, সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের দলে হিন্দু ছাত্র দেখে জিন্নার উষ্মা প্রকাশ প্রসঙ্গগুলো উপন্যাসের আধারেই খাপ খেয়ে ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলনে আহতদের চিকিৎসাপ্রদানের নিমিত্তে কমলাপুরের মরিয়ম পাঠকের ডিস্পেনসারি পরিণত হয় ছোটখাটো হাসপাতালে। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররাও এই কর্মযজ্ঞে যুক্ত হয়। এমনই পরিস্থিতিতে উপন্যাসের কথক প্রশ্নশীল হতে বাধ্য হয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা নিয়ে। পরিস্থিতিগত কারণেই জিন্নাপ্রীত রহমতের মনে জিন্নার প্রতি ঘৃণা জন্মাতে থাকে। জিন্না জাতির পিতা হিসেবে যে অগাধ শ্রদ্ধার অর্জন করেছিল, রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে তার একপাক্ষিক, সাম্প্রদায়িক ও অগণতান্ত্রিক অবস্থান তা থেকে বিচ্যুত করে। গণতান্ত্রিক দাবিকে উপেক্ষা করে সে বুর্জোয়া শ্রেণিস্বার্থকে গুরুত্ব দিয়েছে বলেও রহমত মনে করতে থাকে। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনকেও সে বাংলার জনগণের শত্রুজ্ঞান করতে শুরু করে।

উপন্যাসের বয়ানে স্পষ্টত শোনা যায় ঔপন্যাসিকের জাতীয়তাবাদী উচ্চারণ। এই উচ্চারণের বিকাশ ষাটের দশকে সম্পন্ন হলেও বাংলাদেশ-পর্বেই এর সনাম-প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। পঞ্চাশের ভ্রূণাবস্থা থেকেই এই চেতনার জন্ম; কিন্তু ওই কালে বাংলাদেশের বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রকাশ্য রূপ পায়নি। যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের সঙ্গে যুক্ত শরফুদ্দিন প্রকাশ্যেই বলে:

> পাকিস্তান নামক স্বপ্নের মধ্যে বাংলাদেশ ছিল না। বাংলার মুসলমান ওদের ধর্মীয় ভাই, সে কথা ভাবেনি প্রথমে। পাকিস্তান শব্দটার জন্ম পাঞ্জাব, কাশ্মীর আর বেলুচিস্তান নিয়ে। আমরাই ধর্মীয় ভাই সম্বন্ধ নিয়ে পরে পেছন দরজা দিয়ে ঢুকে পড়েছি। পেছন দরজা দিয়ে যেমন ঢুকেছি তেমনি পেছনেই থাকতে হবে। (সরদার ১৯৭৫ : ১৫৫)

সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনাতেও ধর্ম ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য ও সম্পর্ক বিষয়ে শিক্ষার্থীরা যে সচেতন, তারও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় শরফুদ্দিনের উচ্চারণে : 'সংস্কৃতি ধর্মীয় কোন কিছু নয়। সেটা স্থানিক বা ভৌগোলিক ব্যাপার। ধর্মীয় আচরণ-বিধিকে যারা সংস্কৃতি বলে, তাদের বিশ্ব বড় ক্ষুদ্র।' (সরদার ১৯৭৫ : ১৫৫)

ঔপন্যাসিকের জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ অনুসারে সাংস্কৃতিক আন্দোলন করা প্রয়োজন শিল্পসাহিত্যের মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছানোর জন্য।

তরঙ্গক্ষুব্ধ ঢাকা থেকে রহমতের গ্রামে প্রত্যাবর্তন ওই কালের আরও কিছু বাস্তবতার মুখোমুখি করে পাঠককে। রহমতের মধ্যবিত্তসুলভ মন পুরোপুরি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের তাত্ত্বিক বিষয়ে অভ্যস্ত হতে হয়তো প্রস্তুতও ছিল না। এছাড়া ১৯৪৮ থেকে ১৯৫১ এই সময় পরিসরে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন খানিকটা স্তিমিতও হয়ে পড়ে। কিন্তু জনঅধিকারের সংগ্রাম থেমে থাকেনি। তারই অগ্নিরূপ দেখা যাবে বায়ান্নোর ফেব্রুয়ারিতে। কিন্তু এই সময়পরিসরে প্রান্তিক পর্যায়ে শোষণচিত্র এবং শোষণবিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন ওই কালের আর্থরাজনৈতিক জিজ্ঞাসার অন্য প্রান্তকে উন্মোচিত করে। উপন্যাসে দেখা যায়, রাজনীতি ও ব্যক্তিজীবনের দোদুল্যমানতাকে সঙ্গে নিয়ে রহমতের প্রত্যাগমন ঘটে গ্রামে; স্টিমার, গোয়ালন্দঘাট পেরিয়ে একমাত্র ফুপুর বাড়ি কামার হাটে। সাতচল্লিশ-পরবর্তী গ্রামীণ পরিস্থিতি তখন আরও সঙ্গীন : 'সবাই কেমন রোগ-জীর্ণ পাণ্ডুর চেহারা। দেখে মনে হয়, কতো কাল যেন খায় না। পেটের চাম পিঠের সঙ্গে সাঁটা। পরণে বস্ত্রের দীনতা।' (সরদার ১৯৭৫ : ৩১৬) এমন দীন-হীন গ্রাম অবশ্য ভাবছে শহর এগিয়েছে। কারণ তারা জেনেছে দালান-ইমারত, কলকারখানায় ঢাকা এক 'সোনার পুরী'। তাই বয়াতী বাছের মণ্ডল রহমতকে জিজ্ঞাসা করে 'ঢাকার শহর নাকি জমজমাট হয়ে উঠেছে বাবা : আমাদের হাল হকিকতের কিছু বদল-টদল হবে নাকি? ধান-চাল, কাপড়-টাপড়ের দাম কিছু কম হবে কি?' (সরদার ১৯৭৫ : ৩১৭) এর সদুত্তর প্রস্তুত থাকে না রহমতের কাছে। তবে সে উপলব্ধি করে – অধিকারবঞ্চিত দরিদ্র মানুষ একজোট হতে না পারলে অধিকার আদায় সম্ভব নয়। সে শহরে যা পারেনি, গ্রামে অন্তত তা দেখতে চায়। গ্রামের পাকিস্তানের চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে বাছের বয়াতীর এই গানে:

> ও-ও
> পেলাম স্বাধীনতা খাসা
> স্বাধীন দেশে উপবাসে
> মরছে যতো গরীব চাষা। (সরদার ১৯৭৫ : ৩১৭)

স্বাধীনতার প্রশ্নে কেবল শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যেই প্রত্যাশাভঙ্গ ঘটেনি, প্রান্তিক মানুষও তাদের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছে স্বাধীনতা নামের প্রহসন সম্পর্কে। গ্রামীণ জনপদে লোকজ গানের শক্তির জায়গাটি ছিল দৃঢ়বদ্ধ। সহজ সহজ শব্দে জনমন্তত্ত্বের অনেক গূঢ় সত্য উন্মোচিত হতো সেইসব গানে ও পরিবেশনায়। কৃষক তার শোষণমুক্তির প্রয়োজনে গড়ে তোলে কৃষক সমিতি। কৃষক সমিতির লক্ষ্য, বয়াতির গানের মধ্য দিয়ে আবাহন আর শহরের কলিম-হাতেমদের সমাজতান্ত্রের তাত্ত্বিক অভিযাত্রা

এক পথে এসে মিলিত হয়। প্রতিপক্ষ শোষকশক্তি তখন অভিন্ন। গ্রামীণ শোষক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। এখানে পশ্চিম পাকিস্তানি শোষকদের আসার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে যখন গলদ থাকে, তখন সর্বত্র শোষকশ্রেণি তার সুযোগ গ্রহণ করে। ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের এই প্রান্তিক গ্রামেও দেখা যায় 'প্রেসিডেন্টের হাতে বাঁধা মৌলভী-মোল্লা, তারাও পাঁচ মিনিটে ফতোয়া ঝেড়ে দেবে।' (সরদার ১৯৭৫ : ৩৪৫) স্বাধীন দেশে যে কুসংস্কারমুক্ত-দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ প্রত্যাশিত ছিল, তা বহু দূরেই থেকে যায়। তাই অচিরেই গ্রামবাসীর মনে উদয় হতে থাকে, 'এ ঘোড়ার ডিমের স্বাধীনতায় ভেজাল আছে।' (সরদার ১৯৭৫ : ৩৫৫) পাকিস্তানকে তাঁদের কাছে পরিণত হতে থাকে 'ফাঁকিস্তানে'।

কৃষক সমিতির সূত্রে জালাল মাস্টার-অমল সেনদের যৌথ কর্মতৎপরতা প্রান্তিক পর্যায়ে সম্প্রদায়গত সহাবস্থান চিহ্নিত করে। কারণ সম্প্রদায় এখানে বড় কথা নয়, শোষকের বিরুদ্ধে যুগপৎ সংগ্রামই মুখ্য। কৃষক নেতা অমল সেন মনে করে – 'যতো দিন এ দেশে এই হিন্দু-মুসলমান রেষারেষি থাকবে, ততোদিন গরীব দুঃখীও থাকবে। গরীব হিন্দু-মুসলমান এক হও, বড়লোক হঠাও। গরিবী ঘুচে যাবে। দেশের মুক্তি হবে।' (সরদার ১৯৭৫ : ৩৫৬) সেই সঙ্গে তেভাগা আন্দোলনে সাজেদার সরব উপস্থিতি ওই আন্দোলনে নারীর সক্রিয়তাকে চিহ্নিত করে। তেভাগা আন্দোলন, জমিদার-জোতদার উচ্ছেদের আন্দোলন শেষে রহমত ফেরে ঢাকায়। ঢাকা তখন আবারও উত্তাল। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, খাদ্যসংকটে শহরও তখন পর্যুদস্ত। এর মধ্যেই আসে একুশে ফেব্রুয়ারি। একুশে ফেব্রুয়ারির ঐতিহাসিক তথ্যগুলোই এখানে পরিবেশিত হয়েছে। উপন্যাসের কথক রহমতও সেই রক্তাক্ত দিনের সাক্ষী। নিজেও আক্রান্ত হয় পুলিশি নির্যাতনের। চেতন ফিরে পেলে খবরের কাগজ পড়ে জানতে পায় : 'জালেম সরকারের নৃশংস অত্যাচার, পুলিশের গুলিতে শহীদ বরকত, রফিক, জব্বার আরো অনেকে। (সরদার ১৯৭৫ : ৫৪১) রহমতের মতো একজন আপাত ভীতু মধ্যবিত্তও একুশের চেতনায় জারিত হয়ে নিজেকে আবিষ্কার করে প্রতিবাদ ও অধিকার আদায়ের সামূহিক মহাস্রোতে। এখান থেকেই শুরু হয় আত্ম-আবিষ্কারের নতুন অভিযাত্রা। ফলে একুশের শক্তিকে এমন প্রতিবাদ ও সংগ্রামমুখর সামূহিক জীবনজিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে আবিষ্কার করা যায়। গ্রাম-শহর, নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল শ্রেণির অধিকার আদায়ের একটি প্রতীক একুশ। এই একুশ জাতীয়তাবাদী শক্তির চেয়েও অধিকার আদায়ের শক্তি দিয়ে বেশি ফলবান। প্রত্যক্ষ অর্থে না হলেও এই উপন্যাস বাঙালি জাতীয়তাবাদের বয়ান। উপন্যাসের কাহিনিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ। সাতচল্লিশ-পূর্বাপর রাজনীতির গতিধারা ও তার রূপান্তর কোন পরিপ্রেক্ষিতে সংঘটিত হয়, তার কার্যকারণের পরম্পরা এখানে আছে। তবে

সময়কে ছাপিয়ে ব্যক্তির উদ্বোধন নেই। এই সীমাবদ্ধতাকে বোঝার জন্য ইতিহাস ও রাজনীতির সঙ্গে ঔপন্যাসিক সত্তার সম্পর্কসূত্র বোঝা প্রয়োজন।

সরদার জয়েনউদ্‌দীনের জীবনী পাঠ থেকে তাঁর কোলকাতার মেস-জীবন, বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে সামরিক বাহিনীতে যোগদান, তেতাল্লিশের মন্বন্তর-পাকিস্তান আন্দোলন-দাঙ্গা তথা মানুষের দুর্বিষহ জীবনের প্রত্যবেক্ষণ থেকে *অনেক সূর্যের আশা* ও *বিধ্বস্ত রোদের ঢেউয়ের* রহমতকে ঔপন্যাসিকের আত্মপ্রতিরূপ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। রাজনৈতিক অবস্থান প্রসঙ্গে জীবনীকার জানান:

> পাকিস্তান নামক নতুন রাষ্ট্র কাঠামোয় মানুষের উন্নত জীবন-ব্যবস্থার স্বপ্ন লালন করতেন সরদার জয়েনউদ্‌দীন ও তাঁর সমমনা বন্ধুরা। তাই দেশবিভাগের পর এরা প্রায় সবাই কোলকাতা ছেড়ে ঢাকায় আসেন নতুন জীবনের ডাকে। কিন্তু সদ্যস্বাধীন দেশে চাকরির বাজারে মন্দা এবং অন্য কর্ম-সংস্থানের দারুণ অভাব সরদার জয়েনউদ্‌দীনের জীবনকে একদিকে অনিশ্চিত, অন্যদিকে সংগ্রামমুখর করে তুলেছিল। (আহমদ কবির ১৮৮৯ : ৩১)

উক্ত কয়েকবাক্যে জয়েনউদ্‌দীনের পাকিস্তান সমর্থন ও অব্যবহিত পরে সংগ্রামমুখর জীবন মূলত তৎকালীন বাঙালি শিক্ষিত ও ভাগ্যান্বেষী মুসলমানদের কর্মগতিকে নির্দেশ করে। চিন্তার ওই দুই পর্ব দুই উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে। দুই উপন্যাস যেন দুই বিপরীত রাজনৈতিক চেতনার ধারাবাহিক বয়ান। যদিও সাতচল্লিশ এমন এক মুহূর্ত যা এই জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে দ্রুত পরিবর্তিত করে দেয়। কিন্তু একই ঔপন্যাসিকের দুই উপন্যাসের রচনাকাল যখন দুই রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থায়, তখন ঔপন্যাসিক সত্তার অবস্থানকে সরলভাবে দেখার সুযোগ থাকে না। হুমায়ুন আজাদ (২০০৭ : ২৭৬) দুই উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের দুই অবস্থানকে বেশ কড়াভাবে সমালোচনা করেছেন:

> সরদার জয়েনউদ্‌দীনের ষাটের দশকের মাঝামাঝি প্রকাশিত *অনেক সূর্যের আশা* পাকিস্তানি মানসিকতার ফসল; এতে পাকিস্তান ও তার পিতার প্রশংসা ছড়ানো এখানে সেখানে, কিন্তু সত্তরের দশকে প্রকাশিত *বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ*-এ দেখা দেয় পাকিস্তানের সমালোচনা। সরদার জয়েনউদ্‌দীন যদি *বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ* ষাটের দশকে, আদমজি পুরস্কারকে মনে রেখে লিখতেন এবং *অনেক সূর্যের আশা* লিখতেন সত্তরের দশকে, তাহলে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি উল্টে যেতো। এ উপন্যাসগুলোর কোনোটিই মহৎ রচনা নয়; তবে একুশের চেতনা এগুলোতে নানাভাবে, অনেক সময় এলোমেলোভাবে ঢুকে গেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে কিছু সমাজতান্ত্রিক সৈনিকের সঙ্গে সম্পৃক্তি ঔপন্যাসিককে ওই আদর্শের প্রতি অনুরাগী করে তোলে। 'সমাজতন্ত্রে নিবেদিত-কর্মী ও শ্রমিক-জনতার সঙ্গে অনেকটা সম্পৃক্ত চরিত্র অঙ্কন ক'রে সরদার জয়েনউদ্‌দীন প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী হিসেবে সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর আস্থাও

ব্যক্ত করেছেন।' (মুহম্মদ ইদরিস ১৯৮৮ : ১২০) সমালোচক জয়েনউদ্‌দীনের ঔপন্যাসিক সত্তায় সমাজতন্ত্রের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলেও তাঁর চরিত্রদের মধ্যে শ্রেণিসংগ্রামের কঠিন পরিস্থিতির সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার কোনো দৃষ্টান্ত নেই। এই সমাজতন্ত্রকে অনেকটা রোম্যান্টিক সমাজতন্ত্র বলে অভিহিত করা যায়। তবে উপন্যাসদ্বয়ে উপনিবেশে ও নব্যউপনিবেশের বিরুদ্ধে ঔপন্যাসিকের অবস্থান স্পষ্ট। কলকাতাকেন্দ্রিক জীবনে হিন্দু বাঙালিদের দ্বারা অপরায়ণ এবং পাকিস্তানপর্বে অবাঙালিদের দ্বারা অপরায়ণকে শনাক্ত করেছেন তিনি। ফলে একটি কালের একটি জনগোষ্ঠীর সূক্ষ্ম ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত জটিলতা-সম্ভাবনা ও সংকট এবং রাজনৈতিক চেতনার রূপান্তরকে আত্মজৈবনিকতার অনুষঙ্গে রূপায়ণ করার চেষ্টা করেছেন সরদার জয়েনউদ্‌দীন।

সাতচল্লিশ-পরবর্তী শাহরিক বাস্তবতায় পূর্ববাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনজিজ্ঞাসার ঔপন্যাসিক রূপায়ণে ঔপন্যাসিকদের শ্রেণি-অবস্থান ও রাজনৈতিক অবস্থান কার্যকর থেকেছে। সাতচল্লিশ-পূর্ববর্তী কলকাতার শাহরিক অভিজ্ঞতা থেকে ঢাকার বাস্তবতা পরিবর্তনের তীব্রতাকে আরও গাঢ় করেছে। তবে উপর্যুক্ত তিন উপন্যাসে তিন ধরনের শ্রেণিদৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হয়েছে। আবু রুশ্‌দদের মতো ইসলামি ঐতিহ্যবোধে বিশ্বাসী, কয়েক প্রজন্মব্যাপী ইংরেজি শিক্ষিত এবং সরকারি সুবিধাপ্রাপ্ত *নোঙর* উপন্যাসের চরিত্র কামাল যে প্রেক্ষণবিন্দু থেকে ঢাকার বাস্তবতাকে মোকাবিলা করে, সরদার জয়েনউদ্‌দীনের রহমত-কলিম-হাতেমদের বাস্তবতা তা নয়। অন্যদিকে *সংশপ্তকে* যে ঢাকা মালেকের চোখ দিয়ে উন্মোচিত হয়, তাঁর মধ্যে ঔপন্যাসিকের সচেতন শ্রেণিচেতনার পরিচয় মেলে। তবে আর্থরাজনৈতিক জিজ্ঞাসা ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শহর, বিশেষত গঠনোন্মুখ শহর ঢাকার যে ভূমিকা ছিল, তা উপন্যাস-পাঠ থেকে উপলব্ধি করা যায়।

২.৪.৩. গ্রামীণ বাস্তবতার রূপান্তর

২.৪.৩.১

আবু ইসহাকের (১৯২৬-২০০৩) *সূর্য-দীঘল বাড়ী* (১৯৫৫) উপন্যাসে জয়গুন-মায়মুনদের কাছে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা একদিন ঈদের চাঁদ হিসেবেই আবির্ভূত হয়েছিল। পাকিস্তান হবার পর সত্যিকারের যে ঈদের চাঁদটি আকাশে উদিত হয়, শফির মা-জয়গুনদের সংস্কারের কাছে তা মঙ্গলবাহী। কারণ সেই চাঁদ 'সিদা' ভাবে ওঠে। দক্ষিণমুখী উঠলে আকাল আর উত্তরমুখী উঠলে মড়ক – কোনো দিক থেকেই নিস্তার নেই। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আনন্দের সঙ্গে যেন তাদের অবচেতন দৃষ্টিতে এই 'সিদা চাঁদে'র আনন্দ সঞ্চারিত হয়। আকালের কালে খাবারের অভাবে যেখানে জয়গুন ত্রিশটি রোজা সম্পন্ন

করতে পারেনি, সেখানে নতুন রাষ্ট্রে সে ত্রিশটি রোজা রাখতে পারছে। এসব সম্ভাবনার ইঙ্গিতবাহী। কিন্তু নব্য রাষ্ট্র পাকিস্তান তাদের জীবনে গুণগত তেমন কোনো পরিবর্তন আনতে পারে না। গ্রামীণ সমাজব্যবস্থাতে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ মূলত প্রভাবশালীদের হাতেই ন্যাস্ত থাকে। আকাল না থাকলেও অভাব গ্রামবাসীর নিত্যসঙ্গী। আর সেই সুযোগ নেয় খুরশীদ মোল্লা, কাজী খলিল বকশ, গদু প্রধানরা। রাষ্ট্রকাঠামোতে নৈরাজ্য থাকে বলেই, গণতন্ত্রহীনতা থাকে জন্য প্রান্তিক পর্যায়ে গদু প্রধানরা অনাচার করার সুযোগ পায়। শোষণের জায়গায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগেও তারা যেমন ছিল একজোট, পাকিস্তান হবার পরেও একই। সারা গ্রামের মানুষদের বঞ্চিত করে ফুড কমিটির সেক্রেটারি হয়ে খুরশীদ মোল্লা রেশনের চাল-চিনি বিতরণের বেলায় কেবল প্রভাবশালীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য:

> ঔপন্যাসিক যে সময়কে তার ফ্রেমে এঁটেছেন তার ভিত্তিভূমি এবং প্রচ্ছদপট আরো নির্মম এবং জটিল জীবনাগ্রহে স্পৃষ্ট। এমন সময়কে ধরা এপিকধর্মী উপন্যাসেই সম্ভব। বহু বিস্তারী এ জীবনাগ্রহ শুধু জয়গুন কেন্দ্রিক নয়, রাজনীতির প্রচণ্ডতা সে সময়টাতে সমাজে আরো অনেক দগদগে ক্ষতের চিহ্ন লেপন করেছিল সেদিকটা অনুপস্থিত রয়ে গেছে উপন্যাসে। (শহীদ ২০০৩ : ৬৭)

রাজনৈতিক ক্রিয়াশীলতার প্রত্যক্ষতা না থাকলেও ওই কালের রাজনৈতিক অভিঘাত রাজনীতি না-বোঝা নিম্নবিত্তদের জীবনে কী ধরনের প্রভাব ফেলেছিল, তার চিত্রায়ণে ঔপন্যাসিকের আন্তরিকতা প্রকাশ পায়। সাতচল্লিশ-পরবর্তী বাস্তবতাকে প্রান্তিক জনমানুষ কীভাবে মোকাবিলা করেছিল বা এই রাজনৈতিক পরিবর্তন তাদের জীবনমানে কোনো পরিবর্তন ঘটিয়েছিল কিনা, তা স্বল্পরেখ পরিচর্যার মধ্য দিয়ে এই উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে।

আবু ইসহাক জন্মগতভাবে যেমন পূর্ববাংলার মানুষ তেমনি কথাকার হিসেবেও তিনি পূর্ববঙ্গের জনমানুষের রূপকার। তিনি বাংলাদেশের যে সময়ের কথাকার, যে অর্থনৈতিক জীবনের রূপকার তা দরিদ্র ও প্রান্তিক গ্রামীণ মানুষের জীবন। তৎকালীন ফরিদপুর জেলার শরীয়তপুর মহকুমার নড়িয়া উপজেলার শিবঙ্গল গ্রামে জন্মগ্রহণকারী আবু ইসহাক দারিদ্র্যের কারণে আইএ পাস করার পরেই কর্মজীবনে প্রবেশ করেন বেসরকারি সরবরাহ বিভাগের পরিদর্শক হিসেবে (১৯৪৪)। সাতচল্লিশ-পরবর্তীকালে তিনি পাকিস্তান সরকারের পুলিশ বিভাগে যোগ দেন। কর্মসূত্রে অবস্থান করতে হয়েছে কলকাতা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা এবং করাচি শহরেও। গ্রাম ও শহর উভয়ের সঙ্গেই তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। কিন্তু যখন তিনি উপন্যাস লেখেন, তখন প্রধান হয়ে ওঠে গরিব মানুষ ও গরিব সমাজের চালচিত্র। চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের গ্রামীণ জীবন কিংবা শাহরিক জীবন সর্বত্রই অনাহারে থাকা, জীবনযুদ্ধে নিত্য সংগ্রামশীল গরিব মানুষের প্রাবল্য। সেই গরিব মুখগুলো অনিবার্যভাবে একজন

কথাকারের সামনে চলে আসে। 'শিক্ষিত ও উদার মানসিকতাকে লালন করে লেখক সমগ্র জীবনভর কুসংস্কার ধর্মীয় ভণ্ডামি এবং সাম্প্রদায়িকতাকে ঘৃণা করেছেন। লেখকের এ মানসিকতারও রূপায়ণ দেখা যায় তাঁর গল্প ও উপন্যাসে।' (হোসনে ২০০৭ : ১০) কিন্তু চল্লিশের দশকের একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আবু ইসহাকের রাজনৈতিক অবস্থানের কথা জানা যায় না। *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসের প্রকাশকালে (১৯৫৫) তিনি ছিলেন পাকিস্তানের পুলিশ ও নিরাপত্তা বিভাগের সাব-ইন্সপেক্টর (১৯৪৯-১৯৫৬)। তাই উপন্যাসে পাকিস্তান-আন্দোলন বা দেশবিভাগ প্রশ্নে তাঁকে রাজনীতির প্রত্যক্ষ ভাষ্যকার হিসেবে সরব না হওয়ার একটি সূত্র অনুমান করা যায়। তবে সামাজিক দায়বদ্ধ শিল্পী হিসেবে শিল্পিত উপায়ে ওই কালের বাস্তবতার রূপদান করেছেন। এরই দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা যায় দুর্ভিক্ষের কারণে মৃত কন্যাকে দাফন করার জন্য বস্ত্র মেলে না; তাই জয়গুন তার নিজের সবুজ শাড়ির একটি অংশ দিয়ে মুড়িয়ে কন্যার শেষকৃত্য সম্পন্ন করে। আর কয়েকবছর পর পুত্র হাসু যখন স্বাধীন পাকিস্তানের পতাকা বানানোর জন্য সবুজ কাপড় চায়, তখন ওই শাড়ির বাকি অংশ ব্যবহার করা হয়। দরিদ্র মানুষের জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে পাকিস্তানের স্বাধীনতাকে যেন প্রহসনের সম্পর্কে আবদ্ধ করলেন ঔপন্যাসিক। এর আরও প্রকাশ দেখা যায় প্রান্তিক মানুষের কথোপকথনে জিন্নাকে বাদশা হিসেবে দেখার মধ্য দিয়ে। আবার রমেশ ডাক্তারের দেশত্যাগ না করার পেছনে যে যুক্তি উপস্থাপিত হয় উপন্যাসে, সেখানে অবচেতনে পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান বাঙালির দৃষ্টিকোণ প্রকাশিত হয়। সমালোচক যদিও ঔপন্যাসিকসত্তাকে রাজনৈতিক দর্শনের বাইরে থেকেই দেখতে চেয়েছেন:

> কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দর্শনলগ্ন হয়ে নয়, কেবল সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়ে ঔপন্যাসিক ঔপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে সঙ্গে গণমানুষের ক্ষুধামুক্তির আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন আলোচ্য উপন্যাসে। *সূর্যদীঘল বাড়ী* উপন্যাসে 'স্বাধীনতা' বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে নয়, সাধারণ মানুষের আশা ও আশাভঙ্গের সূত্র ধরেই এসেছে; তেমনি দেশবিভাগও বৃহত্তর মানবিক বিপর্যয় বা রাজনৈতিক দর্শনের আলেখ্য হিসেবে আসে নি। (হোসনে ২০০৭ : ২৩)

কিন্তু ঔপন্যাসিকমাত্রই তাঁর স্বসমাজ ও রাজনৈতিক চিন্তার সঙ্গে সম্পর্কিত। কারণ 'কোন উপন্যাসই শুধু রাজনৈতিক ঘটনার বিবরণ নয়, সেখানে মানুষ-ব্যক্তি-বৃহত্তর প্রসঙ্গ বিশেষ ও নির্বিশেষভাবে আসে।' (পার্থপ্রতিম ১৯৯১ : ১২) সেই সূত্রে বলা যায় প্রত্যক্ষ অর্থে আবু ইসহাক রাজনীতির ভাষ্যকার না হলেও সময় ও সমাজকে ধারণ করার প্রয়োজনেই রাজনৈতিক অভিঘাত তাঁর উপন্যাসে উপস্থিত। কাঙ্ক্ষিত পাকিস্তান যে শ্রমজীবী ও দরিদ্র মানুষের জীবনে মুক্তি এনে দিতে পারেনি, তার আলেখ্য হয়ে থাকে আবু ইসহাকের *সূর্য-দীঘল বাড়ী*। রাজনীতি এখানে কার্যকর থাকে অন্তঃসলিলা হিসেবে।

২.৪.৩.২

সাতচল্লিশ-পরবর্তী নতুন নতুন বাস্তবতা আবুল ফজলের (১৯০৩-১৯৮৩) *রাঙ্গা প্রভাতের* (১৩৬৪) চরিত্রদের নতুন নতুন জিজ্ঞাসার মুখোমুখি করে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল তথা চট্টগ্রাম অঞ্চলের এক গ্রামীণ জনপদও ওইসব বাস্তবতার আওতামুক্ত থাকে না। যেমন অধিক সংখ্যক হিন্দু শিক্ষক এলাকাছাড়া হওয়ায় শিক্ষাব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয় দারুণভাবে। আবুল ফজল মানবতাবাদী; তিনি ওই বাস্তবতাগুলোকে আমলে নিয়েও নির্মাণ করতে চান একটি সমন্বয়ধর্মী চিত্র। নব্য পাকিস্তানে সেই সমন্বয়ের চিত্র এঁকে পাকিস্তানের গ্রহণযোগ্য একটি অবস্থাও নির্মাণ করতে চান। তাই দেখা যায় শিক্ষাব্যবস্থার অচলাবস্থা দূরীকরণে চারুবাবুকে উদ্যোগী হতে। রায়পাড়া আর মির্জাপাড়ার সবাইকে ডেকে সভা করে মসজিদের মাঠের সামনে। মুসলিম জাতীয়তাবাদের ফলে জন্ম নেওয়া পাকিস্তান রাষ্ট্রে একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বীর উদ্যোগে মসজিদের সামনে মিটিং আয়োজনের মাধ্যমে মসজিদকে একটি অসাম্প্রদায়িক চারিত্র্য প্রদান করার ঔপন্যাসিক প্রচেষ্টা দুর্লক্ষ নয়। তাই দেখা যায়, কামালদের ধানী জমিতে চারুবাবুর ঐকান্তিক চেষ্টায় স্কুলটি দাঁড়িয়ে যায়। *রাঙ্গা প্রভাত* উপন্যাসে সাতচল্লিশ-পরবর্তীকালে নতুন জিজ্ঞাসার পরিবর্তে প্রথমত নতুন নতুন বাস্তবতা মোকাবিলার প্রসঙ্গটিই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। তবে এর মধ্য দিয়েও সমাজের আর্থরাজনৈতিক পরিস্থিতি উপলব্ধি করা যায়। অনেক চেষ্টা করেও যে চারুবাবু তার স্কুলের জন্য মুসলমান শিক্ষক ধরে রাখতে পারে না, তার কারণ শিক্ষিত মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান রাষ্ট্রে চাকরির তুলনামূলক অধিক সুযোগ সৃষ্টি। এর পরিপ্রেক্ষিতে চারুবাবু কামালের উদ্দেশে যা বলে, তাতে ঔপন্যাসিকের পাকিস্তানপ্রীত চিন্তনক্রিয়ার প্রকাশ ঘটে:

> মুসলমান এলাকা, ছাত্রও অধিকাংশ মুসলমান। বেশী করে মুসলমান শিক্ষক দেখলে ওদের মনে আস্থা ও আত্মবিশ্বাস আরো বেড়ে যাবে। আর আমি শুধুই কেতাবী শিক্ষায় বিশ্বাস করি না। প্রত্যেক ধর্ম ও সমাজের কতকগুলি বিশিষ্ট আদর্শ আছে – যোগ্য ও আদর্শবাদী শিক্ষকেরাই সেই আদর্শ ছাত্রদের সামনে তুলে ধরতে পারেন। মুসলমানের ধর্মীয় ও সামাজিক আদর্শ যত শুভবুদ্ধিসম্পন্নই হউন না কেন কোনো অমুসলমান শিক্ষক তা তুলে ধরতে পারবেন না যথাযথভাবে। আমার ত বিশ্বাস আদর্শবাদী মুসলমান শিক্ষকের উপরই পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। (আবুল ফজল ১৩৬৪ : ১৬৯)

এইটি মূলত আবুল ফজলেরই উচ্চারণ। তার মানে দাঁড়ায়, পাকিস্তান রাষ্ট্রে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রাধান্যকে আর এড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না।

নতুন পাকিস্তান রাষ্ট্রে ছোট একটি গ্রামকে চারুবাবু একটি আদর্শ গ্রাম হিসেবে রূপদান করতে চায়। আর তাই শিক্ষার পর সে মনোযোগ দেয় চিকিৎসা ব্যবস্থার দিকে। পুত্র মুকুলকে মেডিকেল কলেজে

পাঠায় গ্রামের চিকিৎসাসেবার কথা মাথায় রেখে। চারুবাবু ভাবে কৃষকদের নিয়ে, নারীশিক্ষার প্রসার নিয়ে – কন্যা মায়া বিটি পাশ করে মেয়েদের স্কুলের দায়িত্ব নেবে, এটাও তার ইচ্ছা। কিন্তু সময় পরিস্থিতি দ্রুতই বদলে যায়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার খবর গ্রামের নিরস্তরঙ্গ জীবনেও আতঙ্কের অভিঘাত হানে। কামাল এইসব বিষয়কে কোনো যুক্তিশৃংখলা দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারে না। তার নিজ জেলার অসাম্প্রদায়িক ও সমন্বয়বাদী বৈশিষ্ট্যের জন্য তার গর্ববোধ ছিল। কিন্তু একের পর এক আহত ও নিহতের খবরে মুসলমান প্রধান নিজ গ্রামের শান্তিরক্ষা নিয়েও অনিশ্চিয়তার মধ্যে তাকে পতিত হতে হয়। মসজিদের খুতবায় 'কাফেরদের' সর্বনাশ কামনা করা, ঘৃণা ছড়ানোর মধ্য দিয়ে পরিস্থিতি আর কোনো মতেই শান্ত থাকে না। এবং আকস্মিকভাবেই জানা যায় – চারুবাবু খুন হয়েছে। চারুবাবু খুন হবার মধ্য দিয়ে ওই গ্রামের সমন্বয় ও সম্প্রীতির প্রতীকটিও যেন নির্বাপিত হয়ে যায়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা, দেশভাগ, হিন্দুদের বাস্তুত্যাগ সত্ত্বেও যে চারুবাবু নিজ জন্মভূমিকে করতে চেয়েছিল সমৃদ্ধশালী, অথচ তার মৃত্যুর পর তার পরিবারের ওপরই সাম্প্রদায়িকতার খড়ুগ নেমে আসে। চারুবাবু অসাম্প্রদায়িক হলেও তার সম্প্রদায়ের অপরাপর মানুষ অসাম্প্রদায়িকতার পরিবর্তে সাম্প্রদায়িকতাকেই বড় করে তোলে। 'হিন্দুকে হিন্দু রক্ষা না-করলে কে করবে' – এমন উচ্চারণে বিভেদের রেখাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের এই সাম্প্রদায়িক মনোভাব, কামাল-মায়ার সম্পর্ককে গ্রহণ না করতে পারা, মুসলমান-বিদ্বেষের চিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক সমাজজিজ্ঞাসার আরেকটি প্রান্তকে পরিচিত করিয়েছেন। কিন্তু ঔপন্যাসিক এই হিন্দুজনগোষ্ঠীর এই রক্ষণশীলতার অভ্যন্তরীণ কার্যকারণকে অনুসন্ধান করেননি। তিনি উদার মানবতাবাদকে কেন্দ্রে রেখে হোসেন সাহেব, চারুবাবু ও তাদের উত্তরাধিকারীদেরকেই আদর্শ চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রে কম সংখ্যায় বসবাসকারী হিন্দু জনগোষ্ঠীর অনিশ্চয়তা, অনিরাপত্তার বোধ সম্পর্কে ঔপন্যাসিককে উদ্যোগী হতে দেখা যায় না। 'এখানে আমরা যেন এক ব্যাপক পরিবেশে মানুষ আবুল ফজলের সাক্ষাৎ পাই। এতে ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের প্রভাব, মানবতার তাগিদ, নতুন আদর্শের উদ্ভব ও বিকাশ – সবটা মিলে মনের ওপরে বেশ একটা প্রভাব থেকে যায়।' (কাজী মোতাহার ২০০৯ : ৩২) তারপরেও কামাল-মায়া-মুকুল আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মসমালোচনার মধ্য দিয়ে শনাক্ত করতে চায় দীর্ঘকালের সংকটকে। এবং অনেকটা আকস্মিকভাবেই মুকুল এই সংকটকালের একটি উপায়ের কথা উচ্চারণ করে : 'আমি মনে করি আমাদের সামনে সোসেলিজমই একমাত্র পথ। আমার ত বিশ্বাস ভারত ও পাকিস্তানের জন সাধারণের মুক্তি নির্ভর করছে সমাজতন্ত্রের উপর! সত্যিকার সমাজতন্ত্রের উপর।' (আবুল ফজল ১৩৬৪ : ২০১) উপন্যাসের সামূহিক বাস্তবতায় সমাজতন্ত্র বিষয়ক এই উচ্চারণের পরম্পরা ঠিক উপলব্ধি করা যায় না।

এজন্য কামাল বলে : 'আমাদের আসল সমস্যা ত মনের গোঁড়ামী, সামাজিক গোঁড়ামী। তোমার সমাজতন্ত্র সেই গোঁড়ামীর হাত থেকে আমাদের মুক্তি দিতে পারবে কি?' (আবুল ফজল ১৩৬৪ : ২০১) কামালের কথার মধ্যে তত্ত্বের চেয়ে তার সামনে বিরাজমান বাস্তবতাটিই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। কামালের কাছে রাজনীতি তখন পর্যন্ত 'nasty game'। অপরদিকে মুকুল কলকাতায় মেডিকেল কলেজ পড়ুয়া; ফলে তার চিন্তনে তত্ত্ব গুরুত্ব পায়। হঠাৎ করে তত্ত্বের অবতারণা ঔপন্যাসিকের আত্মঅভিপ্রায়ও বটে।

উপন্যাসের ঘটনাক্রমে এই পর্যায়ে ধর্মের উন্মাদনায় আক্রান্ত হয় মানবতা। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার কারণেই ভারত ও পাকিস্তানের সৃষ্টি; সেই নতুন দুই রাষ্ট্রে ধর্মীয় কারণে সহিংসতা তখনও সংঘটিত হতে থাকে। পাঞ্জাবে ধর্মীয় দাঙ্গায় যেমন অগুণতি মানুষ নিহত হয়, ধর্ষিত হয়; এর প্রভাবে কলকাতাতেও সাম্প্রদায়িক সংঘাত ঘটে। প্রান্তবর্তী চট্টগ্রামের নিভৃত ইছাখালী গ্রামও এই সহিংসতা থেকে মুক্তি পায় না। পুড়ে যায় স্কুল ঘর, দগ্ধ হয় কামাল নিজেও। আর এসবের পরিপ্রেক্ষিতে মুকুলের ক্ষুব্ধ ও সাহসী উচ্চারণ মূলত ঔপন্যাসিক আবুল ফজলেরই উচ্চারণ : 'ধর্ম আর নয়, ধর্ম আর চাই না। পৃথিবী থেকে ধর্ম নির্বাসিত হোক, নির্বাসিত হোক ঐ হৃদয়হীন নিষ্ঠুর অক্টোপাসটা।' (আবুল ফজল ১৩৬৪ : ২০৫) ধর্মভিত্তিক পাকিস্তানে ধর্ম সম্পর্কিত এই উচ্চারণ ধর্মতন্ত্রের তথা ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের অসারতাকে নির্দেশ করে। উপন্যাসের শেষে দুই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কামাল ও মায়ার সম্পর্ক বিষয়ে মায়ার রক্ষণশীল সমাজের যে চিত্র প্রকাশিত হয়েছে, তা অমূলক নয়। এই মিলনে লেখকের প্রশ্রয় আছে তাঁর মানবতন্ত্রী আদর্শের কারণে। তবে এই ঘটনার আরেক দিক এই যে, একজন উদারচিত্ত মুসলমান যুবক একজন উদারচিত্ত হিন্দু তরুণীর বিয়ের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক রূপ আঁকার চেষ্টা থাকলেও কন্যাপক্ষীয় সমাজে তা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আধিপত্য হিসেবেই বিবেচিত হয়। তাই চন্দ্রবাবু প্রশ্ন ছোড়ে : 'পাকিস্তান হয়েছে, পাকিস্তানে আমরা আছি, তাই বলে মুসলমানের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে নাকি?' (আবুল ফজল ১৩৬৪ : ২৪৩) উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মায়ার মনেও জন্ম নেয় আশঙ্কা : 'কামালকে আর এখন কমল মনে হয় না। রীতিমত কামালই মনে হয়।' অর্থাৎ যে কামালকে ঘরের ছেলে মনে করে কমল বলে ডাকত মুকুল-মায়ার মা হৈমবতী, তার কাছেও অবচেতনে সাম্প্রদায়িক পরিচয়টিই প্রধান হয়ে ওঠে তখন। মায়াদের সপরিবারে দেশত্যাগ, বাড়িবদল করেও ঔপন্যাসিকের প্রযত্নে মায়া-কামাল যৌথজীবনের দিকে ধাবিত হয়।

উপন্যাসে প্রত্যক্ষ অর্থে রাজনীতি নেই। কিন্তু সাতচল্লিশ-পরবর্তী বাস্তবতায় আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের একটি পরিচয় পাওয়া যায় *রাঙ্গা প্রভাত* উপন্যাসে। '*রাঙ্গা*

প্রভাতে যে-সমাজবাস্তবতা রূপায়িত হয়েছে তা অনেক বেশি রাজনীতি-প্রভাবিত। তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেরণাসৃষ্ট বিভেদমূলক বাস্তবতার বিপরীতে স্মৃতিচারণার মাধ্যমে চিত্রিত হয়েছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আদর্শ।' (সৈয়দ আজিজুল ২০১০ : ২৩৪) তাই এই উপন্যাসে সামাজিক ও পারিবারিক উপাদান থাকা সত্ত্বেও এর একটি রাজনৈতিক চারিত্র্য ও তাৎপর্য রয়েছে। বিশেষত ঔপন্যাসিকের রাজনৈতিক অভিপ্রায় স্পষ্টতর হয়েছে চরিত্র ও ঘটনার পরিণতির পরম্পরায়।

ছোট ছোট পরিবর্তন হিন্দু জনগোষ্ঠীর সংখ্যালঘু মানসিকতা, একসময়ে হিন্দুশিক্ষক দ্বারা বঞ্চিত মুসলিম লীগ-ঘেষা ইউনুসের প্রধান শিক্ষক হওয়া, মুকুলদের বাড়ি বদল করা তৎকালীন পাকিস্তানপর্বের দ্রুত পরিবর্তনশীল সময়চিত্রকে নির্দেশ করে। অন্যদিকে ঔপন্যাসিক মানবতন্ত্রী হবার পরেও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার চেয়ে হিন্দু-রক্ষণশীলতাকে যেভাবে বড় করে দেখিয়েছেন; তাতে পাকিস্তান রাষ্ট্রপদ্ধতির প্রতি তার প্রচ্ছন্ন সমর্থনও প্রকাশ পায়। এসবের মিথস্ক্রিয়া পাকিস্তান-পর্বে রচিত একটি উপন্যাসে পাকিস্তানের প্রতি ঔপন্যাসিকের সমর্থন আর অস্পষ্ট থাকে না।

২.৪.৩.৩

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের (১৯৪৩-১৯৯৭) *খোয়াবনামা*র (১৯৯৬) মধ্যে প্রান্তিক মানুষের জীবনাচারে সচেতন জাতীয়তাবাদী কর্মতৎপরতা নেই। কিন্তু আছে শ্রেণিবাস্তবতা, যা স্তরবহুল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কীভাবে মানুষের শ্রেণি-পরিবর্তন বা স্তরান্তর ঘটে, তার রূপায়ণ আছে। তমিজের বাপের কাছে সংরক্ষিত চেরাগ আলী ফকিরের সেই খোয়াবনামা যাকে ঘিরে অনেকের মনে আগ্রহ ও রহস্য খেলা করে, তার হাতবদল রাষ্ট্রশক্তির হাতবদলের সমান্তরালে সমাজবিন্যাসে পরিবর্তন ও ক্ষমতার শ্রেণিগত রূপান্তরকে নির্দেশ করে। গায়ক কেরামত যতদিন তা হস্তগত করতে পারে, ততদিন গান বাঁধতে পারে; খোয়াবনামা হাতছাড়া হলে তা আর পারে না। সাতচল্লিশ-পরবর্তীকালে খোয়াবনামা তখন জোতদার শরাফতের জ্যেষ্ঠপুত্র সরকারি ছোট চাকুরে আজিজের কাছে। খোয়াবনামা হাতে পাওয়ার অব্যবহিত পরেই আজিজ সস্তায় বাড়ি কিনতে পারে। আজিজের পুত্র বাবরের কাছে খোয়াবনামা তাই 'পিকিউলিয়ার' বই। অন্যদিকে পাকিস্তান হবার মুসলিম লীগ নেতা ইসমাইলের সহযোগিতায় পর কাৎলাহার বিল মাঝিদের অধিকারে আসবার কথা। কিন্তু তা আসে কেবল কালাম মাঝির দখলে। শরাফত মণ্ডল জোতদার; জমিদার ও তার নায়েব পূর্ণচক্রবর্তীর সঙ্গে ছিল তার সংযোগ; কিন্তু কালাম মাঝি পরিণত হয় নব্য জোতদারে। লোকবিশ্বাস ও লোকাচারের সঙ্গে অবচেতন প্রক্রিয়ায় গেঁথে থাকে শ্রেণি অবস্থান ও শ্রেণিরাজনীতি। একজন দরিদ্র প্রান্তজন বৈকুণ্ঠ গিরির দাবি পোড়াদহের

সন্ন্যাসীর মেলার উদ্ভব ভবানী সন্ন্যাসী তথা ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী ভবানী পাঠকের মাধ্যমে। কিন্তু জমিদারের নায়েব পূর্ণচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় এটি মা ভবানী তথা ভবানী দেবীর দ'। এই লোকবিশ্বাসে যুক্ত থাকে আরেকটি নাম – মুনসি বয়তুল্লাহ, যে ছিল ভবানী সন্ন্যাসীর সহচর এবং ইংরেজ সর্দার টেলরের গুলিতে নিহত। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী সেই মুনসির অদৃশ্য নির্দেশেই পরিচালিত হয় কাৎলাহার বিলের কর্মক্রিয়া। ফলে জনজীবনের সামাজিক ইতিহাসের মর্মমূলে মিথ ও লোককথার মধ্য দিয়ে যুক্ত থাকে বৃহত্তর রাজনীতি। সেই রাজনীতি প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ও অধিকার আদায়ের রাজনীতি। এই রাজনীতি সচেতনভাবে না হলেও অস্তিত্বের প্রয়োজনে বিভিন্ন রূপে প্রান্তিক মানুষদের জীবনায়নের সঙ্গে মিশে থাকে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা-পরবর্তী সামাজিক মনস্তত্ত্বের কিছু সূক্ষ্ম পরিবর্তনও নির্দেশ করেন ঔপন্যাসিক। যেমন : তমিজের বাপের কবর জিয়ারতের সময় কালাম মাঝির 'দুই চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে তার দাড়িতে। দাড়ি এখনো তেমন বাড়ে নি। তবে দাড়ি হচ্ছে বেশ চাপ বেঁধে। মাথায় পরিষ্কার কিস্তি টুপি।' (আখতারুজ্জামান ২০০৮ : ৬২৮) মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে তমিজের পক্ষ যাতে না নেয় এজন্য কুদ্দুস মৌলবিকে কালাম হুমকি দেয় এই বলে 'পয়সা খাও হামার, আর কথা কও উল্টাপাল্টা, না?' (আখতারুজ্জামান ২০০৮ : ৬৩০) কালাম, শরাফত বা কাদের কেউই ধর্মজীবী নয়; ধর্ম নিয়ে এদের কোনো চিন্তাও ছিল না। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ধর্মকে অনুষঙ্গ করতে শেখে এরা। রাষ্ট্রের সৃষ্টিই যখন ধর্মকে কেন্দ্র করে, তখন প্রান্তিক পর্যায়ের শোষক হিসেবে তাদের মধ্যেও বৃহৎ রাজনীতির অবশেষ লক্ষ করা যায়। আরেকটি বড় ক্ষতি হয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির। যেমন মরতে হয় নিরীহ বৈকুণ্ঠকে।

সাতচল্লিশ-পরবর্তী রাজনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামোকে কতটুকু পরিবর্তন বা প্রভাবিত করতে পারে, তার একটি শিল্পপ্রতিবেদন এই *খোয়াবনামা*। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদসমূহে বিশ্লেষিত হয়েছে সাতচল্লিশের ঘটনা প্রান্তিক মনস্তত্ত্বকে কীভাবে প্রভাবিত করে, কারা উপকারভোগী হয়, কারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় এই পর্বে দেখা যায় প্রান্তিক মানুষের জীবনায়নের পরিবর্তন। কলকাতা থেকে ইংরেজি শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মুসলমান বগুড়া শহরের ইসমাইল ছেচল্লিশের নির্বাচনের বিভিন্ন সভায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল পাকিস্তান কায়েম হলে সমাজে চলমান বৈষম্যের অবসান হবে, 'জমিদারি মহাজনি থাকবে না। তেভাগা নিয়ে বলেছে, পাকিস্তান হলে ওসব এমনি হয়ে যাবে।' (আখতারুজ্জামান ২০০৮ : ৬০২) মুসলিম লীগের এই ধরনের সাম্যের বাণী প্রান্তিক কৃষক-মাঝি-কলু-কামারদের আকৃষ্ট করেছিল। শুধু তা-ই নয়, এই সাম্যের বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে বামপন্থি অজিত-মিনতিদেরও কাজ করতে দেখা গেছে ইসমাইলের সঙ্গে। ওইসময় গ্রাম পর্যায়ে জোতদার শরাফতের

বেকারপুত্র কাদের ইসমাইলের বক্তৃতাগুলোকে যেমন গ্রামীণ পরিসরে প্রচার করেছে, তেমনি কেরামতের মতো গায়কও উৎসাহিত হয়েছে পাকিস্তানের জন্য গান গাইতে। কিন্তু পাকিস্তান হবার পর আসলেই কি প্রান্তিক কৃষক হুরমতুল্লাহ, তমিজ, আবিতনের বাপ কিংবা বৈকুণ্ঠের কোনো জীবনমানের পরিবর্তন হয়েছে? কৃষকরা চেয়েছিল জমিদারি উচ্ছেদ এবং বর্গাচাষির ন্যায্য পাওনা নিশ্চিতকরণ। ইসমাইলের বরাতে কাদের তমিজদের জানায় এমন একটি আইন পাশ হতে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে উপকৃত হয়েছে শোষকশক্তিরই আরেক শ্রেণি। আগে জমিদার ও তার নায়েবরা শোষণ করতো। তাদের সহচর ছিল শরাফতের মতো জোতদাররা। পাকিস্তান হবার পর তার পুত্র কাদের ও আজিজের জীবনমানের সমৃদ্ধি ঘটেছে। কিন্তু তেভাগা বাস্তবায়িত হয়নি। বরং তেভাগা রুখতে শরাফত-কাদেররা বিভিন্ন অপতৎপরতা চালিয়েছে। তেভাগা আন্দোলনকারী হিন্দু কর্মীদের ভারতের দালাল বলে অভিহিত করা হয়েছে। আবার এককালের মহাজন জগদীশ সাহা কিংবা মুকুন্দ সাহার সম্পত্তিও পানির দরে কিনে নিতে পেরেছে শরাফত মণ্ডলদের মতো সামন্ত-সহচরেরা।

উপন্যাসে দেখা যায়, কাৎলাহার বিলের দখল যখন শরাফতের ছিল তখন মাছ ধারা অপরাধে তমিজকে জেল খাটতে হয়। মাঝিদের দাবি ছিল 'জাল যার জলা তার হবে।' ইসমাইলের হস্তক্ষেপে কাৎলাহারের দখল পায় কালাম মাঝি, পুরো মাঝি সম্প্রদায় নয়। আগে শরাফতকে খাজনা দিয়ে মাছ ধরতে হতো; এবার জাল ফেলতে কালাম মাঝিকে খাজনা দিতে হবে। ফলে মাঝিদের যে অধিকার সংরক্ষণের প্রত্যাশা, তা অপূর্ণই থেকে যায়। কালাম মাঝি কেবল মাঝিদের সর্দার বলেই নয়; তার ক্ষমতার আরেক উৎস তার সন্তান তহসেন। সাতচল্লিশ-পূর্বকালে যে তহসেন ছিল নিতান্ত একজন কনস্টেবল, সাতচল্লিশের পরে সে দারোগা, অতঃপর এসআইতে উন্নীত হয়। প্রান্তিক পর্যায়ে অর্থনৈতিক বিন্যাসের স্তরবহুলতা শোষণ পদ্ধতির স্তরবহুলতাকে সচল রাখে। আর তাই যমুনার মাঝিরা কালাম মাঝিকে টাকা দিয়ে কাৎলাহার বিলে মাঝ ধরতে এলে স্থানীয় মাঝিদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাধে। তমিজ কালামের নিষেধ উপেক্ষা করে জাল ফেলে বড় মাছ শিকার করার মুহূর্তে যমুনার মাঝিদের বর্শার আঘাতে আহত হয়। পাল্টা-আঘাতে গলায় বর্শাবিদ্ধ হয়ে নিহত হয় যমুনার মাঝিদের একজন। ফলে তমিজকে হতে হয় আবারও ফেরারি আসামি। কিন্তু তমিজ তো স্থবির কোনো ব্যক্তি নয়। যেমন স্থবির নয় গ্রামের খেটেখাওয়া কোনো মানুষ। শোষণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই তাদের জন্য চলমান প্রক্রিয়া। তাই দেখা যায়, অনির্দেশ্য গন্তব্য থেকে তমিজ চিনে নেয় তার নতুন গন্তব্য। কাদেরের সহায়তায় তমিজ তখন ট্রেনে করে ঢাকামুখী:

তমিজের গাড়ির ভেতর কে যেন বলে, 'ওদিকে খুব গোলমাল, কাল এক গাড়ি পুলিস গেলো, আজ আবার আরেক গাড়ি।'

কিসের গোলমাল ভাই?' কে যেন জানতে চাইলে ভিড়ের ভেতর থেকেই জবাব আসে, 'আধিয়ার চাষারা হাঙামা করিছিলো, পুলিসও খুব সাটিচ্ছে। মদদামাগী বাছবিচার নাই, যাক পাচ্ছে তাকই ধরিচ্ছে।'

তমিজ জিগ্যেস করে, 'ঐ গাড়ি কুটি যাবি?'

'শান্তাহার'

শান্তাহার! শান্তাহারের গাড়ি! শান্তাহারের গাড়ির ইনজিনের হুশহুশ ধ্বনি বলতে থাকে, 'শান্তাহার!', অক্ষরজ্ঞান না থাকলেও তমিজ এই লেখাটাই জীবনে প্রথম পড়তে পারে। শান্তাহার যাওয়া মানে সেখান থেকে যাও জয়পুর, যাও আক্কেলপুর, যাও হিলি। দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁ। আবার অন্য লাইন ধরে নাটোর কিংবা নবাবগঞ্জ। এতো পুলিস যাচ্ছে, মানে চাষারা দুই ভাগ ফসল তুলছে নিজেদের গোলায়, জোতদারদের গোয়ার কাপড় খুলে গেছে, শালারা দৌড় দিচ্ছে, লুকাচ্ছে পুলিসের গোয়ার মধ্যে। আবার এর মধ্যেই আমনের জন্যে একদিকে চলছে জমি তৈরি, পাট কেটে সেই জমিতে একটা দুইটা তিনটা লাঙল চাষ দেওয়া হলো, এখন বীজতলায় কলাপাতা রঙের ধানের চারা বিছানো। জমি তৈরি হলে সেখান থেকে চারা এনে ধান রোপার ধুম পড়ে যাবে। আহা, কাল সারা রাত বৃষ্টি হলো, জমি হয়ে আছে মাখনের মতো, লাঙল ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতে ঢুকে যাচ্ছে দুনিয়ার অনেক ভেতরে, তমিজ সেখান থেকে পানি পর্যন্ত টেনে আনতে পারে। শান্তাহারের গাড়ির ধোঁয়ায় আসমানে এখন আবার লেখা হয় ধানজমির ছবি। কী জমি গো! ধানচারা রুইতে না রুইতে ধানের শীষ বড়ো হয়, ধানের শীষ দুধের ভারে নুয়ে পড়ে নিচের দিকে। মোটা মোটা গোছার ধান কাটতে নেমে গেছে কতো কতো মানুষ তার আর লেখাজোকা নাই। জোতদাররা এসেছে পুলিস নিয়ে। রেলগাড়ি ভরা পুলিস স্টেশনে স্টেশনে নেমে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। তারা সব কলেরার মতো নামে, গুটিবসন্তের মতো নামে। চাষারা তাদের তাড়া করছে কাস্তে নিয়ে, শালারা ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাবার আর পথ পাচ্ছে না। (আখতারুজ্জামান ২০০৮ : ৬৬২)

তমিজের এই মনোভাবনার মধ্যে পলায়নপরতা নেই। সে যেন মুহূর্তে ভুলে যায়, সে ফেরারি আসামি। বরং এখানে আছে উৎপাদনমুখরতা, যেখানে কৃষক-চাষি-শ্রমজীবী ন্যায্য অধিকার পাবে। এমন অধিকারের জন্য আগাপাছতলা বিবেচনা না করে তারা পাকিস্তানকে সমর্থন দিয়েছিল। যেহেতু সেই অধিকার তারা অর্জন করতে পারেনি, ফলে সংগ্রামের যাত্রাও চলমান থাকে। এ এক নিরন্তর অভিযাত্রা। এটিই এই জনাঞ্চলের সংগ্রামী ও বিপ্লবী চেতনার সামূহিক পরম্পরা। তেভাগা আন্দোলনে প্রান্তিক মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ সেই সংগ্রামের পরম্পরাকে অতীত থেকে করে ভবিষ্যৎমুখী। জাতিসত্তার গভীরে প্রোথিত এই সংগ্রামী চেতনা। এই বিষয়টিকে সমালোচক চিহ্নিত করেছেন এভাবে:

বাঙালির জাতিসত্তার নির্মিতিতে বরাবর রয়ে-যাওয়া এই সেক্যুলার উপাদান সমাজের নানান স্তরে নানানভাবে ছড়িয়ে আছে; সর্বক্ষেত্রে তার প্রকাশ এক রকমের হয় না, একেক জায়গার নিজ বৈশিষ্ট্য স্বাতন্ত্র্য তৈরি করে দেয়। বগুড়া অঞ্চলের ধর্মসমাজের মেশামেশির যে-প্রতীক সন্ন্যাসী মেলার দেহে গাঁথা, অন্যত্র হয়তো সামাজিক

রূপভিন্নতায় তার দেখা মিলবে। ইলিয়াসকে এই সুযোগ হাতে তুলে দিয়েছিল তাঁর জন্মস্থান ও তৎসংলগ্ন সুপ্রাচীন ইতিহাস। (হায়াৎ ২০১৬ : ২০১)

বগুড়ার এই কাৎলাহার বিল-কেন্দ্রিক জনজীবন ইলিয়াসের ঔপন্যাসিক মুন্সিয়ানায় এমন এক রূপ রাভ করেছে, পাঠকের কাছে তা সমগ্র পূর্ববাংলার শ্রেণিভিত্তিক, কৃষিভিত্তিক ও রাজনীতিঘনিষ্ঠ জনমানুষের অনুবিশ্ব বলে মনে হয়। ফলে আলাদা করে জাতীয়তাবাদী চেতনা খোঁজার প্রয়োজন হয় না এই উপন্যাসে। বরং বিচিত্র কর্ম-ক্রিয়া-বিশ্বাস-মিথ-সংঘর্ষ-মিলন-টানাপোড়েন একটি জনপদের মধ্যে সদাবিরাজিত জাতীয় চারিত্র্য উন্মোচিত করে। জীবনের জটিল সংবেদ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ওই কালের রাজনীতি উপস্থিত হয়। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য:

ইলিয়াস ব্যক্তির গল্পই বলেন প্রধানত। বাংলা ভাষার অন্য অনেক রাজনৈতিক উপন্যাস-লিখিয়ের সঙ্গে ইলিয়াসের পার্থক্য এই যে, ইলিয়াস ব্যক্তি ও তার জীবনযাপনকে প্রধান রেখেই রাজনৈতিক গল্প বলতে শিখেছিলেন। তাই তাঁর কথাসাহিত্য রাজনৈতিক প্রবন্ধের অবৈধ অনুপ্রবেশের দোষে দুষ্ট নয়। (মোহাম্মদ আজম ২০১৭ : ৪১)

ইলিয়াসের চরিত্রের সংগ্রাম সম্মিলিত সংগ্রাম; সহজে তার চিহ্ন মুছে যায় না, অনেকটা সংস্কৃতিচেতনার মতো প্রত্নপ্রতিমার মতো জনজীবনে সেঁটে থাকে। তাঁর উপন্যাসে জাতীয় চেতনার উপস্থিত থাকে সমষ্টির স্বোপার্জিত ধারণা হিসেবে। একটি জনসমাজে জাতীয় পরিধিতে দ্বন্দ্ব ও প্রশ্নের জন্ম হয়। ইলিয়াসের ইতিহাস নির্মাণে দ্বন্দ্ব নিরসনের চেষ্টা আছে। তবে দ্বন্দ্বের বিচিত্র মাত্রিক কারণসমূহকে চিহ্নিত করে; অস্বীকার করে নয়। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ সমাজতান্ত্রিক হলেও তাঁর সাহিত্যাদর্শ মতবাদ-নিয়ন্ত্রিত নয়।

২.৪.৩.৪

সাতচল্লিশ-পরবর্তী পাকিস্তানপর্বের বাংলাদেশে প্রান্তিক পর্যায়ে সংঘটিত কার্যকর কতগুলো আন্দোলন ও প্রতিরোধ সেই কালের আর্থরাজনৈতিক বাস্তবতার স্বরূপ-সন্ধানকে পূর্ণতা দেয়। কেন্দ্রের আন্দোলনের ভিত্তিটিও তখন মজবুত হয়ে ওঠে ওইসব আন্দোলনের অনুষঙ্গে। সুনির্দিষ্ট কিছু আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে কিছু উপন্যাস। সেলিনা হোসেনের *কাঁটাতারে প্রজাপতি* (১৯৮৯) সেগুলোর একটি। এর পরিপ্রেক্ষিত ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ সালে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে সংঘটিত তেভাগা আন্দোলন। আরও সুনির্দষ্টভাবে বললে সেই আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী ইলা মিত্রের জীবনসংগ্রাম ও জীবনদর্শনের ঔপন্যাসিক রূপায়ণ ঘটেছে *কাঁটাতারের প্রজাপতি* উপন্যাসে। এই উপলক্ষ্যে উপন্যাসে বিবৃত হয়েছে ওই জনাঞ্চলের জীবনযাপন, অর্থনৈতিক বিন্যাস, জীবনমান, শ্রেণিসম্পর্কের বিচিত্র প্রান্ত। কালের

বিচারে পাকিস্তানি শাসনামলের শুরুর দিকে প্রান্তিক কৃষক ও তাঁদের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে শাসকশক্তির ভূমিকাও এ উপন্যাসে ঘটনাক্রমে উন্মোচিত হয়েছে। উপন্যাসে তেভাগা আন্দোলন ও তার ইতিহাসের প্রতি ঔপন্যাসিকের বিশেষ মনোযোগ ও সহমর্মিতা শুরু থেকে উপলব্ধি করা যায়। ইতিহাসকে সচল রাখতে তিনি ইলা মিত্র, তার স্বামী কমিউনিস্ট কর্মী রমেন মিত্র, সাঁওতাল সর্দার মাতলা মাঝি, শেখ আজহার হোসেন, অনিমেষ লাহিড়ী, তফিজুদ্দিন দারোগার সরব উপস্থিতি নির্ধারণ করেন। তেমনি জনজীবনের কথকতা অন্বেষণে আজমল, আজিজ, ইয়াসিন বসনি, আছিয়া, জোহরা, ছমিরের মতো চরিত্র নির্মাণ করেন। তবে সবার কেন্দ্রে ইলা মিত্রের অবস্থান ইতিহাস ও জন-ইতিহাসের সংযোগ হিসেবে কাজ করে। বেথুন কলেজ-কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া, মন্বন্তরের বছর কলকাতার মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সদস্য, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, সাঁতারে, বাস্কেটবল-ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন ইলা মিত্র এবং 'মানুষকে মানুষের মর্যাদায় দেখতে' আগ্রহী, 'প্রত্যেক বেলায় পেট ভরে খাওয়া' নিশ্চিত করার আন্দোলনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রমেন মিত্র পরস্পর সহযোদ্ধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় গ্রামীণ পরিসরে। তাদের গ্রামও নিস্তরঙ্গ গ্রাম নয়। সেই গ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী ও তাঁদের দীর্ঘ সংগ্রামী ইতিহাস।

তেভাগা আন্দোলন বাংলার কৃষক আন্দোলনের পরম্পরাগত বিভিন্ন আন্দোলনেরই একটি রূপ। ছোট-বড় অনেক ধরনের আন্দোলনের ইতিহাস বাংলার ইতিহাস – রংপুরের নুরলদীনের কৃষক আন্দোলন (১৭৮৩), তিতুমীরের কৃষক আন্দোলন (১৮৩০-৩১), গারো বিদ্রোহ (১৮৩৭-৩৮), সাঁওতাল কৃষক বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৬), নীল চাষীদের বিদ্রোহ (১৮৬০) প্রভৃতি বিদ্রোহের ইতিহাস। বিভিন্ন সময়ে কৃষক আন্দোলনগুলো সংঘটিত হয়েছে আবার শোষক দ্বারা নির্বাপিতও হয়েছে। কিন্তু এই বিদ্রোহ গুলো একই সূত্রে গাঁথা। 'প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দী থেকে সারা ভারতে যে কৃষক বিদ্রোহ দেখা যায়, প্রবাহিত 'ঐ গতিধারার সংগঠিত যোগফল' হলো তেভাগা সংগ্রাম।' (শেখর ১৯৮৫ : ১১) উপন্যাসে তাই সচেতনভাবে জানানো হয় – ১৮৫৫-র সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা, ১৯২৯-এর বিশ্বমন্দা, জোতদারদের বিরুদ্ধে ১৯৩২ সালে মালদহ-দিনাজপুরে সংঘটিত সাঁওতালদের সংগ্রামের কথা, চল্লিশের দশকে আবারও অধিকার আদায়ে সঙ্ঘবদ্ধ হবার কথা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, জমিদারি প্রথা, জোতদারদের ফসল বণ্টন-ব্যবস্থার নেতিবাচক প্রভাব ও তা থেকে উত্তরণে কৃষক সমিতি ও তেভাগা আন্দোলনের প্রসঙ্গ। আর প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে লাহোর প্রস্তাব, পাকিস্তান-আন্দোলন, নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিজয়, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস, দাঙ্গা, দেশবিভাগ,

কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা, মুসলিম লীগের অবস্থান বর্ণিত হয়েছে। গল্পে ঢুকে যায় বিপ্লবী তিতুমীর, ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন ও তাদের কালের কম্পরাম সিং-এর কথাও।

ইতিহাসের বাস্তব চরিত্র তথা ইলা মিত্রের তৎপরতা থাকে উপন্যাসের বহির্বাস্তব স্তরে। একই সঙ্গে আজমল-আজিজদের সংকট ও সংগ্রাম স্তরবহুল; ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র সেখানে মিথস্ক্রিয়াবদ্ধ। যেমন ষাট বিঘা জমিতে তুত উৎপাদক বড় রেশম চাষি পিতা ইয়াসিন বসনির বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে হয় আজমলকে। এটি যেন প্রজন্মেরও দ্বন্দ্ব। ইলা মিত্রকে কেন্দ্র করে চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কৃষকদের অধিকার আদায়ের যে বয়ান তৈরি করতে চান ঔপন্যাসিক, তার মধ্য দিয়ে তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকদের কাঠামোগত দৈন্য প্রকাশিত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে পূর্ববাংলা অধিকাংশ মানুষের ইতিহাস-সমর্থিত সমর্থন থাকলেও অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে জেঁকে থাকা বৈষম্যপরিস্থিতি প্রান্তিক মানুষকে দ্রুতই শোষণবিরোধী আন্দোলনে নামতে বাধ্য করে। বোঝা যায়, শহরে নাগরিক পরিমণ্ডলে পাকিস্তানি আদর্শ ও মূল্যবোধ নিয়ে দোলাচল থাকলেও প্রান্তিক মানুষ ছিল তা থেকে অনেকটা মুক্ত। তারা যেমন ঘোষণা দিয়ে কখনও পাকিস্তান-আন্দোলনে অংশ নেয়নি, তেমনি অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে পাকিস্তানি আদর্শকে প্রত্যাখান করতেও ঘোষণা দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। অস্তিত্বের প্রয়োজনে, জীবনের প্রয়োজনেই পাকিস্তানি আদর্শ প্রত্যাখানের ইতিহাস নির্মাণ করে তারা।

আজিজ-আজমল কিংবা মাতলা-হরেকরা আবহমান কাল থেকে নিপীড়িত, বঞ্চিত এবং বৈষম্যের শিকার। এমন নির্যাতিত মানুষদের গণজাগরণই পারে বৈষম্যের অবসান ঘটাতে। যে-কোনো সমাজে সংগ্রামের স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করতে যে যুক্তিশীল, ইতিহাস ও রাজনীতিসচেতন ব্যক্তির প্রয়োজন হয়, ইলা মিত্র সেই ভূমিকা গ্রহণ করেছে ইতিহাসে এবং এই উপন্যাসে। ইলা মিত্রের ব্যক্তিক সংকট ততটা মুখ্যতা না পেলেও সামন্ততান্ত্রিক জমিদারিবাড়ির পুত্রবধূ হিসেবে গ্রামের সাধারণের কল্যাণে কাজ করা, মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করা, সাঁওতালদের জীবনায়নে নিজেকে যুক্ত করা এবং তিলোত্তমা কলকাতা থেকে গ্রামীণ পরিমণ্ডলে জীবনকে বরণ করার মধ্যে তার ব্যক্তিত্বের প্রাগ্রসর রূপ অঙ্কিত হয়। ইলা মিত্র কেবল সমাজহিতকর কাজে নয়, সে বৃহত্তর জনমানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে কৃষক সভা ও কমিউনিস্ট পার্টির কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখে; তাকে পাড়ি দিতে হয় দীর্ঘ বন্ধুর পথ। শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় রূপান্তরিত হয় জনমানুষের 'রানিমা' হিসেবে।

*কাঁটাতারের প্রজাপতি*তে ঔপন্যাসিকের রাজনৈতিক অভিজ্ঞান স্পষ্ট। ইলা মিত্রের নিজের লেখা 'আমার জানা পূর্ববাংলা'য় যে বিস্তৃত বর্ণনা আছে, তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিকোণ তার সমরূপ। পাকিস্তানপর্বে হিন্দু জমিদার থেকে কৃষকরা আপাত মুক্তি পেলেও মুসলমান জোতদারদের শোষণ থেকে তাদের মুক্তি মেলে না। তাই তারা মধ্যচল্লিশের তেভাগা আন্দোলনকে আবারও জোরদার করে। আর জোতদাররাও শ্রেণিস্বার্থ রক্ষায় ব্যবহার করে রাষ্ট্রশক্তিকে। রাষ্ট্রশক্তি যেহেতু ধর্মের আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত, তাই কৃষকদের অধিকার আদায়কেও সাম্প্রদায়িক মোড়ক দেবার চেষ্টা হয়। আন্দোলনকারীদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান দুয়ের সহাবস্থান থাকলেও মুসলিম লীগ হিন্দু-কমিউনিস্ট কর্মীদের উপস্থিতির সুবাদে তাদের 'ভারতের দালাল' বলে অপপ্রচার করতে পারে। উপন্যাসে দেখা যায়, তেভাগা অমান্যকারী জোতদারদের খোলান থেকে ইলা মিত্রের নির্দেশে ধান আনতে গেলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। ত্রুটিযুক্ত ক্ষমতাকাঠামোয় এ পর্যায়ে জোতদার-মুসলিম লীগ-পুলিশ অভিন্ন শক্তিতে পরিণত হয়। এরপর আন্দোলন দমনে পুলিশ নারকীয় অত্যাচার চালায়। উপন্যাসের বর্ণনায় পাওয়া যায়:

> দাউদাউ পুড়ে যাচ্ছে গ্রাম। ঘাসুরা, চণ্ডিপুর, কেন্দুয়া, জগদল, দরল, শ্যামপুর, নাপিতপাড়া সর্বত্র আগুনের লেলিহান শিখা – কালো ধোঁয়া বিস্তৃত হচ্ছে এক গ্রামের সীমানা পেরিয়ে অন্য গ্রামে – নদীতীর এবং তারও ওপার। গুলির মুখে লুটিয়ে পড়ছে মানুষ। (সেলিনা ২০১৩ : ২৩১)

ইলা মিত্রকে ধরতেও অভিযান পরিচালিত হয়। ইলা মিত্র পার্টির নির্দেশে আত্মগোপন করে। অনেক চেষ্টার পরেও ইলা মিত্র গ্রেফতার এড়াতে পারে না। শুধু তেভাগা-কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবার জন্যই নয়, নারী হওয়ার জন্যও বন্দি অবস্থায় নারকীয় পুলিশি নির্যাতন সহ্য করতে হয় তাকে। এরপরেও ইলা মিত্র তাঁর কর্তব্যবোধে থাকে অবিচল। কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রচারিত ইলা মিত্রের জবানবন্দিতে তার সাহসী অবস্থান স্পষ্টতর হয়েছে। এর মধ্যে নির্যাতনের ফলে অনৈতিহাসিক চরিত্র আজমল ও হরেকের করুণ মৃত্যু ঘটেছে। একদিকে ধর্মনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রশক্তি, অন্যদিকে শোষণের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান-আদিবাসীর সামবায়িক অবস্থান প্রান্তিক পর্যায়ের সাম্প্রদায়িক যৌথতার ইতিহাসকে চিহ্নিত করে। ধর্মভিত্তিক নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান ধর্মতন্ত্রকে যেভাবে রাজনৈতিকভাবে অপব্যবহার করেছে, তার একটি প্রতিবেদনও এই উপন্যাস। সেলিনা হোসেনের অপরাপর উপন্যাসের মতো এখানেও তাঁর দায়বদ্ধতার পরিচয় স্পষ্ট।

শহরের দৃশ্যমান পরিবর্তনের মতো দ্রুতগামী না হলেও সাতচল্লিশ-পরবর্তী গ্রামীণ বাস্তবতার রূপান্তর ঘটেছে গুণগত ও গভীর অর্থে। এর সঙ্গে জড়িত ভূমিব্যবস্থা, সম্প্রদায়গত চেতনা এবং দীর্ঘদিন ধরে

বিরাজমান আর্থকাঠামোর সামূহিক পরিবর্তন। উপর্যুক্ত উপন্যাস পাঠেও দেখা যায়, আপাত অর্থে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকা মানুষেরা নতুন রাষ্ট্রকাঠামোর পরিবর্তনের ফলে বিচিত্রমাত্রিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। কেন্দ্র তথা ঢাকা কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয়কে সামনে নিয়ে এগুলেও গ্রামীণ বাস্তবতায় মানুষকে অনেকগুলো আভ্যন্তর প্রশ্নকে মোকাবিলা করতে হয়েছে। চিরায়ত শোষণ, শ্রেণিবৈষম্য, সাম্প্রদায়িক বোধ এবং একই সঙ্গে সম্মিলনের বোধে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা যোগ করে নতুন মাত্রা। পরবর্তী পর্যায়ে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে সামূহিক জাতীয়তাবোধের সূচনাবিন্দুকে চিহ্নিত করা হয়, গ্রামীণ বাস্তবতার রূপান্তর তাকে পূর্ণতা দেয়।

২.৪.৪. ভাষা আন্দোলন

২.৪.৪.১

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের তিন বছর অতিক্রান্ত হবার পর অর্থাৎ ১৯৫৫ সালের ফাল্গুনে একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপনে বাঙালি ছাত্র-জনতার সামবায়িক প্রতিবাদী অংশগ্রহণ ও অবস্থান জহির রায়হানের (১৯৩৫-১৯৭২) *আরেক ফাল্গুন* (১৯৬৯) উপন্যাসের দৃশ্যমান পটভূমি। বায়ান্নোর একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তোজ্জ্বল চেতনাই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় শক্তি। কিন্তু উপন্যাসের শুরুটা যখন হয় ভিক্টোরিয়া পার্কের বর্ণনায়, যে ভিক্টোরিয়া পার্ক একসময় ছিল আন্ডারগোরার ময়দান, ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহে অংশ নেবার অভিযোগে যেখানে নিরস্ত্র সিপাহিদের ফাঁসি দিয়ে গাছের ডালে প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়, তখন তা হয়ে ওঠে একুশের চেতনার সুদূর উৎসানুসন্ধানী। একই সঙ্গে উপন্যাসের প্রকাশকাল, ঔপন্যাসিকের রাজনৈতিক বোধি ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সংরক্ত হয় উপন্যাসের শিল্পশরীরে। এমন সময়ে এবং এমন সময়কে নিয়ে রচিত হয় *আরেক ফাল্গুন*, যা রাষ্ট্রের সঙ্গে জনতার সম্পর্কসূত্রের চিরায়ত স্বরূপকে উন্মোচিত করে। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের উত্তুঙ্গকালে সামরিক রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে একুশকে নিয়ে লেখা একটি উপন্যাস সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে সাহসী উচ্চারণ:

> ষাটের দশকের সামরিক শাসনপীড়িত পরাধীন বাংলাদেশে একজন শিল্পীর চৈতন্যে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির সংগ্রামী প্রেরণা কতোটা জীবন্ত রূপ ধারণ করতে পারে, জহির রায়হানের *আরেক ফাল্গুন* (১৯৬৯) তার প্রমাণ। শহীদুল্লা কায়সারের *সংশপ্তক* উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটেছিলো যে নবসম্ভাবনার ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে, *আরেক ফাল্গুন* সেই চেতনারই ধারাবাহিক প্রাগ্রসর সৃষ্টি। (রফিকউল্লাহ ২০০৯ : ১৮৬)

বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারণার উৎসবিন্দু যদি বায়ান্নোর একুশকে ধরা হয়, তাহলে উনসত্তরের ফেব্রুয়ারিকে বলা যায় সেই ধারণার শীর্ষবিন্দু। উনসত্তরের শিখরস্পর্শী ও মীমাংসিত জাতীয়তাবাদী ধারণার চূড়ান্ত ফলাফল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। কিন্তু বায়ান্নো থেকে উনসত্তর বা একাত্তর পর্যন্ত বাঙালির

চলার পথ কোনো অর্থেই মসৃণ ছিল না। বাঙালির বাঙালি হয়ে ওঠা, রাষ্ট্রযন্ত্রের পীড়ন মোকাবিলা করে সফল পরিণতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার পেছনে কাজ করেছে তার গভীরতর ইতিহাসচেতনা ও সমকালীন অর্থনৈতিক বিন্যাস। *আরেক ফাল্গুন* উপন্যাসে পাঠক সেই ইতিহাসচেতনার পরিক্রমণকে অনুভব করতে পারে, যা ১৮৫৭ বা তারও আগে থেকে বায়ান্নো, ১৯৫৫, উনসত্তর ও একাত্তরের পথ বেয়ে বর্তমান পর্যন্ত সঞ্চারিত। 'উনসত্তরের গণআন্দোলনের সময় দেখা গেল জহির রায়হান যুগপৎ আন্তর্জাতিক এবং জাতীয়তাবাদী।' (আরজুমন্দ ২০০৮ : ১৮৮) জহির রায়হানের জাতীয়তাবাদী অবস্থানকে তাই মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সুনির্দিষ্টকৃত বাঙালি জাতীয়তাবাদ দিয়ে শনাক্ত করা যায় না। তাঁর জাতীয়তাবাদী অবস্থানকে শোষকশক্তির বিরুদ্ধে বঞ্চিত জাতির নিত্য প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ও অধিকার আদায়ের লড়াই-চেতনার মধ্য দিয়ে বহুমাত্রিকভাবে চিহ্নিত করা যায়। এই উপন্যাসে দেখা যায় উঠতি শহর ঢাকার একদল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীর সাহসী, সচেতন ও সপ্রতিভ অবস্থান। 'জহির রায়হান *আরেক ফাল্গুন* উপন্যাসে খুব ঝটিকা কিছু মধ্যবিত্ত চরিত্রকে বায়ান্ন পরবর্তী একটি একুশের সময়কে নির্মাণ করেন।' (শহীদ ২০০৩ : ৮৬) আত্মত্যাগের বায়ান্নোর পর তিন বছর অতিক্রান্ত হলেও শহিদ দিবস পালনে শাসকগোষ্ঠীর বাধা, ষড়যন্ত্র, দমন-পীড়নচিত্রের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা ও বাঙালি জনমানুষের প্রতি তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অবস্থানটি স্পষ্টভাবে বুঝে নেওয়া যায়। এর বিপরীতে মুনিম, আসাদ, রাহাত, কবি রসুল, সালমা, নীলা, বেনুরা ওয়ে ওঠে ইতিহাসের সাহসী সন্তান। আবার সময়ের পরিবর্তনে নৈতিকতা বিসর্জন দেওয়া এক সময়ের 'কবিতা-লেখক' সরকারি গোয়েন্দা বিভাগে চাকরিরত মাহমুদের স্খলন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে মিশে থাকা সবুরের গুপ্তচরবৃত্তি, জাতীয় স্বার্থের চেয়ে আত্মস্বার্থসচেতন বজলে হোসেনের গা-বাঁচানো জীবন আলোচ্য কালপর্বের ছবিটাকে পূর্ণ অবয়ব দেয়। পুরো উপন্যাসে চরিত্রদের মধ্যে মুনিম কেন্দ্রে অবস্থান করে। তবে জহির রায়হান মুনিমকে একক গুরুত্ব দিতে চাননি; মুনিমের মধ্যে ব্যক্তি জহির রায়হানের স্পষ্ট উপস্থিতি সত্ত্বেও মুনিমকে নেতায় পরিণত করা হয়নি। বরং সামষ্টিক উচ্চারণই এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় স্বর। এবং উপন্যাসের প্রকাশকাল উনসত্তরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উত্তাল সময়ে প্রয়োজন ছিল এই সামষ্টিক স্বরের। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য:

> '৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের স্মৃতিকে পাকিস্তানী শাসকচক্র মুছে ফেলবার জন্য যে ভীতির রাজত্ব কায়েম করেছিল, তাকে ছাত্রছাত্রীরা একটা কাগজের টুকরোর মতো ছিঁড়ে ফেলল। ... এই আয়োজনটিকে একটি অগ্রসর বৈপ্লবিক শিক্ষার পরিচয় দিয়েছে। এই আয়োজনের মধ্যে দেখা গিয়েছে, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে উৎসর্গীকৃত কয়েকটি মুখচ্ছবি। এই উৎসর্গীকৃত যৌবনের প্রসারমান গণ্ডীটা

একেকটা সংগ্রামের অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে কিভাবে বড় হতে যাচ্ছে 'আরেক ফাল্গুন' তারও আভাস দিয়েছে। (রণেশ ২০১২ : ১৪৫)

মুসলমান অধ্যুষিত পূর্ববাংলা অর্থাৎ বাংলাদেশের বাঙালিদের আত্মপরিচয় নির্মাণে পাড়ি দিতে হয়েছে দীর্ঘ পথ। বাঙালি মুসলমান না বাঙালি – এই দ্বিধা বাঙালিত্বের মীমাংসায় এক জটিল সমীকরণ। ষাটের দশকে নানা রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্র ও পীড়ন মোকাবিলা করার অন্যতম প্রেরণাদায়িনী উৎস ছিল বায়ান্নোর একুশ। আর যা বাঙালির জন্য প্রেরণার উৎস, তাই পাকিস্তানি রাষ্ট্রযন্ত্রের জন্য ছিল আতঙ্কের কারণ। ফলে একুশ উপলক্ষ্যে পক্ষ-বিপক্ষ অবস্থান নিপীড়ক রাষ্ট্রযন্ত্র ও অধিকারসচেতন নাগরিকের একটি সুচিহ্নিত সমীকরণ। তাই *আরেক ফাল্গুন* উপন্যাস থেকে এবং সমসাময়িক বয়ান থেকে বায়ান্নো-পরবর্তী সময়ে পঞ্চাশের দশকের ঢাকার নাগরিক বা নাগরিক-উন্মুখ তরুণদের মধ্যে এমন কিছু প্রগতিশীল চিত্র, কর্মক্রিয়া ও নৈতিক অবস্থান লক্ষ যায়, যা বিস্ময়কর ও একইসঙ্গে আশাজাগানিয়া। সেই ঔজ্জ্বল্য ষাটের শেষাংশে অগ্নিস্ফূরণ হিসেবে প্রজ্বলিত হয়। বায়ান্নোর ফাল্গুন বাঙালি মুসলমানের মধ্যে এমন কিছু চেতনাকে জারিত করে দেয়, যা মুসলমানিত্বকে ধারণ করেও বাঙালি মধ্যবিত্ত তার শ্রেণিগত স্বার্থরক্ষা ও অর্থনৈতিক বিন্যাসে নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। একে বলা যায় মধ্যবিত্ত হয়ে ওঠার প্রথম ধাপ। *আরেক ফাল্গুন* উপন্যাসে ধর্ম ও রাজনৈতিক বোধের অপূর্ব মিথস্ক্রিয়া লক্ষ করা যায়। যে মুসলমান বঙ্গসন্তানরা এক সময় প্যান-ইসলামিক ধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পাকিস্তান-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, রাজনৈতিক গতিধারার পরিবর্তনের ফলে তারাই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে আত্মদানকারী শহিদদের স্মরণে রোজা রাখে; সেটা রমজান মাসে না, ফাল্গুন মাসে। এই উপন্যাসে রোজা রাখার তাৎপর্য এইখানে যে, বাংলা মুসলমানের ভাষা কিনা তা নিয়েই যখন এক সময় দ্বিধা ছিল, সেখানে বাংলা ভাষার জন্য প্রাণবিসর্জনকারীদের প্রতি শোক ও প্রতিবাদ হিসেবে মুসলমান তরুণ-তরুণীরা রোজা রাখছে। এই রোজা রাখা যতটা না ধর্মীয়, তার চেয়ে বেশি সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক। এইজন্য একুশে ফেব্রুয়ারিজাত যে চেতনা এই জনাঞ্চলের মানুষকে সামনের দিকে ধাবিত করে, তা হলে অসাম্প্রদায়িক চেতনা। এক অর্থে একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির প্রথম অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক ঘটনা, যা সম্ভব হয়েছিল পূর্ববাংলায়। ধর্মীয় বোধকে সঙ্গে করে নিয়েও এই জনাঞ্চলের চিরায়ত লোকায়ত ঐতিহ্যে লালিত মানুষ অধিকার আদায়ে, অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্নে, গণতন্ত্রায়ণে বেশি ক্রিয়াশীল। বাংলার জনমানুষের ধারাবাহিক সংগ্রামে বায়ান্নো-পরিস্রুত এই বোধকে সমালোচক অভিহিত করেছেন নতুন রেনেসাঁস হিসেবে:

> ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটি সিনথেসিসে পৌঁছায় এই সংগ্রাম। সৃষ্টি হয় নতুন চেতনা, অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবোধ। এর মধ্য দিয়ে ঢাকাকেন্দ্রিক এক রেনেসাঁসের জন্ম হয়। সাহিত্য-সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে সূচিত হয় নবজাগরণ। (সৈয়দ আজিজুল ২০২২ : ৪৬)

বায়ান্নোর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনটি ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক এবং এর সঙ্গে জড়িত রাষ্ট্র ও জনতার স্বার্থ এবং দুইয়ের টানাপোড়েন। রাতারাতি মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা যেভাবে শহিদ মিনার গড়ে তোলে, সরকারি বাহিনী (মিলিটারি) তা গুড়িয়ে দিলে সেই স্থানটিকে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ঘিরে রাখে এবং গন্ধরাজ ও গাঁদাফুলের চারা লাগিয়ে রাখে – এর মধ্য দিয়ে রাজনীতিচেতন সেক্যুলার নাগরিক মানসিকতার প্রকাশ লক্ষণীয়। এর সঙ্গে ধর্মের কোনো সংঘর্ষ নেই। কারণ ধর্মব্যবস্থা বা ধর্মীয় সংস্কৃতির মধ্যে বসবাস করেই তারা অধিকারচেতন। একইভাবে পঞ্চাশের দশকের তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিবাদের অনুষঙ্গ হিসেবে কালো পতাকা উত্তোলন, কালো ব্যাজ ধারণ, মেয়েদের কালো শাড়ি পরিধান নাগরিক মধ্যবিত্ত হয়ে ওঠার বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে। এই পদক্ষেপগুলো অভিনব ও প্রগতিমুখী। এবং এ-সবকিছুই আলোচ্য কালের আর্থরাজনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঘটেছে। ১৯৫২-র একুশকে ১৯৫৫-তে স্মরণ করবার মুহূর্তে সরকারের দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে মুনিম-আসাদদের শক্তি যৌথায়নের ভেতর দিয়ে তা গতিলাভ করেছে। প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে তারা খালি পায়ে হাঁটে; লরিভর্তি পুলিশও তাদের ভীত করতে পারে না। আসাদ যখন উচ্চারণ করে 'আমি যখন একা ছিলাম তখন সত্যি ভীষণ ভয় হচ্ছিল আমার। এখন অবশ্য আর ভয় হচ্ছে না।', (জহির ২০১৬ : ১১) তখন তার শক্তির উৎসটি স্পষ্টতই পরিষ্কার হয়ে যায়। এই যৌথশক্তিকে বরং ভয় পায় শোষকগোষ্ঠী। 'ইন্সপেক্টর রশীদের বুকটা কাঁপছিলো ভয়ে। কে জানে ছাত্রদের ব্যাপার, কিছু বলা যায় না।' (জহির ২০১৬ : ৬২) সরকারবিরোধী আন্দোলনকে জাতীয়তাবাদী বৃহত্তর গণচেতনায় পরিণত করবার পেছনে সবচেয়ে বড় প্রভাবক এই সঙ্ঘচেতনা। এই উপন্যাসের প্রধান স্বর সামষ্টিক স্বর। প্রকাশ্যে মিছিল সমাবেশে নিষেধাজ্ঞা থাকায় রাতের একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিটি ভবনের ছাদ থেকে 'সমস্ত শহর কাঁপিয়ে অযুতকণ্ঠের শ্লোগানের শব্দে চমকে' (জহির ২০১৬ : ৪৬) ওঠে সবাই। ঔপন্যাসিক এই অংশের বর্ণনায় তৈরি করেন কোরাসের ইফেক্ট, ধ্বনিগত অনুপ্রাস:

> আকাশে মেঘ নেই। তবু, ঝড়ের সঙ্কেত।
>
> বাতাসে বেগ নেই। তবু, তরঙ্গ সংঘাত।
>
> কণ্ঠে কণ্ঠে আওয়াজ, শহীদের খুন ভুলবো না। বরকতের খুন ভুলবো না। যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে। পৃথিবী কাঁপছে। ভূমিকম্পে চৌচির হয়ে ফেটে পড়েছে দিগ্বিদিক।

> শুধু উত্তর নয়। দক্ষিণ নয়। পূর্ব নয়। পশ্চিম নয়। যেন সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ছাতে ছাতে, প্রতি ছাতে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-যুবক ফেটে পড়ছে চিৎকারে, শহীদ স্মৃতি অমর হোক। (জহির ২০১৬ : ৪৭)

আর এভাবেই সামষ্টিক কোরাস স্বরে গভীর রাতেও জীবন্ত হয়ে ওঠে মুসলিম হল (এস এম হল), মেডিকেল হোস্টেল, ঢাকা হল (শহীদুল্লাহ্ হল), চামেরী হাউস (বর্তমানে সিরডাপ কার্যালয়, তখনকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাস), ফজলুল হক হল, বান্ধব কুটির, ইডেন হোস্টেল, নূপুর ভিলাসহ পুরো ঢাকা শহর। আবার ১৯৫৫-র একুশে ফেব্রুয়ারির ভোরে যখন পুলিশ হামলা চালায় মুসলিম হল এবং মেডিকেল কলেজের হোস্টেলে, তখনও একই রণহুঙ্কারে জেগে ওঠে সকলে : 'অন্ধকারের বুক চিরে ধ্বনির বজ্র ইথারে-ইথারে কাঁপন সৃষ্টি করলো।' (জহির ২০১৬ : ৫৪) স্লোগানের ধ্বনি সমগ্র উপন্যাসেই সামূহিক মাত্রা নিয়ে ধ্বনিত ও ব্যঞ্জিত হয়েছে। তাই পঞ্চান্নোর একুশে ফেব্রুয়ারিতেও ঘটে ফাল্গুনের পুনরাবৃত্তি। পুলিশি অবরোধের মধ্যেও গণজাগরণে অংশ নেয় নানা শ্রেণি-পেশা-বয়সের মানুষ। লেখক বর্ণনা দিচ্ছেন:

> কারো বয়েস ষোলো-সতেরোর বেশি হবে না। কারো চব্বিশ পেরিয়ে গেছে। কারো গায়ের রঙ কালো। কারো গৌরবর্ণ। কারো পরনে পায়জামা, কারো প্যান্ট। কিন্তু সংকল্পে সকলে এক। (জহির ২০১৬ : ৬৬)

জহির রায়হান ফাল্গুনের এই বর্ণনা দিচ্ছেন উনসত্তরের আরও একটি ফাল্গুনে দাঁড়িয়ে, যখন বাঙালি তার দ্বিধা কাটিয়ে বাঙালিত্বের শক্তিতে এক হয়ে নতুন এক বিপ্লবের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

এই উপন্যাসে শ্রেণির প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই আন্দোলনে মূলত অংশগ্রহণ করে বাঙালির নবোদ্ভিন্ন এক শ্রেণি, যে মধ্যবিত্ত হবার পথে ধাবমান। কিন্তু সকলের অর্থনৈতিক স্তরকাঠামো এক নয়। মুনিম-আসাদ-সালমাদের নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজে পড়ার ফলে যে প্রত্যাশার চাপ তৈরি হয়েছে, তারই অনিবার্য ফলাফল আন্দোলনে অংশগ্রহণ। আর এই ছাত্রসমাজের প্রতিই আস্থা রেখেছে প্রান্তিক শ্রেণির মানুষও। তাই মতিভাইয়ের চায়ের দোকানে তার বায়ান্নোর স্মৃতিচারণাসূত্রে ছাত্রদের আন্দোলনের উত্তুঙ্গ অবস্থা বর্ণনা কিংবা আন্দোলনকারী পরিচয় জানার পর মুনিমের কাছ থেকে চায়ের দাম না রাখার মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলনের প্রতি তার শ্রেণির অবস্থান ও সমর্থনকে স্পষ্ট করে। একদিকে শাসক গোষ্ঠী, অন্যদিকে সমগ্র 'শোষিত বাঙালি' – এই হিসাবকে বারবার এবং নানাভাবে প্রমাণ করতে চেয়েছেন জহির রায়হান। লক্ষণীয়, পরবর্তীকালের জাতীয়তাবাদী উপস্থাপনায় বাঙালিত্বের ধারণা শোষিত বাঙালির ধারণায় একাকার হয়ে গেছে। উপন্যাসে পুলিশ অফিসারের মুখ দিয়েই যখন উচ্চারিত হয়, 'লোফার এই খবরের কাগজের হকার বলুন, রিকশাওয়ালা বলুন, এমনকি সরকারি কর্মচারীদের মধ্যেও কেমন একটা সন্দেহের ভাব দেখলাম। আমাদের বিরুদ্ধে কেমন যেন

একটা ষড়যন্ত্র করছে ওরা।', (জহির ২০১৬ : ৪৮) তখন শাসক-শোষিতের সম্পর্কটি স্পষ্ট হয়ে যায়। অন্যদিকে দেখা যায় আন্দোলনের উত্তাল সময়ে লাইব্রেরিতে 'কিছুসংখ্যক ছেলে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে সেলফ থেকে কয়েকটা বই নামিয়ে সুবোধ বালকের মতো পড়তে বসে গেলো। বাইরে যে অতকিছু ঘটে গেলো যেন ওসবের সাথে কোনো যোগ ছিলো না ওদের।' (জহির ২০১৬ : ৬৪) অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক অবস্থানে থাকা গোয়েন্দা কর্মকর্তা মাহমুদ, বজলে হোসেনের কর্মক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রতিক্রিয়াশীলদের চারিত্র্য উন্মোচিত হয়। আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী রসুল একজন কবি, আবার বজলে হোসেনও কবি। কিন্তু কবিতে কবিতে কী আশ্চর্য তফাৎ! কবি রসুলের বর্ণনায় বায়ান্নোর একুশ হয়ে ওঠে জীবন্ত। রসুল পঞ্চান্নোর ফাল্গুনেও গ্রেফতার হয়। আর বজলে হোসেন বলে : 'আমরা হলাম সাহিত্যিক। সমাজের আর দশটা লোক কি শোভাযাত্রা বের করে, পুলিশের লাঠি গুলি খেয়ে প্রাণ দিলে কিছু এসে যায় না। কিন্তু আমাদের মৃত্যু মানে দেশের প্রতিভার মৃত্যু।' (জহির ২০১৬ : ৪৩) যুগে যুগে মুনিম-রসুলদের প্রগতিশীল ন্যায্য আন্দোলনের বিপরীতে এই সুযোগসন্ধানীরাও থাকে তৎপর। উপন্যাসের সমগ্রটা জুড়ে 'আমরা' আর 'ওরা' উচ্চারণে এই দুই পক্ষের ধারণা আরও স্পষ্টতর হয়।

আরেক ফাল্গুন উপন্যাসে লক্ষণীয়, রাষ্ট্রযন্ত্রের অনুষঙ্গগুলো ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামোর মতোই পুরোনো, বৃদ্ধ, গতানুগতিক ও দমন-মনস্ক। যেমন, পুলিশ কর্মকর্তা কিউ খান যে দমননীতি অনুসরণ করে তা যেমন অনুসৃত হয়েছিল ১৮৫৭-র স্বাধীনতা আন্দোলনে, তেমনি বায়ান্নোতে, তেমনি উনসত্তরে, এবং পরবর্তীকালেও। এ-যেন দমননীতির দুষ্টচক্র, নিপীড়নের পরম্পরা। একইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর দেয়ালে প্রতিবাদী পোস্টার সাঁটাতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে কিংবা ছাত্র-হলে কালো পতাকা উত্তোলনকে প্রভোস্টের কাছে মনে হয় 'আপদ', বর্তমান সময়েও তার পুনরাবৃত্তি দুর্লক্ষ নয়। জহির রায়হান বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্বর্ণযুগে অবস্থান করেও এ-উপন্যাসে কেবল বাঙালিত্বের বোধকে আরোপণমূলকভাবে উপস্থাপন করতে চাননি; বরং রাষ্ট্র ও জনতার এই চিরায়ত সম্পর্কের ভেতরে বাঙালি জনমানুষের অবস্থানকে ব্যাখ্যা করেছেন। উগ্র-জাত্যভিমানের বিরুদ্ধেও ছিল তাঁর সচেতন সংবেদনশীলতা। তিনি রাষ্ট্রের শোষণনীতির বিরুদ্ধে বাঙালি তরুণদের দাঁড় করিয়েছেন, কিন্তু জাতিগত বিদ্বেষ তৈরি করেননি। তাই ছাত্রদের প্রতিরোধ আন্দোলনে পুলিশের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে আগত, যাকে লেখক বলছেন সীমান্তের ছেলে, ওসমান খানের সাহসী অবস্থান সেই সত্যকে প্রমাণ করে। অপরদিকে তৎকালীন ক্ষমতার মোহগ্রস্ত বাঙালি নেতাদের প্রতি সাধারণ জনগণের হতাশার চিত্র আছে। যেমন দেখা যায় একুশের স্মৃতিরোমন্থনে মুনিমের আত্মীয়-অধ্যাপকের মন্তব্যে : 'নেতারা কেউ ছিলো না। তারা কখনই বা ছিলেন।' (জহির ২০১৬ : ৩৩)

বায়ান্নোর একুশের রাজনৈতিক অর্জনের ওপর ভর করেই বাঙালি নেতারা ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে বিপুল জয়ের মাধ্যমে পূর্ববাংলায় প্রাদেশিক সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়। সেই নির্বাচনের কথাও এসেছে সালমার ভাই শাহেদের উচ্চারণে : 'যাদের ভোট দিয়ে পাঠিয়েছিস তারা তো এখন কিছু বলছে না।' (জহির ২০১৬ : ৪৭) নেতাদের প্রতি আস্থাহীনতায় ছাত্রসমাজ হয়ে ওঠে সাধারণের প্রত্যাশা ও আস্থার আশ্রয়স্থল।

ইতিহাসের এক প্রান্তকে দিয়ে জহির রায়হান উপন্যাসটি শুরু করেছিলেন – সিপাহী বিদ্রোহীদের ফাঁসির মঞ্চ ভিক্টোরিয়া পার্ক দিয়ে। উপন্যাসের শেষে যখন আন্দোলনকারী তরুণ-তরুণীদের পুলিশ ভ্যানে করে লালবাগের মাঠে আনা হয়, তখন আবার তিনি ইতিহাসে ফিরে যান : 'হলদে রোদ চিকচিক করছে লালবাগের মাঠের ওপর, যেখানে এককালে সেই একশো বছর আগে, দেশি সিপাহিরা বিদ্রোহ করেছিল বিদেশি বেনিয়াদের বিরুদ্ধে – সেই মাঠে।' (জহির ২০১৬ : ৬৬) উপন্যাসের শুরুতে ও শেষে ইতিহাসের এই বন্ধনী জহির রায়হানের উদ্দেশ্য ও অবস্থানকে স্পষ্ট করে দেয় এবং ইতিহাস ও বর্তমানের বলয়টিও পূর্ণ হয়। 'এ-উপন্যাসের পটভূমি ১৯৫৫-এর একুশে ফেব্রুয়ারি হলেও সময় ও সমাজবোধের গভীরতায় তা বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের অখণ্ড অনুভবে প্রাণময়।' (রফিকউল্লাহ ২০০৯ : ১৮৬) শোষক-শোষিতের সম্পর্কটি ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করায় উপন্যাসের পক্ষ-বিপক্ষের চিরায়ত ধারণা পরিষ্কার হয়ে যায়। যে একুশ ছিল একটি আর্থরাজনৈতিক শ্রেণিস্বার্থমূলক আন্দোলন, তা-ই ইতিহাস পুনর্নির্মাণের মধ্য দিয়ে হাল আমলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হিসেবে পরিচিহ্নিত। শ্রেণিরাজনীতি-সচেতন জহির রায়হান সেই শ্রেণিস্বার্থের স্বরূপকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছেন। *আরেক ফাল্গুনের* গুরুত্ব এইখানে যে, এটি একুশের চেতনার বাস্তব কার্যকারণকে উন্মোচন করতে পেরেছে; এক ফাল্গুনের কথা বলতে গিয়ে বলা হয়ে গেছে বহু ফাল্গুনের কথা। সেই ইঙ্গিত আছে উপন্যাসের মধ্যেই, যখন শেষ বাক্যে তারা বলে – 'আসছে ফাল্গুনে আমরা কিন্তু দ্বিগুণ হবো।'

আরেক ফাল্গুন উপন্যাসে ব্যক্তি জহির রায়হানকে শনাক্ত করা আয়াসসাধ্য নয়। পঞ্চাশের দশকে প্রকাশ্যে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতি ছিল নিষিদ্ধ। ফলে গোপনে এই রাজনীতি পরিচালনা করতে হয়েছে। 'অগ্রজ শহীদুল্লা কায়সারের কাজে সহযোগিতার সূত্রধরেই জহির রায়হান রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৫৩/৫৪ সনের দিকে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন' (আফজালুল ১৯৮৬ : ৬) এবং ১৯৫৫ সালে রাজনৈতিক কারণে কারারুদ্ধ হন। এরও আগে ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের

সক্রিয় কর্মী হিসেবে কারাবরণ করেন। ১৯৪৮ সালে জিন্নাহর উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণার প্রতিবাদে ছাত্রসমাজের সক্রিয়তার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি। '১৯৪৫ সালে 'ভিয়েতনাম দিবস' এর মিছিলে জহির অংশগ্রহণ করেন। সেই মিছিলে পুলিশ লাঠিচার্জ করলে অন্যান্যদের সঙ্গে তিনিও আহত হন। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের মিছিলেও তিনি উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিতেন।' (সারোয়ার ১৯৮৮ : ১৩)। 'বায়ান্ন সালের ভাষা আন্দোলনে জহির রায়হানের অংশগ্রহণ কোন আকস্মিক বা নিছক আবেগতাড়িত ঘটনা ছিলো না। তাঁর রাজনৈতিক জীবন-প্রবাহের স্বাভাবিক গতি তাঁকে যুক্ত করেছিলো এই আন্দোলনের সঙ্গে।' (শাহরিয়ার ২০১৩ : ৭-৮) অর্থাৎ রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, শ্রেণিচেতনা ও জাতীয়তাবোধের একটি স্পষ্ট ধারণা ও উত্তরাধিকার নিয়েই সাহিত্যসৃজনে সক্রিয় ছিলেন জহির রায়হান। যদিও সমালোচক বলছেন – 'জহির রায়হানের উপন্যাস প্রকরণ-পরিচর্যায় পরিস্রুত ও পরিমার্জিত নয়, কিন্তু জীবনার্থ ও সমাজভাবনায় নিঃসন্দেহে প্রাগ্রসর এবং ইতিহাস-চেতনাসমৃদ্ধ।' (বিশ্বজিৎ ২০০৯ : ১২১) তাঁর *আরেক ফাল্গুন* সেই কতগুলো সচেতন রাজনৈতিক বোধের সামষ্টিক রূপ। আরোপিত মতবাদকে আশ্রয় করে নয়; বরং ওই কালের রাজনৈতিক উত্তাপকে ধারণ করেই এই জনগোষ্ঠীর একটি উদার ও সংগ্রামী চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে আলোচ্য উপন্যাসে। একুশে ফেব্রুয়ারি বা তৎপরবর্তী বছরের ঘটনাক্রমের মধ্যে এই উপন্যাস সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং বাঙালির সংগ্রামশীল চেতনার ধারাবাহিকতাকে আরও অনেক দূর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করে।

২.৪.৪.২

শওকত ওসমানের (১৯১৭-১৯৯৮) *আর্তনাদ* (১৯৮৫) ভাষা আন্দোলন-কেন্দ্রিক একটি উপন্যাস। শওকত ওসমান ইতিহাসের সাহিত্যিক রূপকার হিসেবে বিদ্বৎ-মহলে সমাদৃত। ইতিহাসের কালজ্ঞান-সম্পন্ন, বিশেষত বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারার একজন বিশ্বস্ত সৃষ্টিশীল লেখক হিসেবে তিনি সুচিহ্নিত। যতীন সরকার (১৩৯৭ : ৮) মন্তব্য করেন:

> শওকত ওসমান অত্যন্ত আন্তরিকভাবেই জাতিকে অসুস্থ ও পশ্চাৎগামী বিকৃত ইতিহাস থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। স্বজাতির মানুষগুলোর মধ্যে সুস্থ ইতিহাসবোধ সঞ্চার করাই তাঁর লেখনী চালনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

শওকত ওসমান এই উপন্যাসে ইতিহাসকে আশ্রয় করলেও ব্যক্তি ও সমাজ-সংকট রূপায়ণে সচেষ্ট। প্রকরণের দিক থেকেও নিরীক্ষাপ্রবণ থেকেছেন। উপন্যাসের শুরু একজন ভাষা আন্দোলনে শহিদের পিতার অব্যক্ত আর্তনাদের মধ্য দিয়ে। 'কোরাস' নামক এই অংশে একুশে ফেব্রুয়ারিতে ঘটে যাওয়া রক্তাক্ত অধ্যায়ের উন্মোচন ঘটেছে একজন সন্তানহারা পিতার হাহাকারের মধ্য দিয়ে : 'কি দোষ করেছিল

আমার ছেলে? ওরা কেন তাকে গুলী করে মারল? কি দোষ – কি দোষ করেছিল সে?' (শওকত ১৯৯৫ : ১৪) – এই প্রশ্ন, নৈঃশব্দ্য ও দীর্ঘশ্বাস বাঙালির জাতিসত্তার আর্তনাদের সমান্তরালতায় উপস্থিত। আর তার রূপায়ণে ঔপন্যাসিক পরিপার্শ্বের যে থমথমে ও পিনপতন নীরব পরিস্থিতি তৈরি করেছেন, তাতে ওই কালের একুশে ফেব্রুয়ারি বিষয়ে সামাজিক ও ব্যক্তিক অবস্থানটি প্রথমেই চিহ্নিত হয়ে যায়। অন্যান্য বাসযাত্রী, চাষি, ড্রাইভার যেভাবে একাত্মতা প্রকাশ করে এই পিতার আর্তনাদের প্রতি, তাতে ভাষা আন্দোলনে সামূহিক অংশগ্রহণ ও সম্মতির একটি চিত্র তৈরি হয় : 'জোড়া জোড়া জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ে। দমকে দমকে সিংহ-গর্জন এখনই ফেটে পড়বে। সকলের গলার শিরা কেঁপে কেঁপে উঠছে। দমকে দমকে।' (শওকত ১৯৯৫ : ১৫) 'ভাষা আন্দোলনের চেতনাবাহী এই উপন্যাসে সমাজের মাত্রা এবং ব্যক্তির মাত্রাকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন ঔপন্যাসিক।' (রফিকউল্লাহ ২০০৯ : ৩৫৫) শওতক ওসমানের রাজনীতিসচেতনতা সম্পর্কে আরও উল্লেখ্যঃ

> শওকত ওসমান আমৃত্যু শোষক ও শোষণের বিপক্ষে এবং নিম্নবর্গের পক্ষে এক প্রতিবাদী সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব। তাঁর উপন্যাসচিন্তায় সর্বদাই জ্বলজ্বল করে উপনিবেশবাদবিরোধী রাজনীতির এক শক্তিমান আলো। (সৈয়দ আজিজুল ২০১৭ : ৪)

ঔপন্যাসিক শওকত ওসমানের রাজনৈতিক বোধ যেমন মীমাংসিত, তেমনি এই উপন্যাসের চরিত্রগুলোর অবস্থানও অনেকখানি মীমাংসিত। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র আলি জাফর একজন কেরানি। তার শ্রেণি-অবস্থান নিম্নমধ্যবিত্ত, সে কৃষকপুত্র। পিতার দারিদ্র্যময় অবস্থা থেকে উন্নতির জন্য সে শহরে এসে লজিং থেকে পড়াশোনা করে। আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য পড়াশোনা শেষ না করেই কেরানির চাকরিতে প্রবেশ করে। কিন্তু কলেজে পড়াকালীন অবস্থায় সালামত আলির মতো প্রগতিশীল মতাদর্শের শিক্ষকের সাক্ষাৎ-লাভ জাফরের জীবনবোধে প্রভাব বিস্তার করে। জাফর আরও দেখা পায় পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী শিক্ষক নগীবউদ্দীনের। উত্তম পুরুষ তথা আলি জাফরের বয়ানে তার দুই শিক্ষকের কথোপকথন, কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়ে দুই জনের রাজনৈতিক অবস্থান, শ্রেণি-অবস্থান এবং তাদের সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের অবস্থান স্পষ্ট হয়েছে। এখানে চরিত্রের দ্বন্দ্বগুলো যতটা না ব্যক্তিক, তার চেয়ে বেশি সামাজিক। রাজনৈতিক বিষয়গুলোও সামাজিক সংকটের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। মূলত ১৯৪৭-এর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত মূলধারার যে বয়ান ইতিহাসে বর্ণিত আছে, তারই ঔপন্যাসিক রূপায়ণ ঘটেছে *আর্তনাদে*। প্রসঙ্গক্রমে এসেছে রিফিউজি ক্যাম্প, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, ট্রেনে প্রথম শ্রেণিতে ওঠা নিয়ে বাঙালি ও অবাঙালির বাক্‌-বিতণ্ডা ইত্যাদি। শব্দগতভাবে 'রিফিউজি' নিয়ে

ঔপন্যাসিকের কিছু স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষণ আছে। শওকত ওসমান ব্যক্তিঅভিজ্ঞতা থেকেও এই বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কথক আলি জাফরের বয়ানেই তা তুলে ধরা হয়েছে:

> 'রিফিউজি' শব্দ পূর্বে শুনেছিলাম। তখন চোখে দেখতে পেলাম তার প্রকৃত অর্থ পরিচয়। ওরা মানুষ। নিজেদের আবাস ভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে, তাই ত্যাগ করে এসেছে তারা নতুন আবাস রচনায় এবং এখানে জোরজবরদস্তি নেই কিছু। সবাই এসেছে নিজেদের অধিকারে। ... আরো অন্য এক নাম ছিল তা অর্থহীন। ওদের বলা হোত "বিহারী"। অথচ সকলে বিহার প্রদেশ আগত নয়। কেউ এসেছে উত্তর প্রদেশ থেকে কেউ উড়িষ্যা বা অন্য কোন ভারতীয় প্রদেশ থেকে। কিন্তু ওদের নামকরণ হয় এজমালী এক শব্দে বিহারী। (শওকত ১৯৯৫ : ১৭)

উপন্যাসের চরিত্রগুলো ভাষা আন্দোলনের প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র। যেমন, একুশে ফেব্রুয়ারি শহিদদের মধ্যে একজন অন্তত কেরানি পেশাভুক্ত ছিল – শফিউর রহমান – হাইকোর্টের কেরানি। আলি জাফরও কেরানি। কিন্তু এই কেরানি কোনো অসচেতন কেরানি নয়। তার মৃত্যুও দৈবাৎ নয়। ঔপন্যাসিক সচেতনভাবে তার সঙ্গে সালামতের মতো প্রগতিশীল অংশের পরিচয় ঘটান এবং তাকে শিক্ষিত কিন্তু কৃষকপুত্র হিসেবে নির্মাণ করেন। এবং উপন্যাসের শুরুতে যেভাবে সেই পিতার হাহাকার নিনাদিত হয়, তাতে পুরো পূর্ববাংলার কেন্দ্র থেকে প্রান্ত পর্যন্ত – সকল স্তরে যে ভাষা আন্দোলনের অভিঘাত পৌঁছেছিল তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আবার যখন আলি জাফরের বয়ানে পাওয়া যায় : 'মুসলিম লীগের পতাকাবাহী আমি কিশোর কাল থেকে' তখন চেতনাগত রূপান্তরের প্রক্রিয়াটিও যুক্তিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করা যায়। এই জাফরের উচ্চারণেই পাওয়া যায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অর্থনৈতিক ভিত্তি:

> ইংরেজরা এদেশে এসে একটু গুছিয়ে ওঠার পরই তাদের প্রথম কাজ হোলো রাষ্ট্রভাষা ফারসি তুলে দিয়ে ইংরেজিকে পাকাপোক্ত করা। তার ফল ত দেখছেন। আমরা অর্থাৎ মুসলমানরা ইংরেজী শিখিনি হিন্দুরা শিখেছে, তাই চাকরিবাকরি ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা অগ্রসর। (শওকত ১৯৯৫ : ২৭)

এমন উচ্চারণই শোনা গিয়েছিল একসময়ের পাকিস্তান-আন্দোলনের অন্যতম বাঙালি সচেতন রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবী ও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্বের অন্যতম তাত্ত্বিক আবুল মনসুর আহমদের (১৯৪৭ : সতের) লেখায়:

> উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিলে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজ রাতারাতি "অশিক্ষিত" ও সরকারী চাকরির "অযোগ্য" বনিয়া যাইবেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফারসীর জায়গায় ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষা করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম শিক্ষিত সমাজকে রাতারাতি "অশিক্ষিত" ও সরকারী কাজে "অযোগ্য" করিয়াছিলেন।

এর মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার সঙ্গে সাধারণ বাঙালির সম্পর্কটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উপন্যাসবিধৃত কলেজের অধ্যাপক সালামত তৎকালীন সময়ের প্রগতিশীল অংশের প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র। মুহম্মদ

শহীদুল্লাহ্‌, মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০২-১৯৮২), রণেশ দাশগুপ্ত (১৯১২-১৯৯৭), মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১) প্রমুখ যেমন ওই সংগ্রামক্ষুব্ধ বন্ধুর সময়ে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, সালামতের কর্তব্যজ্ঞান, সহনশীলতা, সহমর্মিতার মধ্য দিয়ে তা প্রকাশিত। আবার উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে দেখতে চাওয়ার পক্ষেও কিছু বাঙালি বুদ্ধিজীবী ছিলেন। আরবি হরফে বাংলা লেখার তৎপরতায়ও সহমত জানিয়েছিলেন কেউ কেউ। তাঁদের যুক্তি ছিল পাকিস্তানের মধ্যে কোনোরূপ দ্বিমত তৈরি না করা। নগীবউদ্দীন সেইসব রক্ষণশীল বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধিত্ব করেছে। *আর্তনাদ* উপন্যাসে ভাষা আন্দোলন যে মুখ্য বিষয়, তা উপন্যাসের শুরু থেকেই স্পষ্ট। 'একটি বিশেষ ঘটনার সঙ্গে তিনি [ঔপন্যাসিক] নির্বিশেষে মিলিয়ে দিয়েছেন ইতিহাসের অকথিত অনেক ঘটনা।' (বিশ্বজিৎ ২০০৯ : ৩২২) 'কোরসে'র পর 'একাকী' অংশে চরিত্রের স্বগতোক্তি হলেও তাতে রয়েছে ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ। সেখানে বাংলা ভাষাকে জননীসম করে একটি পরিপ্রেক্ষিত বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে:

> এত রক্ত, এত রক্ত ছিল এ শরীরে জননী বাংলা ভাষা? চেতনার দিগন্ত ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসার পূর্বে এই খানে মাটির উপর, জননী, তোমার বর্ণমালার ফুলঝুরিগুলো একে একে জ্বালিয়ে দাও যেন নবযুগের ভীষ্ম আমি, আমার উপর আলোক-শরশয্যার আয়োজন শুরু হয় এবং তেমনই আকাশ-মুখী শয়ান আমি অগণন নক্ষত্ররাজির বেহায়া প্রতিযোগিতা দেখতে চাই, যদিও আমার বক্ষ স্পন্দন নীহারিকার স্পন্দনের কাছে ক্রমশ পরাজিত। (শওকত ১৯৯৫ : ১৬)

এই উপন্যাসে নিম্নবর্গের চোখ দিয়ে একুশকে দেখার চেষ্টা থাকলেও তা মধ্যবিত্তের দৃষ্টিকোণে সমর্পিত; তবে এই দেখার মধ্যে বৈচিত্র্য আছে। উপন্যাসের শেষে ঔপন্যাসিক বিরামচিহ্নবিহীন কয়েক পৃষ্ঠার বাক্যবিন্যাস পাঠককে এক অস্থৈর্যময় মানসপ্রবণতা ও কালচেতনার সঙ্গে পরিচিতি ঘটায়। '*আর্তনাদ* (১৯৮৫) উপন্যাসে শওকত ওসমান ভাষা আন্দোলনের চেতনাবীজকে বাঙালি জাতিসত্তার মৌল আবেগের সঙ্গে সম্পর্কিত করে উপস্থাপন করেছেন।' (রফিকউল্লাহ ২০০৯ : ৩০৩) সামূহিক সংকটকে ব্যক্তির সংকটের মধ্য দিয়ে এখানে উপস্থাপন করা হয়নি; তবে ব্যক্তির সংকট বহুদূর পর্যন্ত যেতে চেয়েছে। এই বিবেচনায় *আর্তনাদ* উপন্যাসকে ভাষা আন্দোলনের একটি প্রতিনিধিত্বশীল সাহিত্যকর্ম বলা যায়।

বাংলাদেশের বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার সমান্তরালেই পঠিত হয় শওকত ওসমানের উপন্যাস। *আর্তনাদ* উপন্যাসটিও সেই পাঠেরই অন্তর্গত। পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রামে জন্ম নেওয়া শওকত ওসমানের শৈশব-কৈশোর-শিক্ষাজীবন ও কর্মজীবনের প্রারম্ভপর্ব কাটে পশ্চিমবঙ্গে। '১৯৪০ এর দশকের গোড়া থেকেই কলকাতাকেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চায় শওকত ওসমান ছিলেন

নিবেদিতপ্রাণ।' (অনীক ২০১৪ : ১১) ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগজনিত বাস্তবতায় তিনি তৎকালীন পূর্ববাংলায় আসেন চাকরির সূত্র ধরে – চট্টগ্রাম সিটি কলেজে প্রভাষক হিসেবে। '১৯৪৭ সালে শওকত ওসমান যখন কলকাতা ছেড়ে চট্টগ্রামে সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন, তখনই তাঁর পরিবারের সদস্যদের সেখানে নিয়ে আসেননি। নিজের চাকরি ও পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তার প্রশ্নে তিনি ছিলেন সন্দিহান। ... এই পারিবারিক উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ শওকত ওসমানকে অনেক সময়ই স্পষ্ট কথা বলতে দেয়নি।' (কুদরত ২০১৩ : ৫০) ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি একজন সচেতন নাগরিক। একুশের প্রথম সংকলন হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩) সম্পাদিত *একুশে ফেব্রুয়ারী*তে (১৯৫৩) 'মৌন নয়' শীর্ষক তাঁর একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু উপন্যাস রচনার বিষয়ে তিনি অনেক সময় বিচিত্র কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। যেমন আইয়ুবি স্বৈশাসনের আমলে তাঁকে রূপক-প্রতীকের আশ্রয়ে লিখতে হয় *ক্রীতদাসের হাসি* (১৯৬২)। সমকালের অন্যান্য সাহিত্যিকরা একাধিক উপন্যাস রচনা করলেও ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছেন। শওকত ওসমানও ভাষা আন্দোলন নিয়ে *আর্তদান* লিখতে পারলেন স্বাধীন বাংলাদেশের কাল পরিসরে; অনেকখানি নিরাপদ প্রতিবেশে। সেখানে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ; সমাজের সঙ্গে বৃহত্তর রাজনীতির সংযোগ সাধনের শিল্প প্রয়াস আছে।

আর্তনাদ উপন্যাসটি মূলত বর্ণনাধর্মী। ভাষা আন্দোলন নিয়ে জানা কথাগুলোই উপন্যাসের আঙ্গিকে রূপদান করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু পরিচিত বয়ানের রূপায়ণ সত্ত্বেও রাজনৈতিক চিন্তার দিক থেকে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো গ্রামীণ ও প্রান্তিক পর্যায় থেকে শিক্ষিত হয়ে ওঠার অভিযাত্রায় উক্ত কালপর্বের বিচিত্র পক্ষ-বিপক্ষের সঙ্গে উপন্যাসের মূল চরিত্র আলি জাফরের সাক্ষাৎ ও সম্পৃক্তি। এর মধ্য দিয়ে একজন নিরীহ বাঙালি শিক্ষিত যুবক কেরানি অস্তিত্বের প্রয়োজনে তার পক্ষ ও অবস্থান বুঝে নিতে সক্ষম হয়েছে। ফলাফল হিসেবে তাকে একুশে ফেব্রুয়ারিতে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে। এর আরেকটি দিক – আলি জাফরের মৃত্যুর পর তার পিতার অর্থাৎ একজন ভাষাশহিদের দরিদ্র বৃদ্ধ পিতার আর্তনাদের সঙ্গে অপরাপর শ্রমজীবী মানুষের একাত্মতার রূপায়ণ, অর্থনৈতিক বিন্যাসে যারা নিম্নশ্রেণিভুক্ত। ঔপন্যাসিকের অভিপ্রায় একুশের চেতনা তথা বাঙালি জাতীয়তাবোধের ধারণা বায়ান্নোর অব্যবহিত পরে যেভাবে সর্বব্যাপী হয়েছিল, তাকে উপন্যাসে ধারণ করা, একুশের চেতনার সামূহিকতা ও সামষ্টিকতাকে চিহ্নিত করা।

২.৪.৪.৩

সেলিনা হোসেনের (জ. ১৯৪৭) *যাপিত জীবন* (১৯৮১) উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের করণকৌশলের চেয়েও সক্রিয় ইতিহাস পাঠের বর্ণনা। ইতিহাসের প্রতিষ্ঠিত বক্তব্যগুলোই উপন্যাসের চরিত্ররা উচ্চারণ করে। সেলিনা হোসেন যে পূর্বপ্রকল্পিত বক্তব্যই উচ্চারণ করবেন, তাঁর নির্মিত প্রতিটি চরিত্র সে-বিষয়ে সচেতন। যেমন, ১৯৪৮ সালে কাজী মোতাহার হোসেনের 'রাষ্ট্রভাষা ও বাংলাদেশের ভাষা-সমস্যা' শীর্ষক (প্রথম প্রকাশ : *সওগাত* ১৯৪৭) প্রবন্ধের প্রসঙ্গ উপন্যাসে আছে। রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে তিনি বলেছিলেন, 'বর্তমানে যদি গায়ের জোরে উর্দুকে বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের উপর রাষ্ট্রভাষারূপে চালাবার চেষ্টা হয়, তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে। কারণ ধূমায়িত অসন্তোষ বেশীদিন চাপা থাকে না। শীঘ্রই তাহলে পূর্ব-পশ্চিমের সম্বন্ধের অবসান হবার আশংকা আছে।' এই প্রবন্ধ পড়ে আলোড়িত হয় জাফর। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় – 'সত্যি কি তেমন দিন আসবে যেদিন পূর্ব-পশ্চিমের সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে? ভাষাভিত্তিক একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে? প্রবন্ধের এ'কটি পংক্তি জাফরের মগজে গেঁথে থাকে। ও নানাভাবে বিশ্লেষণ করে। একবার মনে হয় সম্পর্ক শেষ হয়ে যাওয়াই উচিত। তেমন ঘটনা ঘটলে বাঙালির অহংকারের সীমা থাকবে না।' (সেলিনা ২০০৯ : ৫১) ১৯৪৮-এ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শত নিপীড়ন সত্ত্বেও এ-ধরনের ভাবনা ভাবার কোনো পরিস্থিতির ইতিহাস-সম্মত প্রমাণ নেই। এটি লেখকের উচ্ছ্বাসমূলক উচ্চারণ। কয়েক বাক্য পরে যখন জাফর তার বাবা সোহরাবকে বলে, 'তবে তিনিও [কাজী মোতাহার] কিন্তু বাবা পঁচিশ বছর এগিয়ে কথা বলেছেন।' (সেলিনা ২০০৯ : ৫২) তখন স্পষ্ট হয়ে যায় লেখক সেলিনা হোসেন সেই কাল থেকে পঁচিশ বছর পর স্বাধীন বাংলাদেশকে দেখেছেন বলেই চরিত্রের মুখে সেই কথা জুড়ে দিতে পেরেছিলেন। এরূপ আরও কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় বলেই সেলিনা হোসেনের ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাসগুলোকে স্বতন্ত্র মানদণ্ডে পাঠ করতে হয়।

পারিবারিক পরিমণ্ডল থেকে পূর্ববাংলার রাজনীতির পরিমণ্ডলে প্রবেশ ঘটে জাফরের কাছে থাকা 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' এই পুস্তিকার সঙ্গে পরিচয় করানোর মধ্য দিয়ে। জাফর বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া ছাত্র, সচেতন নাগরিক। সপরিবারে পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুর থেকে উন্মূলিত হয়ে ঢাকায় এসে তার বাবা সোহরাব আলিকে অভিযোজনজনিত পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হলেও জাফরের রাজনীতি-সম্পৃক্ততা এই পুস্তিকা দিয়ে শুরু হাওয়ার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য ও অভিপ্রায় সম্পর্কে শুরুতেই ধারণা পাওয়া যায়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ওই কালে শিক্ষিত তরুণদের নিঃসন্দেহে আলোড়িত করেছিল। জাফর তাদের একজন। কিন্তু জাফরের সার্বিক কর্মকাণ্ডে তাঁর এই রাজনীতি-সচেতনতার পেছনে অন্য কোনো আর্থসামাজিক সংকট প্রত্যক্ষ করা যায় না। কেবল ভাষার

প্রশ্নেই সে সরব। যেমন, ফজলুল হক মুসলিম হলের সভায় উপস্থিত জাফর বক্তাদের কথা শুনে বিরক্ত বোধ করে। কারণ 'বক্তারা সবাই বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার দাবি জানায়। মেজাজ খিঁচে যায় ওর। পূর্ব পাকিস্তানের কেন? পাকিস্তানের নয় কেন? কিসের হীনমন্যতা? চাইবার সাহস না থাকলে কেউ পাতে তুলে দেবে?' (সেলিনা ২০০৯ : ৫৪) এর মধ্যে ঔপন্যাসিকের জাতীয়তাবাদী প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। এভাবে উপন্যাসে বিবৃত হয় শিক্ষাসম্মেলনে গৃহীত পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর প্রস্তাব, এর প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় প্রতিবাদী বক্তৃতা, বিশেষত মুনীর চৌধুরীর বক্তৃতা। এছাড়াও ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাব, হামিদুল হক, নুরুল আমীন, খাজা নাজিমুদ্দিন, শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান, মাওলানা আকরম খাঁ, লিয়াকত আলি খান প্রমুখ ব্যক্তি, ভাষা সংক্রান্ত বিভিন্ন স্লোগানের প্রসঙ্গ, প্রভৃতি প্রামাণিক বর্ণনা আছে। ১৯৪৮-এ ১১ই মার্চের ধর্মঘট, দমনপীড়ন-গ্রেফতার, আপস-চুক্তি, পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন, ভাষাপ্রশ্নে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-অজিত গুহর অবস্থান ও বিবৃতি, বাংলা ভাষায় আরবি হরফ প্রবর্তনের উদ্যোগ ও এর বিরোধিতা, ১৯৫০-এর দাঙ্গা, ১৯৫১-এর দুর্ভিক্ষ, লবণ নীতি – ইতিহাসের ধারাবাহিক ঘটনাক্রম উপন্যাসেও সহজ বিবরণে উল্লেখিত আছে। এইসব ঐতিহাসিক তথ্য ব্যবহার করে ঔপন্যাসিক চরিত্রদের উজ্জীবিত করতে তৎপর। যেমন জাফর তৎকালীন সংকটকে দেখেছে এভাবে:

> জাফরও নিজের মধ্যে জোরালো শক্তির তেজ দেখে। যে কারণে ও অবিচল থেকে বুক পেতে দিতে পারে, যেন সমস্যাটা ওর জন্মজন্মান্তরের, আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। এর জন্যে ওর পূর্বপুরুষও মূল্য দিয়েছে, নির্যাতন সয়েছে। ভাষার প্রশ্নে আপস নেই। দেশের প্রশ্নে আপস নেই। (সেলিনা ২০০৯ : ৬০)

কিন্তু দেশের ধারণা স্পষ্ট হয়নি। জাফর বাংলাদেশের ইতিহাসের বয়ানের সমান্তরালিত। জাফর এই উপন্যাসের কেন্দ্রে থাকে এবং সে মীমাংসিত। সে শুরু থেকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদী। তাই সে বলতে পারে:

> ভেবে দেখ ওরা কি বুঝবে চর্যাপদের ভাষা? বুঝবে কি আবদুল হাকিম কত গভীর স্বরে মাতৃভাষার প্রতি তার প্রেম উচ্চারণ করেছে? ওরা কি বুঝবে আলাওলের কাব্য? বুঝবে কি বাংলা নববর্ষ আমাদের জীবনের কতখানি? বৈশাখি মেলা না হলে আমাদের গ্রামে কোনো উৎসব জমে না? (সেলিনা ২০০৯ : ৬১)

কিন্তু সোহরাবের আত্মকুণ্ডলায়নের সংকটটিই উপন্যাসকে খানিকটা হলেও দ্বন্দ্বমুখর ও জীবনজিজ্ঞাসায়িত করে। তার মতো স্ত্রী আফসানা খাতুনও আত্মকুণ্ডলায়িত। সেজন্য দেখা যায় সে নিজের সঙ্গে কথা বলে। দুই প্রজন্মের মধ্য দিয়ে দুই সংকটকে উপস্থাপন করা হয়েছে। সোহরাব তার ভিটেমাটি শেকড় থেকে বিচ্যুত হয়ে হয়েছে আত্মকুণ্ডলায়িত। বহরমপুরের নিজ বসতে হার্বেরিয়াম গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখা সোহরাবকে বরণ করে নিতে হয় ঢাকার সংকীর্ণ জীবন। 'বংশালের সরু নোংরা

গলির লোক চলাচল দেখতে দেখতে তার মনে হয় জীবনে অনেক স্বপ্ন ছিলো।' (সেলিনা ২০০৯ : ৩৫) বাধ্য হয়ে নতুন জীবন বরণ করে নিতে হলেও এই অঞ্চলের মানুষ সম্পর্কে সোহরাবের পর্যবেক্ষণও প্রকাশ পায় :

> ওদের সঙ্গে কথা বললে বুকের ভার হালকা হয়। অবলীলায় নিজের সুখ-দুখের কথা গড়গড়িয়ে বলে যায়। লোকগুলো কি ভীষণ সরল। বহরমপুরের লোকেরা এমন ছিলো না। ওদের মাঝে একটা আড়াল ছিলো। ওরা কাছে এলেও দূরত্ব রাখতো। কিন্তু এখানকার লোকদের ঐ সবের বালাই নেই। যাকে বিশ্বাস করে তাকে মনপ্রাণ ঢেলে দেয়। (সেলিনা ২০০৯ : ১৮)

উপন্যাসের বয়ানে কিছু সামাজিক চিত্র আছে; যেমন নারী যাত্রীর রিকশাকে চারপাশ শাড়ি দিয়ে ঘেরাও করে থাকা। জাফর নতুন দেশে এসে নতুন সংকটকে নিজের সংকট বলেই জেনেছে। এক সাক্ষাৎকারে সেলিনা জানান, 'জাফর চরিত্র আমি বরকতের প্রতীকী চরিত্র হিসেবে রেখেছি।' (হারুন ২০২৩ : ৫৪০) জাফরের মধ্যে এই দেশে নিজের অস্তিত্ব নিয়ে কোনো দ্বিধা নেই। সে মা আফসানাকে যেমন বলে : 'বাপ-দাদা চৌদ্দপুরুষের ভিটে আমার এই দেশ। নিজের দাবি নিয়ে থাকি, কারো তোয়াক্কা করি না।' (সেলিনা ২০০৯ : ১৩৩) অন্যদিকে সোহরাব-আফসানার সময় কাটে স্মৃতি রোমন্থনে। তার কাছে তার চারপাশ, গাছপালার মতোই হিন্দু গৃহকর্মী দম্পতি হরেণ-মালতী আপনজন। হরেণ ভিন্নধর্মাবলম্বী হলেও নিজ দেশে পরবাসী; সোহরাব তো পরবাসীই। তৈরি হয় মানসিক ঐক্যের জায়গা। শাসকগোষ্ঠীর কাছে দুই পক্ষই দুর্বল। কবুতরের বকম-বকম শব্দে 'কখনো মনে হয় ঐ শব্দ ট্রেনের ঝমঝম, আমনুরা থেকে একদল উদ্বাস্তু নিয়ে ছুটে আসছে। তার মধ্যে একটি পরিবার নতুন মাটিতে শেকড় ছড়িয়ে দিয়েছে, তাদের স্বপ্নগুলো ফুটে উঠছে।' (সেলিনা ২০০৯ : ৩৪) পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত বাড়ি বদল করতে পারা একটি মধ্যবিত্ত পরিবার নতুন শহরে এসে কীভাবে অভিযোজিত হচ্ছে, তাদের অর্থনৈতিক বিন্যাসটি কেমন, তার একটি চিত্র সোহরাব পরিবারকে দেখে বোঝা যেতে পারে:

> সোহরাব আলির বড় ছেলে মারুফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানিতে চাকরি নিয়েছে। যা বেতন পায় তাতে সংসার ভালোই চলে। মাঝখানে জাফর, ও ইউনিভার্সিটিতে ঢুকেছে মাস্টার ডিগ্রি ফার্স্ট পার্ট। ছোট দীপু। আরমানীটোলা স্কুলে যায়। (সেলিনা ২০০৯ : ১৮)

১৯৫২তে এসে কনিষ্ঠপুত্র দীপুও বড় হয়ে ওঠে। সে যোগ দেয় একুশের মিছিলে। দীপুও আহত হয়। একুশের আত্মদানকারী ভাই জাফরকে হারিয়েও সে মিছিলে অংশ গ্রহণ করে:

> সে মিছিলের দিকে তাকিয়ে আঞ্জুম কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না যে জাফর নেই। ও জানে, যে বিন্দুতে মিছিল শুরু, সে বিন্দুতেই জাফরের অবস্থান। ও বিড়বিড় করে, তোমাকে আমি কিছুতেই মরতে দেবো না মিছিল [জাফর]। আমি কোনোদিন মা হলে সে সন্তানের নাম রাখবো জাফর। (সেলিনা ২০০৯ : ১৫৯)

উপন্যাসের পরিণতি বিয়োগাত্মক হলেও রোম্যান্টিক। এখানে রাজনীতির স্বরূপ অঙ্কনটিও রোম্যান্টিক মাত্রা পেয়েছে। সাতচল্লিশ-পরবর্তী অপরাপর আর্থরাজনৈতিক জিজ্ঞাসা কেবল রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ঘটনাক্রমে এসে মিলেছে। উপন্যাসের নিজস্ব কোনো বয়ান বা ভাষ্য তৈরি হয়নি; ইতিহাসের ঘটনাই উপন্যাসের ঘটনা হয়ে উঠেছে।

২.৪.৪.৪

সেলিনা হোসেনের *নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি* (১৯৮৫) ভাষা আন্দোলনের উপন্যাস হিসেবে পরিচিত। যদিও উপন্যাসটিকে দুই পর্বে ভাগ করে ফেলা যায় সহজে। প্রথম পাঁচ পরিচ্ছেদ বিপ্লবী সোমেন চন্দকে (১৯২০-১৯৪২) নিয়ে বলয়িত। শেষ ছয়টি পরিচ্ছেদ মুনীর চৌধুরীকে কেন্দ্র করে রূপায়িত। সোমেন চন্দের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপনে তরুণ মুনীর চৌধুরী অংশগ্রহণ করেন। এক সোমেন চন্দের মৃত্যু হয়, কিন্তু সেই সূত্রটি ছিন্ন হয় না; বরং মুনীর চৌধুরী সংগ্রামী জীবনের সেই 'রিলে রেস'কে জীবন্ত করে রাখেন। সেলিনা হোসেন এই উপন্যাসে ঐতিহাসিক চেনা মানুষগুলোকে উপন্যাসের চরিত্র করে তুলেছেন। 'বাঙালির স্বাতন্ত্র্যকামী সংগ্রামী চেতনা, যে চেতনার অন্তর্মূলে ছিল ত্যাগ, অসাম্প্রদায়িকতা ও সৌহার্দের মানবিক প্রেরণা। জাতিসত্তার সেই মর্মবাণীই সেলিনা হোসেন অনুসন্ধান করেছেন *নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি* উপন্যাসে।' (সিরাজাম ২০১৮ : ১০০) ইতিহাসের বয়ানকে ঔপন্যাসিক চরিত্রের কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। মুনীর চৌধুরীর সাংগঠনিক কর্মক্রিয়া, ব্যক্তিগত ত্যাগ, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম প্রভৃতি শিল্পী মুনীর চৌধুরী ও কর্মী মুনীর চৌধুরীর মধ্যে মেলবন্ধন স্থাপন করেছে। ভাষা আন্দোলন যে একক বিষয়নির্ভর কোনো আন্দোলন নয়, বরং অনেক মাত্রার কর্মক্রিয়ার মিলিত ফল এবং এর আবেদন তখনই ফুরিয়ে যায়নি, তা নামকরণের মধ্য দিয়েও প্রকাশিত হয়। সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামে মুনীর চৌধুরী কেবল এখানে ব্যক্তি নয় – সমষ্টির প্রতিনিধি। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশের নির্বিচার গুলি ও হত্যার প্রতিবাদে ২৪শে ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে যে প্রতিবাদ-সমাবেশ হয়েছিল, সেখানে অন্যান্যদের সঙ্গে মুনীর চৌধুরীও বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই 'অপরাধে' ২৬ তারিখ তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। উপন্যাসের শেষের দিকে উপন্যাসের ভেতর ঢুকে যায় 'কবর' নাটকও। আরেক রাজবন্দি রণেশ দাশগুপ্তের কাছ থেকে মুনীরের কাছে আসে গোপন চিঠি, যাতে বলা হয় – নাটক লিখতে হবে। ঔপন্যাসিক এই আপাত ছোট বিষয়টিকে তাঁর নিজস্ব বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় জারিত করে মহাজাগতিক বিষয় হিসেবে রূপদান করেন:

ক'টি মাত্র কথা, কিন্তু কি তার শক্তি। কি তার তেজ। শরীরের প্রতি রোমকূপ দাঁড়িয়ে যায়। যেন মহাকালের আহ্বান, মুনীর এখনই সময়, উঠে দাঁড়াও, চেতনাকে শাণিত করো। স্মৃতি অমর করে রাখো। (সেলিনা ২০১৬ : ১৭০)

আর এরপরই মুনীর যেন ব্যক্তি-মুনীর থাকে না; পরিণত হয় রাজনৈতিক দায়বদ্ধ এক ঐতিহাসিক চরিত্রে। তাঁর সংগ্রাম হয়ে যায় মহাকালের চলমান সংগ্রামের অংশ:

জেলের ঘণ্টায় এগারোটা বাজলো। ঢং ঢং শব্দটা অন্যরকম হয়ে যায়, যেন গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেল থেকে বক্তৃতা করছে শহীদুল্লা কায়সার। সেই কণ্ঠে যেন ঐ ঢং ঢং শব্দের মতো বুকের ভেতর হাতুড়ি পেটায়। ভেসে ওঠে হাসান হাফিজুর রহমানের মুখ। সবার মাঝে লিফলেট বিলি করছে। অল্পক্ষণের মধ্যে নিজ উদ্যোগে, আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় ছাপিয়ে এনেছে লিফলেট। বিলি হচ্ছে শত শত লিফলেট। মুনীর দেখতে পায় হালকা মেঘের মতো উড়ে উড়ে হাজার লিফলেট ছড়িয়ে যাচ্ছে শহরে-বন্দরে, গ্রামে, গঞ্জে, মাঠে-ঘাটে, প্রান্তরে। ছেয়ে যাচ্ছে সবুজ পত্রালি, ভরে উঠেছে শস্যময় ভূমি, নদী তলদেশে। ছুটে আসছে মানুষ-মানুষ। না, এসব দিয়ে নাটক হবে না। সবই বড় বেশি বুকের কাছাকাছি। তক্ষুনি মনে হয় শহীদদের কথা, যাদের সঙ্গে এখন মুনীরের ব্যবধান অনেক। যারা ইতিহাসে অমর হয়েছে, সেই কালজয়ী নক্ষত্র বুকের নিচে জ্বলজ্বল করে ওঠে। কাগজ টেনে লিখতে বসে ও। (সেলিনা ২০১৬ : ১৭১)

এরপর 'কবর' নাটকের অংশ বিশেষের উল্লেখ। শেষ কয়েকটি বাক্যে সেলিনা হোসেন জানান:

এখনো শেষ হয়নি নাটক, মুনীর লিখছে, আর অল্প বাকি। বাহান্নের একুশের পটভূমিতে রচিত হচ্ছে নাটক। জেলখানার ঘণ্টা ঢং-ঢং করে জানিয়ে যায় সময়। থেমে থেমে ঘণ্টা বাজে। লেখা থামে না, কলমে এখন জাদুর প্রদীপের ঘষা, একটা শিল্পিত দৈত্য বেরুচ্ছে

রচিত হচ্ছে মুনীরের 'কবর'। (সেলিনা ২০১৬ : ১৭৫)

অপরাপর উপন্যাসের মতো এখানেও ঔপন্যাসিকের শিল্পিসত্তার চেয়েও বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বেশি ক্রিয়াশীল। এই প্রবণতাকে সমালোচকরা ইতিবাচক অর্থেই গ্রহণ করেছেন। যেমন রফিকউল্লাহ খান (২০২০ : ১১৩) মনে করেন:

জাতীয় ইতিহাসের একটা মহৎ অধ্যায়কে উপন্যাসে প্রতিফলিত করতে গেলে সেখানে শুধু একজন শিল্পীর পর্যায়ে থাকেন না, হয়ে ওঠেন সমাজতাত্ত্বিক, রাজনীতিজ্ঞ ও ইতিহাসবিদ। এ-উপন্যাস পড়ে মনে হলো বাংলাদেশের কথাসাহিত্য তার কৈশোরক উচ্ছ্বলতাকে অতিক্রম করে যৌবনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। অন্তত স্বাধীনতা-উত্তর এক দশক আমাদের উপন্যাস সমাজতাত্ত্বিক অর্থে পুরোপুরি সফলকাম না হলেও জীবনের বিচিত্র আঙিনায় প্রবেশের অধিকার অর্জনে যে অনেকখানি সক্ষম হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ইতিহাস বার বার ফিরে আসে নতুন নতুন রূপে, ভিন্ন চারিত্র্যে। সংগ্রামী চেতনার ক্ষেত্রে বলা যায়, এই চেতনা কখনো থেমে যায় না। একুশের চেতনার মধ্যে যে এক অফুরন্ত সংগ্রামী শক্তি সঞ্জীবিত থাকে, *নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি*র এই অনিঃশেষ দ্যোতনা তারই পরিচয় বহন করে।

২.৪.৪.৫

সেলিনা হোসেনের *গায়ত্রী সন্ধ্যা* (১৯৯৪) উপন্যাসে আলী আহমদের জীবনায়নের মধ্য দিয়ে একজন মানুষের মুসলমান বাঙালি থেকে বাঙালি হয়ে ওঠার আলেখ্য নির্মিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান হওয়ার কারণে যাকে দেশচ্যুত হতে হয়, নতুন মুসলমান অধ্যুষিত দেশে রবীন্দ্রনাথ পড়াবার দায়ে তাকে 'মালাউন' অপবাদ শুনতে হয়। আর এই দ্বিমাত্রিক আক্রমণের ফলাফল হিসেবেই সে হয়ে ওঠে আত্মপরিচয়-সন্ধানী। সেলিনা হোসেনে তাঁর এ-জাতীয় ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী প্রতিষ্ঠিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতি আস্থাশীল থেকেছেন। উপন্যাসের পরতে পরতে – চরিত্রায়ণে, ঘটনাবিন্যাসে, সংলাপে তিনি ইতিহাসের বয়ানকে সংরক্ত করেছেন। ফলে তাঁর উপন্যাসগুলো কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংবাদপত্রধর্মী বর্ণনায় পরিণত হয়েছে। তাঁর চরিত্রগুলো 'ইতিহাস রক্ষা'র প্রতীকে পরিণত হয়েছে। জাতীয়তাবাদী চেতনার পূর্বধারণা নিয়ে তিনি উপন্যাস লিখেছেন। ফলে ইতিহাসের সরলীকৃত পাঠ তাঁর উপন্যাসে ধরা দিয়েছে। *গায়ত্রী সন্ধ্যা* লেখার পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে ঔপন্যাসিক অন্যত্র উল্লেখ করেন:

> আনোয়ার পাশার ওপর প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর একটি মন্তব্য পড়েছিলাম। তিনি লিখেছিলেন : মুসলমান হবার অপরাধে তিনি '৪৭ সালে ভারত থেকে চলে আসেন এবং বাঙালি হবার অপরাধে তাঁকে '৭১ সালে পাকসেনাদের হাতে নিহত হতে হয়। বিষয়টি আমার মাথাতে খুব গেঁথে গিয়েছিল। তখনই আমি ভেবেছিলাম এটাই আমাদের আইডেন্টিটি ক্রাইসিস্ এবং এই আইডেন্টিটি ক্রাইসিস্‌কে পটভূমি করে আমি উপন্যাস লিখব। (সেলিনা ২০১২ : ১৯২)

সেলিনা হোসেনের এই উপন্যাসকে ইতিহাসের পাঠের লক্ষ্য হিসেবে নির্মাণের প্রবণতাকে অবশ্য বাংলাদেশের বেশিরভাগ সাহিত্য-সমালোচক ইতিবাচক অর্থে গ্রহণ করেছেন।

গায়ত্রী সন্ধ্যা এক অর্থে বাঙালির জাতিসত্তা নির্মিত হবার ইতিহাস। এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ঔপন্যাসিকের বাঙালিত্বের প্রতি পক্ষপাত ও সুপরিকল্পনা। তাই উপন্যাসের কালপর্ব হিসেবে বেছে নিতে হয় ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৫। উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্র পরিবার ও সমাজঘনিষ্ঠ হয়েও তারা কোনো না কোনোভাবে রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। '*গায়ত্রী সন্ধ্যা*র বৈশিষ্ট্য এখানেই যে এর চরিত্ররা

রাজনৈতিক ডামাডোলের বাইরের কেউ নয়। সামগ্রিকভাবেই তারা ঐ সকল ঘটনার অংশীদার।' (সুব্রত ২০২০ : ২৩০) দেশ হারানোর বেদনা ও শঙ্কা নিয়েই আলী আহমদ-পুষ্পিতা দম্পতি পূর্ববাংলায় আসে। কিন্তু এখানে তাদের জন্য অপেক্ষা করে আরেক সংগ্রাম – অস্তিত্বের সংগ্রাম। তারা যদি কেবল মুসলমান হয়ে বেঁচে থাকতে চাইতো, তাহলে অস্তিত্ব সংশয়াকুল হতো না। কিন্তু তারা প্রত্যেকেই বাঙালি হয়ে বাঁচতে চেয়েছে। বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও মুসলমান হওয়ার কারণে তাঁদের স্বভূমি ছাড়তে হয়েছিল। কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজিত দুই রাষ্ট্রে ধর্মকে উপেক্ষা করা তৎকালীন পরিপ্রেক্ষিতে রীতিমত স্রোতের বিপরীতে চলা। কিন্তু ঔপন্যাসিকের প্রকল্পিত চেতনা বাঙালিত্ব প্রতিষ্ঠার চেতনা। এই প্রশ্নে তাঁর চরিত্ররা কোনো দ্বন্দ্ব অনুভব করে না। এর সঙ্গে কিছু বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনা যখন উপন্যাসের শরীরে সেঁটে যায়, তখন সেই চেতনা বাস্তবায়নও গতিপ্রাপ্ত হয়। উন্মুলিত হবার পর একদিকে নতুন রাষ্ট্রের জন্ম, অন্যদিকে তাদেরই মতো উন্মুলিত যাত্রীবোঝাই ট্রেনে পুষ্পিতার সন্তান প্রসবের ঘটনা নতুন চিন্তার ব্যঞ্জনা তৈরি করে। এই চেতনা পরিণত পর্যায়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদে রূপ নেয়। আহমদ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নামকরণে যেমন পুষ্পিতা, প্রদীপ্ত, প্রতীক এগুলো ঔপন্যাসিকের আদর্শায়িত অনুকল্পের ফলাফল; ওই কালের বাস্তবতার সঙ্গে খানিকটা অসামঞ্জস্যময় মনে হলেও। মুর্শিবাদ থেকে উৎখাত হয়ে রাজশাহীতে থিতু হতে চাওয়া আহমদ সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও পরিপার্শ্বের বাস্তবতায় সেও রাজনীতির অংশ হয়ে যায়। আহমদ হয়তো কংগ্রেসের সমর্থক ছিল। কারণ মহাত্মা গান্ধীর নিহত হবার খবরে সে বিমূঢ় হয়ে যায়। অপরাপর উপন্যাসের মতো এখানেও গান্ধীবাদের প্রতি ঔপন্যাসিকের সমর্থন মেলে। সাংস্কৃতিক দিক থেকে আহমদের মনে বাঙালিত্বের চেতনাও জারি থাকে। ঔপন্যাসিক এই চরিত্রের মধ্য দিয়ে একটি অসাম্প্রদায়িক মননের প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন:

> আলী আহমদ সেদিন ক্লাসে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ায়। আজি হতে শতবর্ষ পরে – বলতে বলতে ঘোর লাগে, কথা ফুরোয় না, যেন ভেতরের অর্গল মুক্ত হয়ে গেছে। ছাত্ররা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার লেকচার শোনে, পুরো ঘর নিস্তব্ধ, কাগজের খসখস শব্দ নেই – ঘরজুড়ে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় রবীন্দ্রনাথ এবং আলী আহমদের আবেগময় কণ্ঠ। ক্লাসে তিনি ছেলেদের বলেন, রবীন্দ্রনাথ আত্মার আত্মীয়। তাকে বাদ দিলে আমাদের অস্তিত্বের আমিটাই না হয়ে যাবে। (সেলিনা ২০১৩ : ৩১)

অপরাপর চরিত্র কৃষক ফজল গাজী, নসরুল্লাহর পুত্র রাজশাহী কলেজের ছাত্র নেতা মফিজুলের সূত্রে আহমদ পরিচিত হয় ইলা মিত্রের তেভাগা আন্দোলন এবং রাজশাহী জেলে খাপড়াওয়ার্ডে বন্দিদের ওপর গুলি চালানোর সঙ্গে। এরা প্রগতিশীল অংশের প্রতিনিধিত্ব করে। আবার স্থানীয় পর্যায়ের কাঠের আড়তের মালিক 'উগ্র বদমেজাজি মুসলিম লিগার' মতলুব মিয়া চরিত্র অঙ্কন চেতনাগত বিপ্রতীপতা

তৈরি করে। এর সঙ্গে জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ নিয়েও তাদের কথোপকথনে রাজনৈতিক সচেতনতা প্রকাশ পায়:

> গণপরিষদের অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন উর্দু ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে ওকালতি করে। খবরটা মফস্বল শহরে পৌঁছুনোর পর মফিজুল চেঁচিয়ে বলেছিল, এ কেমন দেশ ভাই? এরা তো মানুষের অধিকার স্বীকার করে না।
>
> আলী আহমদ জবাব দেয় না। চৈত্রের রোদে তেতে পুড়ে ঘরে ফিরে বিষণ্ণ হয়ে থাকে। মুখ্যমন্ত্রীর এই কথার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এগারো মার্চ হরতাল ডাকে, দেশব্যাপী হরতাল। রাজশাহী কলেজের ছেলেরা গরম হয়ে উঠেছে। প্রচারপত্র বিলি হচ্ছে, পোস্টারে ছেয়ে গেছে শহরের বিভিন্ন এলাকা – ছাত্ররা ছোট ছোট ছাত্রসভায় বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার যুক্তি ব্যাখ্যা করতে থাকে। (সেলিনা ২০১৩ : ৬৩)

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্রে রেখেই ঔপন্যাসিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঘটনাবিন্যাস নির্মাণ করেন। কিন্তু এর ভিত হিসেবে অর্থনৈতিক সংকটের জায়গাটিও শনাক্ত করেন বিভিন্ন অনুষঙ্গে। যেমন ভাষা আন্দোলন-কেন্দ্রিক প্রসঙ্গের মধ্যেও উঠে আসে তৎকালীন যাপিত জীবনের সংকট ও চালচিত্র:

> জিনিসপত্রের দাম যে হারে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, সাধারণ মানুষ তো হিমশিম খাচ্ছে। আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের কোনো সঙ্গতি নেই। শিক্ষার ব্যয় বাড়ার ফলে গরিব ছাত্রদের পড়াশোনা বন্ধ হওয়ার জোগাড় হয়েছে। ছোটখাটো বক্তৃতা করে ফেলে আকরাম। আলী আহমদ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আকরাম এক মুহূর্ত একটু থেমে আবার বলে, জানেন ছেলেরা আজ মিছিল করবে। 'চাল ডাল তেলের দাম কমাতে হবে, খাতা কলম বই পুস্তক ও শিক্ষার ব্যয়ভার কমাতে হবে' এইসব নিয়ে মিছিল বেরুবে একটু পর, এজন্য এরা জড়ো হয়েছে। (সেলিনা ২০১৩ : ৭১-৭২)

এই মফিজুল একসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। সেখানেও একুশে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সে অংশগ্রহণ করে এবং নিখোঁজ হয়। এভাবেই ঔপন্যাসিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমান কর্তৃক বাঙালিত্বের ধারণা নির্মাণ করেন।

সময়চেতনা এই উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সমাবেশ ঘটেছে অনেক শ্রেণিপেশার মানুষের। আছে চেতনাগত পক্ষ-বিপক্ষের সুস্পষ্ট অবস্থান। কিন্তু ব্যক্তি এখানে বড় হয়ে ওঠেনি। 'উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ জুড়ে নায়ক হয়ে যায় নিপীড়িত সময়; প্রহমান রাজনীতি।' (শহীদ ২০০৩ : ১১৫) রাজনৈতিক ক্রিয়াশীলতা প্রতিটি চরিত্রকে গতিশীল রাখে। সাতচল্লিশের অব্যবহিত পরে নতুন নতুন সংকট – ব্যক্তির সংকট, জাতীয় সংকট, শ্রেণির সংকট রাজনীতির অনুষঙ্গে বিরাজমান থাকে

উপন্যাসে। এই সংকট থেকে উত্তরণের অভিযাত্রা অব্যাহত থাকে বলেই উন্মূলিত ও আগন্তুক সত্তা থেকে বেরিয়ে স্বতন্ত্র পরিচয়ে এই ভূমিতে বেঁচে থাকার রসদ পায় উপন্যাসের চরিত্ররা।

সেলিনা হোসেনের উপন্যাসে রাজনৈতিক চেতনার উপস্থিতিতে সারল্য আছে। চরিত্রের মধ্যে এমন কোনো দ্বান্দ্বিক অবস্থান থাকে না, যা পাঠককে বৃহত্তর জীবনজিজ্ঞাসার মুখোমুখি করে। যেমন *যাপিত জীবন* উপন্যাসে দেখা যায় – রেসকোর্স ময়দান থেকে জিন্নার বক্তৃতা শুনে এসে জাফর চাপা উত্তেজনা আর ক্ষোভে ঘুমাতে পারে না। ১৯৪৮ সালে ভাষাপ্রশ্নে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্রদের উত্তেজনার যথেষ্ট কারণ ও পরিপ্রেক্ষিত ছিল। কিন্তু এটি কেবল আবেগের বিষয় ছিল না; ছিল ন্যায্য হিস্যা পাবার জন্য, জীবন জীবিকার প্রয়োজনে, অস্তিত্বশীল হয়ে সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকার লড়াই। 'বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত পূর্ব বাংলার রাজনীতিক, ছাত্র সমাজ বা জনগণের মধ্যে পাকিস্তানের অখণ্ডতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ছিল না। তাঁদের এই আন্দোলন ছিল শুধু বাংলার রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি আদায়ের আন্দোলন। তাদের দৃষ্টিভঙ্গিটি ছিল গণতান্ত্রিকতার আর ন্যায্যতার মধ্যে সীমাবদ্ধ।' (কুদরত ২০২২ : ৯৫) তৎকালীন আন্দোলন-তৎপরতার মধ্যেও বোঝা যায়, পাকিস্তান-প্রীতি, জিন্না-প্রীতি, ধর্মীয় চেতনা এসব নিয়েই গঠিত ছিল তৎকালীন বাঙালি মুসলমানের মন। ২১শে মার্চে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে জনসভায় জিন্না যে বক্তৃতা করেছিলেন এবং বলেছিলেন – 'কেবল উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা', তা নিয়ে যে চালু কথা প্রচলিত আছে প্রত্যক্ষদর্শী অনেকেই তার থেকে ভিন্ন কথা জানান। যেমন, ওই সময়ের তরুণ রাজনৈতিক কর্মী পরবর্তীকালে বিশিষ্ট লেখক ও দার্শনিক সরদার ফজলুল করিম (১৯২৫-২০১৪) স্মৃতিচারণায় জানান : 'আমি একজন সচেতন কর্মী হিসেবেই সেখানে গিয়েছিলাম ... সেখানে কোনো বিক্ষোভ বা প্রতিবাদ আমি লক্ষ করিনি।' (উদ্ধৃত, আহমদ ২০১৫ [ভাষা] : ২৩) অর্থাৎ জিন্নার কথায় মর্মাহত হলেও তাকে অতিক্রম করতে পারেনি ছাত্ররা। শুধু ১৯৪৮ই নয়, ১৯৫২ এবং তার পরেও ভাষা আন্দোলন কেবল আবেগের বিষয় ছিল না। এটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও অধিকার আদায়ের সংগ্রামের একটি প্রতীক হয়ে ওঠে। ভাষা আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি দিক এই যে, এটি পাকিস্তানবাদের সাম্প্রদায়িকতাকে কাটিয়ে একটি অসাম্প্রদায়িক চারিত্র্য নির্মাণ করে দিয়েছিল পূর্ববাংলার সংগ্রামশীল মানুষের সামনে। কিন্তু উপন্যাসে ভাষা আন্দোলনেকে সরল রাজনৈতিক চিন্তা থেকে বিবেচনা করা হয়েছে, যাকে সুকৌশলে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে আরোপিতভাবে মেলানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

সেলিনা হোসেনের উপন্যাসে বায়ান্নোর দ্বান্দ্বিক বাস্তবতার চেয়ে একাত্তর-পরবর্তী বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উপস্থিতি বেশি। এই চেতনা কখনো কখনো হয়েছে আবেগ-আক্রান্ত। উপন্যাস হিসেবে পরিচিত হলেও তাঁর উপন্যাসের আখ্যান অনেক ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে সংবাদপত্রধর্মী বর্ণনায়। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত তাঁর উপন্যাসের চরিত্রের আভ্যন্তর-দ্বন্দ্ব তীব্র নয়; চিন্তা ও উদ্দেশ্য সাধনে সরলরৈখিক। বলা যেতে পারে, ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে শিল্পের সঙ্গে বোঝাপড়াটা ঠিকমতো হয়নি; তাঁর উপন্যাসে শিল্প অনেকখানি ইতিহাস-আক্রান্ত। ইতিহাসের বয়ানের বিপরীতেও কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি তাঁর উপন্যাসে। শিল্পসাফল্যে খানিকটা ঘাটতি থাকলেও মূলধারার ইতিহাস রক্ষায় তার নিবেদন প্রশংসনীয়।

সাতচল্লিশ-পরবর্তী পাকিস্তানভুক্ত পূর্ববাংলার রাজনীতির গতিমুখ যেমন সরলরৈখিক ছিল না, জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত ধারণাও তাই মীমাংসিত হয়ে ওঠেনি। আলোচ্য উপন্যাসসমূহের মধ্য দিয়ে যে বয়ান তৈরি হয়, সেগুলোও একমাত্রিক থাকে না। ঔপন্যাসিকের ব্যক্তি-অবস্থান, শ্রেণি-অবস্থান ও রাজনৈতিক অবস্থান ওই কালচেতনাকে উপন্যাসে ধারণ করার ক্ষেত্রে সবিশেষ ভূমিকা রেখেছে। তবে অনেকগুলোর দৃষ্টিভঙ্গির মিথস্ক্রিয়ায় একটি সময়পর্বের বিচিত্র মাত্রাকে সামূহিকভাবে উপলব্ধি করা যায়। একটি সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফসল নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান। সেই রাষ্ট্রশক্তি যখন আরেক শোষকশক্তিতে পরিণত হয়, রাষ্ট্রে অবস্থানকারী মানুষ তখন তাদের শ্রেণি ও স্বার্থ অনুযায়ী রাষ্ট্রের প্রতি আচরণ নির্ধারণ করে। উপন্যাসের চরিত্রসমূহের মধ্যেও এমন আচরণের বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। প্রত্যাশিত রাষ্ট্রের অনেক সীমাবদ্ধতা থাকলেও অল্প সময়ের মধ্যে তার আবেদন ফুরিয়ে যায় না। তার দৃষ্টান্ত ওই শ্রেণিচরিত্রের তৎপরতায় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বাঙালি জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠার একমাত্রিক দৃষ্টিকোণ যেসব উপন্যাসে প্রযুক্ত হয়েছে, সেখানে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ ও রাষ্ট্রের দ্বন্দ্বের পরিবর্তে জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের সরলরৈখিক পাঠের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। বলা যায়, কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে, সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্নো – এই কালপর্বের জীবনজিজ্ঞাসার রূপায়ণে বাংলাদেশের উপন্যাস সর্বতোভাবে শক্তিশালী বয়ান নিমার্ণ করতে পারেনি। তারপরেও উপন্যাসের বয়ানকে ইতিহাসের বয়ানের সমান্তরাল পাঠ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

উপসংহার

উপসংহার

সাতচল্লিশ-কেন্দ্রিক রাজনীতি ও ইতিহাসের ভাষ্যের মতো উপন্যাসের বয়ানের বড় অংশ জুড়ে থাকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, দেশভাগজনিত তথা দেশহারানো ও দেশবদলের ক্ষত-ক্ষতি; অপর বিবেচনায় নতুন রাষ্ট্রপ্রাপ্তির আনন্দ এবং আত্মসত্তা-অনুসন্ধানের নব-অভিযাত্রা। অতীতের পাঠ কখনো কখনো একটি কালের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ত্রুটি ও দোদুল্যমানতাকে চিহ্নিত করে দেয়। উপন্যাস মূলত ভাষা, উপন্যাসের রাজনৈতিক বয়ানও একটি কালের বিচিত্র মাত্রাকে পাঠ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্যই অতীতের দিকে তাকানো প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়; নতুন সংকটের উদ্ভব-আশঙ্কা সত্ত্বেও। ইতিহাসের চঙ্ক্রমণে অতীতের মধ্যে যেমন থাকে বর্তমানকে বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান, তেমনি ভবিষ্যতমুখী বয়ান নির্মাণের প্রয়োজনে জরুরি অতীতের ঘটনাক্রমের কার্যকারণগত বিশ্লেষণ। কেবল একটি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, শুধু একটি শ্রেণির প্রেক্ষণবিন্দু দিয়ে কিংবা নির্দিষ্ট মতবাদের ওপর আশ্রয় করে সেই কার্যকারণ অনুসন্ধান করলে একটি সময়পর্বের সামূহিক চিত্রটি দেখা সম্ভব হয় না। যদিও অনেকগুলো দৃষ্টিকোণ ব্যবহার সত্ত্বেও পরিপূর্ণ চিত্র প্রাপ্তির নিশ্চয়তা নেই।

বাংলাদেশের প্রতিটি সফল আন্দোলনের পেছনে আছে গণমানুষের অধিকার আদায়ের লড়াই। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। কখনো কখনো রাজনৈতিক দর্শনে ত্রুটি থাকে, কিন্তু জনগণ সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করে না। বাংলা জনাঞ্চলের এই ধারাবাহিক গণমুখী আন্দোলন-সংগ্রামের নামকরণ করা যেতে পারে – বাঙালি জাতীয়তাবাদ। তবে বিশেষ কোনো তত্ত্ব বা মতবাদ দিয়ে বাংলার সাধারণ মানুষ এইসব আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করেনি। যখনই সে অধিকার-বঞ্চিত হয়েছে, শোষণের শিকার হয়েছে, তখনই সে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করেছে। বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকগণ তাঁদের করণকৌশলের সক্ষমতা অনুযায়ী সেই গণমানুষের রাজনীতিসচেতনা ও প্রত্যক্ষতার আলেখ্য নির্মাণ করতে চেয়েছেন তাঁদের উপন্যাসের আধারে। এজন্য দেখা যায় – বাংলাদেশের রাজনীতিমূলক উপন্যাসে ব্যক্তির চেয়ে সামাজিক ও সামষ্টিক শক্তির প্রকাশ বেশি। যেখানে ব্যক্তি মুখ্য সেখানেও সে সমাজসাপেক্ষ, রাজনীতিনিয়ন্ত্রিত। সাতচল্লিশের পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই এই অঞ্চলের জনমানুষকে মোকাবিলা করতে হয়েছে বহুমাত্রিক সংকট। তার মনে তৈরি হয়েছে বহুস্তরিত প্রশ্নের। ওই কাল

মানুষকে নির্দ্বন্দ্ব থাকতে দেয়নি। সেই দ্বান্দ্বিক অবস্থান শিল্পফসলেও আড়াল থাকেনি। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মতো একটি জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ অর্জনের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারণার সঙ্গে জনমানুষের একটি সুস্পষ্ট সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছে। এর ফলে সাহিত্য নির্মাণেও আসে চেতনাগত পরিবর্তন। যে-কোনো বড় অর্জন তাঁর পূর্ববর্তী বিপ্রতীপ তৎপরতাকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা পায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে সফল ও প্রতিষ্ঠিত হয়, তার প্রাতিষ্ঠানিক নাম বাঙালি জাতীয়তাবাদ। এটি সংবিধান দ্বারাও স্বীকৃত। সরল সমীকরণে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিপ্রতীপ চেতনায় পরিগণিত হতে থাকে পাকিস্তান-আন্দোলন প্রসঙ্গ। বাঙালি জাতীয়তাবাদী আলোচনায় সাতচল্লিশকে অস্বীকার করবার প্রবণতা অমূলক নয়। কিন্তু এটাও ঐতিহাসিক সত্য যে, সাতচল্লিশের ভেতর দিয়েই উনিশশ একাত্তরে আসা সম্ভব হয়েছে। সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর পর্যন্ত জাতীয়তাবাদের গঠন প্রক্রিয়ায় বহুবিধ রাজনৈতিক মতবাদ, দৈশিক ও বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিত, ধর্মীয় চেতনা, দীর্ঘকালের শোষণ-বঞ্চনার স্মৃতি, শ্রেণিগত অবস্থান জনসাধারণের মতো শিল্পী-সাহিত্যিকদের পরিপূর্ণ মীমাংসায় পৌঁছতে দেয়নি। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকগণ চেতনে বা অবচেতনে সাতচল্লিশের রাজনীতিকে এড়িয়ে যাননি বা অস্বীকার করেননি। একটি রজনৈতিক ঘটনার মীমাংসায় পৌঁছানোর চেয়েও জরুরি যথাযথ কার্যকারণের বয়ান নির্মাণ। সমকালের চেতনা পরিস্রুত ধারণায় পূর্বের কর্মকাণ্ড সমালোচনার শিকার হতে পারে। তবে ওইসব কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে সমকালের চেতনা তার ভিত্তি খুঁজে পায়।

গবেষণার শুরুতে যে ধারণাটি ছিল একটি সম্ভাবনার সূত্রে সম্পর্কিত, শেষে তা একটি শক্ত ভিত্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছে; তা হলো বাংলাদেশের উপন্যাসের স্বতন্ত্র বয়ান, বিশেষত সাতচল্লিশ-কেন্দ্রিক রাজনীতির বিকল্প নন্দন। একটি শিল্পরূপকল্প হিসেবে চল্লিশের দশকে উপন্যাস যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছিল, বাংলাদেশের উপন্যাস সে জায়গা থেকে শুরু হয় না। উপন্যাসের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য অন্তর্বাস্তবতা। কিন্তু বাংলাদেশের উপন্যাস ব্যক্তির একক উন্মোচনের চেয়েও অনেক বেশি বহির্মুখী বাস্তবতার রূপায়ণ দিয়ে যাত্রা শুরু করে; ব্যক্তি উপস্থিত হয় সমষ্টির বড় পরিধিতে। বহির্বাস্তবতার দ্বন্দ্ব ও সংকটের মধ্য দিয়েই এই অঞ্চলের জনমানুষকে দীর্ঘ সময় পাড়ি দিতে হয়। অন্তর্বাস্তবতা থাকে বহির্বাস্তবতার পরিপূরক হিসেবে। সাতচল্লিশ-কেন্দ্রিক চল্লিশের দশকের রাজনীতির সংঘটন-প্রক্রিয়ায় যে পক্ষ-বিপক্ষ অবস্থান তৈরি হয়েছিল, তাকে কেবল হিন্দু-মুসলমান সরল সমীকরণে বিচার করা যায় না। সম্প্রদায়গত পরিচয়ের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত থাকে অর্থনৈতিক ও ভূগোলগত বিন্যাস। আর্যত্বের দাবিদার কলকাতাকেন্দ্রিক ও ঔপনিবেশিকতার সুবিধাপ্রাপ্ত ভদ্রহিন্দুসমাজ এবং অনার্য-অধ্যুষিত ও

ঔপনিবেশিকতা থেকে আপাত দূরবর্তী বাংলাদেশের জনসমাজ – পক্ষদুটিকে এই বহু বৈশিষ্ট্যযুক্ত দুই বর্গ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে; যদিও এই চিহ্নায়নও স্বয়ংসম্পূর্ণতার দাবি করে না। এক পক্ষের প্রভাবশালী বয়ানে অন্য পক্ষ 'অপর' হয়ে থেকেছে দীর্ঘদিন। এর মধ্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিরও পালাবদল ঘটেছে বহুবার বিচিত্র মাত্রা-সহযোগে। এইসব সত্ত্বেও বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকরা শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস থেকে নিজের কথা, নিজের জনমসাজের কথা বলতে গিয়ে ইতিহাসের নির্মম ও জটিল সময়পর্বকে দেখার স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ নির্মাণ করেছেন। কোনো প্রতিপক্ষকে মোকাবিলাসূত্রে নয়, বরং আত্মসত্তা-সন্ধানের অংশ হিসেবে এই স্বতন্ত্র বয়ান বা বিকল্প নন্দন তৈরি হয়ে যায়। এই নন্দনও একমাত্রিক নয়; এতে উপস্থিত থাকে বহুস্বরতা। নিজস্ব বয়ান নির্মাণ প্রক্রিয়াতে কখনো কখনো প্রভাবশালী বয়ানের প্রচ্ছায়া থেকে যায়। তারপরেও প্রভাবশালী পাঠের সঙ্গে বাংলাদেশের স্বতন্ত্র স্বর বয়ানের একপাক্ষিকতার সীমাবদ্ধতা ঘুচিয়ে একে একটি বড় স্রোতের দিকে ধাবিত করে।

বর্তমান অভিসন্দর্ভের আলোচিত উপন্যাসসমূহের অধিকাংশের প্রেক্ষণবিন্দু মধ্যবিত্তের জীবনপদ্ধতির। শহর বা গ্রাম, অভিজাত কিংবা নিম্নবর্গ সকল শ্রেণির মানুষের উপস্থাপনে ঔপন্যাসিকের মধ্যবিত্তশ্রেণি অবস্থান দুর্লক্ষ নয়। বাংলাদেশের রাজনীতি যে অনেকখানি মধ্যশ্রেণিসাপেক্ষ – উপন্যাসেও একই দৃষ্টিভঙ্গির রূপায়ণ ঘটে – এর মধ্য দিয়ে সেই বিবেচনা যুক্তিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। তবে রাজনীতি মধ্যবিত্তের নিয়ন্ত্রণে থেকেও পাকিস্তান-আন্দোলন যে অপরাপর নিম্নবর্গের ও প্রান্তিক পেশাজীবী মানুষকে যুক্ত করতে পেরেছিল, তারও ঐতিহাসিক সমর্থন আছে। বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকগণ দেশভাগকে বাংলাভাগ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এবং ক্রমাগত এই দেশভাগের বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু অখণ্ড বাংলা যে একটি দেশ এই ধারণা তাঁরা প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। বরং চেতনে বা অবচেতনে পূর্ববাংলা যে অপর অংশ থেকে অনেক দিক থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, সেটিই রূপায়িত হয়েছে – কী জীবনবিন্যাসে, কী অর্থনৈতিক কাঠামোতে, কী খাদ্যাভ্যাসে, কী ভাষা প্রয়োগে; আর ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্য তো আছেই। মূলত দেশভাগের প্রক্রিয়ার ফলে জনজীবনে যে সামূহিক বিপর্যয় নেমে আসে, সেটাই ছিল মুখ্য। কিন্তু তাতে এক বাংলার ধারণা স্পষ্ট হয়নি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে বাংলা অঞ্চলের রাজনীতির অন্যতম অনুষঙ্গ ছিল মন্বন্তরের বাস্তবতা। মন্বন্তর পুরো বাংলা অঞ্চলকে আক্রান্ত করলেও কলকাতা শহরে আক্রান্তির বিষয়টি ছিল দৃশ্যমান। ফলে বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকদের একটা বড় অংশ মন্বন্তরকে উপস্থাপন করেছেন কলকাতার পটভূমিতে। আর যেসব উপন্যাসে পূর্ববাংলা এসেছে সেখানে শ্রেণিগত অবস্থান গুরুত্ব পেয়েছে।

জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে ওই ঘটনাক্রম সম্বলিত কোনো উপন্যাসেই একক কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে দেখা যায় না। তবে জাতীয়তাবাদ নির্মাণ প্রক্রিয়া বা এর যাত্রাপথের একাধিক ও বিচিত্র মাত্রাকে কার্যকারণের ভিত্তিতে দেখবার চেষ্টা করা হয়েছে। জাতীয়তাবাদ একটি ইয়োরোপীয় ধারণা। ভারতীয় উপমহাদেশের মতো বাংলা-দেশ ও বাংলাদেশে জাতীয়তার ধারণা ভিন্ন। যদিও চল্লিশের দশকে 'মুসলিম জাতীয়তাবাদে'র সূত্র ধরে যে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়, তা পশ্চিমী জাতীয়তাবাদেরই অনুকরণ। সাতচল্লিশ-পরবর্তী বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের ধরন পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির পটভূমিগত মিল থাকলেও চারিত্র্যগত স্বাতন্ত্র্য ও বৈভিন্ন্য ছিল। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল নয় বরং একটি রাষ্ট্রের ভেতর অবস্থান করেই, সেই রাষ্ট্রকে স্বীকার করে নিয়েই বাঙালি তার অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইকে জাতীয়তার দিকে অগ্রসর করেছে। কারণ এই বাঙালি মধ্যবিত্ত মুসলমানেরই কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র ছিল পাকিস্তান।

বাংলাদেশের বেশিরভাগ ঔপন্যাসিক পশ্চিমী জাতীয়তাবাদের যা পরবর্তীকালে বাঙালি জাতীয়তাবাদ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, তার একমুখী রূপকে অঙ্কন করেছেন। ফলে উপন্যাসের বয়ান যেভাবে জনমানুষের বয়ান হতে পারতো, তা হয়নি। বরং একমুখী জাতীয়তাবাদ প্রচারের বর্ণনায় পরিণত হয়েছে আর চরিত্রায়ণের বদলে ঘটেছে জাতীয়তাবাদ প্রচারের পাত্রপাত্রী নির্মাণ। সময় ও সমাজের অর্গ্যানিক ভাষ্যকার হওয়ার বদলে চরিত্ররা হয়ে উঠেছে ঔপন্যাসিকের একমুখী জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার মুখপাত্র। যেমন – সেলিনা হোসেন; তিনি মুখ্যত বাঙালি জাতীয়তাবাদকে লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে উপন্যাসের বাকি বিষয়গুলোকে সাজিয়েছেন। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। তাঁর *খোয়াবনামা* উপন্যাসে কোথাও জাতীয়তাবাদ বা বাঙালি জাতীয়তাবাদ উচ্চারিত হয়নি। কিন্তু তাঁর উপন্যাস বাঙালি জনসমাজকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। জনসমাজের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের জাতীয়তা সংশ্লিষ্ট ধারণা বিভিন্ন শ্রেণি অবস্থানের মানুষ কীভাবে মোকাবিলা করেছে, তা-ই ঔপন্যাসিক বয়ানে রূপলাভ করেছে। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ তার স্ব স্ব অবস্থান ও কার্যকারণের ভিত্তিতে ধারণাগুলোকে মোকাবিলা করেছে। উপন্যাসে ব্যক্তিকে ধর্ম-সমাজ বা অতীত স্মৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে নির্মাণ করেননি। হাসান আজিজুল হকের *আগুনপাখি*তেও দেশভাগের পটভূমিতে অখণ্ড বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা আছে। সেখানে সাতচল্লিশ-পূর্ব পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের অসারতা চিহ্নিত হয়েছে এবং উনিশ শতকীয় ভারতীয় জাতীয়তাবাদলব্ধ বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতি সমর্থনও স্পষ্ট।

বাস্তব কার্যকারণে দেখা যায়, বাঙালি জাতীয়তাবাদের সূচনা সাতচল্লিশ-পরবর্তীকালে এবং তা পাকিস্তানে। পাকিস্তানপর্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদ একটি অবয়ব লাভ করতে শুরু করে। বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয়তার সকল উপাদান থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত আর্থরাজনৈতিক অভিঘাত না আসার ফলে তা দৃশ্যমান রূপ ধারণ করতে পারেনি। *নোঙর* উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে উঠতি ঢাকায় যেখানে অর্থ-অনর্থ আর সুবিধাবাদের প্রাবল্য দেখা যায় বলেই *সূর্য-দীঘল বাড়ী*র জয়গুন-হাসু-মায়মুনা চিরস্থায়ী বঞ্চনার শেকলে বন্দি থাকে। এ-কথা সকল সময়ের জন্য প্রযোজ্য হলেও সাতচল্লিশ-পরবর্তী সময়ে তীব্র প্রত্যাশার বিপরীতে তীব্র দারিদ্র্য ও হতাশা মানুষের জীবনে সামূহিক মূল্যবোধের চরমতাকে চিহ্নিত করে। এর প্রভাব গ্রাম-শহর, কেন্দ্র বা প্রান্ত সর্বত্র ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে অবস্থান করে। কিন্তু সংকট যে বিরাজমান ছিল, এটি যেমন ঐতিহাসিক বাস্তবতা, ঔপন্যাসিকের শিল্পবয়ান থেকেও সেই বাস্তবতার ব্যক্তি ও সমাজ আভ্যন্তর চিত্র অনুধাবন করা যায়।

আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য, বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকরা সমকাল থেকে সবসময় একটি নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করেছেন। বাংলাদেশের সাহিত্য পর্যালোচনা করে এ-কথা বলা যায়, সাহিত্য এই জনাঞ্চলের রাজনীতিকে কমই প্রভাবিত করেছে। বরং বাংলাদেশের সৃজনশীল সাহিত্যকরা তাদের সৃষ্টিশীল রচনায় হয়েছেন রাজনৈতিক ঘটনা ও তৎপরতার অনুগামী। এ-কথা চল্লিশের দশকের পাকিস্তান-আন্দোলন, চল্লিশের দশকের শেষ থেকে শুরু হওয়া ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে বলা যায়। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চকে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক সূচনা হিসেবে বিবেচনায় রেখে দেখা যায়। অথচ ১৯৪৮-১৯৫২ এই চার বছরের কালপরিসরে ভাষা আন্দোলনকেন্দ্রিক ঘটনা বা তৎপরতা নিয়ে কোনো উপন্যাস রচিত হয়নি। শুধু উপন্যাসই নয়, আবদুর রশীদ খান (১৯২৪-২০১৯) ও আশরাফ সিদ্দিকীর (১৯২৭-২০২০) সম্পাদনায় ১৯৫০ সালে প্রকাশিত সমাদৃত কবিতা-সংকলন *নতুন কবিতা*র মধ্যেও প্রত্যক্ষত ভাষা আন্দোলনের প্রসঙ্গ নেই। যদিও ১৯৫২-র অব্যবহিত পরে এ-সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাহিত্যকর্ম বিশেষত কবিতা, গান, গল্প রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে। সেসবের একটি দৃশ্যমান ও সাহিত্যিক দলিল হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩) সম্পাদিত *একুশে ফেব্রুয়ারী* (১৯৫৩) সংকলন। বাংলাদেশের উপন্যাসে চলমান কালের ঘটনার সংযুক্তি ঘটেছে কম। কিন্তু যে একুশের চেতনা পুরো দুই দশক জুড়ে পূর্ববাংলার বাঙালি জনগোষ্ঠীকে বৃহত্তর সংগ্রামী চেতনায় ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল, উপন্যাসের মতো বড় সাহিত্য-ফর্মেও তাকে ধারণ করার প্রয়াস হয়েছে বিলম্বিত। এক্ষেত্রে

ব্যতিক্রম এবং উজ্জ্বল ব্যতিক্রম জহির রায়হান। জহির রায়হান তাঁর *আরেক ফাল্গুনে* কেবল ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ এনেছেন বলেই নন্দিত হবেন না। শিল্পীর দায় এবং ইতিহাসের দায় – এই দুইয়ের অভূতপূর্ব মিথস্ক্রিয়া ঘটেছে এখানে। একুশের চেতনাকে তিনি কেবল ভাষাচেতনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি, একে যুক্ত করেছেন বাঙালি জনগোষ্ঠীর ধারাবাহিক সংগ্রামী অভিযাত্রার সঙ্গে।

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। ফলে বাংলাদেশের প্রকৃত জাতীয়তার সূত্র নিবদ্ধ আছে কৃষক সমাজে। কিন্তু তাদের সংকট নিরসিত হয়নি প্রচলিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে – না পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে, না বাঙালি জাতীয়তাবাদের সংগ্রামে। তাই দেখা যায়, প্রত্যক্ষ জাতীয়তাবাদ যেসব উপন্যাসে উপস্থিত, সেখানে শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্তের প্রাধান্য; প্রান্তিক কৃষক আড়ালে। কিন্তু কৃষক আন্দোলন থেমে থাকেনি। ঔপনিবেশিক আমলের শুরু থেকেই সময়ে সময়ে বিভিন্ন কৃষক আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। চল্লিশের দশকেও ঘটেছে। কিন্তু সেইসব কৃষক আন্দোলনকে সামূহিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা যায়নি। স্বল্প মুহূর্তে যখনই যুক্ত করা গেছে, সেই আন্দোলন সামূহিক রূপ লাভ করেছে। কৃষক আন্দোলনগুলো বিচ্ছিন্নভাবে উপন্যাসে এসেছে, ইতিহাসের বইতে যেভাবে থাকে।

বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকদের বেশিরভাগই তাঁদের রাজনীতিসংশ্লিষ্ট উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের পরিবর্তে নিজেই হয়ে যান একটি পক্ষ। তাই এ-জাতীয় অনেক উপন্যাস হয়ে উঠেছে আত্মজৈবনিকতার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। উপন্যাস পাঠের মধ্য দিয়ে কেবল একটি নির্দিষ্ট কালখণ্ডের বাস্তবতা অনুসন্ধান যথেষ্ট নয়; ঔপন্যাসিকের রাজনৈতিক আদর্শও উপন্যাস পাঠের মতো প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের অধিকাংশ ঔপন্যাসিকের শ্রেণি-অবস্থান মধ্যবিত্তভুক্ত হলেও তাঁদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্য রয়েছে। ঔপন্যাসিকদের একটা অংশ পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গে আগত, আরেক অংশ পূর্ববঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা। ফলে তাঁদের ভৌগোলিক অবস্থান রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপ নির্ধারণে কার্যকর থেকেছে। এর সঙ্গে অধিত বিদ্যা, পারিবারিক অনুশীলন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্প্রদায়গত উত্তরাধিকারের ক্রিয়াশীলতাও লক্ষ করা যায়। কখনো কখনো ঔপন্যাসিকের রাজনৈতিক অবস্থানের রূপান্তর চরিত্রের রূপান্তরসূত্রে একটি জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক রূপান্তরকে নির্দেশ করে। আবার রাজনৈতিক চিন্তার যথাযথ কার্যকারণ নির্ণীত না হওয়ায় কোনো কোনো উপন্যাস কেবল রাজনৈতিক ঘটনার ধারাবাহিক উপস্থাপনাতে সীমাবদ্ধ থাকে।

বাংলাদেশের উপন্যাসে আলোচ্য রাজনৈতিক চিন্তা উপস্থাপনের আরেকটি দিক হচ্ছে – 'হতে পারতো' ইতিহাসের বিনির্মাণ। যা হয়েছে বা ঘটেছে, তার চেয়েও ভালো কিছু হতে পারতো – এই বোধ প্রত্যেক সৃজনশীল মানুষের সহজাত প্রবণতা। সাতচল্লিশ-কেন্দ্রিক রাজনীতি যে ইতিহাসের জন্ম দিয়েছে অর্থাৎ ঘটেছে, তার চেয়ে ভালো কিছু চাওয়ার প্রবণতা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে যাঁরা ওই কালের সংকটকে স্বীকার করে নিয়েছেন, তাঁদের উপন্যাসে এই প্রবণতা কার্যকর হয়েছে। শিল্পপ্রকরণগত কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও উপন্যাসের ঘটনাক্রম, রচনাকালের রাজনৈতিক অবস্থা এবং ঔপন্যাসিকের রাজনৈতিক বোধ – এই তিনের মিথস্ক্রিয়ায় বাংলাদেশের উপন্যাসে সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্নোর ঘটনাক্রম পায় একটি সামূহিক মাত্রা।

গ্রন্থপঞ্জি

উল্লেখপঞ্জি

আলোচিত উপন্যাসগ্রন্থ

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (২০০৮)। *রচনাসমগ্র ২* [*চিলেকোঠার সেপাই*, *খোয়াবনামা*], পঞ্চম মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

আবু ইসহাক (২০০৪)। *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, সপ্তদশ সংস্করণ, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা

আবু রুশ্‌দ (২০০০)। *উপন্যাসসমগ্র* [*নোঙর*], গতিধারা, ঢাকা

আবুল ফজল (১৩৬৪)। *রাঙ্গা প্রভাত*, বইঘর, চট্টগ্রাম

আবুল মনসুর আহমদ (১৯৯৮)। *আবুল মনসুর আহমদ রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড* [*জীবন-ক্ষুধা*], রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

আলাউদ্দিন আল আজাদ (২০১৩)। *ক্ষুধা ও আশা*, দ্বিতীয় প্রকাশ, বাতায়ন প্রকাশন, ঢাকা

জহির রায়হান (২০১৬)। *আরেক ফাল্গুন*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা

মাহমুদুল হক (২০১০)। *কালো বরফ*, তৃতীয় মুদ্রণ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

রশীদ করীম (২০১৩)। *উত্তম পুরুষ*, চতুর্থ মুদ্রণ, বিউটি বুক হাউস, ঢাকা

রাজিয়া খান (২০০৪)। *উপন্যাসসমগ্র* [*হে মহাজীবন*], মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

শওকত আলী (২০১২)। *ওয়ারিশ*, ষষ্ঠ প্রকাশ, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা

শওকত ওসমান (১৯৯৫)। *আর্তনাদ*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

শহীদুল্লা কায়সার (২০১০)। *সংশপ্তক*, চারুলিপি, ঢাকা

সত্যেন সেন (২০১৪)। *সত্যেন সেন রচনাবলি ২য় খণ্ড* [*পদচিহ্ন*], সম্পাদনা : বদিউর রহমান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

সত্যেন সেন (২০১৪)। *সত্যেন সেন রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড* [*উত্তরণ*], সম্পাদনা : বদিউর রহমান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

সরদার জয়েনউদ্‌দীন (২০১২)। *অনেক সূর্যের আশা*, বিজয় প্রকাশ, ঢাকা

সরদার জয়েনউদ্‌দীন (১৯৭৫)। *বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ*, আদিল ব্রাদার্স এ্যান্ড কোং, ঢাকা

সেলিনা হোসেন (২০০৯)। *যাপিত জীবন*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মীরা প্রকাশন, ঢাকা

সেলিনা হোসেন (২০১৩)। *গায়ত্রী সন্ধ্যা (অখণ্ড)*, তৃতীয় মুদ্রণ, সময় প্রকাশন, ঢাকা

সেলিনা হোসেন (২০১৩)। *কাঁটাতারে প্রজাপতি*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা

সেলিনা হোসেন (২০১৫)। *সোনালি ডুমুর*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা

সেলিনা হোসেন (২০১৬)। নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা

হরিপদ দত্ত (২০১২)। *মোহাজের*, ভূমিকা, ঢাকা

হাসান আজিজুল হক (২০০৬)। *আগুনপাখি*, দ্বিতীয় প্রকাশ, সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা

হুমায়ূন আহমেদ (২০০৮)। *মধ্যাহ্ন (অখণ্ড)*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা।

সহায়ক গ্রন্থ

অজয় রায় (২০১৭)। *বাঙলা ও বাঙালী*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

অনীক মাহমুদ (২০১৪)। *বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান*, দ্বিতীয় সংস্করণ, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা

অমলেন্দু দে (১৯৭৪)। *বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ*, রত্না প্রকাশ, কলিকাতা

অমলেন্দু দে (২০২১)। *পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

অমলেন্দু সেনগুপ্ত (১৯৮৯)। *উত্তাল চল্লিশ : অসমাপ্ত বিপ্লব*, পার্ল পাবলিশার্স, কলিকাতা

অমলেশ ত্রিপাঠী (১৪২৫)। *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭)*, দ্বাদশ মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

অসীম রায় (২০১৭)। *ইসলাম ও বাঙালি মুসলমান সমাজ*, সম্পাদনা : হাবিব আর রহমান, ধ্রুবপদ, ঢাকা

আকবর আলি খান (২০২৩)। *বাংলায় ইসলাম প্রচারে সাফল্য : একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ*, তৃতীয় সংস্করণ, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (২০১৭)। *সংস্কৃতির ভাঙা সেতু*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

আনিসুজ্জামান (২০১৪)। *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য*, পুনর্মুদ্রণ, চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা

আনিসুজ্জামান (২০১৫)। *কাল নিরবধি*, তৃতীয় মুদ্রণ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

আনোয়ার পাশা (১৯৮১)। *আনোয়ার পাশা রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড (সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সম্পাদিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা

আবদুল বাছির (২০১২)। *বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্তশ্রেণি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

আবদুল মান্নান সৈয়দ (২০০৮)। *নজরুল ইসলাম : কালজ কালোত্তর*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

আবদুল হক (১৯৭৬)। *ভাষা আন্দোলনের আদিপর্ব*, মুক্তধারা, ঢাকা

আবদুল হক (২০১৯)। *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, দ্বিতীয় সংস্করণ, সম্পাদনা : আহমাদ মাযহার, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা

আবু রুশ্‌দ্ (১৯৯৮)। *আত্মজীবনী*, এ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা-চট্টগ্রাম

আবুল কাসেম ফজলুল হক (১৯৯৮)। *একুশে ফেব্রুআরি আন্দোলন*, জাগৃতী প্রকাশনী, ঢাকা

আবুল ফজল (১৯৭৯)। *মানবতন্ত্র*, দ্বিতীয় সংস্করণ, মুক্তধারা, ঢাকা

আবুল মনসুর আহমদ (১৯৯৯)। *শেরে বাংলা হইতে বংগবন্ধু*, পঞ্চম মুদ্রণ, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা

আবুল মনসুর আহমদ (২০১৬)। *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, পুনর্মুদ্রণ, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা

আবুল হাসনাত ও অন্যান্য সম্পাদিত (২০১০)। *আলোছায়ার যুগলবন্দি : মাহমুদুল হক স্মরণে*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

আবুল হাশিম (২০১৮)। *আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা

আরজুমন্দ আরা বানু (২০০৮)। *শহীদুল্লা কায়সার ও জহির রায়হানের কথাসাহিত্য : বিষয় ও প্রকরণ*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা

আলী রিয়াজ (২০২২)। *লেখকের দায়*, বাতিঘর, ঢাকা

আহমদ কবির (১৮৮৯)। *সরদার জয়েনউদ্‌দীন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

আহমদ ছফা (২০০২)। *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

আহমদ ছফা (২০০৯)। *বাঙালি মুসলমানের মন*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা

আহমদ রফিক (২০১৫)। *দেশবিভাগ : ফিরে দেখা*, তৃতীয় মুদ্রণ, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা

আহমদ রফিক (২০১৫)। *ভাষা আন্দোলন*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা

আহমদ শরীফ (২০০১)। *বাঙলা, বাঙালী ও বাঙালীত্ব*, অনন্যা, ঢাকা

আহমদ শরীফ (২০১১)। *বাঙলাভাষা-সংস্কার আন্দোলন*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

আহমেদ কামাল (২০১৮)। *কালের কল্লোল : ইতিহাস, উন্নয়ন ও রাজনীতি*, সংহতি প্রকাশন, ঢাকা

এম. এ. রহিম (২০০৯)। *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭)*, সপ্তম মুদ্রণ, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা

এস. এম. রেজাউল করিম (২০২১)। *বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং ভূমি বিরোধের রাজনীতি, ১৮৮৫-১৯৭১*, পিএইচডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

কাজী ইমদাদুল হক (১৯৬৮)। *কাজী ইমদাদুল হক রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), সম্পাদক : আবদুল কাদির, কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা

কামরুদ্দীন আহ্‌মদ (২০০৯)। *বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ*, তৃতীয় মুদ্রণ, ধ্রুপদ সাহিত্যাঙ্গন, ঢাকা

কামরুদ্দীন আহ্‌মদ (২০১৪)। *পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

কামরুল হাসান (২০১০)। *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা*, সংগ্রহ ও সম্পাদনা : সৈয়দ আজিজুল হক, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা

কুদরত-ই-হুদা (২০১৩)। *শওকত ওসমান ও সত্যেন সেনের উপন্যাস : আঙ্গিক বিচার*, আদর্শ, ঢাকা

কুদরত-ই-হুদা (২০২২)। *জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিকাশ : বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবিতা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

গিয়াস শামীম (২০১৯)। *উপন্যাসের শিল্পস্বর*, ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা

জয়া চ্যাটার্জী (২০১৪)। *বাঙলা ভাগ হল : হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ-বিভাগ ১৯৩২-১৯৪৭*, অনুবাদ : আবু জাফর, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

তপন রায়চৌধুরী (২০১৯)। *বাঙালনামা*, আনন্দ পাবিলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া (১৯৮১)। *পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর*, সম্পাদক : আবদুল হাফিজ, বাংলাদেশ বুক্‌স ইন্টান্যাশনাল লিঃ, ঢাকা

তপোধীর ভট্টাচার্য (২০২১)। *দেশভাগ : নির্বাসিতের আখ্যান*, সোপান, কলকাতা

তাজউদ্দীন আহমদ (২০২২)। *তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরি ১৯৪৭-৪৮ (প্রথম খণ্ড)*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা

দীনেশচন্দ্র সেন (১৯৯৩)। *বৃহৎ বঙ্গ*, ২য় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

দেবেশ রায় (২০১৬)। *উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে*, দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

নাজমা জেসমিন চৌধুরী (১৯৯১)। *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*, তৃতীয় প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা

নীহাররঞ্জন রায় (১৪২৭)। *বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদি পর্ব*, ষোড়শ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

নুরুল আমিন (২০১১)। *আবুল মনসুর আহমদের কথাসাহিত্য*, পরিমার্জিত পুনর্মুদ্রণ, ঐতিহ্য, ঢাকা

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯১)। *উপন্যাস রাজনৈতিক*, র‍্যাডিক্যাল ইমপ্রেশন, কলকাতা

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৪)। *উপন্যাসের সমাজতত্ত্ব*, র‍্যাডিক্যাল ইমপ্রেশন, কলকাতা

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৬১)। *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক (৩য় খণ্ড)*, দ্বিতীয় সংস্করণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা

ফজলুল হক সৈকত (২০০৮)। *সরদার জয়েনউদ্‌দীনের কথাসাহিত্য : সমাজ ও সমকাল*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা

বদরুদ্দীন উমর (১৯৬৭)। *সংস্কৃতির সংকট*, গ্রন্থনা, ঢাকা

বদরুদ্দীন উমর (২০১২)। *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (প্রথম খণ্ড)*, সুবর্ণ, ঢাকা

বদরুদ্দীন উমর (২০১২)। *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (দ্বিতীয় খণ্ড)*, সুবর্ণ, ঢাকা

বদরুদ্দীন উমর (২০১৫)। *সাম্প্রদায়িকতা*, নবম মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০৯)। *বাংলাদেশের সাহিত্য*, আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা

মফিদুল হক (১৯৯০)। *আবুল হাশিম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মফিদুল হক (২০১২)। *দেশভাগ, সাম্প্রদায়িকতা এবং সম্প্রীতির সাধনা*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

মমতাজুর রহমান তরফদার (১৯৯৪)। *বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূপ ও সম্ভাবনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মহীবুল আজিজ (২০০২)। *বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গ*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন, ঢাকা

মিল্টন বিশ্বাস (১৯৯৬)। *শওকত আলী ও সেলিনা হোসেনের উপন্যাস : প্রসঙ্গ রাজনীতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুজীবুর রহমান খাঁ (১৯৫৯)। *নজরুল-পরিচিতি*, পাকিস্তান পাবলিকেশান্‌স্‌, ঢাকা

মুনীর চৌধুরী (১৯৮৫)। *মুনীর চৌধুরী রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, সম্পাদক : আনিসুজ্জামান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুহম্মদ ইদরিস আলী (১৯৮৮)। *আমাদের উপন্যাসে বিষয়-চেতনা : বিভাগোত্তর কাল*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মোজাফ্‌ফর হোসেন (২০১৯)। *দক্ষিণ এশিয়ার ডায়াসপোরা সাহিত্য*, পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি., ঢাকা

মোস্তফা মোহাম্মদ (২০১৪)। *আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কথাসাহিত্যে জীবন ও সমাজ*, প্রতিভাস, কলকাতা

মোহাম্মদ আজম (২০২০)। *হুমায়ূন আহমেদ : পাঠপদ্ধতি ও তাৎপর্য*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা

যতীন সরকার (২০১৩)। *যুগান্তরের ঘূর্ণিপাক ও বাংলাদেশের উপন্যাস*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা

রণেশ দাশগুপ্ত (২০১২)। *রণেশ দাশগুপ্ত রচনাবলি প্রথম খণ্ড*, সম্পাদনা : সৌমিত্র শেখর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

রফিকউল্লাহ খান (২০০৯)। *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

রফিকউল্লাহ খান (২০১১)। *আখ্যানতত্ত্ব ও চরিত্রায়ণ*, চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১২)। *রবীন্দ্রসমগ্র, খণ্ড ১২* ['লোকহিত', *কালান্তর*], পাঠক সমাবেশ, ঢাকা

রমেশচন্দ্র মজুমদার (২০০৬)। *বাংলা দেশের ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড : প্রাচীন যুগ), পুনঃমুদ্রণ, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা

শওকত আলী (২০১৮)। *অবিস্মৃত স্মৃতি*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা

শহীদ ইকবাল (২০০৩)। *রাজনৈতিক চেতনা : বাংলাদেশের উপন্যাস*, সাহিত্যিকা, ঢাকা

শাহীদা আখতার (১৯৯২)। *পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উপন্যাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

শেখ মুজিবুর রহমান (২০১৪)। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, চতুর্থ মুদ্রণ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

শেখর দত্ত (১৯৮৫)। *তেভাগা আন্দোলন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১৫)। *দাঙ্গার ইতিহাস*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৩৫১)। *পঞ্চাশের মন্বন্তর*, দ্বিতীয় সংস্করণ, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১৯)। *ইতিহাসের ফিরে দেখা : ছেচল্লিশের দাঙ্গা*, চতুর্থ প্রকাশ, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (২০২০)। *দেশভাগ-দেশত্যাগ*, পুনর্মুদ্রণ, অনুষ্টুপ, কলকাতা

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (২০২২)। *স্মৃতিসত্তায় দেশভাগ*, পরিবর্ধিত সংস্করণ, বুকপোস্ট পাবলিকেশন, কলকাতা

সরদার ফজলুল করিম (২০১৬)। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ*, পঞ্চম মুদ্রণ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

সরদার ফজলুল করিম (২০১৭)। *চল্লিশের দশকের ঢাকা*, চতুর্থ মুদ্রণ, কথাপ্রকাশ, ঢাকা

সরোজ মুখোপাধ্যায় (১৯৮৬)। *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা*, দ্বিতীয় খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা

সাঈদ-উর রহমান (২০০১)। *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা

সারোয়ার জাহান (১৯৮৮) *জহির রায়হান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

সালাহউদ্দীন আহমদ (১৯৯১)। *বাংলাদেশের জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ (২০১৭)। *বাঙালির সাধনা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, চতুর্থ মুদ্রণ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

সিরাজাম মুনিরা (২০১৮)। *সেলিনা হোসেনের উপন্যাসে রাজনীতি*, পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি. ঢাকা

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (২০১৬)। *জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও জনগণের মুক্তি (১৯০৫-১৯৪৭)*, দ্বিতীয় সংস্করণ, সংহতি, ঢাকা

সৈয়দ আকরম হোসেন (১৯৮৫)। *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

সৈয়দ আকরম হোসেন (২০২০)। *প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য*, তৃতীয় মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

সৈয়দ আজিজুল হক (২০১৭)। *বাংলা কথাসাহিত্যে মানবভাবনা*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (২০১৩)। *অগ্রন্থিত রচনা*, সম্পাদনা : সাজ্জাদ শরিফ, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা

সৌম্য বসু (২০১৮)। *ভারতের মুক্তি সংগ্রাম ও বাংলার মুসলমান*, এডুকেশন ফোরাম ও দেশ প্রকাশন, কলকাতা

হাসান আজিজুল হক (২০১৩)। *কথাসাহিত্যের কথকতা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

হাসান আজিজুল হক (২০১৯)। *স্মৃতিকাহন*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা

হুমায়ুন আজাদ (২০১৪)। *ভাষা-আন্দোলন : সাহিত্যিক পটভূমি*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

হুমায়ুন আজাদ (২০০৭)। *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, পঞ্চম মুদ্রণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

হুমায়ুন কবির (১৯৯২)। *বাঙলার কাব্য*, অনির্বাণ, ঢাকা

হোসনে আরা (২০০৭)। *আবু ইসহাকের কথাসাহিত্যে প্রতিফলিত জীবন ও তার শিল্পরূপ*, এমফিল ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Ahmed Kamal (2016) *Sate Against the Nation*, First paper back edition, The University Press Limited, Dhaka, Bangladesh

Ayesha Jalal (1994) *The Sole Spokesman : Jinnah, The Muslim League and The Demand for Pakistan*, Paperback edition, Cambridge University Press, UK

Gyanendra Pandey (2003) *Remembering Partition : Violence, Nationalism and History of India*, Cambridge University Press, UK

Nafis Ahmad (1958) *An Economic Geography of East Pakistan*, Oxford University Press, London

Rounaq Jahan (2023) *Pakistan : Failure in National Integration*, Sixth Impression, The University Press Limited, Dhaka, Bangladesh

Sayeed Ferdous (2022) *Partition as Border-Making : East Bengal, East Pakistan and Bangladesh*, Routledge, Oxon

Shila Sen (1976) *Muslim Politics in Bengal*, Impex India, New Delhi

Sumit Sarkar (1983) *Modern India 1985-1947*, Macmillan, Delhi

Taj ul-Islam Hashmi (1992) *Pakistan as a Peasant Utopia*, Westview press, USA

Willem van Schendel (2004) *The Bengal Borderland : Beyond State and Nation in South Asia*, Anthem Press, London.

সহায়ক প্রবন্ধ

অমর মিত্র (২০১৪)। 'অনন্ত এক অশ্রুপাত – কালো বরফ', *গল্পকথা*, বর্ষ ৪ সংখ্যা ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, সম্পাদক : চন্দন আনোয়ার, রাজশাহী

অমলেন্দু দে (২০২০)। 'মুসলিম লীগ, পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক', *সাতচল্লিশের দেশভাগ*, সম্পাদনা : বুদ্ধদেব ঘোষ, দেবব্রত বিশ্বাস, বাংলাদেশ সংস্করণ, কথাপ্রকাশ, ঢাকা

অশ্রুকুমার সিকদার (২০১৮)। 'ভাঙা বাংলার সাহিত্য', *দেশভাগ : স্মৃতি আর স্তব্ধতা*, সম্পাদনা : সেমন্তী ঘোষ, গাঙচিল, কলকাতা

আতিউর রহমান, লেনিন আজাদ (২০০০)। 'ভাষা-আন্দোলন : অর্থনৈতিক পটভূমি', *ভাষা-আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক পটভূমি*, দ্বিতীয় সংস্করণ, আতিউর রহমান সম্পাদিত, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

আনিসুজ্জামান (২০০১)। 'আমাদের সংস্কৃতি', *বাঙালির আত্মপরিচয়*, সম্পাদনা : মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, বর্ণায়ন, ঢাকা

আনিসুজ্জামান (২০০৯)। 'আবুল ফজল : স্মৃতিকথা', *মানবতন্ত্রী আবুল ফজল : শতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থ*, সম্পাদক : আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য, সময় প্রকাশন, ঢাকা

আনিসুজ্জামান (২০১৫)। ‘আবুল মনসুর আহমদের রাষ্ট্রচিন্তা : একটি রূপরেখো’, *আবুল মনসুর আহমদ স্মারকগ্রন্থ*, সম্পাদক : ইমরান মাহফুজ, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা

আফজালুল বাসার (১৯৮৬)। ‘জহির রায়হান : তাঁর সাহিত্য ও অপ্রকাশিত ডায়েরী’, *উত্তরাধিকারী*, মাঘ-চৈত্র, ঢাকা

আবদুল করিম (২০০১)। ‘বাংলাদেশ ও বাঙালি’, *বাঙালির আত্মপরিচয়*, সম্পাদনা : মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, বর্ণায়ন, ঢাকা

আবু হেনা মোস্তফা এনাম (২০১০)। ‘মাহমুদুল হক : জীবনপঞ্জি’, *আলোছায়ার যুগলবন্দি : মাহমুদুল হক স্মরণে*, আবুল হাসনাত ও অন্যান্য সম্পাদিত, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

আবুল মনসুর আহমদ (১৩৪৯)। ‘সাহিত্যে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য’, *মাসিক মোহাম্মদী*, সম্পাদক : মোহাম্মদ আকরম খাঁ, ষোড়শ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, কলকাতা

আবুল মনসুর আহমদ (১৯৪৭)। ‘বাংলাই আমাদের রাষ্ট্র-ভাষা হইবে’, *পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষা বাংলা – না উর্দু?*, প্রকাশক : অধ্যাপক এম. এ. কাসেম, প্রথম সংস্করণ, তমদ্দুন মজলিস প্রচার বিভাগ, ঢাকা

আবুল মনসুর আহমদ (১৯৬৮)। ‘মূল সভাপতির অভিভাষণ’, *পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য*, সম্পাদনা : সরদার ফজলুল করিম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

আবুল মোমেন (২০২০)। ‘হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক : ইতিহাসের আলোকে’, *সাতচল্লিশের দেশভাগ*, সম্পাদনা : বুদ্ধদেব ঘোষ, দেবব্রত বিশ্বাস, কথাপ্রকাশ, ঢাকা

আবুল হাসনাত (২০১০)। ‘মুখবন্ধ’, *আলোছায়ার যুগলবন্দি : মাহমুদুল হক স্মরণে*, আবুল হাসনাত ও অন্যান্য সম্পাদিত, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

আলমগীর টুলু (২০১৫)। ‘প্রসঙ্গ আগুনপাখি’, *অন্তর্দেশ*, সম্পাদক : ভীষ্মদেব চৌধুরী, দ্বিতীয় সংখ্যা, ঢাকা

আহমদ মোস্তফা কামাল [সম্পাদিত] (২০১৩)। ‘মাহমুদুল হকের নির্বাচিত সাক্ষাৎকার’, *হিরন্ময় কথকতা*, শুদ্ধস্বর, ঢাকা

ইমতিয়ার শামীম (২০১৫)। ‘আগুনপাখি : ব্যক্তিনির্মাণযজ্ঞ’, *হাসান আজিজুল হক : নিবিড় অবলোকন*, চন্দন আনোয়ার সম্পাদিত, কথাপ্রকাশ, ঢাকা

কাজী মোতাহার হোসেন (২০০৯)। ‘সাহিত্যিক আবুল ফজল’, *মানবতন্ত্রী আবুল ফজল : শতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থ*, সম্পাদক : আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য, সময় প্রকাশন, ঢাকা

কানিজ ফাতেমা (২০১৫)। ‘উপনিবেশিত মানবের হৃত-শৈশব : মাহমুদুল হকের উপন্যাস’, *সাহিত্য পত্রিকা*, বর্ষ ৫২, সংখ্যা ৩, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

গোলাম মুস্তাফা (২০১৯)। ‘কয়েকটি নির্বাচিত উপন্যাসে ১৯৪৭-এর দেশভাগ’, *নান্দীপাঠ*, সংখ্যা : আট, সম্পাদক : সাজজাদ আরেফিন, ঢাকা

গোলাম সাকলায়েন (১৯৮১)। ‘জীবনকথা’, *শহীদুল্লা কায়সার রচনাবলী* প্রথম খণ্ড, সম্পাদক: গোলাম সাকলায়েন, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা

গৌতম রায় (২০১৪)। ‘কালো বরফ : দেশভাগের সাহিত্যের চেয়েও বেশি কিছু’, *গল্পকথা*, বর্ষ ৪ সংখ্যা ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, সম্পাদক : চন্দন আনোয়ার, রাজশাহী

ত্রিদিবসন্তপা কুণ্ডু (২০২০)। ‘বাংলায় দেশভাগের অভিজ্ঞতার পুর্নির্মাণ সমস্যা ও সম্ভাবনা’, *পার্টিশন সাহিত্য : দেশ-কাল-স্মৃতি*, সম্পাদনা : মননকুমার মণ্ডল, গাঙচিল, কলকাতা

দীপেশ চক্রবর্তী (২০১৮)। ‘বাস্তুহারার স্মৃতি ও সংস্কার : ছেড়ে আসা গ্রাম’, *দেশভাগ : স্মৃতি আর স্তব্ধতা*, সম্পাদনা : সেমন্তী ঘোষ, গাঙচিল, কলকাতা

পিয়াস মজিদ (২০১৪)। ‘রশীদ করীম একজনই’, *একজন উত্তম পুরুষ*, সম্পাদনা : হামিদ কায়সার, জয়তী, ঢাকা

ফেরদৌসী আরা আলীম (২০১০)। ‘মাহমুদুল হক ও তাঁর কথাসাহিত্য’, *আলোছায়ার যুগলবন্দি : মাহমুদুল হক স্মরণে*, আবুল হাসনাত ও অন্যান্য সম্পাদিত, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

বদরুদ্দীন উমর (২০১৬)। ‘দেশভাগ এবং কিছু স্মৃতি’, *পশ্চিম থেকে পূর্ববঙ্গ : দেশবদলের স্মৃতি*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, সম্পাদনা : রাহুল রায়, গাঙচিল, কলকাতা

বিনায়ক সেন (২০১৬)। ‘হুমায়ূন ও তাঁর *মধ্যাহ্নের* সমাজ’, *কালের খেয়া*, দৈনিক সমকাল, ১৫ই জুলাই, ঢাকা (https://samakal.com/todays-print-edition/tp-kaler-kheya/article/1607223799)

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০২০)। ‘সেলিনামঙ্গল’, *সেলিনা হোসেনের সাহিত্যকীর্তি : পাঠ ও মূল্যায়ন*, সম্পাদক : চন্দন আনোয়ার, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা

বেগম আকতার কামাল (২০১২)। ‘ওয়ারিশ : সময়-গাঁথা জীবনের উত্তরাধিকার’, *উলুখাগড়া* ১৬, সম্পাদক : সৈয়দ আকরম হোসেন, ঢাকা

মননকুমার মণ্ডল (২০১৯)। ‘ভূমিকা’, *পার্টিশন সাহিত্য : দেশ-কাল-স্মৃতি*, সম্পাদনা : মননকুমার মণ্ডল, গাঙচিল, কলকাতা

মফিদুল হক (২০১৮)। ‘দেশভাগ : আমাদের বিষবৃক্ষ’, *দেশভাগ : স্মৃতি আর স্তব্ধতা*, সম্পাদনা : সেমন্তী ঘোষ, গাঙচিল, কলকাতা

মফিদুল হক (২০২১)। 'মাহমুদুল হক : কাছের মানুষ দূরের মানুষ', *মাহমুদুল হকের মানস ও সৃষ্টি অবলোকন*, চন্দন আনোয়ার সম্পাদিত, কবি প্রকাশনী, ঢাকা

মুনিরা সুলতানা (২০২২)। 'দেশ বিভাজনের প্রতিবেদন : খুশবন্ত সিং ও দেবেশ রায়', *সাহিত্য পত্রিকা*, বর্ষ ৫৭ সংখ্যা ৩, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (২০১৫)। 'অভিভাষণ – পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন', *ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্মারকগ্রন্থ*, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, সম্পাদনা : শামসুজ্জামান খান, আজহার ইসলাম ও সেলিনা হোসেন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মোরশেদ শফিউল হাসান (২০১৫)। 'আবুল মনসুর আহমদ : গণতন্ত্র-ভাবনা', *আবুল মনসুর আহমদ স্মারকগ্রন্থ*, সম্পাদক : ইমরান মাহফুজ, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা

মোহাম্মদ আজম (২০১৭)। '*চিলেকোঠার সেপাই* : জীবনবোধ ও প্রকাশরীতির কয়েকটি দিক', *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ও তাঁর উপন্যাস*, সম্পাদনা : মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

মোহাম্মদ আজম (২০১৭)। 'সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে নজরুলের বোঝাপড়া এবং বাংলাদেশের সম্প্রদায়-সংকট', *সাহিত্য পত্রিকা*, বর্ষ ৫৫ সংখ্যা ১, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

মোহাম্মদ আজম (২০১৮)। 'আবুল মনসুর আহমদের খোঁজে : বুদ্ধদেব বসুর সাথে তর্কের সূত্র ধরে', *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা : ৯৭, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

মো. রাফাত আলম মিশু (২০২৩)। 'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন : সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াশীলতার অনুষঙ্গে ইতিহাসের পুনঃপাঠ', *সাহিত্য*

পত্রিকা, বর্ষ ৫৮, সংখ্যা ১-২, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মৌমিতা রায় (২০২১)। 'রাজিয়া খানের *হে মহাজীবন* : দেশভাগ ও ব্যক্তিসঙ্কট', *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ভাষা-সাহিত্যপত্র*, ৪৭তম সংখ্যা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

যতীন সরকার (১৩৯৭)। 'ইতিহাসচেতন শওকত ওসমান', সরকার আশরাফ (সম্পাদিত), *নিসর্গ*, ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা, ফাল্গুন (শওকত ওসমান সংখ্যা), বগুড়া

যতীন সরকার (২০১৫)। 'আবুল মনসুর আহমদের জীবনদর্শন : 'জীবন-ক্ষুধা'র দর্পণে' *আবুল মনসুর আহমদ স্মারকগ্রন্থ*, সম্পাদক : ইমরান মাহফুজ, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা

রফিকউল্লাহ খান (২০০৩)। 'পঁচিশ বছরের বাংলাদেশের উপন্যাস', *বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের সাহিত্য*, সম্পাদক : সাঈদ-উর রহমান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

রফিকউল্লাহ খান (২০২০)। 'সেলিনা হোসেনের *যাপিত জীবন*', *সেলিনা হোসেনের সাহিত্যকীর্তি : পাঠ ও মূল্যায়ন*, সম্পাদক : চন্দন আনোয়ার, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা

রফিকুল ইসলাম (২০০৪)। 'বাঙলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : সংক্ষিপ্ত রূপরেখা', *বাঙলাদেশ*, দ্বিতীয় সংস্করণ, সম্পাদনা : মনসুর মুসা, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

রফিকুল ইসলাম (২০১৫)। 'আবুল মনসুর আহমদ : প্রাসঙ্গিক গ্রন্থপরিচয়', *কালের ধ্বনি*, বর্ষ ৫, সংখ্যা ৫, সম্পাদক : ইমরান মাহফুজ, ঢাকা

শাহরিয়ার কবির (২০২৩)। 'ভূমিকা', জহির রায়হান, *একুশে ফেব্রুয়ারী*, সপ্তম মুদ্রণ, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা

সন্‌জীদা খাতুন (২০১০)। ‘*আগুনপাখি*র জীবনসত্য’, *উলুখাগড়া* ১২, ফাল্গুন ১৪১৬ সম্পাদক : সৈয়দ আকরম হোসেন, ঢাকা

সনৎকুমার সাহা (২০১৫)। ‘বিহাসে এখন হাসান আজিজুল হক’, *হাসান আজিজুল হক : নিবিড় অবলোকন*, চন্দন আনোয়ার সম্পাদিত, কথাপ্রকাশ, ঢাকা

সরদার ফজলুল করিম (১৯৬৮)। ‘প্রসঙ্গ কথা’, *পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য*, সম্পাদনা : সরদার ফজলুল করিম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

সাঈদ ফেরদৌস (২০১৮)। ‘১৯৪৭ এর বাংলাভাগ : ভারতকেন্দ্রিকতার পরপারে’, বক্তৃতা : দশম মাসিক সাধারণ সভা, কাউন্সিল ২০১৮ ও ২০১৯, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা

সাযযাদ কাদির (২০১৩)। ‘একজন উত্তম পুরুষ’, *একজন উত্তম পুরুষ*, সম্পাদনা : হামিদ কায়সার, জয়তী, ঢাকা

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (২০১৩)। ‘উত্তম পুরুষ’, *একজন উত্তম পুরুষ*, সম্পাদনা : হামিদ কায়সার, জয়তী, ঢাকা

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (২০২০)। ‘মুখবন্ধ’/ ‘দেশভাগের দায়দায়িত্ব’, *সাতচল্লিশের দেশভাগ*, সম্পাদনা : বুদ্ধদেব ঘোষ, দেবব্রত বিশ্বাস, বাংলাদেশ সংস্করণ, কথাপ্রকাশ, ঢাকা

সিরাজ সালেকীন (২০১৭)। ‘রঞ্জু থেকে ওসমান গনি’, *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ও তাঁর উপন্যাস*, সম্পাদনা : মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

সিরাজ সালেকীন (২০২০)। ‘গল্প থেকে নিরন্তর’, *সেলিনা হোসেনের সাহিত্যকীর্তি : পাঠ ও মূল্যায়ন*, সম্পাদক : চন্দন আনোয়ার, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা

সুস্মিতা শেঠ (২০২১)। ‘সেলিনা হোসেনের ‘গায়ত্রী সন্ধ্যা’ : এক অভিবাসী মানুষের শিকড়-সন্ধান’, *বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ ও*

উদ্‌বাস্তু জীবনবোধ, সম্পাদনা : সুব্রত কুমার দে, অঞ্জলি প্রকাশনী, কলকাতা

সেমন্তী ঘোষ (২০১৮)। 'দেশভাগের ইতিহাস আর স্মৃতি-বিস্মৃতি', *দেশভাগ : স্মৃতি আর স্তব্ধতা*, সম্পাদনা : সেমন্তী ঘোষ, গাঙচিল, কলকাতা

সেলিনা হোসেন (২০১৭)। 'ফিরে দেখা আপন ভুবন', *বহুমাত্রিক কথাশিল্পী সেলিনা হোসেন : ৭০তম জন্মবার্ষিকী*, বঙ্গীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি সংসদ, ১৪ জুন, ঢাকা

সেলিনা হোসেন (২০১৯)। 'দেশভাগের সাহিত্য : শিল্পের বেদনায় বহুমাত্রিক ক্যানভাস', *পার্টিশন সাহিত্য : দেশ-কাল-স্মৃতি*, সম্পাদনা : মননকুমার মণ্ডল, গাঙচিল, কলকাতা

সৈয়দ আকরম হোসেন (২০০৪)। 'বাঙলাদেশ', *বাঙলাদেশ*, মনসুর মুসা সম্পাদিত, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

সৈয়দ আজিজুল হক (২০১০)। 'আবুল ফজলের উপন্যাসে সমাজবাস্তবতা', *হালখাতা*, বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা, সম্পাদক : শওকত হোসেন, ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা জানুয়ারি মার্চ, ঢাকা

সৈয়দ আজিজুল হক (২০১৭)। 'শওকত ওসমানের উপন্যাস : উপনিবেশবাদ-বিরোধী রাজনৈতিক চেতনা', শওকত ওসমান জন্মশতবর্ষ স্মারক বক্তৃতা, বাংলা গবেষণা সংসদ, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

সৈয়দ আজিজুল হক (২০২০)। 'নিষ্ঠুরতম কলঙ্কিত এক রাতের আখ্যান', *সেলিনা হোসেনের সাহিত্যকীর্তি : পাঠ ও মূল্যায়ন*, সম্পাদক : চন্দন আনোয়ার, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা

সৈয়দ আজিজুল হক (২০২২)। 'পঞ্চাশের দশকের ঔপন্যাসিক : নবতর চেতনায় উজ্জ্বল', *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সম্পাদক : হারুন রশীদ, সংখ্যা ১০২-১০৩, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

হামিদ কায়সার (২০১৩)। ‘সম্পাদকীয়’, *একজন উত্তম পুরুষ*, সম্পাদনা : হামিদ কায়সার, জয়তী, ঢাকা

হারুন পাশা (২০২৩)। ‘সেলিনা হোসেনের সঙ্গে আলাপচারিতা’, *পাতাদের সংসার*, ৯ম বর্ষ ৩৪তম সংখ্যা, সম্পাদক : হারুন পাশা, ঢাকা

হাসান হাফিজুর রহমান (২০০১)। ‘একুশে ফেব্রুয়ারী’, *একুশে ফেব্রুয়ারী*, সম্পাদক : হাসান হাফিজুর রহমান, সময় প্রকাশন (সংস্করণ), ঢাকা

হায়াৎ মামুদ (২০১৬)। ‘দেশটাকে কখনও বিদেশ মনে হয়নি’, *পশ্চিম থেকে পূর্ববঙ্গ : দেশবদলের স্মৃতি*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, সম্পাদনা : রাহুল রায়, গাঙচিল, কলকাতা

হায়াৎ মামুদ (২০১৬)। ‘কাৎলাহার রহস্যকথা ও ভূগোল-পারম্পর্য’, *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস*, লিরিক বিশেষ সংখ্যা, সম্পাদক : এজাজ ইউসুফী, বাতিঘর, ঢাকা।

Maurice & Taya Zinkin (1970) `Impresson, 1938-47’, C.H. Philips and Mary Doreen Wainwright (eds.) *The Partition of India : Politics and Perspectives 1935-1947*, Geroge Allen & Unwin Ltd., London.

সমাপ্ত